রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সিটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ
অরুণকুমার সেন, এম্. এ. (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত); এম্. এস্-সি. (ইকন্., লণ্ডন);
ব্যারিষ্টার এ্যাট্-ল
প্রণীত

অধ্যাপক **নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,** এম্. এ.
লিখিত
'রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ' নামক রচনা সম্বলিত

PREPARED IN ACCORDANCE WITH
THE SYLLABI ON
TWO-YEAR & THREE-YEAR DEGREE
COURSES

দি সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রকাশক
দি সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সীর পক্ষে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, বি. এস্-সি.
১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

[মূল্য পাঁচ টাকা]

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—আগষ্ট, ১৯৬১

মুদ্রাকর
শ্রীরমেশচন্দ্র বসু
এলিট প্রেস প্রাইভেট্ লিমিটেড
১০, হরমোহন ঘোষ লেন
কলিকাতা-১০

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণে বিশেষ পরিমার্জনা ছাড়াও ত্রি-বার্ষিকী কোর্সের (THREE-YEAR DEGREE COURSE) প্রয়োজনে কয়েকটি অধ্যায়ের আলোচনা পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে, কয়েকটি অধ্যায় সম্পূর্ণ নূতনভাবে লিখিতও হইয়াছে। স্বভাবতই সংস্করণটির আকার পূর্বাপেক্ষা কিছুটা বৃহৎ হইয়াছে। আশা করি পরিমার্জনার ফলে সংস্করণটি দ্বি বার্ষিকী ও ত্রি-বার্ষিকী উভয় প্রকার স্নাতকশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সমান উপযোগী হইবে।

এই প্রসংগে জানাইতে চাই যে, গ্রন্থখানির উন্নতিসাধনে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আমার সহকর্মীবৃন্দ পূর্বের ন্যায়ই নানাভাবে সহায়তা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইতি—

২১শে আগষ্ট, ১৯৬১
সিটি কলেজ
কলিকাতা

অরুণকুমার সেন

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার 'পৌরবিজ্ঞান' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পর বিভিন্ন স্থান হইতে বি. এ. ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাংলায় একখানি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য একরূপ অবিরামভাবেই অনুরোধপত্রাদি আসিতে থাকে। ফলে আমাকে গ্রন্থরচনাকার্য স্থরু করিতে হয়। রচনাকালে গ্রন্থখানি যাহাতে বি. এ. ছাত্রছাত্রীগণ ছাড়াও সাধারণ পাঠকের উপকারে আসে সে-দিকেও যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরিভাষার অপ্রতুলতাহেতু পদে পদে বিশেষ অস্থবিধা ভোগ করিতে হইলেও প্রয়োজনীয় বিতর্কমূলক আলোচনার কোন অংশকে উপেক্ষা করি নাই। রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রায় সকল আধুনিক আলোচনাই সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থখানি যাহাতে ব্যক্তিগত মতামতে ভারাক্রান্ত বা পক্ষপাতদুষ্ট না হয় সে-দিকেও যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিয়াছি। তবুও গ্রন্থখানিতে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিয়া যাইতে পারে। আশা করি সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দ এবং পাঠকগণ ভবিষ্যতে গ্রন্থখানিকে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠকদের জন্য অধিকতর উপযোগী করিয়া তোলার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। ইতি—

অরুণকুমার সেন

Syllabus on Two-year Degree Course
POLITICAL THEORY

Definition. Scope. Methods.

The State. Leading Theories of its Origin and Nature. Law. Government.

The People of the State. The Nation. Nationality as a constituent element of the State. Political Society. Privileged classes. Citizenship. Classes without Political Rights. Rights and Duties. Natural Law. The Territory of the State. Its Political Divisions.

The Constitutions of the State. Different forms of Constitutions. Monarchy, Oligarchy, Aristocracy, Democracy.

The Structure of the State. The Legislature. The Executive. The Judiciary. Power of Taxation. Control of the Public Purse. Test of Popular Liberty.

Growth of the State. Functions of Legislation. The Individual and the State.

The Ends and Functions of the State. Sovereignty and Subjection. The Nature and Organisation of the Public Services.

Syllabus on Three-year Degree Course
POLITICAL THEORY

Definition and scope of Political Science—Relation of Political Science to other Sciences—Methods of Political Science.

Definition of State—Difference between State, Government and other Associations.

Leading Theories of the Origin and Nature of the State—Theory of Divine Origin—Theory of Force—Theory of Social Contract—Views of Hobbes, Locke and Rousseau—Evolutionary Theory of the Origin of the State—Organic Theory about the nature of the State—The Idealist Theory—Marxist conception of the State.

Nature and characteristics of Sovereignty—Legal and Political Sovereignty—De Jure and De Facto Sovereignty—Doctrine of Popular Sovereignty—Austinian Theory of Sovereignty—its critical estimate—Theory of Limited Sovereignty. Attacks upon the Monistic Theory of Sovereignty.

Definition and nature of Law—Different kinds of Law—Sources of Law. Distinction and relation between Law and Morality. Relation between Law and Liberty—The Concept of Liberty, Safeguards of Liberty in a modern State—Concept of Natural Law and Natural Right.

Meaning of Nationality—Nation and Nationalism—Essential elements of Nationality—Right of Self-Determination—Mono-National State Vs. Poly-National State—Dangers of Nationalism—Nationalism and Internationalism.

Citizens and Aliens—Modes of acquiring citizenship—Rights and Duties of citizens—Hindrances to good citizenship—Relation between Rights and Duties.

Unions of State and Forms of Government—Personal and Real Union-Confederation Federal Union—Nature and types of Federation —Chief features and conditions of Federation—Merits and defects of Federation—Alliance—Distinction between Unitary and Federal Governments.

Forms of Governments—Monarchy, Aristocracy, Oligarchy and Democracy—Types of Democracy—Strength and weakness of Democracy—Comparison between Democracy and Dictatorship—Conditions essential to the success of Democracy—Parliamentary and Presidential Governments, their strength and weakness.

Structure of Government—Organisation and functions of Legislature, Executive and Judiciary—Bicameralism, its merits and defects—Separation of Powers.

Functions of Government—Individualism and Socialism—their comparative merits and defects—Types of Socialism.

Constitution—Different kinds of constitutions—their strength and weakness.

Party systems—Its advantages and disadvantages—Two-party system Vs. Multiple-party system—One-party Rule.

Public opinion—Its nature and its Importance in Popular Government—Agencies for the formation of Public Opinion.

Electorate—Universal Suffrage—Methods of Minority representation—Direct and Indirect election—Relation between the representative and his constituency.

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ

অধ্যাপক নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ব্যাপকভাবে মানব-সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে মানুষ ধীরে ধীরে অন্ধবিশ্বাসের পথ ছাড়িয়া ক্রমে বুদ্ধি ও যুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে। মানুষের ইতিহাসকে বুদ্ধিবৃত্তির বিবর্ত্তনের ইতিহাস বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ দ্বারা মানুষ নিজ জীবনযাত্রাকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে; নিজ পরিবেশকে ইচ্ছামত যথাসম্ভব পরিবর্ত্তিত করিয়া মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিয়াছে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে এই ধারা অল্পবিস্তর সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে পরিলক্ষিত হয়।

রাষ্ট্র মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের একটি প্রকাশ। যে সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিবিধান করিয়াছে তাহার ভিতর রাষ্ট্রই সর্ব্বপ্রধান। রাষ্ট্র যে শুধু সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছে তাহা নহে, রাষ্ট্র মানুষের নৈতিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আবশ্যক ও শক্তি-অনুযায়ী নানা প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছে। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ামকরূপে অগ্রসর হইয়াছে। তাই সর্ব্বদেশে রাষ্ট্রশক্তি বিপুলভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রভাবের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব এত বেশি যে তাহার পরিমাপ করা অসম্ভব। জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরাট অবদান আছে বলিয়াই চিন্তানায়কেরা রাষ্ট্রের রূপ, গঠন, প্রকৃতি ও আদর্শ সম্বন্ধে নিজ নিজ চিন্তার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে আরও দেখা যায় যে বিভিন্ন কালের রাষ্ট্রচিন্তার উপর তৎকালীন যুগধর্ম্ম আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিভিন্ন যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ রাষ্ট্রদর্শনের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই কোন যুগের রাষ্ট্রচিন্তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে সেই যুগের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ইতিহাসের সহিত পরিচয় স্থাপন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। প্লেটোর মহান আদর্শ বুঝিতে হইলে গ্রীসের খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর রাষ্ট্রিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ধারণা অপরিহার্য্য। রুশোর রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী পটভূমিকায় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। রাষ্ট্রিক আদর্শ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রভাবগুলির ফলস্বরূপ। অন্যপক্ষে, যে সকল রাষ্ট্রাদর্শ জনসাধারণের মনের উপর ব্যাপকভাবে ক্ষমতাবিস্তার করে তাহা সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে মৌলিকভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয়। রুশোর ভাবধারা ফরাসীদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর যে অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারই ফলে ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। মার্কসীয় দর্শন নিষ্পেষিত জনসাধারণের মানসলোকে

যে আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছে, তাহারই জন্য বৈপ্লবিক সমাজবাদ আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রিক আদর্শ বিভিন্নকালে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। অনেক সময় রাষ্ট্রচিন্তা প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিদেরা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন যে রাজন্যবর্গের স্বেচ্ছাচারী শাসন-ব্যবস্থার পশ্চাতে বিধিদত্ত অধিকার আছে। রাজার সকল আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করাই প্রজাগণের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য। নৃপতির আদেশ লঙ্ঘন করা ও ভগবানের বিরোধিতা করা একই বস্তু। বলা বাহুল্য, এই নীতি প্রতিক্রিয়াশীল রাজন্যবর্গকে স্বৈরাচারে সহায়তা করিয়াছে। আর একশ্রেণীর রাষ্ট্রচিন্তাকে সমালোচনা-মূলক রাষ্ট্রচিন্তা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তাধারা পুরাতন ও প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের প্রতিকূল। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন এই শ্রেণীর চিন্তাধারার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই গোষ্ঠীর চিন্তানায়কেরা ধীরে ধীরে এই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চান। ইঁহারা ক্রমবিবর্ত্তনে বিশ্বাসী। মিল প্রভৃতি উদারনৈতিক রাষ্ট্রবিদেরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ আছেন যাঁহারা বিপ্লবপন্থী। বৈপ্লবিক রাজনৈতিকেরা রাষ্ট্র, সমাজ বা অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন কামনা করেন এবং তদনুযায়ী নীতি ও কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন! রুশো, কার্ল মার্কস্ প্রভৃতি দার্শনিক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বিবর্ত্তনের ফলে কোন সুদূর অতীতে মানুষ পৃথিবীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কে জানে! মানবসমাজ সভ্যতার অভিযানে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমানকালে উপনীত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ বিবর্ত্তনে মানুষের অর্থ নৈতিক পরিবেশ একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। অর্থ-নৈতিক দিক হইতে মানব ইতিহাস বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। শিকারের যুগ মানব ইতিহাসের প্রথম যুগ; এই যুগে মানুষ কোন কোন বন্য হিংস্র প্রাণীর ন্যায় ছোট ছোট দল গঠন করিয়া পশুশিকারের দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। দ্বিতীয় যুগকে সমাজতত্ত্ববিদেরা পশুপালনের যুগ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এই যুগে মানুষ বন্য পশুকে আয়ত্তে আনিয়া গৃহপালিত করিবার বুদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। এই দুই যুগেই মানুষ যাযাবর; তাহার কোন স্থায়ী বাসস্থান নাই। তৃতীয় যুগে মানুষ কৃষিবিদ্যার সন্ধান লাভ করিয়াছে এবং উর্ব্বরা নদী উপত্যকায় স্থায়ীভাবে নিজ বসবাস স্থাপন করিয়াছে। চতুর্থ যুগই বর্ত্তমান শিল্পের যুগ। প্রতিযুগের ধনোৎপাদন ব্যবস্থা মানুষের জীবনপদ্ধতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। আদিম মানুষ যখন আত্মরক্ষার জন্য সাহসী নেতার কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছে, যখন প্রাকৃতিক শক্তির রোষ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে, আদিম পুরোহিতের আদেশে, দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই রাষ্ট্রদর্শনের সূত্রপাত হইয়াছে।

রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাস আদিম শিকারের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। রাষ্ট্রচিন্তার ধারা মানব ইতিহাসের ন্যায়ই সুপ্রাচীন। গিরি-নির্ঝরিণী যেমন সুদূর নিভৃত গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হইয়া নানা গিরিসংকটের সঙ্কীর্ণ পন্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং বিশালতা ও পুষ্টিলাভ করে তেমনি অজ্ঞাত অতীতে আদিম মানুষের জগতে যে নগণ্য চিন্তাটুকু আরম্ভ হইয়াছিল, যে শাসনপদ্ধতি আদিম মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা গঠিত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্তী যুগসমূহে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাবে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক কালে বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে।

রাষ্ট্রদর্শনের ঐতিহাসিকেরা নানা সূত্র হইতে তাঁহাদের চিন্তার মালমশলা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। শাসনপদ্ধতি, দার্শনিকগণের গ্রন্থাবলী, রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তানায়কদিগের বক্তৃতাবলী, সাহিত্য, সরকারী দলিল, সাময়িক পত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিকদের গবেষণার বিষয়বস্তু যোগাইয়াছে। এ্যাথেন্সের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা, প্রজাতান্ত্রিক এ্যাথেন্সের রাষ্ট্রপতি পেরিক্লিসের বক্তৃতা, দার্শনিক প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের গ্রন্থাবলী, ইউরিপাইডিস ও এ্যারিষ্টোফেনীসের নাটকাবলী, থুকিডিডিসের ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন সূত্র হইতে গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

প্রাচ্যজগতেই সর্ব্বপ্রথম স্থায়ী ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন মিশর, আসীরীয়া, ব্যাবিলনীয়া ও পারস্যে যদিও স্থায়ী শাসনপদ্ধতি দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল তথাপি রাষ্ট্রদর্শন বলিলে যুক্তিমূলক যে সূক্ষ্ম চিন্তাধারাকে সূচিত করে এই সকল দেশে তাহার উদ্ভব হয় নাই। এই ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত ও মহাচীনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। এই দুইটি দেশে শুধু যে স্থায়ী রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা নহে, সুচিন্তিত রাষ্ট্রদর্শনও জন্মলাভ করিয়াছিল। এমনকি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মতবাদ এবং সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শের সুস্পষ্ট আভাস প্রাচীন হিন্দু ও চৈনিক গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো ও বিশেষতঃ এ্যারিষ্টটলের প্রভাবে রাষ্ট্রদর্শন যেমন একটি বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল প্রাচীন ভারত ও চীনে রাষ্ট্রচিন্তার তেমন উন্নতি সম্ভব হয় নাই। প্রাচীন গ্রীসকে সত্যই বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির জন্মস্থান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে কয়েকটি বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা যায়।

(১) গ্রীসীয় যুগঃ এই যুগে যে সকল চিন্তানায়কেরা রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল্ সর্ব্বপ্রধান। প্লেটোর কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদের আদর্শ সেই যুগের মানুষের কাছে এক নূতন পথের সন্ধান দেয়। এ্যারিষ্টটল্ যদিও প্লেটোর সাম্যবাদমূলক মতবাদের বিরোধিতা করেন তথাপি প্লেটোর ন্যায় তিনিও রাষ্ট্রকে মানুষের জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রাধান্য ও ক্ষমতা দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গ্রীসের কোন

কোন সোফিষ্ট এবং ষ্টোইক ও এপিকিউরিয়ান নামক দার্শনিক সম্প্রদায়দ্বয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

(২) রোমক যুগঃ রোমের রাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির মূলীভূত আদর্শ ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক মতবাদকে প্রভাবিত করিয়াছে। আইন ও শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই রোমের মৌলিকতা; চিন্তার ক্ষেত্রে সিসেরো প্রভৃতি রোমক লেখকগণ বিভিন্ন গ্রীসীয় দার্শনিকদের মতবাদ সসম্ভ্রমে ও নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) মধ্যযুগঃ মধ্যযুগে খৃষ্টধর্ম্ম বিপুলভাবে ইউরোপীয় জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। ইহার ফলে তদানীন্তন খৃষ্টধর্ম্মের সর্ব্বাধিনায়কেরা অর্থাৎ পোপগণ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ জুড়িয়া খৃষ্টধর্ম্মসম্মত এক বিরাট ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। হিল্‌ডেব্র্যাণ্ড বা পোপ সপ্তম গ্রেগরী এই মতাবলম্বীদের মুখপাত্র। এই মতবাদের প্রসারের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তাই রাষ্ট্রের স্বাধিকারকামী দার্শনিকেরা ইহার বিরুদ্ধে নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় কবি বিশ্বশান্তিকামী ডাণ্টে ও গণতন্ত্রের উপাসক মারসিগ্‌লিও এই ভাবের ভাবুক ছিলেন।

(৪) রেনেইসান্স যুগঃ রেনেইসান্স যুগে মানুষের মন মধ্যযুগের ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার মুক্ত হইয়া প্রাচীন গ্রীস-রোমের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন ও শিল্পকলার বিশ্বাসী হইয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার মানুষের দৃষ্টিকে সুদূর প্রসারী করিয়া তোলে। এই সময়ে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের ধারা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। রেনেইসান্স যুগের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রদার্শনিক ছিলেন মেকিয়াভেলি। ইটালীকে বহিঃশত্রুর অধিকার হইতে মুক্ত করিবার জন্য জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ মেকিয়াভেলি প্রচার করেন যে জাতীয় একতা ও মঙ্গল সাধনকল্পে নীতিমূলক বা নীতিবিরুদ্ধ যে কোন উপায় অবলম্বন করা সকল রাজারই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এই সময়ে ইংলণ্ডের দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিদ্ সার টমাস্ মোর মানবহিতৈষণা মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া লোক সমাজে কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করেন।

(৫) রেফরমেশন যুগঃ এই যুগে লুথার প্রভৃতি প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ পোপের অনাচারের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং পোপের একনায়কত্বে উত্যক্ত ইউরোপের রাজন্যবর্গের সাহায্যে নূতন ধর্ম্মপ্রচারে বদ্ধপরিকর হন। লুথার প্রভৃতি প্রচার করেন যে নিজ ইচ্ছানুযায়ী প্রজাশাসন করা রাজন্যবর্গের ঈশ্বরদত্ত অধিকার। এই প্রচারের ফলে অনেক দেশে নৃপতিদিগের স্বৈরাচার বৃদ্ধি পায়। হল্যাণ্ডে স্পেনীয় নৃপতিবর্গের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ওলন্দাজেরা বিদ্রোহ উত্থাপন করে এবং ওলন্দাজ প্রজাতন্ত্রের অভ্যুত্থান হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ব্যক্তি-স্বাধীনতামূলক ও রাজতন্ত্রবিরোধী রাষ্ট্রনীতি প্রসার লাভ করিতে থাকে। রেফরমেশনের যুগে বর্ত্তমান সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের সূচনা দেখা দেয়। ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক বোদ্যাঁ সার্ব্বভৌমত্বের নীতি বৈজ্ঞানিক গঠিত করেন।

(৬) বিপ্লবের যুগঃ এই যুগে রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে দুইটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। একটি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং অপরটি ঐ শতাব্দীর শেষভাগে। মহাকবি মিল্টন, জন লক্ প্রভৃতি মণীষীরা চুক্তিবাদ বা Contract Theory-র ভিত্তিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণসার্ব্বভৌমত্ব বা Popular Sovereignty-র বাণী প্রচার করেন এবং ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্স্, সার রবার্ট ফিলমার প্রভৃতি বিধিদত্ত অধিকারের দোহাই পাড়িয়া রাজার স্বেচ্ছাচারিতা সমর্থন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে টমাস্ হবস্ রাজার সার্ব্বভৌম ক্ষমতার সপক্ষে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Contract Theory বা চুক্তিবাদ প্রচার করিতে থাকেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণ-সার্ব্বভৌমত্বের বাণী ফরাসী দেশে ও আমেরিকায় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ইংরাজ অধিকৃত আমেরিকার উপনিবেশ-বাসিগণ ১৭৭৬ সালে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে ইংরাজ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয় ও দীর্ঘ সাত বৎসর যুদ্ধের পর জয়লাভ করে। রাষ্ট্রদর্শনের দিক হইতে আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্র অতিশয় মূল্যবান কিন্তু তদপেক্ষা মূল্যবান ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা। ফরাসী দার্শনিক মঁতেস্কিউয়ে ও রুশোর সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ফরাসী বিপ্লব অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিকতার অবসান এবং গণতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাত হয়।

(৭) ঊনবিংশ শতাব্দীঃ এই যুগে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে অগ্রগতি লাভ করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্পবিপ্লব জয়যুক্ত হয়, এবং তাহার ফলস্বরূপ রাষ্ট্রিক ক্ষমতা সামন্তবর্গ বা জমিদারশ্রেণীর হস্ত হইতে ক্রমে শিল্পপতিগণের করায়ত্ত হয়। মিল্, স্পেন্সার প্রভৃতি ইংরেজ মনীষিগণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বাণী প্রচার করিতে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্ম্মানী বহুধাবিভক্ত ও ইংল্যাণ্ডের তুলনায় অনগ্রসর ছিল। অল্পসময়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিবিধানের জন্য কয়েকজন জার্ম্মান দার্শনিক এই সময়ে জার্ম্মানীতে রাষ্ট্রকর্তৃক সামগ্রিক নায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হেগেলের রাষ্ট্রদর্শন জার্ম্মানীর জাতীয় প্রয়োজনীয়তার মূর্ত্ত প্রকাশ। তিনি প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের ন্যায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাণী উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্রকে মানুষের জীবনের সর্ব্বময় নিয়ন্তা হিসাবে গ্রহণ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। ধনিক ও মজুর শ্রেণীর স্বার্থের ভিতরে এক বিরাট সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কস ও এঙ্গেল্স প্রমাণ করেন যে শ্রেণীবিভেদ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব ধনিকতন্ত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাঁহারা ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ communist manifesto-তে শ্রেণী-সংগ্রামের পথে ধনিকতন্ত্রের অবসান সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে

সাম্যবাদ ব্যতীত অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গঠিত হইতে থাকে। ইহার ভিতর বিবর্ত্তনবাদী সমাজতন্ত্র, গিল্ড সমাজতন্ত্র ও সিণ্ডিক্যালিজম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে বিভিন্নদেশে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রদর্শন বিভিন্ন দিক হইতে প্রাণরস সংগ্রহ করিয়া দৃঢ় ও পুষ্ট হইয়া ওঠে। সমাজতত্ত্ববাদ, বিবর্ত্তনবাদ, মনস্তত্ত্ববাদ, ভৌগোলিক ভাবধারা, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ববাদ রাষ্ট্রদর্শনকে প্রভাবিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রদার্শনিকেরা নিজ নিজ মতবাদ গড়িয়া তোলেন।

(৮) বিংশ শতাব্দী : উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ ধনতন্ত্রবাদের সহিত মিলিত হইয়া পরদেশলোভী সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয় এবং সমগ্র পৃথিবীকে যুদ্ধবিগ্রহে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। বিংশ শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ এই বর্ব্বর জাতীয়তাবাদ, শোষণশীল ধনতন্ত্রবাদ ও পরস্বাপহারী সাম্রাজ্যবাদেরই নগ্ন প্রকাশ। এই শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা রুষ-বিপ্লবকে উপরোক্ত তিনটি মতবাদের বৈপ্লবিক প্রতিবাদ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। রুষ-বিপ্লবে লেনিনের নেতৃত্বে মার্কসের রাষ্ট্রদর্শন জয়যুক্ত হয় এবং সাম্যবাদ শক্তিশালী হইয়া শ্রেণী সংগ্রামের পথে বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করিতে থাকে।

(৯) দুই মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে আর একটি রাজনীতি দ্রুত প্রসারলাভ করে এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ (Communism), উভয়েরই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দণ্ডায়মান হয়। এই নীতি ফাশীজ্‌ম্ নামে অভিহিত হইয়াছে। ইটালীর মুসোলিনী ছিলেন এই মতবাদের প্রবর্ত্তক। একদিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ ও জনসাধারণের সার্ব্বভৌমত্ব এবং অন্যদিকে কমিউনিজমের আন্তর্জ্জাতিকতা এবং আর্থিক ও সামাজিক সাম্যের আদর্শকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া ফাশীজ্‌ম্ একনায়কত্বের ভিত্তিতে উগ্র জাতীয়তা-বাদ ও ধনতন্ত্রবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পায়। হিট্‌লার প্রবর্ত্তিত জার্ম্মানীর নাৎসীজ্‌ম্ এই নীতির সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র প্রকাশ। ইটালী, জার্ম্মানী ও জাপান—এই তিনটি প্রধানতম ফাশীবাদী দেশ বিশ্বজয়ের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবতারণা করে। রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলির যুক্ত প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফাশীবাদের পতন ঘটে।

ফাশীবাদ ধ্বংসের পর ধনতন্ত্রবাদ বনাম সাম্যবাদ বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের উপর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। বলা বাহুল্য যে চীনের কমিউনিষ্ট বিপ্লবের পর ধনতন্ত্র অতিমাত্রায় সঙ্কট হইয়া উঠিয়াছে।

(১০) সাম্যবাদী একনায়কত্ব ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদের দ্বন্দ্ব বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রদর্শনের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। অন্যপক্ষে বর্ত্তমান শতাব্দীকে আন্তর্জ্জাতিকতার যুগও বলা যাইতে পারে। এই যুগে দুইটি মহাযুদ্ধের পর পর জাতিসঙ্ঘ ও সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠান আন্তর্জ্জাতিকতার আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। বিজ্ঞানের

অভূতপূর্ব্ব উন্নতির ফলে মানুষ আজ সর্ব্ববিধ্বংশী আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার সন্ধান পাইয়াছে। সম্মিলিত জাতি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। কিন্তু সর্ব্ববিধ্বংশী মারণাস্ত্রের আস্ফালনে এবং রাশিয়া ও আমেরিকার ক্রমবর্দ্ধমান বিরোধে শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হইয়াছে।

সমগ্র দৃষ্টিতে যদি রাষ্ট্রদর্শনের বিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে কয়েকটি সত্য স্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত হয়। বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রচিন্তা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রতিযুগের মানব-মনের গঠন ও গতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেই যুগের রাষ্ট্রদর্শনের ভিতর। রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসের মধ্য দিয়া আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের মনোরাজ্যের সঙ্গে সংযোগ ও পরিচয় স্থাপন করিতে পারি। ইহাও সামান্য কথা নহে। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমবিকাশ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের ধারার সুস্পষ্ট আভাস দেয়। কিন্তু সর্ব্বোপরি রাষ্ট্রদর্শন ভবিষ্যতের অন্ধকার পথে আলোকপাত করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রাকে সহজ করিয়া তুলিতে পারে।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক ও সমাজ-ব্যবস্থার অসাম্য, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দরিদ্রের উপর ধনিকের দাম্ভিক অবিচার মানবসভ্যতাকে কলুষিত করিয়াছে। আজ গণতন্ত্র ও ন্যায় যুদ্ধের নামে পৃথিবীব্যাপী হত্যার বিরাট ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। সাধারণ মানুষের সুখশান্তি মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল। সভ্যতার এই নিদারুণ সঙ্কট মুহূর্ত্তে রাষ্ট্রিক আদর্শ দীপবর্ত্তিকার ন্যায় বিভ্রান্ত মানবসমাজকে পথনির্দ্দেশ করিতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র

(NATURE AND SCOPE OF POLITICAL SCIENCE)

মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীর কোলে উপস্থিত হইল সে ছিল অত্যন্ত অসহায় ও দুর্বল। চারিদিকে তাহার ছিল প্রতিকূল পরিবেশ; তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে টিকিয়া থাকিতে হইত। ক্রমে প্রকৃতির সহিত সে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে শিখিল এবং নিত্য নূতন উদ্ভাবনের সাহায্যে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন মিটাইবার এবং উদ্দেশ্যসাধন করিবার কাজে লাগাইতে লাগিল। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ আদিম যুগ হইতেই সংঘবদ্ধ; আর সমাজ-বিবর্তনের সূত্রপাতে রহিয়াছে মানুষের এই সংঘবদ্ধতা। প্রথম অবস্থায় দলবদ্ধভাবে মানুষ বনবনান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে ফলমূল আহরণ এবং মৎস্য ও পশুপক্ষী শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাহা সংগ্রহ হইত তাহা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল সামান্যই; তবে যাহা সংগ্রহ করা হইত তাহা দল বা গোষ্ঠীর সমস্ত লোকই সমভাবে ভোগ করিত। তারপর যত দিন যাইতে লাগিল মানুষ পশুপালন, কৃষিকার্য এবং উৎপাদনের অন্যান্য কলাকৌশল শিখিল। সংগে সংগে হইল শ্রমবিভাগের উন্নতি এবং পণ্যবিনিময়-ব্যবস্থার উদ্ভাবন। ইহার ফলে আদিম সমাজগুলির মধ্যে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির হইল উদ্ভব, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা দিল ধনবৈষম্য এবং স্বার্থের সংঘাত। তখন প্রয়োজন হইয়া পড়িল দ্বন্দ্ব-মীমাংসার জন্য একটি বিশেষ শক্তির। রাষ্ট্র তাহার বিধি-ব্যবস্থা, রক্ষি-বাহিনী, বিচারালয়, আমলা প্রভৃতি লইয়া এই বিশেষ শক্তিরূপে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল। তারপর হইতে বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। সমাজ ও রাষ্ট্র বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আজ মানুষ কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য। তাহার সুখদুঃখ, আশা-আকাংক্ষা এই রাষ্ট্রের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনৈতিক সমাজই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

আদিম যুগ হইতেই মানুষ সংঘবদ্ধ

সমাজ-বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে; এই রাষ্ট্রই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

***আলোচনাক্ষেত্র ও সংজ্ঞা* (Scope and Definition) :** রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র বিশেষ বিস্তৃত, কারণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন সম্পর্ক লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা চলে; এবং যাহা কিছুই রাষ্ট্র এবং মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে স্পর্শ করে তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একদিকে যেমন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনা করা হয়,

আলোচনাক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বেরও বিচার-বিশ্লেষণ চলে। আবার রাষ্ট্রকে বুঝিতে হইলে রাষ্ট্র যাহার মাধ্যমে উহার উদ্দেশ্য প্রকাশ ও কার্যকর করে তাহার আলোচনাও প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই মাধ্যম হইল সরকার (Government)। সরকারই রাষ্ট্রের হইয়া আইনকানুন প্রণয়ন করে, দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে কার্যকর করে। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বভাবতই রাষ্ট্রের আলোচনা হইতে সরকারের আলোচনা আসিয়া পড়ে।

আলোচনাক্ষেত্র সম্পর্কে মতানৈক্য

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অবশ্য এই মতের বিরোধিতা করেন। ইঁহারা বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারবার হইল কেবলমাত্র রাষ্ট্রকে লইয়া। জার্মান লেখকগণের অধিকাংশই এই মত পোষণ করেন। আধুনিক লেখকগণের মধ্যেও অনেকে—যথা, অধ্যাপক গার্ণার বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সুরু ও সমাপ্তি হইল রাষ্ট্রকে লইয়া।"* সরকারকে লইয়া যে-শাস্ত্র আলোচনা করে, ইঁহাদের মতে, তাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা সম্পূর্ণ সমীচীন হইবে না।

অপরদিকে, যে-সকল চিন্তাবীর ও লেখক সরকারের আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক গেটেল (Gettell), উইলসন (F. G. Wilson), ল্যাস্কি (Laski) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধ্যাপক গেটেল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন সোজাসুজি 'রাষ্ট্রের বিজ্ঞান' বলিয়া ; কিন্তু তাহার পরেই বলিয়াছেন যে, এই বিজ্ঞান মানুষের যে-সংঘকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হয় তাহাকে এবং সরকারের সংগঠন ও কার্যাবলী লইয়া আলোচনা করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সরকার লইয়াও আলোচনা করে

বস্তুত, সরকার ও তাহার কার্যাবলীর আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হইতে পারে না, কারণ সরকার ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের কল্পনাও আমরা করিতে পারি না। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে প্রকাশিত এবং কার্যকর করা হয়। যাঁহারা রাষ্ট্রকে 'ভাব' বলিয়া ধরিয়া লহেন তাঁহারাও স্বীকার করেন যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা, রাষ্ট্র যাহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠে সেই সরকারের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতীত হয় না। এখানে অধ্যাপক ফ্রান্সিস গ্রাহাম উইলসনের (F. G. Wilson) মত উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে, "রাষ্ট্রের সভ্যগণের রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ ভাবগত। ভাবের মধ্যে সমগ্র রাষ্ট্রনৈতিক জীবন কখনই আসিতে পারে না। সুতরাং

* "Political science is the science which is concerned with the State, which endeavours to understand and comprehend the State in its fundamental conditions, in its essential nature, its various forms of manifestation, its development." Bluntschli

"Political Science begins and ends with the State." Garner

নাগরিককে এই তত্ত্বগত ধারণা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা প্রতিভূর সংস্রবে আসিতে পারে, কিন্তু কখনই রাষ্ট্রের সংস্রবে আসে না।"

স্বতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রের বর্ণনা করিতে হইলে সরকারের বর্ণনা করিতে হইবে, রাষ্ট্রের জন্মেতিহাস জানিতে হইলে সরকারের জন্মেতিহাসের অনুসন্ধান করিতে হইবে; এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করিতে হইলে সরকারের রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র সম্পর্কে এই মতই অনুমোদন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়; এবং আমরা তাহাই করিব—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় রাষ্ট্র ও সরকার উভয়কে লইয়াই আলোচনা করিব।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অতীত ও বর্তমান—উভয় লইয়াই আলোচনা করে

রাষ্ট্র ও সরকার সম্বন্ধে যে আলোচনা তাহার কতকটা ঐতিহাসিক কতকটা আধুনিক। অর্থাৎ, ইতিহাসের পটভূমিকায় এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে। ইতিহাসের দিক দিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবলম্বিত নীতি ও অনুসৃত কার্যক্রম এবং অতীতের রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণা ও তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে। এইভাবে ইতিহাসের পটভূমিকায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা না করিলে বর্তমান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয় না। কিভাবে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা ধীরে ধীরে গঠিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা জানিতে না পারিলে বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে স্বস্পষ্ট ধারণা আমরা করিতে পারিব না।* উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গণতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা না করিলে বর্তমানে গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে স্বস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। স্বতরাং ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা উদ্দেশ্যমূলক

বর্তমানের দিক দিয়াও রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবলম্বিত নীতি ও অনুসৃত কার্যাবলীর আলোচনা করে। এই আলোচনায় তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দেখা হয় যে, বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক অবলম্বিত নীতি ও অনুসৃত কার্যক্রমসমূহ যে-যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ত্রুটি কোথায়, কোন্‌টি তাহাদের মধ্যে কাম্য, ইত্যাদি। এইরূপ তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্য হইল বিচার করিয়া দেখা যে, বর্তমানে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন মানুষকে কতটা স্বখী করিতে পারিয়াছে। কোন রাষ্ট্রের গুণাগুণ বিচারের মাপকাঠি হইল সেই রাষ্ট্র উহার জনগণের আত্মবিকাশের পথ স্বগম করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ইংগিত দেয়

এখানেই কিন্তু থামিলে চলিবে না। আরও অগ্রসর হইতে হইবে। অতীতের আলোচনা ও বর্তমানের সমালোচনা হইতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইংগিত দিতে হইবে। দেখাইতে হইবে যে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের গতি কোন্‌

* "..nothing in our field of investigation is capable of being rightly understood save as it is illustrated by the process of its development." Laski

দিকে ; যে দিকে গতি সেই দিকেই গতি কাম্য কিনা, ইত্যাদি। ফলে আবার নীতিশাস্ত্রের আলোচনা আসিয়া পড়ে।

অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করে। ইহা দেখে যে কিভাবে রাষ্ট্র উদ্ভূত ও ক্রমবিকশিত হইয়াছে, বর্তমানে রাষ্ট্রের স্বরূপ কি, ভবিষ্যতে ইহার কি প্রকৃতি হওয়া উচিত। এখানে পুনরুক্তি করা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই পূর্ণাংগ আলোচনার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে সরকার সম্বন্ধে আলোচনা। রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ, ব্যক্তির সহিত বিভিন্ন সংঘ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ সরকারকে আলোচনাক্ষেত্রে না আনিয়া উপলব্ধি করা যায় না। উপরন্তু, রাষ্ট্রের বর্তমান রূপ সম্বন্ধে যে-আলোচনা তাহা প্রধানত সরকার সম্বন্ধেই আলোচনা। এই সকল আলোচনা হইতে সংগৃহীত তথ্য হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্র নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন ; এবং এই সকল সূত্র শাসন-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ইংগিত দেয়।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনার প্রতি পদে জড়াইয়া আছে সরকার সম্বন্ধে আলোচনা

এখানে আমাদের একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার জন্য এবং বিষয়বস্তুকে সম্ভাব্য সীমার মধ্যে রাখিবার প্রয়োজনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক দিকের প্রতিই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি ; কিন্তু আমরা যদি রাষ্ট্রনৈতিক দিককে সমাজের অন্যান্য দিক হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তাহা হইলে আমাদের আলোচনা অবাস্তব হইয়া পড়িবে। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উপর তাহার সামাজিক ও আর্থিক জীবনের প্রভাব বিশেষভাবে বর্তমান। সুতরাং রাষ্ট্র ও সরকারের আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমাদের মুখ্য বিষয় হইলেও মানুষের সামাজিক ও আর্থিক দিকগুলি সম্পর্কে আমাদিগকে সচেতন থাকিতে হইবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু রাষ্ট্রের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি (Political Science and Politics):

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যাহা বিষয়বস্তু তাহাকে অনেক সময় রাষ্ট্রনীতি (Politics) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এ্যারিষ্টটলই হইলেন প্রথম লেখক যিনি রাষ্ট্র সংক্রান্ত গ্রন্থকে 'রাষ্ট্রনীতি' (Politics) বলিয়া আখ্যা দেন। এ্যারিষ্টটলের সময়ে 'রাষ্ট্রনীতি' বলিতে বুঝাইত গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের নীতি। ইহার আলোচ্য বিষয় ছিল নগর-রাষ্ট্র এবং নগর-রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান না রাষ্ট্রনীতি

অধ্যাপক গিলক্রাইষ্টের মতে, এই অর্থে 'রাষ্ট্রনীতি' শব্দটি ব্যবহারে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু জেলিনেক (Jellinek), সিজউইক (Sidgwick), স্যর ফ্রেডেরিক পোলক (Sir Frederick Pollock) প্রভৃতি লেখক যেভাবে 'রাষ্ট্রনীতি' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। এই লেখকগণ যে-শাস্ত্রকে বর্তমানে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Political Science)

বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহাকে সাধারণভাবে 'রাষ্ট্রনীতি' (Politics) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—'তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি' (Theoretical Politics) এবং 'ফলিত রাষ্ট্রনীতি' (Applied Politics)। ইঁহাদের মতে, তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্র, সরকার, আইন, রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করে এবং ফলিত রাষ্ট্রনীতি বর্তমান যুগে সরকারের বিভিন্ন রূপ, শাসনতান্ত্রিক আইন, শাসন-ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি, কূটনৈতিক সম্বন্ধ, আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করে। এইভাবে 'রাষ্ট্রনীতি'র বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ করিলে তত্ত্বের দিক দিয়া বিশেষ আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না, কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সমস্ত কিছুই তত্ত্বগত এবং ফলিত রাষ্ট্রনীতির মধ্যে পড়ে। কিন্তু 'রাষ্ট্রনীতি' শব্দটি ব্যবহারেই বিশেষ আপত্তির কারণ আছে। বর্তমানে আমরা 'রাষ্ট্রনীতি' (Politics) বলিতে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহের রীতি বুঝি না—বুঝি সরকারের সাম্প্রতিক সমস্যাসমূহকে, বুঝি স্বার্থসিদ্ধির কৌশলকে। যখন আমরা বলি যে, অমুক ব্যক্তি রাষ্ট্রনীতিতে উৎসাহী তখন আমরা বলিতে চাই ব্যক্তিটি সাম্প্রতিক সমস্যাসমূহে উৎসাহী। এরূপ ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিজ্ঞান বা শাস্ত্রে উৎসাহী নাও হইতে পারেন; হয়ত' রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয়ও নাই। সুতরাং রাষ্ট্রনীতিতে উৎসাহী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র এক এবং অভিন্ন নন। এই সমস্ত কারণের জন্য আমাদের আলোচ্য বিষয়কে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বলিয়াই অভিহিত করা উচিত। আমরা তাহাই করিব।

তত্ত্বগত ও ফলিত রাষ্ট্রনীতি

আমাদের আলোচ্য বিষয়কে 'রাষ্ট্রনীতি' বলিয়া অভিহিত করা চলিতে পারে না

ইহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলিয়াই অভিহিত করা হইবে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শন **(Political Science and Political Philosophy) :** রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত অনেক সময় রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যেও পার্থক্য করা হয়। যাঁহারা এই প্রকার পৃথকিকরণের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা প্রধানত তত্ত্বমূলক। এই তত্ত্বমূলক আলোচনাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান না বলিয়া 'রাষ্ট্রদর্শন' (Political Philosophy) বলিয়া অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত। রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনার এক অংশে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের সভ্যগণের অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্রনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি (grounds of political obligation) প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করা হয়। এগুলির আলোচনা হইতে কতকগুলি মূলসূত্র, রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ, রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়। এইগুলি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তিস্বরূপ। রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনার অপর অংশে এই রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে লইয়া আলোচনা করা হয়। এই দ্বিতীয় অংশকেই 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করা উচিত।

অনেকের মতে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনার তত্ত্বমূলক অংশকে রাষ্ট্রদর্শন এবং অপর অংশকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া উচিত

এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে সীমারেখা টানিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অর্থকে সংকুচিত করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কেবলমাত্র ফলিত রাষ্ট্রনীতি অথবা তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতিকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। উভয়কেই লইয়া ইহার কাজকারবার। রাষ্ট্র ও সরকারের গঠন এবং কার্যপদ্ধতি যেমন জানা দরকার, তেমনি উহাদের উদ্দেশ্য কি এবং উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত—সে সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অতীতে কি ছিল এবং বর্তমানে কি আছে—শুধু ইহাই অনুসন্ধান করা যথেষ্ট নয়; অতীত এবং বর্তমানের গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করা, ভালমন্দ বিচারের মাপকাঠি নির্ণয় করা, ভবিষ্যতের ইংগিত দেওয়া, প্রভৃতিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও নৈতিক মানের প্রশ্ন লইয়া আলোচনা চলে। সুতরাং রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশমাত্র।

রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশমাত্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য? **(Is Political Science a Science?):** রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা যায় কিনা—এই প্রশ্ন লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। এ্যারিষ্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে (Politics) চরম বিজ্ঞান বলিয়া মনে করিতেন এবং তৎকালীন গ্রীক রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এ-বিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন বোঁদা (Bodin), হবস্ (Hobbes), মন্টেস্কু (Montesquieu), সিজউইক, ব্লুণ্টস্‌লি, লর্ড ব্রাইস প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। অপরদিকে বাক্‌ল (Buckle), কোঁট (Comte), মেটল্যাণ্ড (Maitland) প্রভৃতি চিন্তাবীরের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যালোচনা সম্ভব নয়। বস্তুত, তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য নহে। মেটল্যাণ্ড এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "যদি আমি পরীক্ষায় এমন প্রশ্নপত্র দেখি যাহার শিরোনাম হিসাবে লেখা আছে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Political Science), তখন আমার ঐ শিরোনামের জন্য বিশেষ দুঃখ হয়, প্রশ্নগুলির জন্য নহে।"*

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য কিনা এ-সম্পর্কে মতবিরোধ

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করার বিরোধী তাঁহাদের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়সমূহ বিশেষ অনিশ্চিত, জটিল ও সংখ্যায় বিপুল বলিয়া ইহাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত না করাই যুক্তিযুক্ত। বিরুদ্ধবাদিগণের এই যুক্তির বিরুদ্ধে স্যর ফ্রেডেরিক পোলক বলেন, যাঁহারা এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করার বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণাই অসম্পূর্ণ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করার বিরুদ্ধে যুক্তি

* "When I see a..set of examination questions headed by the word 'Political Science,' I regret not the questions but the title."

বিজ্ঞান কাহাকে বলে

ইহার পর প্রশ্ন উঠে বিজ্ঞান কাহাকে বলে? সংক্ষেপে বিজ্ঞান হইল 'কোন এক শ্রেণীভুক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে শৃংখলিত জ্ঞান।'* এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত; এবং এইভাবে নির্ণীত জ্ঞান হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বেলায় দেখা যায় যে পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভক্তিকরণ প্রভৃতি পদ্ধতি দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আমরা একপ্রকার শৃংখলিত জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

ব্রাইসের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য

লর্ড ব্রাইস বলেন, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণ জটিল হইলেও তাহার মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়; এবং এই সামঞ্জস্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণে সামঞ্জস্য আছে বলিয়া এ বিষয়ে শৃংখলিত জ্ঞানলাভ সম্ভব। এই শৃংখলিত জ্ঞান হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা নিয়মের প্রতিষ্ঠাও করা যায়, এবং এই সূত্রগুলি রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানে একরূপ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

রাষ্ট্রনৈতিক সূত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান

এইভাবে দেখিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়াই অভিহিত করিতে হয়। অধ্যাপক ফ্রান্সিস গ্রাহাম উইলসনের ভাষায় বলিতে গেলে, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা চলে, কারণ রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভক্তিকরণ সম্ভব এবং এই বিশ্লেষিত ও শ্রেণীবিভক্ত জ্ঞান হইতে সাধারণ সূত্রের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব।"

অবশ্য ইহা সত্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বেলায় বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি কার্যক্ষেত্রে সকল সময় প্রয়োগ করা বিশেষ কঠিন কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারবার ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষকে লইয়া। ইহার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে সকল সময় সতর্কভাবে চলিতে হয়; বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অসম্ভব হইলে মীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; সাধারণভাবে সরকারের সমগ্র সমস্যার সমাধান অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ সমস্যার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হয়। উপরন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে মানুষকে লইয়া গবেষণাগারে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না; সম্ভব হইলেও ইহা বিশেষ বিপজ্জনক পদ্ধতি।

বিজ্ঞান হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নয়

চরম দাসত্বের পীড়নে মানুষের অবস্থা কি হয় তাহা লইয়া পরীক্ষা করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়; সম্ভব হইলেও সমীচীন নয়। ইহার ফলে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীকে অনেক সময় অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রগুলি অনুমানসিদ্ধ। এই সকল কারণে লর্ড ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবহবিদ্যার (Meteorology) ন্যায় অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

কোন সামাজিক বিজ্ঞানই সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নয়

অন্যতম আধুনিক লেখক অধ্যাপক ক্যাটলিনের (George E. G. Catlin) মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অর্থবিদ্যার মত অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত, রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার ন্যায় সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত নয়। বস্তুত, শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থবিদ্যা কোন কোন সামাজিক বিজ্ঞানই সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নয়।

* "Science is a systematic study of a group of inter-related problems."

ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানসমূহের পর্যায়ভুক্ত করার পর বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রগতিশীল বিজ্ঞান।"* মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতা প্রত্যহই বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে দিন দিন মানুষের সমাজজীবন সম্বন্ধে আলোচনা সহজ হইতে সহজতর হইতেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রগতিশীল বিজ্ঞান

উপরি-উক্ত আলোচনার সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলিতে পারা যায়, বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই বিষয়ে এক মত যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য, কারণ বিজ্ঞানের অধিকাংশ গুণ বা লক্ষণ ইহাতে আছে—যথা, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহের মধ্যে একটি গভীর শৃংখলা দৃষ্ট হয়, ইহা হইতে কতকগুলি সাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক সূত্র নির্ধারণ করা যায় এবং এই সূত্রগুলি সাধারণভাবে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ সম্ভব। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নয়। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ন্যায় ইহা মানুষকে লইয়া কারবার করে বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান হইতেও পারে না। অধ্যাপক উইলসনের (F. G. Wilson) ভাষায় বলিতে পারা যায়, "রাষ্ট্রনৈতিক পরিসংখ্যানকে বিশ্লেষিত ও শ্রেণীবিভক্ত করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারা যায়—কিন্তু যাহাকে বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ বলে—অর্থাৎ পরীক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্যসাধনের যে-চেষ্টা তাহা অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদ্ধতিরও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে নাই, এবং বোধ হয় কোন দিনই পারিবে না।" এই কারণে পোলক রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিবিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াছেন।**

আলোচনার সংক্ষিপ্তসার

***রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতি* (Methods of Political Science) :** দেখা গেল যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ হইলেও বিজ্ঞান পদবাচ্য। এখন দেখিতে হইবে, এই শাস্ত্র বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা ও অনুসন্ধানের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত না। তাহার পর হইতে বহু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান : (ক) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, (খ) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, (গ) পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি, (ঘ) জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, (ঙ) সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, (চ) মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি, (ছ) আইনমূলক পদ্ধতি, (জ) ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং (ঝ) তুলনামূলক পদ্ধতি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ

(ক) **পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি (Observational Method) :** অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহের অনুসন্ধানে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিই

* "Political Science is a progressive science."

** "There is a science of politics in the same sense.... as there is a science of morals." Sir Frederick Pollock

অনুসৃত হওয়া উচিত। এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মধ্যে লর্ড ব্রাইসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ব্রাইস বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিবেন। পর্যবেক্ষণকারীরা অবশ্য সমালোচকের দৃষ্টি লইয়াই সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং বাহ্য সাদৃশ্য ও সামান্যিকরণ (generalisation) যথাসম্ভব পরিহার করিয়া যাইবেন। ব্রাইসের উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় লাওয়েলের (Lowell) কথায়। লাওয়েল বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক নহে।" রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহের অনুসন্ধানের প্রকৃত পদ্ধতি হইল পর্যবেক্ষণ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর গবেষণাগার গ্রন্থাগার নহে, গবেষণাগার হইল বাহিরের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন। এই বাহিরের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেই রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহের পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতির গুরুত্ব

(খ) **পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental Method):** স্যর জর্জ লিউ (Sir George Lewis) বলিয়াছেন যে, রসায়নবিদ রসায়নের ক্ষেত্রে যেভাবে পরীক্ষা করিতে পারেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেভাবে পরীক্ষা করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে পূর্ণভাবে অনুসন্ধান করা সেখানেই সম্ভব যেখানে অনুসন্ধানের প্রতিকূল বিষয়গুলি বাদ দিয়া শুধু অনুকূল ঘটনাসমূহকে লইয়াই পরীক্ষা করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নয়। ধরা যাউক, কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতে চান। তাঁহার পক্ষে যে-কোন একটি রাষ্ট্র নির্বাচিত করিয়া, তাহাতে গণতন্ত্র প্রবর্তিত করিয়া, এবং পরে প্রবর্তনের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর এই নয়া গণতন্ত্র অন্তর্বিপ্লব, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, আর্থিক সংকট প্রভৃতি দ্বারা বিপর্যস্ত হইতে পারে। এই বিষয়গুলির উপর বৈজ্ঞানিকের কোন হাত নাই। সুতরাং তাঁহার পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতে পারে।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অসুবিধা

আবার পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতির ন্যায় সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বারবার পরীক্ষা করাও সম্ভব নয়। কোনপ্রকার কলাকৌশলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী একই অবস্থার বারবার প্রবর্তন করিতে পারেন না। আমরা আর্দ্রতার পরিমাপ করিতে পারি, বায়ুর বেগের পরিমাপ করিতে পারি, উষ্ণতার পরিমাপ করিতে পারি কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতার ক্ষিপ্ততার পরিমাপ করিতে পারি না। এইজন্যই লর্ড ব্রাইস এক স্থানে বলিয়াছেন যে, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের শুধু বর্ণনাই করা যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিসমূহ অবলম্বনে উপরি-উক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা সত্য যে, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে প্রতিনিয়তই পরীক্ষা চলিতেছে। প্রত্যেক নূতন আইন, নূতন প্রতিষ্ঠান, নূতন রাষ্ট্রনীতি 'পরীক্ষা' ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সকল পরীক্ষার ফল ধীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং পর্যবেক্ষণের ফলে পুনঃপরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে। এক দেশে পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইলে

রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে পরীক্ষা সর্বদাই চলিতেছে

অপরাপর দেশ তাহা অনুসরণ করে; অসন্তোষজনক হইলে তাহা পরিহার করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং উপসংহার হিসাবে বলিতে পারা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ করা না হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেকাংশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ করে।

উপসংহার

(গ) **পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি (Statistical Method):** রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিরও অনুসরণ করে। প্রথমে যে-সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক তথ্য গণনা ও পরিমাপ করা যায় তাহা সংগৃহীত হয় এবং পরে ইহা হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সরকারী নীতির নির্দেশক হিসাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ভোটদান পদ্ধতি, জনমতের প্রাবল্য, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের পর্যালোচনায় পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকর।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি কার্যকর

(ঘ) **জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological Method):** রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনা দ্বারা রাষ্ট্রের গতি বিবর্তনবাদ অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। জীববিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের এই ব্যাখ্যা অনেক সময় প্রয়োজনীয় এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া এখন আর এই পদ্ধতির অনুসরণ বিশেষভাবে করা হয় না।

জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির অনুসরণ বিপজ্জনক

(ঙ) **সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method):** জীব-বিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির সমজাতীয় আর একটি পদ্ধতি হইল সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রকে একটি সমাজদেহ বলিয়া কল্পনা করা হয়। এই দেহের অংশ বা কোষ হইল ব্যক্তি। যে ব্যক্তিগণের সমবায়ে সমাজদেহ বা রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহাদের গুণাগুণ অনুসারেই সমাজদেহ বা রাষ্ট্রের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়। সমাজ-বিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতির মতই বিবর্তনবাদ অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের গতি ব্যাখ্যা করে।

সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি জীববিজ্ঞান-মূলক পদ্ধতিরই সমজাতীয়

(চ) **মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি (Psychological Method):** কিছুদিন পূর্ব হইতে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনোবিদ্যার সূত্র অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা-সমূহের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যালোচনায় বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণ কতদুর তাহার প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, দলে পড়িলে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, কিভাবে জনমত গঠন করা যায়, ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণে মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি

মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতির কার্যকারিতা

বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। ফলে রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহের কার্যকলাপ, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা সহজতর হইয়া উঠিয়াছে।

অধ্যাপক গার্ণারের মতে, জীববিজ্ঞানমূলক, সমাজবিজ্ঞানমূলক এবং মনোবিদ্যা-মূলক—এই তিনটি পদ্ধতির কোনটিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের উপযুক্ত পদ্ধতি নহে। জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি ও সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি বিশেষভাবে কতকগুলি বাহ্য সাদৃশ্য বর্ণনার উপর নির্ভর করে। বাহ্য সাদৃশ্য বর্ণনা করিলেই অভিন্নতা প্রমাণ করা হয় না। অভিন্নতা প্রমাণ করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে, জীবদেহ ও রাষ্ট্রের মধ্যে অপরিহার্য বিষয়সমূহের মধ্যে সমতা রহিয়াছে। ইহা জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি বা সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি দেখাইতে পারে না। এবং মনোবিদ্যামূলক পদ্ধতি ঐ একই দোষে দুষ্ট। অধ্যাপক গিডিংস্ (Giddings) বলিয়াছেন, এই তিনটি পদ্ধতির কোনটিই বর্তমানে বিশেষ অনুসৃত হয় না।

বর্তমানে জীববিজ্ঞান-মূলক, সমাজবিজ্ঞান-মূলক এবং মনোবিদ্যা-মূলক পদ্ধতি বিশেষ-ভাবে অনুসৃত হয় না

(ছ) **আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method)**: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধানে জার্মান ও ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিশেষভাবে এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে আইনমূলক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কল্পনা করা হয়—সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নহে, এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আইনের নীতির বিজ্ঞান বলিয়া ধরা হয়।* এই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্র আইনসংগত অধিকার ও কর্তব্যের একটি সমষ্টিমাত্র—অর্থাৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্বই আইন প্রণয়ন ও আইনকে কার্যকর করিবার জন্য। সুতরাং এই পদ্ধতি আইনের ভিত্তিতে গঠিত 'রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের' সকল সম্পর্কই বিশ্লেষণ করে, কিন্তু আইনের গণ্ডির বাহিরে কোন কিছু লইয়াই আলোচনা করে না। গার্ণারের মতে, এই ধরনের যে-কোন পদ্ধতিই, যাহা রাষ্ট্রকে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখে না, সংকীর্ণ হইতে বাধ্য।

আইনমূলক পদ্ধতি সংকীর্ণ

(জ) **ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method)**: বর্তমানে ইহা একরূপ স্বীকৃত অভিমত যে, ইতিহাসের পটভূমিকাতেই রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্যক আলোচনা সম্ভব। অতীতের অস্তিত্ব যে বর্তমানের এবং বর্তমান যে ভবিষ্যতের ইংগিত দেয়—এই সুপ্রচলিত উক্তি বিশেষভাবে সত্য। সুতরাং আমরা মাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতেই বর্তমান রাষ্ট্রনীতির পর্যালোচনা করিতে পারি।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির গুরুত্ব

ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে দেখা হয় যে, বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পূর্বে তাহাদের রূপ কি ছিল। পোলকের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, এই পদ্ধতি "রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ গতি

* "It regards the state primarily as a corporation or juridical person and views political science as a science of legal norms...." Garner

ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে।" অতীতে তাহাদের কিরূপ ছিল এবং কিভাবে তাহারা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াই এই ব্যাখ্যা করা হয়, বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া নহে। সুতরাং এই পদ্ধতি বিবর্তনবাদের সহিত সম্পর্কিত।

এই গোত্রীয় অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে আলোচনা করিবার সময়ও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই পদ্ধতি অনুসারে অনুসন্ধানকালে বাহ্য সাদৃশ্যকে অভিন্নতা বলিয়া মনে হইতে পারে। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে লর্ড ব্রাইস আমাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। উপরন্তু, ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানী ব্যক্তিগত ধারণা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ইতিহাসের গতির ভুল ব্যাখ্যা করিতেও পারেন। সুতরাং ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণকারীকে ব্যক্তিগত ধারণার ঊর্ধ্বে উঠিয়া, বিজ্ঞানীর ন্যায় শান্ত ও ধীরভাবে যুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ করিয়া বর্তমান রাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ইংগিত দিতে হইবে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন

(ঝ) **তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)** : ঐতিহাসিক পদ্ধতির সহিত তুলনামূলক পদ্ধতির বিশেষ মিল আছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতির ন্যায় ইহাতেও অতীতের রাষ্ট্রসমূহের শাসন-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা হয়। তবে তুলনামূলক পদ্ধতিতে অতীতের আলোচনা ছাড়া বর্তমানেরও স্থান আছে। অতীত ও বর্তমানের রাষ্ট্রসমূহের পর্যালোচনা হইতে লব্ধ বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করা হয় এবং যে বিষয়গুলি তুলনীয় নয়, সেগুলিকে বাদ দেওয়া হয়। এইভাবে তুলনার দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

এ্যারিষ্টটলই প্রথমে তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।* কথিত আছে যে, তিনি ১৫৮টি রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা আলোচনা ও তাহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া তাঁহার রাষ্ট্রনীতির (Politics) সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হইয়াছিলেন। আধুনিক কালে মণ্টেস্কু, টক্‌ভিল (Tocqueville), লর্ড ব্রাইস প্রভৃতি তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছেন। ব্রাইস বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা আলোচনা করিয়া শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রের গুণাগুণ নির্দেশ করিয়াছেন।

তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যবহারে ঐতিহাসিক পদ্ধতির মতই সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। বলা হইয়াছে, এই পদ্ধতির ব্যবহারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যে বিষয়গুলি তুলনীয় নহে, সেগুলি লইয়া আলোচনা করেন না। অনেক সময় এমন ঘটিতে পারে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঠিক এই বিষয়গুলি নির্বাচন করিতে পারেন না। সুতরাং এই পদ্ধতিতেও ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

তুলনামূলক পদ্ধতিতেও সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে

* এ্যারিষ্টটলের পূর্বে প্লেটোও কতকটা এই পদ্ধতি অনুসরণের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন...... Bertrand Russel, A History of Western Philosophy, Ch. XIV দেখ।

***রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক* (Relation of Political Science to Other Sciences) :** সিজউইক এক স্থানে বলিয়াছেন, কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা লাভ করিতে হইলে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত ঐ শাস্ত্রের সম্পর্ক অনুধাবন করা উচিত—অর্থাৎ দেখা উচিত যে, ঐ শাস্ত্র অপরাপর শাস্ত্র হইতে কি গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে কি-ই বা দান করিয়াছে।

অপরাপর শাস্ত্রের উল্লেখ না করিয়া বলিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সিজউইকের এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। একমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানই মানুষকে লইয়া আলোচনা করে না। সকল মানবীয় বিজ্ঞান (humanistic sciences) এবং কতিপয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও মানুষকে লইয়া আলোচনা করে। উপরন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কোনক্রমেই স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা যায় না কারণ সন্দেহাতীতভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে মালমসলা গ্রহণ করে; এবং অন্যান্য কতিপয় বিজ্ঞানও যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে, তাহাও নিশ্চিত। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা প্রসংগে দেখিতে হইবে যে, অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক কি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে ; ইহা অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যা (Political Science and Zoology) : প্রাণিবিদ্যা হইতে লব্ধ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্র নির্ধারণ করা প্রাচীন গ্রীস হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য, এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসৃত হয় ডারউইনের সময় হইতে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ সমগ্র চিন্তাজগতে বিশেষভাবে আলোড়ন তুলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও ইহার প্রভাব এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিবর্তনবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেন। ফলে রাষ্ট্র সম্বন্ধে জৈব মতবাদের (Organic Theory) উদ্ভব হয়। এই জৈব মতবাদের সর্বপ্রধান সমর্থক হইলেন ইংরাজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer)। স্পেন্সারের পরই জার্মান চিন্তাবীর ব্লুণ্টস্লির (Bluntschli) নাম উল্লেখ করিতে হয়।

জৈব মতবাদ ও উহার সমর্থকগণ

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জৈব মতবাদে রাষ্ট্রকে প্রাণীর সহিত তুলনা করা হয় বা প্রাণী বলিয়া গণ্য করা হয় এবং ইহাতে প্রাণীর সমস্ত কিছু বৈশিষ্ট্য—জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু আরোপ করা হয়। প্রাণী ও রাষ্ট্রের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, প্রাণীবিদ্যার সূত্রগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য।

মন্তব্য হিসাবে বলিতে পারা যায়, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের এই প্রচেষ্টা—অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি যে প্রাণিবিদ্যারই অনুরূপ তাহা প্রমাণ করা, বিশেষ সফল হয় নাই। তবুও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই চেষ্টা সমসাময়িক ও পরবর্তীকালীন রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি প্রাণিবিদ্যার অনুরূপ নহে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞান (Political Science and Geography): মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উপর ভৌগোলিক বিষয়সমূহের প্রভাব অস্বীকার কর যায় না। যে প্রাকৃতিক জগতে মানুষ বাস করে তাহার আয়তন ও অবস্থান, তাহার জলবায়ু, তাহার ঐশ্বর্য প্রভৃতি মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ হইতেই মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবান্বি করিয়া আসিতেছে। এই কারণে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রা বিজ্ঞানের সহিত ভূবিজ্ঞানের সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন

অনেকের মতে, রাষ্ট্রনৈতিক জীবন প্রধানত ভৌগোলিক বিষয়সমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়

এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়েকজনের মতে, এই সম্পর্ক বিশেষ গভীর—অর্থা মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন প্রধানত ভৌগোলিক বিষয়সমূহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ্যারিষ্টটল ভৌগোলিক বিষয়সমূহ ও রাষ্ট্রনৈতি কার্যকলাপের মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে ফরাসী চিন্তাবীর বোঁদাই (Bodin) এই আলোচনা স্থরু করেন। বোঁদার প রুশোর (Rousseau) লেখায় ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। রুশোর ধারণায়, জলবায়ু সহিত সরকারের বিভিন্ন রূপের বিশেষ সম্পর্ক আছে। তিনি প্রমাণ করিতে চে করিয়াছেন যে, উষ্ণ জলবায়ুতে স্বেচ্ছাচারিতা, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে কাম্য শাস ব্যবস্থা এবং শীতপ্রধান দেশে বর্বরতার উদ্ভব হয়। রুশোর পর মণ্টেস্কু ও বা (Buckle) ভূবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন বাক্লের মতে, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উপর যে-সকল বিষয় প্রভাব বিস্তার ক তাহাদের মধ্যে ভৌগোলিক বিষয়সমূহই প্রধান।

অতি আধুনিক কালে কয়েকজন জার্মান চিন্তাবীর এই আলোচনার পুনরুত্থা করিয়াছেন। এই লেখকগণের মধ্যে কয়েকজন বাক্লকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন মূলত ভৌগোলিক বিষয়সমূহ যে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে ইহাই তাঁহাদে প্রতিপাদ্য বিষয়।

রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উপর ভৌগোলিক বিষয়সমূহের প্রভাব অস্বীকার করা গেলেও বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞানের মধ্যে সম্প লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি করিয়াছেন। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলা ভৌগোলিক ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিশয়োক্তি করা হইয়াছে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান (Political Science and Sociology): মানুষ সমাজবদ্ধ জীব; আদিমতম যুগ হইতেই সে সংঘবদ্ধভাবে বাস করি আসিতেছে। সমাজজীবনের মানুষের কার্যকলাপ লইয়া যে-সকল শাস্ত্র আলোচ করে তাহাদিগকে সামাজিক বিজ্ঞান (Social Sciences) বলা হয়। সমাজজীব মানুষের কার্যকলাপের আলোচনা সমগ্রভাবে, আব সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবে অভিহি করা যাইতে পারে। যাহাকে সমাজবিজ্ঞান বলিয়া

সমাজবিজ্ঞান মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান

করা হয় তাহা সমাজজীবনের আলোচনা সমগ্রভাবেই করে। ইহা সমাজজীবনের সূত্রপাত, সংগঠন ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়া সমাজ সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব ও সূত্র নির্ধারণ করে। এই কারণে ইহাকে মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করা হয়।

অপরাপর সামাজিক বিজ্ঞান সমাজজীবনের এক একটি দিক লইয়া পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে। অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজজীবনের একটি দিক—অর্থাৎ মাত্র মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ লইয়া আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই আলোচ্য বিষয় সমাজবিজ্ঞানেরই বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় 'রাষ্ট্র' প্রাথমিক অবস্থায় অন্যতম সামাজিক সংগঠন মাত্র ছিল। সমাজ-বিবর্তনের বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সমাজ-বিজ্ঞানের দ্বারস্থ না হইলে চলে না। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক গিডিংস (Giddings) বলিয়াছেন, "যাঁহারা সমাজ-বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি জ্ঞাত নহে তাঁহাদিগকে রাষ্ট্র সম্বন্ধে তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া নিউটনের গতি সম্বন্ধে সূত্রের জ্ঞানরহিত ব্যক্তিকে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ারই মত।"

সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা সম্ভব নহে

সমাজবিজ্ঞান শুধু যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে দান করে তাহা নহে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে গ্রহণও করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন লইয়া গভীরভাবে আলোচনা করে। এই বিষয়টিতে জ্ঞানলাভ করা সমাজবিজ্ঞান আলোচনা না করিয়া সম্ভব নয় কারণ সমাজবিজ্ঞান সাধারণভাবে সমাজজীবন লইয়া আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেমন সমাজবিজ্ঞান হইতে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সূত্রপাত, সমাজ-বন্ধনের সূত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে তেমনি সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে রাষ্ট্রের সংগঠন, কার্যাবলী প্রভৃতি সম্বন্ধে তত্ত্ব গ্রহণ করে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। গার্ণারের মতে, উভয় শাস্ত্রের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখার সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে, বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রকে পরস্পর হইতে পৃথক করা হইয়াছে। অধ্যাপক গিডিংস্ এই সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, সাম্প্রতিক যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র সমাজবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের সহিত মিশিয়া যায় নাই; উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানা যাইতে পারে। এবং ইহাই সাম্প্রতিক যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখার সন্ধান পাওয়া যায়

উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সীমারেখার আলোচনায় এই বিষয়ের পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সমাজবিজ্ঞান ব্যাপকতম ও মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান

বিশেষীকৃত সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ও সংগঠন লইয়া আলোচনা করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাত্র একপ্রকার সামাজিক কার্যকলাপ—রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ লইয়া আলোচনা করে। উপরন্তু, সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা সুরু হয় সমাজজীবনের সূত্রপাত হইতে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা সুরু করে প্রধানত রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইতে। পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক জীব হিসাবে গ্রহণ করিয়া আলোচনা সুরু করে কিন্তু সমাজবিজ্ঞান মানুষ কেন এবং কি করিয়া সামাজিক জীবে পরিণত হইল তাহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে।

উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সম্বন্ধের সংক্ষেপ বর্ণনা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Political Science and History) : রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের পরই ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন স্যর জন সিলী (Seeley)। সিলীর মতে, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতিরেকে ইতিহাসের আলোচনা নিষ্ফল এবং ইতিহাস ব্যতিরেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিহীন।"* এই উক্তি যে কতকটা অতিরঞ্জিত সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে। বর্তমানে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাসের আলোচনা ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা সম্ভব নয়। জেলিনেকের (Jellinek) মতে, শুধু রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নহে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও কার্যকলাপ অনুধাবনের জন্যও ইতিহাসের আলোচনা প্রয়োজন।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্কে সিলীর মত

বস্তুত, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচনা অনেকাংশে উদ্দেশ্যমূলক আলোচনা। এই উদ্দেশ্য হইল আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ইহা সাধন করিবার জন্য প্রয়োজন ঐতিহাসিক তথ্যের—কারণ ঐতিহাসিক পটভূমিকা ব্যতিরেকে বর্তমান দিনের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। আজিকার দিনের সমাজ-ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ, আজিকার দিনের শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি কোথায়—এই সকল প্রশ্নের বিচার আমরা করিতে পারি না যদি-না ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের সংগ্রহে থাকে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার জন্য আমাদিগকে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাহাই করেন। তিনি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে তুলনা করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক সূত্রের নির্ধারণ করেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য যে-পরিমাণ সংগৃহীত হইবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা হইয়া উঠিবে ততই মূল্যবান, ততই গভীর। এই কারণে

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের আলোচনা উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া ঐতিহাসিক তথ্যের প্রয়োজন

* "History without Political Science has no fruit
Political Science without History has no root."

উইলোবি বলিয়াছেন, ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গভীরত্ব (third dimension) যোগান দেয়।*

ইতিহাসের আলোচনাও উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক তথ্যের প্রয়োজন

ইতিহাসও রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে মালমসলা সংগ্রহ করে। ইতিহাসের আলোচনাও কতকটা উদ্দেশ্যমূলক। এই উদ্দেশ্য হইল ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে ইংগিত দিয়া মানুষকে কল্যাণময় পথে পরিচালিত করা। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ইতিহাসেরও উদ্দেশ্য আদর্শ সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের আলোচনা করিতে হইবে। তাহা না হইলে ইতিহাস অতীতের শুষ্ক ঘটনাবলীর সংকলন ছাড়া আর কিছুই হইবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস হইতে যদি জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি সংক্রান্ত ঘটনাবলী বাদ দেওয়া হয় তবে এই আলোচনা কোনমতেই পূর্ণাংগ বা সার্থক হইতে পারে না। তেমনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস হইতে যদি কংগ্রেসের ভূমিকা, মুস্লিম লীগের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি, বিভিন্ন শাসন-সংস্কার, 'ভারত ছাড় আন্দোলন' প্রভৃতি বাদ দেওয়া হয় তবে এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও ভিত্তিহীন হইতে বাধ্য।

ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ও পরস্পরের পরিপূরক। এই কারণেই সিলী আর একস্থানে বলিয়াছেন যে, ঐতিহাসিক তথ্য ব্যতিরেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মার্জিত রূপ ধারণ করে না এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলে ইতিহাস সাধারণ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। বার্জেস (Burgess) বলেন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে একটি পংগু হইয়া পড়িবে—শবদেহেও পরিণত হইতে পারে এবং অপরটি আলেয়ার রূপ ধারণ করিবে।**

ইতিহাসের সমস্তটাই প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি নহে

উপরের আলোচনা হইতে এ-ধারণা করা উচিত হইবে না যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের উপরই ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ-বিষয়ে সিলীর উক্তি যে কতকটা অতিরঞ্জিত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সিলী, ফ্রীম্যান (Freeman) প্রভৃতির উক্তির বিরোধিতা করিয়া গার্ণার স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন যে ইতিহাসের সমস্তটাই প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি নহে। ইতিহাস একটি ব্যাপক শাস্ত্র। ইহা পর্যানুক্রমিকভাবে অতীত ঘটনাবলীর সংকলন করিয়া যায়। এই সংকলিত ঘটনাবলীর মধ্যে অনেক কিছুরই রাষ্ট্রনীতির সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। অধিকাংশ সময় ললিতকলা বা ভাষা বা আচার-ব্যবহারের

* "History provides the third dimension of political science." Willoughby, The Nature of the State.

** "Separate them....and the one becomes a cripple, if not a corpse, the other will-o'-the-wisp"

ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সকল বিষয়ের ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নহে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রধানত সেই সকল মূল তথ্যই সংগ্রহ করেন যাহা রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

অপরদিকে, আবার সমগ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানই বর্তমান ইতিহাস নহে—অর্থাৎ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমগ্রটার সন্ধান ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক অংশই কল্পনাপ্রসূত—ঐতিহাসিক তথ্য হইতে তাহারা নির্ধারিত হয় নাই। কল্পনা ও দার্শনিক তত্ত্বের সমবায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এমন অনেক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের ভিত্তি আলোচনায় ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

অপরদিকে, সমগ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানই বর্তমান ইতিহাস নহে

এইজন্যই অধ্যাপক বার্কার (Earnest Barker) বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমন অনেক সার্থক মতবাদ আছে যাহাদের ভিত্তি অতীত ইতিহাস নহে।* উদাহরণস্বরূপ প্লেটোর কমিউনিজম বা সমভোগবাদ, লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারা যায়। আদর্শ রাষ্ট্র, আদর্শ সমাজজীবন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইংগিত দিবার প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই সকল মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল সময়ই আদর্শ নির্ধারণ করা হইয়াছিল ঐ বিশেষ যুগের পটভূমিকায়।

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস পরস্পরের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইলেও উভয়ের আলোচনাক্ষেত্র পরস্পর হইতে অনেকাংশে পৃথক। এ-সম্বন্ধে ডাঃ লীককের (Leacock) প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যায়, "ইতিহাসের কিছুটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ।"** এই কিছুটা বা অংশকে সমগ্র বলিয়া ভুল করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস উভয়েরই স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবে।

ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র পরস্পর হইতে পৃথক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা (Political Science and Economics): কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত অর্থবিদ্যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ বলিয়া মনে করা হইত। অর্থবিদ্যা নামটিও আধুনিক। প্রাচীন গ্রীকরা ইহাকে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থ-ব্যবস্থা (Political Economy) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার আলোচ্য বিষয় ছিল কি করিয়া রাষ্ট্র প্রভূত রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে। স্যর জেমস্ ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছেন, "পারিবারিক অর্থ-ব্যবস্থার মত রাষ্ট্রেরও একটি অর্থ-ব্যবস্থা আছে।" অর্থাৎ, পরিবারের লক্ষ্য হইল যেমন আয় বৃদ্ধি করিয়া পরিবারকে প্রতিপত্তিশালী করিয়া

পূর্বে অর্থবিদ্যাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ বলিয়া মনে করা হইত

---

* "You have a political theory which is a good theory without being rooted in historical study."

** "Some history is part of Political Science."

তোলা, তেমনি রাষ্ট্রেরও লক্ষ্য হইল রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিয়া তোলা।

অর্থবিদ্যা সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন

অনেককাল পর্যন্ত অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি এই ধারণাই ছিল। পরে ইহার সামান্য পরিবর্তন করিয়া বলা হয় যে, অর্থবিদ্যার লক্ষ্য হইল দুইটি : রাষ্ট্রের জনসমষ্টির জন্য প্রভূত পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করা এবং শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রভূত পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করা। এককথায় বলা যায় যে, অর্থবিদ্যার লক্ষ্য হইল জনসমষ্টি ও রাষ্ট্রকে ধনশালী করিয়া তোলা। বর্তমানে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা আরও পরিবর্তিত হইয়াছে। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, অর্থবিদ্যার পরিধি বিশেষ ব্যাপক। ইহা শুধু রাজস্ব সংগ্রহ লইয়া আলোচনা করে না; ইহা ছাড়া ধনের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ও বণ্টন সংক্রান্ত মানুষের সকল কাজকর্ম লইয়াও আলোচনা করে। অর্থবিদ্যার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত এই সমস্ত বিষয়বস্তুর সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক থাকিলেও অনুধাবনের সুবিধার জন্য বর্তমানে অর্থবিদ্যাকে পৃথক শাস্ত্র হিসাবে আলোচনা করা হয়।

বর্তমানে অর্থবিদ্যাকে একটি পৃথক শাস্ত্র বলিয়া গণ্য করা হয়

অর্থবিদ্যাকে পৃথক শাস্ত্র হিসাবে আলোচনা করা হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থবিদ্যার মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সম্পর্কের আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় যে, উভয় শাস্ত্রই সমাজজীবনে মানুষের কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে এবং উভয়েরই লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের কল্যাণ। বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি একরূপ অভিন্ন করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা পরস্পরের সহিত অংগাংগি সম্পর্কে সম্পর্কিত বলা চলে।

পৃথক হইলেও অর্থবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অংগাংগি সম্পর্কে সম্পর্কিত

পূর্বে এই অংগাংগি সম্বন্ধ সুস্পষ্ট ছিল না কারণ রাষ্ট্র তখন ছিল পুলিস-রাষ্ট্র। তখন ইহার কার্য ছিল আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা। এই পুলিস-রাষ্ট্রের যুগেও রাষ্ট্র ও অর্থ-ব্যবস্থা পরস্পরের উপর কতকটা পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল কারণ রাষ্ট্রে শান্তিশৃংখলা বজায় না থাকিলে ধনোৎপাদন ব্যাহত হইত এবং ধনোৎপাদন ব্যাহত হইলে রাষ্ট্রে শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইত।

বর্তমান দিনে নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইলেও ইহাকে আর পুলিস-রাষ্ট্র বলিয়া বর্ণনা করা চলে না; মোটামুটিভাবে ইহা হইল সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র। বলা হয়, ইহা সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখে, কিভাবে সমাজের কল্যাণসাধন করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ইহাকে অধিক উৎপাদন, উপযুক্ত বিনিময়-ব্যবস্থা ও ন্যায্য বণ্টনের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। ইহার জন্য রাষ্ট্র নানারূপ আইন প্রণয়ন করে, শুল্কনীতি নির্ধারণ করে, শ্রমিকের কল্যাণের ব্যবস্থা করে এবং প্রয়োজন হইলে ভোগের নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করে। অপরদিকে, আবার দেশের আর্থিক অবস্থাও শাসন-ব্যবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। দেশে আর্থিক দুরবস্থা দেখা

এই অংগাংগি সম্বন্ধের কারণ বর্তমান দিনের সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র

দিলে রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্যসমূহ ঠিকমত পালন করা সম্ভব হয় না। ফলে শাসনযন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে এবং রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের পরিধি সংকীর্ণ হইয়া আসে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত রাষ্ট্রের অপর একদিক দিয়াও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। পুঁজিবাদী সমাজে বণিক-সম্প্রদায় রাষ্ট্র পরিচালনায় যে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে ইহা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি প্রামাণ্য মতবাদ। উপরন্তু, এমন অনেক রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ আছে যাহা অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের সমন্বয়ের ফল। উদাহরণস্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদ, সমভোগবাদ, স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে দিন দিন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। সোবিয়েত ইউনিয়ন বা নয়া চীনের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ঘনিষ্ঠতা বিশেষ প্রকট। ইংল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতির ন্যায় সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রেও ইহা অনুভব করিতে বিশেষ তত্ত্বগত আলোচনার প্রয়োজন হয় না। মোটকথা, অর্থবিদ্যা হইল অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান। জীবিকার্জনের তাগিদে মানুষ কিভাবে ধনোৎপাদন করে, কিভাবে উৎপাদিত ধন বণ্টন করা হয়, উৎপাদনের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কি প্রকারের সামাজিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, উৎপাদনশক্তি ও সামাজিক সম্বন্ধের ঘাত-প্রতিঘাতে কিভাবে সমাজের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়, ইত্যাদি বিষয়কে অর্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। সার্বভৌম শক্তি হিসাবে রাষ্ট্র আইনকানুনের সাহায্যে এই সামাজিক সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে কাহারও স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে না।

দিন দিন উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইতেছে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Political Science and Psychology): আধুনিক কালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মনোবিজ্ঞানপ্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বার্কার বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহের ব্যাখ্যায় মনোবিজ্ঞানের সমাধানসমূহের ব্যবহার যেন বর্তমান দিনের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পূর্ববর্তিগণ যদি জীববিজ্ঞানের সূত্র ধরিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন, আমরা মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরিয়া চিন্তা করিতেছি।"* এবং "যেদিন হইতে বেজহট (Bagehot) তাঁহার 'পদার্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Physics and Politics) লিখিয়াছেন, সেদিন হইতে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদগণ মনোবিজ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছেন।" বেজহট তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সেইদিন হইতে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাস আলোচনা করিলেই প্রকৃত মনোবিজ্ঞানমূলক প্রভূত রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই সকল রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে ফ্রান্সের

মনোবিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যার সূত্রপাত

---

* "The application of the psychological clue to the riddles of human activity has indeed become the fashion of the day. If our forefathers thought biologically, we think psychologically."

তার্দে (Tarde) এবং লেবঁ (Le Bon) এবং ইংল্যাণ্ডের ম্যাগ্ডুগাল (McDougall), গ্রাহাম ওয়ালাস্ (Graham Wallas) এবং স্পেন্সারের (Herbert Spencer) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়।

গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যায় মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব

ইহা সত্য যে, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য মনোবিজ্ঞানের সূত্রসমূহের প্রয়োগ বিশেষভাবে কার্যকর। আধুনিক যুগে এই কার্যকারিতা আরও বাড়িয়াছে, কারণ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকার জনমত দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়; জনমত সরকারকে প্রভাবান্বিত করে বলিয়া জনমতকে প্রভাবান্বিত করিবার পদ্ধতিসমূহও আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মনস্তত্ত্বের অনুধাবন অপরিহার্য। এ-সম্পর্কে গার্ণার বলিয়াছেন, সরকারের মধ্যে জনসাধারণের মানসিক ধারণা ও নৈতিক বিশ্বাস প্রতিফলিত না হইলে সরকার স্থায়ী ও প্রকৃত জনপ্রিয় হইতে পারে না। স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তার জন্য প্রয়োজন সরকার এবং 'জাতির মানসিক গঠনে'র (mental constitution of the race) মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান। শুধু যে শাসন-ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও জনপ্রিয় করিবার জন্য মনস্তত্ত্বের অনুধাবন প্রয়োজন, তাহা নহে। আধুনিক কালে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন সংক্রান্ত সমস্যা-সমূহের সমাধানের সূত্রও মনোবিজ্ঞানে মিলে কারণ জাতীয়তাবাদ প্রধানত ভাবপ্রবণতা, মনোবৃত্তি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সমবায়েই সৃষ্ট। বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ ও রাষ্ট্রনৈতিক দল প্রভৃতির গঠনেও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইহা ছাড়াও আধুনিক যুগে সরকারকে সৈন্যবাহিনী গঠনে, রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়োগে, বিচারালয়ে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির ব্যবহার করিতে দেখা যায়। এই সকল পর্যবেক্ষণ করিয়া লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড় আছে মনোবিজ্ঞানের মধ্যে।*

অনেক আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানের সূত্রও মনোবিজ্ঞানে মিলে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন্ধভাবে মনোবিজ্ঞানকে অনুসরণ করিতে পারে না

অবশ্য মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রযোজ্য নহে। মনোবিজ্ঞানের প্রধান সীমাবদ্ধতা হইল যে, ইহা অবস্থা লইয়া আলোচনা করে, আদর্শ লইয়া আলোচনা করে না। মনোবিজ্ঞানী কি ঘটে তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু কি ঘটা উচিত তাহার নির্দেশ দিতে পারেন না। মনোবিজ্ঞান এইভাবে নৈতিক মানদণ্ডের সহিত সম্পর্করহিত বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে পারে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Political Science and Ethics) : প্রাচীন গ্রীকগণ নীতিশাস্ত্রকে মূলশাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতিকে ইহার অংশমাত্র বলিয়া মনে করিতেন।

---

* "Political Science has its roots in psychology."

তাঁহাদের নিকট রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ছিল প্রধানত নৈতিক আদর্শ। প্লেটোর রিপাবলিকের (Republic) রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনা নৈতিক আদর্শ দ্বারাই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। এ্যারিষ্টটলের মতে, মংগলময় সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং একমাত্র সু-রাষ্ট্রেই সু-নাগরিকের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। এইভাবে গ্রীকদের প্রদর্শিত নৈতিক পথে রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের অনুসরণ বহুদিন পর্যন্ত চলিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালীর চিন্তাবীর মেকিয়াভেলিই (Machiavelli) হইলেন প্রথম রাষ্ট্রনীতিবিদ যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্রের কবল হইতে মুক্ত করেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা দান করেন। ইংরাজ দার্শনিক হবস্ মেকিয়াভেলিকেই অনুসরণ করেন। এইভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে অংগাংগি সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল এবং উভয়ের বিষয়বস্তু ও পরিধি পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়িল।

পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্রের অংশ বলিয়া গণ্য করা হইত

মেকিয়াভেলি প্রথমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পৃথক শাস্ত্রের মর্যাদা দান করেন

উভয়ের বিষয়বস্তু যে পরস্পর হইতে কতকটা পৃথক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নীতিশাস্ত্র মনের চিন্তা ও বাহ্যিক আচরণ উভয় লইয়াই আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাত্র মানুষের বাহ্যিক আচরণ লইয়া আলোচনা করে, মনের চিন্তার সংগে এই শাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। উপরন্তু, মানুষের সকল প্রকার বাহ্যিক আচরণ লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান কারবার করে না; ইহার পরিধি মাত্র মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরিশেষে বলিতে পারা যায় যে, ন্যায়-অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ রচিত হয়; রাষ্ট্রের নির্দেশ বা আইন রচিত হয় সুবিধা-অসুবিধার কথাও চিন্তা করিয়া। যাহা বেআইনী তাহাই দুর্নীতিমূলক না-ও হইতে পারে।

এইভাবে নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পরস্পর হইতে পৃথক হইলেও উভয় শাস্ত্র পরস্পরের সহিত সম্পর্করহিত মনে করিলে সম্পূর্ণ ভুল হইবে। একথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে নৈতিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত করা যায় না। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইল এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করা যেখানে মানুষ তাহার সত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের গণ্ডি নির্ধারিত হয় এবং গণ্ডির নির্ধারণে রাষ্ট্র সকল সময়ই নীতিশাস্ত্রের নির্দেশে পরিচালিত হয়। দুর্নীতিমূলক কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র নাগরিকগণের সত্তার উপলব্ধিতে সহায়তা করিতে পারে না। এইজন্য অন্যতম আধুনিক লেখক অধ্যাপক আইভর ব্রাউন (Ivor Brown) বলিয়াছেন যে, নীতিশাস্ত্রের ধারণা প্রতিফলিত না হইলে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ অর্থহীন এবং রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ ব্যতিরেকে নৈতিক মতবাদ অসম্পূর্ণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র পরস্পরের

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পৃথক শাস্ত্র হইলেও নীতিশাস্ত্রের সহিত সম্পর্করহিত নহে

পরিপূরক। আজ যাহা নীতিশাস্ত্রের সূত্র হিসাবে প্রচলিত আছে, কাল তাহা আইনে রূপান্তরিত হইয়া মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রও আবার অনেক সময় আইন প্রণয়ন দ্বারা কুনীতি দূর করিয়া সুনীতিকে আহ্বান করে। ফলে নীতিশাস্ত্রের রূপও পরিবর্তিত হয়। লর্ড এ্যাক্টনের (Lord Acton) মতে, ইহাই রাষ্ট্রের প্রধান কার্য। সুতরাং, এ্যাক্টনের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর প্রধান অনুসন্ধানের বিষয় হইল রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ঔচিত্য-অনৌচিত্য।*

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কখনও নীতিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্যুত হইতে পারিবে না

উপসংহার হিসাবে অধ্যাপক গেটেলের ভাষায় বলা যায় যে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে রাষ্ট্রের কার্যাবলী নির্ধারিত হইবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের সমন্বয়সাধনের জন্য নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র কখনই পরস্পর হইতে সম্পর্কচ্যুত হইতে পারিবে না। বর্তমানে উভয়ের মধ্যে অংগাংগি সম্বন্ধ না থাকিলেও, নিকট সম্পর্ক আছে—চিরকালই থাকিবে।

সংক্ষিপ্তসার

আদিম যুগেই মানুষ সমাজ গড়িয়াছিল। সমাজ বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। এই রাষ্ট্রই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র বিশেষ ব্যাপক। ইহা রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সরকারকে লইয়া আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সরকারকে লইয়া আলোচনা করে কিনা সে-সম্বন্ধে অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। আধুনিক মত হইল যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও সরকার উভয়কে লইয়াই আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইংগিত দিতে চেষ্টা করে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়কে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' না 'রাষ্ট্রনীতি' কি আখ্যা দেওয়া হইবে? সাম্প্রতিক ধারণা অনুসারে ইহাকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বলিয়াই অভিহিত করা উচিত।

আমাদের আলোচ্য বিষয়কে 'রাষ্ট্রদর্শন' বলা চলে না—কারণ রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশমাত্র।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য কিনা? এই সম্পর্কেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ একমত নহেন। তবে ব্রাইস্ প্রভৃতি সাম্প্রতিক লেখকগণের মত যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত তাহাই ঠিক মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞান হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নয়। বস্তুত কোন সামাজিক বিজ্ঞানই সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার জন্য প্রধানত নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয়: (ক) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, (খ) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, (গ) পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি, (ঘ) সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, (ঙ) জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, (চ) মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি, (ছ) আইনমূলক পদ্ধতি, (জ) ঐতিহাসিক পদ্ধতি, এবং (ঝ) তুলনামূলক পদ্ধতি। পদ্ধতিগুলির

* "The great question is not what governments prescribe, but what they ought to prescribe."

প্রত্যেকটির কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ বলিয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণকে এতগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখা যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রাণিবিদ্যা : উভয় শাস্ত্রের কিছুটা সংগতি থাকিলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি প্রাণিবিদ্যার অনুরূপ নহে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞান : রাষ্ট্রনৈতিক জীবন একমাত্র ভৌগোলিক বিষয়সমূহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান : রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার জন্য সমাজবিজ্ঞানের দান অপরিহার্য ; কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের অংগীভূত নহে।

ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান : এই দুই শাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক, কিন্তু সমগ্র ইতিহাস প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি বা সমগ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান বর্তমান ইতিহাস নহে। বলা যায় "ইতিহাসের কিছুটা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অংশ।" অংশকে সমগ্র বলিয়া ভুল করা চলিতে পারে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা : পূর্বে অর্থবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশমাত্র ছিল। পরে উভয়ে পরস্পর হইতে পৃথক হইলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। আজিকার সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে এই সম্পর্ক দিন দিন ঘনিষ্ঠতর হইতেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান : বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় মনোবিজ্ঞানের নীতিসমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের সহিত সম্পর্করহিত বলিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান উহাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে পারে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র : পূর্বে উহাদের মধ্যে অংগাংগি সম্পর্ক ছিল। বর্তমানে এই অংগাংগি সম্পর্ক ঘুচিয়া গেলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্র হইতে বিদায় হইতে পারে নাই এবং কোন দিনই পারিবে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শমূলক বিজ্ঞান বলিয়া চিরকালই নৈতিক মানদণ্ডের সহিত সম্পর্কিত থাকিবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the scope of Political Science. (C.U. 1959) (১-৪ পৃষ্ঠা)

2. How far do you agree with the view that there is a science of Politics ? (৬-৮ পৃষ্ঠা)

3. Define Political Science. Indicate the relation of Political Science to (a) Sociology, (b) Economics, and (c) Ethics. (C.U. 1940, '58, '60) (১-৩, ১৪-১৬, ১৮-২০ এবং ২১-২৩ পৃষ্ঠা)

4. "History without Political Science has no fruit, and Political Science without history has no root." Discuss the statement. (C. U. 1950, '59)

[উত্তরের কাঠামো : উক্তিটি স্যর জন সিলীর। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত ও পরস্পরের পরিপূরক। ঐতিহাসিক পটভূমিকা ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও কার্যাবলী সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। শুধু তাহাই নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইতিহাস ব্যতীত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ভিত্তিহীন ও অসার হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে

ইতিহাসের আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত সম্পর্কচ্যুতভাবে হইতে পারে না। ইতিহাসের কার্য অতীতের ঘটনাবলীর সংকলন করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা করা, তাহাদের কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ধারণ করা, ; কিভাবে যুগে যুগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ও পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার সন্ধান দেওয়া, এবং তাহাদের অগ্রগতির সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করা। এই ইতিহাসের আলোচনার অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস—অর্থাৎ রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন, তাহাদের প্রসার ইত্যাদির আলোচনা ইতিহাসের অংগীভূত। সুতরাং ইতিহাসকে সম্যকভাবে বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদের উহাকে রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়া আলোচনা করিতে হইবে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইতিহাসের সমস্তটাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান নহে—যেমন, চারুকলা বা ভাষা বা আচার-ব্যবহারের ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। অনুরূপভাবে সমগ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানই বর্তমান ইতিহাস নহে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক অংশ আছে যাহা কল্পনাপ্রসূত।...এবং ১৬-১৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

5. Bring out the relation between (a) Political Science and History (C. U. 1957, '58) and (b) Political Science and Economics (C. U. 1958).

(১৬-১৮, এবং ১৮-২০ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা

(NATURE AND PURPOSE OF THE STATE)

ষ্ট্রং (C. F. Strong) বলিয়াছেন, রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে-কোন প্রকার আলোচনা সমাজ হইতে সুরু করিতে হয়, কেন-না রাষ্ট্র হইল অন্যতম সামাজিক সংগঠন। বস্তুত, সমাজ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ব্যতিরেকে রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা সার্থক হইতে পারে না। সুতরাং আমরা সমাজ হইতেই আলোচনা সুরু করিব।

***সমাজ হইতে রাষ্ট্রে* (From Society to State) :** মানুষের যে কোন সংগঠনকেই সমাজ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অধ্যাপক ম্যাকআইভারের মতে, যেখানেই কিছুসংখ্যক ব্যক্তি পরস্পরের সহিত স্বেচ্ছায় সম্পর্ক স্থাপন করে সেখানেই সমাজের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।* জীবিকার্জনের তাগিদেই হউক বা প্রকৃতিগত কারণেই হউক মানুষ

সংক্ষেপে সমাজ কাহাকে বলে

* "Whenever living beings enter into willed relations with one another, there society exists."

পরস্পরের সহিত স্বেচ্ছায় সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সমাজের প্রতিষ্ঠা করে। প্রকৃতিগত কারণ বলিতে মানুষের স্বাভাবিক সংগপ্রিয়তা ও বুদ্ধিমত্তাকে বুঝায়। অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষও ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি প্রবৃত্তির দাস। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতির নিবৃত্তি হইলেই মানুষের চলে না কারণ মানুষ প্রজ্ঞাশীল জীব (rational animal)। সে আরও কিছু চায়। এই আরও কিছু হইল উন্নততর জীবন। এই উন্নততর জীবনের আকাংক্ষাই তাহাকে সংগপ্রিয় করিয়াছে। সে একা বাস করিতে পারে না; সকলের সংগে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে চায়। এইজন্যই আদিম যুগে মানুষ পরিবারের সংগঠন করিয়াছিল। পরিবারই মানুষের আদিমতম সমাজ।*

সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যখন একই পরিবার বহু পরিবারে বিভক্ত হইয়া গেল, তখন তাহারা সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠী (clan) বলিয়া পরিচিত হইল। গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রত্যেকে একই পূর্বপুরুষের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল; ফলে তাহারা একই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত রহিল। গোষ্ঠী হইল সমাজ-বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর। গোষ্ঠীর পর আসিল উপজাতি (tribe)। সমাজ-বিবর্তনের এই স্তরে প্রতিষ্ঠা হইল রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের। এইভাবে পারিবারিক সংগঠন বিবর্তিত হইয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। এই বিবর্তনে অবশ্য পারিবারিক বন্ধন বা রক্তের সম্বন্ধ ছাড়াও ধর্ম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাও বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। এ-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে করা হইতেছে।†

পরিবার হইতে রাষ্ট্রের বিবর্তন

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই প্রকারের রাষ্ট্রকে নগর-রাষ্ট্র (city-state) বলা হয়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল নগর-রাষ্ট্রকেই মানুষের সমাজ-সংগঠনের চরম বিকাশ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই ধারণা যে ভ্রান্ত ইতিহাস তাহা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছে। এ্যারিষ্টটলেরই ছাত্র ম্যাসিডনবীর আলেকজাণ্ডার অগ্রসর হইলেন প্রথম বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা প্রসংগে বলা প্রয়োজন যে, এমন অনেক চিন্তাশীল লেখক আছেন যাঁহারা রাষ্ট্রকে সমাজ-সংগঠনের শ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া মনে করেন না। জনসংখ্যার মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক যে রাষ্ট্রের ভিত্তি ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এই লেখকগণের মতে, প্রত্যেক রাষ্ট্র মূলত শক্তিপ্রয়োগের বাস্তব প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সন্ধান মিলে তখনই যখন মনুষ্যসমাজে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব

অনেকে রাষ্ট্রকে সমাজ-সংগঠনের শ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া মনে করেন না

* অবশ্য অনেকে ইহার বিপরীত ধারণা পোষণ করেন। ইঁহাদের মতে প্রথমে সংগঠিত হইয়াছিল সমাজ এবং পরে আসিয়াছিল পরিবার। ম্যাক্‌আইভারের উপরি-উক্ত সংজ্ঞা এই দ্বিতীয় ধারণারই প্রতিফলন।

† রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (৪র্থ অধ্যায়) দেখ।

বর্তমান থাকে কারণ এই বিরোধ বা দ্বন্দ্বকে সংযত রাখিবার জন্যই শক্তিপ্রয়োগের হয় প্রয়োজন। সমাজ-বিবর্তনের যে-স্তরে উৎপাদনের উন্নতি এবং শ্রমবিভাগের ফলে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি, ধনবৈষম্য এবং মানুষে মানুষে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিল সেই সময়ই উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের। প্রত্যেক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে-শ্রেণী আর্থিক বলে সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী—অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের উপর মালিকানা যাহাদের, সেই শ্রেণী রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করে এবং যে-প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় তাহারা সুবিধা ভোগ করে সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়োগ করে। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সমাজের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজ আবার পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্ন প্রকৃতির সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে রাষ্ট্রের চরিত্র এবং উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হয়। দাস-রাষ্ট্র, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। দাস-সমাজে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হইল দাসপ্রভুরা দাস খাটাইয়া যাহাতে উদ্বৃত্তাংশ ভোগ করিতে পারে তাহা দেখা; সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভুরা রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে ভূমিদাসের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত সময় আদায় করিবার উদ্দেশ্যে; পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল পুঁজিবাদী মালিকের মুনাফাকে বজায় রাখা; এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে কাজ করা।

ইঁহারা রাষ্ট্রকে চিরন্তন প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করেন না

এই শ্রেণীর লেখকেরা আরও বলেন যে, রাষ্ট্র কোন চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়। আদিম সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্র ছিল না। শ্রেণীবিরোধের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার যখন পৃথিবীর বুক হইতে শ্রেণীবিরোধ দূরীভূত হইবে তখন সংগে সংগে রাষ্ট্রও লোপ পাইবে।

বর্তমানে আমরা এই শ্রেণীর চিন্তাশীলদের মতবাদ আলোচনাক্ষেত্রের বাহিরে রাখিয়া কতকটা গতানুগতিকভাবেই আলোচনা করিব।

***রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি* (Definitions and Nature of the State) :** রাষ্ট্রকে অনেকে সামাজিক সংগঠনের চরম বিকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চরম বিকাশ হউক বা না-হউক রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। প্রত্যেক সংগঠনেরই অন্তত একটি করিয়া উদ্দেশ্য থাকে—যথা, শ্রমিক-সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল বিশেষ ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচার করা, সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল বিশেষ সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা, ইত্যাদি। রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত। এই কারণে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনানুগ অধ্যাপক হল (Hall) রাষ্ট্রের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন: রাষ্ট্র হইল "রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত, বহিঃশক্তির শাসন হইতে সর্বপ্রকারে

রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং রাষ্ট্রের হল-প্রদত্ত সংজ্ঞা

মুক্ত জনসমাজ।" এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে, 'রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য' কাহাকে বলে? এক কথায়, রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য বলিতে বুঝায় সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা। সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে হয় নাই। সমাজ সংগঠনের বিকাশ বলিতে যখন পরিবারকে বুঝাইত তখন মানুষের জীবন ছিল বিশৃংখল। পরিবারের পর যখন উদ্ভব হইল গোষ্ঠীর, গোষ্ঠীর পর যখন উদ্ভব হইল উপজাতির—তখনও মানুষের পক্ষে সুশৃংখল, সুন্দর সমাজজীবন-যাপন সম্ভব হইল না। সম্ভব হইল তখনই যখন উপজাতি হইতে উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের। সহজ সুন্দর জীবন মানুষের স্বভাবজাত আকাংক্ষা। এই আকাংক্ষাই তাহাকে আদিম যুগে পরিবার গঠনে, দল গঠনে বাধ্য করিয়াছিল। এবং পরিবারই বিবর্তিত হইয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। কতকটা এই দিক দিয়াই চিন্তা করিয়া স্যর হেনরী মেইন (Maine) বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল মানুষের প্রকৃতি।*

মেইন বলেন, রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল মানুষের প্রকৃতি

রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন থাকে—যথা, ধর্মীয় সংগঠন, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক-সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বণিক-সমিতি ইত্যাদি। রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে বহু পরিবারও থাকে। রাষ্ট্রের মধ্যে বহু পারিবারিক ও সামাজিক সংগঠন থাকিলেও ইহাদের সমবায়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নাই। এ-বিষয়ে এ্যারিষ্টটল ভুল করিয়াছেন। তিনি নগর-রাষ্ট্রকে মানুষের সমাজ-সংগঠনের চরম বিকাশ বলিয়া মনে করিয়া রাষ্ট্রের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন: "রাষ্ট্র হইল কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি যাহার উদ্দেশ্য হইল স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন।" রাষ্ট্রকে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক সংগঠনের স্বার্থের রক্ষক বলিয়া মনে করাও ভুল। রাষ্ট্রকে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লওয়া হইলে ইহার সম্বন্ধে আরও উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা আরও ব্যাপকতর; ইহার উদ্দেশ্য আরও মহত্তর। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইলেও বলা যায় যে, বর্তমানে রাষ্ট্র সমাজজীবনের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান; রাষ্ট্র সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সুশৃংখল ও সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে এক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহাকে বলা হয় সার্বভৌম ক্ষমতা বা সার্বভৌমিকতা।

এ্যারিষ্টটল

রাষ্ট্রকে সমাজ-জীবনের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করা হয়

অধ্যাপক ম্যাক্‌আইভার (MacIver) সার্বভৌম ক্ষমতাকে 'সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা' (united power of the community) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সমাজের এই সম্মিলিত ক্ষমতা আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা। আইন রাষ্ট্রের নিয়মাবলী মাত্র। অন্যান্য সংগঠনের নিয়মাবলী হইতে ইহার পার্থক্য এইখানে যে, আইন মান্য করা প্রত্যেক ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষে বাধ্যতামূলক; অন্যান্য সংগঠনের নিয়মাবলী পালন

* The State is based upon the habit of mankind.

করা সভ্যদের বাধ্যতামূলক নহে। আইন মান্য না করিলে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করিতে পারে; অন্য যে-কোন সংগঠনের নিয়মাবলী ভংগ করিলে সেই প্রতিষ্ঠান অনুনয়-বিনয় করিতে পারে, সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে—কিন্তু বলপ্রয়োগ করিতে পারে না। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রপতি উইলসন (President Wilson) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন: "রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি।"

রাষ্ট্রপতি উইলসন-প্রদত্ত সংজ্ঞা

রাষ্ট্রের অন্যান্য কয়েকটি সংজ্ঞা (Some other definitions of the State): রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য। একজন জার্মান লেখক বলিয়াছেন যে, প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই রাষ্ট্রের একটি করিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং যে-কোন দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে সংগতির অভাব দেখা যায়। আমরা ইতিমধ্যেই হল, এ্যারিষ্টটল ও উইলসন প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলি লইয়া সামান্য আলোচনা করিয়াছি। ইহার মধ্যে হল ও উইলসন প্রদত্ত সংজ্ঞা হইল রাষ্ট্রের আধুনিক সংজ্ঞা। অন্যান্য আধুনিক সংজ্ঞার মধ্যে বার্জেস ও ব্লুণ্টস্‌লি প্রদত্ত সংজ্ঞা সমধিক প্রসিদ্ধ। বার্জেসের মতে, যদি 'মানবজাতির কোন অংশকে সংঘবদ্ধভাবে দেখা যায়' তবে তাহাই রাষ্ট্র। ব্লুণ্টস্‌লি বলেন যে, রাষ্ট্র হইল 'কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজ।' এই সকল আধুনিক সংজ্ঞার প্রত্যেকটি অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট—ইহাদের কোনটি হইতেই রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় অধ্যাপক গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা হইতে। গার্ণারের সংজ্ঞা মৌলিক সংজ্ঞা নয়; ইহা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলির সমন্বয় মাত্র। গার্ণারের মতে, "রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া গঠিত এমন একটি জনসমাজ যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বাস করে, যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং যাহার একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে—যে শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশই স্বভাবগত আনুগত্য স্বীকার করে।"

বার্জেস ও ব্লুণ্টস্‌লি প্রদত্ত সংজ্ঞা

আধুনিক সংজ্ঞাগুলি অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট

গার্ণারের সংজ্ঞা

গার্ণারের উপরি-উক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের চারিটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়: (ক) জনসমাজ বা ঐক্যবদ্ধ মনুষ্য সম্প্রদায়, (খ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (গ) সুগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন প্রণীত ও কার্যকর হয়, এবং (ঘ) সার্বভৌমিকতা বা রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের উপর চরম ক্ষমতা এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা।

গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

এই চারিটি উপাদানের সমবায়েই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়; ইহাদের মধ্যে কোন একটির অভাব হইলে সংগঠন রাষ্ট্র পদবাচ্য হয় না। রাষ্ট্র শুধু জনসমাজ বা ভূখণ্ড বা শাসনযন্ত্র নহে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী, সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন জনসমাজের সুগঠিত শাসন-ব্যবস্থা থাকিলে তবেই তাহা রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়। রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট

করিবার জন্য রাষ্ট্রের উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের জনসমষ্টি (Population of the State): সমাজের মধ্য হইতে যখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য যখন মানুষের সামাজিক সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রণ করা তখন রাষ্ট্রের জন্য যে জনসমষ্টির প্রয়োজন তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বস্তুত, জনসমষ্টি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের কল্পনাও করিতে পারি না। রাষ্ট্রের জনসমষ্টিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়—নাগরিক (citizens) এবং বিদেশী (aliens)। যাহারা আইন কর্তৃক রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন জন বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাহারাই নাগরিক; আর যাহারা কোন বহিঃরাষ্ট্রের সভ্য এবং যাহাদের আনুগত্য কোন বহিঃরাষ্ট্রের প্রতি অথচ অস্থায়ীভাবে এই রাষ্ট্রে বাস করিতেছে তাহাদের বিদেশী বলা হয়।

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির শ্রেণীবিভাগ

নাগরিকদের আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) যাহারা রাষ্ট্রের সকল সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ, এবং (২) যাহারা ঐগুলি পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পায় না। সকল রাষ্ট্রেই এমন অনেক নাগরিক আছে যাহাদের ভোট দিবার অধিকার নাই। সুতরাং ভোটাধিকারের মত রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার না থাকিলে যে নাগরিক পর্যায়ভুক্ত হওয়া যায় না এমন কোন কথা নাই। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে হইলে নাগরিক হইতে হইবে। অনেক লেখক আছেন যাঁহারা ভোটাধিকার প্রাপ্ত নয় এমন সমস্ত রাষ্ট্রের সভ্যদিগকে 'প্রজা' (subjects) আখ্যা দেওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু এখানে অসুবিধা হইল 'প্রজা' শব্দটির সহিত রাজতন্ত্র এবং স্বৈরাচারিতার স্মৃতি বিজড়িত আছে। এখনও ব্রিটেনে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজতন্ত্র বর্তমান এবং বহুদিন হইতে ব্রিটেনের নাগরিকদের 'ব্রিটিশ প্রজা' (British Subjects) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অবশ্য সম্প্রতি 'নাগরিক' শব্দটিরও প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, 'ব্রিটিশ প্রজা' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ব্রিটিশ ন্যাশানালিটী আইন (British Nationality Act, 1948) অনুসারে যুক্তরাজ্য (United Kingdom), ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং ডোমিনিয়নগুলির নাগরিককে ব্রিটিশ প্রজা বা কমনওয়েলথ্-নাগরিক বলিয়া অভিহিত করা হয়। এমনকি একজন ভারতীয় নাগরিক যুক্তরাজ্য এবং উপনিবেশে অবস্থানকালে ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া পরিচিত। অতএব দেখা যাইতেছে, সমস্ত ব্রিটিশ প্রজাই যুক্তরাজ্যের নাগরিক নয়। আবার অনেক সময় নাগরিক এবং স্বজাতীয় (national) শব্দ দুইটি সমার্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়া এই দুইটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য করা যাইতে পারে। ঐ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকারকারী সকল ব্যক্তিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বজাতীয় কিন্তু সকল স্বজাতীয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নহে।

ভারতেও এমন অনেক লোক আছে যাহারা নাগরিক এবং বিদেশী এই দুই শ্রেণীর কোনটির মধ্যেই পড়ে না। ১৯৫০ সালের সংবিধান (বিদেশী রাষ্ট্র সম্পর্কিত ঘোষণা) আদেশ [The Constitution (Declaration as to Foreign States) Order, 1950] অনুসারে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে ভারত বিদেশী রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিবে না। সুতরাং ভারতে অবস্থানকারী কোন কমনওয়েলথ্ দেশের নাগরিক বিদেশী নয়।

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সংখ্যা সম্বন্ধে কোন প্রচলিত বিধি নাই। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করিতেন যে, স্বল্প সংখ্যাই সুশাসনের পক্ষে অপরিহার্য কিন্তু আধুনিক যুগে পরোক্ষ শাসন, বিকেন্দ্রিকরণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা, স্বায়ত্ত-শাসন-পদ্ধতি, পরিবহণ-ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি প্রভৃতির ফলে দেখা গিয়াছে যে বৃহৎ জনসংখ্যা সুশাসনের কোন অন্তরায় নহে। পূর্বে সুশাসনের দিক দিয়া অনেক সময় দশ হাজার জনসংখ্যাকে কাম্য বলিয়া মনে করা হইত; বর্তমানে ঐ একই দিক দিয়া দশ কোটিও অকাম্য নহে। তবে কাম্য জনসংখ্যা নির্ধারণে একমাত্র সুশাসনকেই মানদণ্ড করিলে চলিবে না; দেশের আর্থিক সম্পদ কি সংখ্যক জনসংখ্যার উপযোগী তাহাও দেখিতে হইবে।

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সংখ্যা নির্ধারণ

রাষ্ট্রের ভূখণ্ড (Territory of the State): জনসমাজ যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী হয়, ততক্ষণ রাষ্ট্র গঠিত হয় না। যাযাবর জাতির রাষ্ট্র বলিয়া কিছুই নাই যদিও তাহারা শাসন-ব্যবস্থার অধীনে সংঘবদ্ধভাবে বাস করে। প্যালেষ্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইহুদিরা সংঘবদ্ধ ছিল, কিন্তু পৃথিবীময় ছড়াইয়া থাকায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে, ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্র বলিয়া কোন কিছুর কল্পনাও করা যায় না। রাষ্ট্রের উদ্ভবের ঐতিহাসিক মতবাদ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানব সভ্যতার যে-পর্যায়ে মানুষ শুধু পশুচারণ করিত, সে-পর্যায়ে ঠিক রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব হয় নাই। মানুষ যখন পশুচারণার স্তর হইতে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া কৃষিকর্ম সুরু করিল এবং ইহার ফলে যখন দেখা দিল জনসমাজের মধ্যে বিশেষ ধনবৈষম্য, তখন প্রয়োজন হইল এক নূতন ধরনের সংগঠনের যাহা ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির সংরক্ষণ করিবে ও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা করিবে। এই নূতন ধরনের সংগঠনই হইল রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সমাজ যখন কৃষিকর্মকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিল, তখনই উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের। ইংরাজী শব্দগত অর্থ ধরিলে রাষ্ট্রের সংগে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। অধ্যাপক গেটেলের ভাষায়, রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমিকতাও ভূমিগত।*

মানব-সভ্যতার যে-পর্যায়ে মানুষ ভূমির সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিল, সেই পর্যায়েই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল

ভূমি জনসমাজের ঐক্যের এবং সার্বভৌমিকতার ভিত্তি

* "....the idea of territorial sovereignty and jurisdiction is firmly embedded in present political thought."

রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলিতে মাত্র নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকেই বুঝায় না—উহার এলাকাধীন সকল নদনদী হ্রদ-খাল ইত্যাদিও ঐ ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের ভূখণ্ড সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে উপকূলবর্তী সমুদ্রের কিছু অংশ (territorial waters) ঐ রাষ্ট্রের এলাকাধীন জমির অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য সমুদ্রের কতদূর পর্যন্ত রাষ্ট্রের জমির অন্তর্ভুক্ত হইবে সে-সম্পর্কে ধরাবাঁধা নিয়ম এখনও নির্ধারিত হয় নাই। তবে বলা যায় যে সাধারণত নিম্নতম জল-রেখা (low-water mark) হইতে সমুদ্রের তিন মাইল পর্যন্ত সমীপবর্তী রাষ্ট্রের এলাকাধীন ভূমির অন্তর্গত। কিন্তু বর্তমানে অনেক রাষ্ট্র এই তিন মাইল সীমারেখার অধিক এলাকা দাবি করিয়া থাকে। অনেক সময় আবার সর্ববিষয়ে সার্বভৌম অধিকার দাবি না করিয়া তিন মাইলের অধিক অঞ্চলের উপর বিশেষ অধিকার দাবি করা হয়। সমুদ্রের যে-অংশের উপর এইরূপ বিশেষ অধিকার দাবি করা হয় তাহাকে সংলগ্ন অঞ্চল (the 'Contiguous Zone') বলিয়া অভিহিত করা হয়। কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে—যেমন, রাজস্ব, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়মকানুনাদি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য—সংলগ্ন অঞ্চলের নীতিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই অঞ্চলের দূরত্ব কতটা হইবে সে বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও বর্তমানের ধারণা হইল যে, দূরত্ব উপকূল সীমারেখা হইতে ১২ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।*

রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সমুদ্র

সংলগ্ন অঞ্চল সম্পর্কে রাষ্ট্রের অধিকার

বিমান চলাচল ও বেতারের প্রসারের ফলে সম্প্রতি বায়ুমণ্ডলের উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করিলেও ইহা একপ্রকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এলাকাধীন ভূখণ্ডের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের উপর ঐ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিস্তৃত। একমাত্র চুক্তির দ্বারা যে অধিকার দেওয়া হয় অন্যান্য রাষ্ট্র ঐ রাষ্ট্রের এলাকাধীন বায়ুমণ্ডলে সেই অধিকার মাত্র ভোগ করিতে সমর্থ।

বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে রাষ্ট্রের অধিকার

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সংখ্যার ন্যায় ভূখণ্ডের এলাকা সম্বন্ধেও ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদের নিকট একটি মাত্র নগর ছিল রাষ্ট্রের পক্ষে পর্যাপ্ত ভূখণ্ড; আবার রোমানদের নিকট সমগ্র পৃথিবীও রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের পক্ষে যথেষ্ট বৃহৎ ছিল না। বর্তমান যুগের ধারণা হইল যে, প্রাকৃতিক সীমা ও ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সীমা নির্ধারিত হওয়া উচিত।

ভূখণ্ডের আয়তন সম্বন্ধে আলোচনা

রুশোর মত কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র বৃহদায়তন রাষ্ট্র হইতে অধিকতর শক্তিশালী। বর্তমানে অবশ্য এ-মত মানিয়া লওয়া হয় না। বর্তমানে দুইটি প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্রই—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত ইউনিয়ন—আয়তনে

* J. L. Brierly, The Law of Nations

বিশাল। আর একটি প্রাচীন ধারণা যে, বৃহদায়তন রাষ্ট্র গণতন্ত্রের পরিপন্থী, তাহাও বর্তমানে অপনীত হইয়াছে। অতি বৃহৎ রাষ্ট্রেও যে অন্তত পরোক্ষ গণতন্ত্র সফল হইতে পারে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ইহা প্রমাণিত করিয়াছে।

রাষ্ট্রের জনসমষ্টি ও ভূখণ্ডের আলোচনা প্রসংগে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সংখ্যা বৃহৎ এবং আয়তন বিশাল হইলে তাহাকে বিশাল রাষ্ট্র বলা হয়। ভারত, নয়া চীন, সোবিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি এইরূপ বৃহৎ রাষ্ট্র। অপরদিকে, ইংল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতিকে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। লর্ড এ্যাক্টনের মতে, রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রত্ব নানা কারণে অবাঞ্ছনীয়। এইরূপ রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সংকীর্ণ মনোভাবাসম্পন্ন হওয়ায় সমাজের প্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়; জনমত এইরূপ রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না, ইত্যাদি। ট্রিটস্‌কে (Treitschke) প্রভৃতি জার্মান দার্শনিকগণের মতে, রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রত্ব রাষ্ট্রের পাপেরই প্রতীক।*

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনা

অপরদিকে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সপক্ষে বলা হইয়াছে যে, ইহা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ অনুকূল। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে কখনই খর্ব হইতে দেয় না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকার রাষ্ট্রেরই পক্ষ সমর্থন করা হইয়াছে। পক্ষ সমর্থন যে সকল সময় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা নহে। যাহা হউক, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রের গুণাগুণ আলোচনা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভূখণ্ডের আয়তন ও জনসমষ্টির সংখ্যাই রাষ্ট্রের শক্তি ও মর্যাদার পরিচায়ক নহে। ইংল্যাণ্ড অপেক্ষাকৃত 'ক্ষুদ্র' হইলেও ভারত অপেক্ষা কম শক্তিশালী বা কম মর্যাদা-সম্পন্ন নহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জাপান যে-কোন 'বৃহৎ' রাষ্ট্র অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। সুতরাং ভূখণ্ডের আয়তন ও জনসমষ্টির সংখ্যার দিক দিয়া যে রাষ্ট্র ক্ষুদ্র প্রকৃতপক্ষে তাহা 'ক্ষুদ্র' না-ও হইতে পারে।

ভূখণ্ডের আয়তন ও জনসমষ্টির সংখ্যাই রাষ্ট্রের শক্তি ও মর্যাদার পরিচায়ক নহে

উপসংহারে বলিতে পারা যায়, বর্তমানে প্রকৃত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্র পাশাপাশি অবস্থান করিলেও গতি হইল বৃহৎ রাষ্ট্রের দিকে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে আজিকার দিনে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করা সহজ নহে। এই কারণেই অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে বা আঞ্চলিক জোটে (regional associations) মিলিত হয়।

বর্তমানে গতি হইল বৃহৎ রাষ্ট্রের দিকে

* "....the state is power....it is a sin for the state to be small."

রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র (Government of the State): জনসমষ্টি ও ভূখণ্ডের পর রাষ্ট্র-গঠনের জন্য পরবর্তী অপরিহার্য উপাদান হইল শাসনযন্ত্র বা সরকার। সরকারই রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্র পরিচালনা করে। পরিচালকমণ্ডলীর অভাবে যেমন যে-কোন প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া পড়ে, তেমনি সরকার না থাকিলে রাষ্ট্র এক বিচ্ছিন্ন জনতায় পরিণত হয়।

সরকারের প্রয়োজনীয়তা

যাহারা শাসনকার্য পরিচালনা করে মাত্র তাহাদের লইয়াই সরকার গঠিত হয়। এক কথায়, সরকারকে 'শাসকগোষ্ঠী' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শাসক-গোষ্ঠী রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উদ্দেশ্যসাধন করে। রাষ্ট্র শুধু একটি তত্ত্বগত ধারণা কিনা—এই লইয়া মতবিরোধ থাকিলেও, বাস্তব দৃষ্টিতে সরকারই যে রাষ্ট্র ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্যই সাধারণ লোকে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে না, হব্‌সের মত অনেক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীও করেন নাই।

সরকারকে 'শাসকগোষ্ঠী' বলিয়া অভিহিত করার পর প্রশ্ন উঠে যে, রাষ্ট্রাধীন কোন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সম্প্রদায় এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? ব্যাপক অর্থে যে-সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে, তাহারা সকলেই শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থে সাধারণ নির্বাচকগণও সরকারের এক অংশ। সংকীর্ণ অর্থে সরকার বলিতে বুঝায় মাত্র শাসন বিভাগ, ব্যবস্থা বিভাগ ও বিচার বিভাগকে। এই সমস্ত বিভাগের কর্মকর্তাগণ কিভাবে সার্বভৌম শক্তি ব্যবহৃত হইবে তাহা নির্ধারণ করেন, সাধারণ কর্মচারিগণ তাঁহাদের নির্দেশ অনুসারে কার্য করে। আবার অনেক সময় শুধু শাসন বিভাগকে বুঝাইবার জন্যও সরকার শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

সরকারের স্বরূপ

রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শৃংখলা বজায় রাখা। এই উদ্দেশ্যে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে স্বার্থের যে-সংঘাত তাহাকে নিয়মিত করিতে হয় এবং প্রচলিত ধারণানুযায়ী সাধারণ স্বার্থের উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ এই ব্যবস্থা ছাড়াও আন্তঃরাষ্ট্র সম্বন্ধ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই সকল কার্যই সাধিত হয় সরকার বা শাসনযন্ত্রের দ্বারা।

সরকারের কার্যাবলী

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা (Sovereignty of the State): সার্বভৌমি-কতাকে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া অভিহিত করা যায়। সার্বভৌমিকতার স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। 'সার্বভৌম ক্ষমতা' কথাটি আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা এবং বহিঃশক্তির অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত অবস্থা বুঝাইবার

জন্য সাধারণত ব্যবহার করা হয়। আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা হইল, ম্যাক্আইভারের ভাষায়, 'সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা'।* এই ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রের নিয়মাবলী বা আইন মান্য করিতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি ও সংগঠনই বাধ্য। চরম আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইলে রাষ্ট্রকে বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। স্থতরাং আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতার সহিত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে ভারতে জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও শাসনযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও ভারত রাষ্ট্রপর্যায়ভুক্ত ছিল না, কারণ ভারতের তখন সার্বভৌমিকতা ছিল না। উপরি-উক্ত তারিখে সার্বভৌম ক্ষমতা ভারতবাসীর হস্তে হস্তান্তরিত হওয়ায় ভারত রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক

ভারত রাষ্ট্রের জন্ম

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার আলোচনা প্রসংগে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে সার্বভৌমিকতাকে আইনগত বা তত্ত্বগত বলিয়াই ধরা হয়। কারণ, প্রকৃত সার্বভৌমিকতা—অর্থাৎ, কার্যক্ষেত্রে বহিঃশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতা বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই নাই। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। অনেকে আবার এইরূপ চরম অভিমত পোষণ করেন যে, বর্তমানে মাত্র দুইটি রাষ্ট্র – যথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন; অপরাপর রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটিই অল্পবিস্তর ইহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

বর্তমানে সার্ব-ভৌমিকতাকে তত্ত্বগত বলিয়াই ধরা হয়

শাসনতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র (The State in Constitutional and International Law): রাষ্ট্রকে যে সর্বতোভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে ইহা অনেক সময় শাসনতান্ত্রিক আইনের লেখকরা দাবি করেন না। তাঁহাদের মতে, সংগঠন যদি আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতাসম্পন্ন হয় তবেই রাষ্ট্র আখ্যা পাইতে পারে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক আইনের লেখকগণের মতে, রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত হইবার জন্য প্রয়োজন বহিঃশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। এই আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ হইতেই অধ্যাপক হল রাষ্ট্রকে "···বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জনসমাজ" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।**

শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিতে মাত্র আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতাই প্রয়োজন

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য সংগঠনের স্বতন্ত্রভাবে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব, সন্ধি-সর্তাদি পালনের ক্ষমতা থাকা চাই। বহিঃশক্তির

---

* ২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

** ২৭-২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিলে এই ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন দেশসমূহ আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র নয়। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক আইন জাতিগোষ্ঠীর (Comity of Nations) সভ্য হিসাবে কোন দেশকে আসন দান করে না, যদি না ঐ দেশের এক বিশেষ ধরনের ও উন্নত পর্যায়ের সভ্যতা থাকে। বর্তমানের মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে যেখানে বর্বরতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচিত হয়, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে তাহা রাষ্ট্র নহে।

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে প্রয়োজন বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা ও উন্নত স্তরের সভ্যতা

আসলে আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র কিনা তাহা বিচারের মাপকাঠি হইল অপরাপর রাষ্ট্রের স্বীকৃতি।* কোন গভীর জংগলে বা সভ্যজগতের বাহিরে কোন পার্বত্য অঞ্চলে কোন সর্দারের অধীনে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, শাসনযন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা থাকিতে পারে। এইরূপ সংগঠন শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইলেও আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র নয়—কারণ, ইহা অপরাপর রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায় নাই। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে তুরস্ক উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই; চীন ও জাপান আরও পরে জাতিগোষ্ঠীর সভ্যপদে আসীন হয়। বর্তমানেও অনেক সময় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (U. N.) নূতন সভ্যগ্রহণের সময় আপত্তি উঠে যে, ঐ দেশ পররাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন —অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র নহে।

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র-বিচারের মাপকাঠি

অপরাপর রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বলিতে সকল রাষ্ট্রেরই স্বীকৃতি বুঝায় না। সকল সময় নবগঠিত রাষ্ট্রকে অপর সকল রাষ্ট্র স্বীকার নাও করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নয়া চীনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপর কয়েকটি রাষ্ট্র দ্বারা নয়া চীন আজ পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই; কিন্তু ইংল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। ফলে, অধিকাংশের মতে, চীন গণতন্ত্র আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, যদিও ইহাকে অযৌক্তিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরে রাখা হইয়াছে।

রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য অন্তত কয়েকটি বড় বড় রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রয়োজন

উপসংহারে গেটেল প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা এবং বহিঃশক্তির অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত অবস্থা—এই দুইটি অবস্থাকে সার্বভৌমিকতার (sovereignty) দুইটি দিক বলিয়া মনে না করিয়া প্রথমটিকে বুঝাইতে সার্বভৌমিকতা শব্দটি এবং দ্বিতীয়টিকে বুঝাইতে স্বাধীনতা (independence) শব্দটি ব্যবহার করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

---

* "With certain exceptions,....no community or territorial group can claim rights under international law unless it is regarded by the members of the state system as a state, independent and co-equal with other states." Schuman, International Politics

রাষ্ট্র ও সরকার **(State and Government):** সাধারণত রাষ্ট্রকে একটি তত্ত্বগত ধারণা বলিয়া মনে করা হয়। ইহা পরিচালিত হয় সরকারের মাধ্যমে। সেইজন্য সাধারণ লোকে রাষ্ট্র বলিতে সরকারকেই জানে; তাহারা রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। প্রাচীনকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও অনেক সময় এই পার্থক্য নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেন না। হবস্ 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটি এইরূপভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যেন তাহারা একার্থবোধক ও অভিন্ন। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র"। ইংল্যাণ্ডের ষ্টুয়ার্ট রাজাদের দুই একজনও অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। এইভাবে 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটি অনেক সময় সমার্থবোধকভাবে ব্যবহৃত হইলেও এই দুইটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এই পার্থক্যের তাৎপর্য কি তাহা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন।

রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন নহে

রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী, বহিঃশাসন হইতে মুক্ত, সংগঠিত জনসমাজ। অন্যান্য সংগঠনের মত রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের কার্যাদি কতিপয় লোকের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়; ইহারা রাষ্ট্রের নামে রাষ্ট্রের সার্বভৌমশক্তি ব্যবহার করে। যাহারা এইভাবে রাষ্ট্রের হইয়া কার্য করে তাহাদিগকে সরকার বলিয়া অভিহিত করা হয়। সরকার রাষ্ট্রের হইয়া কার্য পরিচালনা করে বলিয়া উহাকে রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিতও কার্যে পরিণত করিবার যন্ত্র বলিয়াও বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই যন্ত্র রাষ্ট্র-গঠনের অন্যতম উপাদান বা রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মাত্র। রাষ্ট্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হইল জনসমষ্টি, ভূখণ্ড ও সার্বভৌমিকতা। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের অংশ মাত্র। উপরন্তু, রাষ্ট্র গঠিত হয় সমগ্র জনসমষ্টিকে লইয়া, কিন্তু সরকার গঠিত হয় মাত্র শাসকগোষ্ঠীকে লইয়া। এইদিক দিয়াও সরকার রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র। অংশ যেমন কখনই সমগ্রের সমান হইতে পারে না, তেমনি সরকারও কখনও রাষ্ট্রের সমান হইতে পারে না।

সরকার রাষ্ট্রের অংশ মাত্র

অধ্যাপক গার্ণার রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাইবার জন্য রাষ্ট্রকে জীবদেহ এবং যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। রাষ্ট্র যদি জীবদেহের তুল্য হয়, তবে সরকার হইল রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক। জীবদেহের মতই 'মস্তিষ্কে'র নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। কিন্তু সরকার যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন সরকার এবং রাষ্ট্র অভিন্ন বলিয়া মনে করা যায় না, যেমন মস্তিষ্ক এবং জীবদেহকে এক এবং অভিন্ন বলিয়া ধরা যায় না। আবার রাষ্ট্রকে যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করা হইলে, সরকারকে ইহার পরিচালকমণ্ডলী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশে যেমন যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়, তেমনি সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্র

পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রেও পরিচালকমণ্ডলী যেমন যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সব নয় তেমনি সরকারও রাষ্ট্রের সব নয়।*

রাষ্ট্র স্থায়ী আর সরকার অস্থায়ী

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার সময় আবার বলা হয় যে স্থায়িত্ব (permanence) রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সরকার কিন্তু হইল চিরপরিবর্তনশীল। বলা হয় যে বিপ্লব, আইনগত পদ্ধতি, বংশের বিলুপ্তি প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সরকার অনবরত পরিবর্তিত হইতেছে ; কিন্তু সরকারের এই ভাঙাগড়ার মধ্যে রাষ্ট্র অবিচ্ছিন্ন ও অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যাইতেছে। অতএব, অবিনশ্বরতা বা স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।**

রাষ্ট্র বিমূর্ত, সরকার মূর্ত

আবার বলা হয় যে, রাষ্ট্র হইল বিমূর্ত ভাব (abstract) এবং বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ব্যতীতও রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা করা যায়, কারণ সকল রাষ্ট্রই মূলত এক ধরনের। অপরপক্ষে সরকার হইল বস্তুবাচক (concrete) এবং উহা বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে।

রাষ্ট্র অপরিবর্তনীয় নয়

রাষ্ট্র চিরস্থায়ী ও বিমূর্ত—এই মতবাদ সকল চিন্তাবিদ স্বীকার করিয়া লন নাই। সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে রাষ্ট্র শাশ্বত বা অবিনশ্বর নয়। সুদূর অতীতে এমন এক সময় ছিল যখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। যে-সময় হইতে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়িল তখন হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল।† শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র হইল আর্থিক প্রতিপত্তিশীলশ্রেণীর যন্ত্রস্বরূপ। এই রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে প্রতিপত্তিশীলশ্রেণী নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। যখন সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়, একশ্রেণীর স্থলে অন্য আর একশ্রেণী প্রতিপত্তিশীল হইয়া দাঁড়ায় তখন রাষ্ট্রও পরিবর্তিত হয়। যেমন, ফরাসী বিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীসম্পর্ক পরিবর্তিত হইয়া ধনতান্ত্রিক শ্রেণীসম্পর্ক প্রবর্তিত হইয়াছিল। সুতরাং রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয়। রাষ্ট্রের পরিবর্তনের সংগে সংগে আবার সরকারেরও পরিবর্তন হয়। তবে রাষ্ট্র অপরিবর্তিত থাকিয়াও সরকারের পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। যেমন, ইংল্যাণ্ডে রক্ষণশীল দলের সরকারের পরিবর্তে শ্রমিক দলের সরকার গঠিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না, কারণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বা সামাজিক সম্পর্কে (Economic or Social Relations) পরিবর্তন আসে না।††

---

* 'The government is an essential element or mark of the state, but it is no more the state itself than the brain of an animal is itself the animal, or the board of directors of a corporation is itself the corporation.' Garner

** 'States possess the quality of permanence.' Garner

† 'There was a time when there was no state. It appears wherever and whenever a division of society into classes appears, whenever exploiters and exploited appear.' Lenin, The State

†† Laski, The State in Theory and Practice.

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণাও করা ভুল হইবে যে, রাষ্ট্র অবিনশ্বর। রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমিকতা। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ততদিনই বজায় থাকে যতদিন রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতার অধিকারী থাকে। ১৯৩৫ সালে আবিসিনিয়া রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল, কারণ আবিসিনিয়ার সার্বভৌম ক্ষমতা ইতালীর নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছিল। অনুরূপভাবে বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশ আবার সার্বভৌম ক্ষমতার পুনঃপ্রাপ্তিতে পুনর্জীবিত হয়।

অবশ্য রাষ্ট্র অবিনশ্বর নহে

রাষ্ট্র ও সমাজ **(State and Society):** রাষ্ট্র ও সমাজ এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। এই আলোচনায় রাষ্ট্রকে 'অন্যতম সামাজিক সংগঠন' এবং সমাজকে 'মানুষের যে-কোন সংগঠন' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন আলোচনাকে ঈষৎ ভিন্নমুখী করিতে হইবে।

বার্ক (Edmund Burke) তাঁহার বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব সংক্রান্ত গ্রন্থে (Reflections on the Revolution in France) লিখিয়াছেন, "সমাজ একটি চুক্তিগত প্রতিষ্ঠান. . .কিন্তু রাষ্ট্রকেও সম্প্রদায়ের সমগ্র ব্যবসায়-বাণিজ্য, সমগ্র বিজ্ঞান, সমগ্র ললিতকলা, সমগ্র সংগঠন এবং সমগ্র সার্থকতায় অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোনরূপে গণ্য করা যায় না।"* বার্কের এই উক্তিতে দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা প্রতিফলিত হইয়াছে—যথা, রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন এবং এই এক ও অভিন্ন ব্যবস্থা মানুষের সমাজ-সংগঠনের সকল উদ্দেশ্যসাধন করে। এইরূপ সংগঠনকে সমাজ-রাষ্ট্র (Society-State) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা যে শুধু আইন প্রণয়ন ও আইন প্রবর্তন করিয়া সমাজজীবনকে শৃংখলাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে তাহা নহে; ইহা শৃংখলিত সমাজজীবনের আর্থিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় সকল দিকই নিয়ন্ত্রিত করে।

সমাজ-রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা

বার্কের বহু পূর্বে প্রাচীন গ্রীকরাও এইভাবে রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। গ্রীকদের নগর-রাষ্ট্র ছিল একাধারে সমাজ ও রাষ্ট্র। বার্কার বলেন, গ্রীক নগর-রাষ্ট্র ছিল রাষ্ট্র ছাড়াও আরও অনেক কিছু; ইহা ছিল নৈতিক সমাজ, উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান, সুন্দর ও সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত সাংস্কৃতিক সংগঠন।

প্রাচীন গ্রীকদের পরে রোমক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ লইয়া বহু তর্কবিতর্ক চলিয়াছে। কোন রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রকে

* "Society is indeed a contract. . . .but the state ought not to be considered nothing better than a partnership agreement in a trade. . . .it is a partnership in all science; a partnership in all art; a partnership in every virtue, and in all perfection."

পরস্পরের অংগীভূত বলিয়া কল্পনা করিয়াছে, কোন মতবাদ বা উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছে। উল্লিখিত তর্কবিতর্কের ফলে একটি রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার সৃষ্টি হইয়াছে বলা যায়। এই চিন্তাধারার শেষ স্তর বা রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আধুনিক মতই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বর্তমানে 'সমাজ' ও 'রাষ্ট্র' উভয় শব্দই জাতি (Nation) বা সম্প্রদায়ের ধারণার সহিত সম্পর্কিত। বর্তমানের সমাজ হইল জাতীয় সমাজ (National Society)। এই 'জাতীয়' অর্থে 'সমাজ' শব্দটি ব্যবহার করিলে ইহা দ্বারা 'মানুষের যে-কোন সংগঠনকে' বুঝায় না—বুঝায় কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংঘের সমষ্টিকে।* সুতরাং ধর্মীয় সংগঠন, অর্থনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি সমষ্টিগতভাবে হইল জাতীয় সমাজ। জাতীয় সমাজের প্রত্যেক উপাদান বা ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক সংঘই এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত; এবং স্বেচ্ছাধীনভাবে মানুষ এই সকল সংঘের সদস্যভুক্ত হয়—আবশ্যিকভাবে নয়। অপরদিকে, রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় জাতির অন্তর্গত বিশেষ সংগঠনকে, যাহার উদ্দেশ্য হইল আবশ্যিকভাবে কতকগুলি বিধিনিয়ম বা আইন প্রবর্তিত রাখা। এই বিধিনিয়ম ভংগ করিলে রাষ্ট্রও আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগ করে। আবশ্যিকভাবে বর্তমানে মানুষ কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য, স্বেচ্ছাধীনভাবে নয়।

জাতীয় সমাজ

সমাজকে এইভাবে 'মানুষের স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সমষ্টি' ও রাষ্ট্রকে 'একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আবশ্যিক সংগঠন' বলিয়া বর্ণনা করিলে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে; এবং এখন আর হার্বার্ট স্পেন্সারের ন্যায় রাষ্ট্রকে 'যৌথভাবে সমাজ' বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। বস্তুত, সমাজ ও রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নয়। ম্যাক্‌আইভারের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রকে সমাজ এবং সমাজকে রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিলে বিশেষ ভুল হইবে। ইহার ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ কোনটিরই সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা সম্ভব হইবে না। ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন, ধর্মীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি জাতীয় সমাজের উপাদান রাষ্ট্র হইতে উদ্ভূত হয় নাই; রাষ্ট্র হইতে ইহারা কোন অনুপ্রেরণাও লাভ করে না। উপরন্তু, সমাজ-ব্যবস্থা এমন কতকগুলি সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা কখনও শাসনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিতে পারে না।

সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট

ম্যাক্‌আইভার

এইভাবে ম্যাক্‌আইভারের মত সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে গভীর সীমারেখা নির্দেশে হয়ত' আপত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু সীমারেখা যে আছে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বার্কার বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত সহযোগিতার সূত্রে গ্রথিত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা একই কার্য

বার্কার ও ল্যাস্কি

* "By 'Society' we mean the whole sum of voluntary bodies, or associations contained in the nation." Barker

একভাবে ও একসংগে করে না। ল্যাস্কির মতে, "রাষ্ট্র সমাজজীবনের মূলসূত্র নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র এবং সমাজজীবন অভিন্ন নহে।"*

সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশের সংগে সংগে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্কের সন্ধানও পাওয়া যায়। সমাজ এবং রাষ্ট্র অভিন্ন না হইলেও সমাজজীবন নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব রহিয়াছে রাষ্ট্রের উপর। ল্যাস্কি একস্থানে রাষ্ট্রকে 'মানুষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'মানুষের ব্যবহার' বলিতে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবহার সমেত সংঘবদ্ধ জীবনের সমগ্র ব্যবহার বুঝায়। ধর্মীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন, অর্থনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অনুপ্রেরণা লাভ না করিলেও তাহাদের অস্তিত্ব ও কার্যাবলী নির্ভর করে রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নির্দেশের উপর। পরিবার সম্বন্ধেও এই উক্তি অনেকাংশে প্রযোজ্য। সমাজজীবনে মানুষের ব্যবহার রাষ্ট্রের নীতির পরিপন্থী হইতে পারে না। রাষ্ট্রের নীতি হইল সার্বভৌম শক্তির প্রকাশ; ইহার সহিত সংঘাত বাধিলে ব্যক্তি বা সংগঠনের ব্যবহারকে পরিবর্তিত করিতে হইবে।

ন্যায়বোধ এবং সমাজ ও রাষ্ট্র জীবন

অপরদিকে আবার রাষ্ট্র সমাজজীবনের মূলনীতিগুলিকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে। তত্ত্বের দিক দিয়া বলা হয়, রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য—ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ সুগম করিবার জন্য। যে-সমাজে সুশৃংখল জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে কতকগুলি নীতি গৃহীত হইয়াছে, সেখানে রাষ্ট্র এইগুলিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। করিলে মহা ভুল করিবে। অবশ্য গৃহীত নীতিগুলি যদি ন্যায়বোধের (idea of justice) উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে সেইগুলির পরিবর্তন-সাধনের চেষ্টা করা।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান (State and other Associations): আমরা দেখিলাম যে রাষ্ট্র এবং সমাজ এক ও অভিন্ন নহে। রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক-সংগঠন, ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষামূলক সংগঠন প্রভৃতি অসংখ্য সংগঠন থাকে। আধুনিক জীবনের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে মানুষ এই সকল সংগঠনের সহিত নিজেকে বিশেষ করিয়া জড়াইয়া ফেলে। মানুষের জীবনের সহিত এই সকল প্রতিষ্ঠানের এই প্রকার সম্পর্কের জন্য বার্কার সমাজকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "বর্তমানে সমাজ সমষ্টিগত জীবনের জন্য ব্যক্তিসমূহের সংগঠন নহে, ইহা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি।"

এই সকল প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল। রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের এইরূপ মিল থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে

---

* The State "may set the keynote of social order, but it is not identical with it."

যথেষ্ট। রাষ্ট্রের সভ্যপদ মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না; অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সভ্যপদ মানুষের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। রাষ্ট্রের সভ্যপদ সাধারণত মানুষের জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু অন্যান্য সংগঠনের বেলায় সভ্যপদ নির্ভর করে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর। উপরন্তু, মানুষ আবশ্যিকভাবে কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য; অন্যান্য সংগঠনের সভ্য না হইলেও মানুষের চলে।

বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য:

কোন ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না, কিন্তু একাধিক সংগঠনের সভ্য হইতে পারে এবং হয়।

উদ্ভবগত পার্থক্য

রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে বিবর্তনের ফলে; কিন্তু অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার দ্বারা।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে। এই ভূখণ্ডের বাহিরে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হইতে পারে না এবং ইহার বাহির হইতে রাষ্ট্র সভ্যসংগ্রহ করিতে পারে না।

গঠনগত পার্থক্য

অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সভ্যগ্রহণের বেলায় কিন্তু এরূপ কোন বাধা নাই বা ইহাদের কার্যক্ষেত্র এইরূপ গণ্ডি দিয়া নির্দিষ্ট নহে। রামকৃষ্ণ মিশনের ন্যায় অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত; ইহারা সভ্যসংগ্রহও করে পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই।

সাধারণত রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী, অন্যান্য সংগঠন দীর্ঘস্থায়ী নাও হইতে পারে। অন্যান্য সংগঠনের উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই ইহাদের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে কত প্রতিষ্ঠানই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং কত নূতন প্রতিষ্ঠানই সংগঠিত হইতেছে। এই চিরপরিবর্তনের মধ্যে রাষ্ট্র অধিকাংশ সময় অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থাকে।

অন্যান্য সংগঠনের সাধারণত দুই একটি উদ্দেশ্য থাকে। ফলে ইহাদের কার্যাবলীও সংখ্যায় পরিমিত। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল আবশ্যিকভাবে বিধিনিয়ম প্রবর্তন করিয়া ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ সুগম করা। ম্যাক্‌আইভারের মতে, "শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, কিন্তু শৃংখলার জন্য শৃংখলা বজায় রাখা হয় না; শৃংখলা বজায় রাখা হয় ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ সুগম করিবার জন্য।"

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র ইহার নিয়মাবলী বা আইন মান্য করিতে বাধ্য করিতে পারে। স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুনয় করিতে পারে, বিনয় করিতে পারে, সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে মাত্র—কিন্তু বাধ্য করিতে পারে না, বা নিয়মভংগকারীকে শারীরিক শাস্তি প্রদানও করিতে পারে না।

ক্ষমতাগত পার্থক্য

পরিশেষে, রাষ্ট্রের স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা আছে। অন্তত তত্ত্বের দিক দিয়া অন্যান্য সংগঠনের অস্তিত্বই নির্ভর করে রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর। রাষ্ট্র কিন্তু কাহারও নিয়ন্ত্রণাধীন নহে; ইহার অস্তিত্বও অপর কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বও অনেক সময় রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে

রাষ্ট্রের এই নিয়ন্ত্রণ ও অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার ক্ষমতার সহিত জড়াইয়া আছে আর এক ক্ষমতা। ইহা হইল নূতন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা। সুতরাং রাষ্ট্রকে ইচ্ছামূলক সংগঠনসমূহের স্রষ্টকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী ও বিলুপ্তিকারক হিসাবে দেখা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

প্রকৃতিগত কারণে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে একা বাস করিতে পারে না; সকলের সংগে মিলিয়া বাস করিতে চায়। এইজন্য আদিম যুগেই মানুষ পরিবার গঠন করিয়াছিল। অনেকের মতে, এই পরিবারই মানুষের আদিমতম সমাজ।

পরিবার বিবর্তিত হইয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রকে অনেকে সমাজ-সংগঠনের শ্রেষ্ঠ রূপ এবং চিরন্তন প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। বিরুদ্ধবাদী লেখকেরা অবশ্য বলেন যে রাষ্ট্র শক্তি-প্রয়োগের বাস্তব প্রতিষ্ঠান; শ্রেণীবিরোধের ফলেই ইহার উৎপত্তি। সুতরাং যে-দিন শ্রেণীবিরোধ দূরীভূত হইবে রাষ্ট্রও সে-দিন লোপ পাইবে।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সমাজজীবনকে সুশৃংখল করিয়া তোলা। এই কারণে ইহা সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা বা সার্বভৌমিকতার অধিকারী। সার্বভৌমিকতা বা সার্বভৌম ক্ষমতা আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা মাত্র।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা একরূপ অসংখ্য। ইহাদের মধ্যে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলির সমন্বয়ে গার্ণার একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের চারিটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়—যথা, (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) শাসনযন্ত্র, (৪) সার্বভৌমিকতা।

জনসমষ্টি: রাষ্ট্রের জনসমষ্টি প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত—নাগরিক ও বিদেশী। জনসমষ্টির সংখ্যা সম্বন্ধে কোন প্রচলিত বিধি নাই।

ভূখণ্ড: ভূখণ্ডের এলাকা সম্বন্ধেও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। তবে বর্তমান গতি হইল বৃহৎ রাষ্ট্রের দিকে।

শাসনযন্ত্র: শাসনযন্ত্র বা সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রকার্য পরিচালিত হয়।

সার্বভৌমিকতা: ইহাই রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। বর্তমানে 'বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা' কথাটির পরিবর্তে 'স্বাধীনতা' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়।

শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য মাত্র আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা প্রয়োজন; আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে প্রয়োজন হইল অপরাপর রাষ্ট্রের স্বীকৃতি।

রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন নহে। সরকার রাষ্ট্রের অংশমাত্র। সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ।

রাষ্ট্র এবং সমাজ এক ও অভিন্ন নহে। রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংগঠন মাত্র। কেন্দ্রীয় সংগঠন বলিয়া রাষ্ট্র সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ সুগম করা।

রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সহিত ইহার উদ্ভবগত, গঠনগত এবং ক্ষমতাগত পার্থক্য রহিয়াছে। তবে রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ইহা অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ, সৃষ্টি ও বিলোপসাধন করিতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. How would you define a State ? Distinguish State and Society.

[উত্তরের কাঠামো : রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া গঠিত এমন একটি জনসমাজ যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বাস করে, যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং যাহার একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে—যে শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশই স্বভাবতই আনুগত্য স্বীকার করে। এই সংজ্ঞা হইতে রাষ্ট্রের চারিটি অপরিহার্য উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। (১) জনসমষ্টি ; (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ; (৩) সুগঠিত সরকার যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন প্রণীত ও কার্যকর হয় ; এবং (৪) সার্বভৌমিকতা বা রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের উপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা।

পূর্বে রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা হইলেও বর্তমানে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। বর্তমানের সমাজ হইল জাতীয় সমাজ। এই জাতীয় সমাজ বলিতে বুঝায় কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংঘের সমষ্টিকে। সুতরাং ধর্মীয় সংগঠন, অর্থনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি সমস্তই সমষ্টিগতভাবে হইল জাতীয় সমাজ। অপরদিকে রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় জাতির অন্তর্গত বিশেষ সংগঠনটিকে যাহার উদ্দেশ্য আবশ্যিকভাবে কতকগুলি বিধিনিয়ম বা আইন প্রবর্তিত রাখা। এই বিধিনিয়ম ভংগ করিলে রাষ্ট্র আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগ করে। আবশ্যিকভাবে মানুষ কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য, স্বেচ্ছাধীনভাবে নয়। এইভাবে সমাজকে মানুষের স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সমষ্টি ও রাষ্ট্রকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আবশ্যিক সংগঠন বলিয়া বর্ণনা করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা নির্দিষ্ট করা যায়। তবে এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজ ও রাষ্ট্র অভিন্ন না হইলেও সমাজজীবন নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব রহিয়াছে রাষ্ট্রের উপর। রাষ্ট্র অবশ্য সমাজজীবনের মূল নীতিগুলিকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে।....এবং ২৭-২৯ এবং ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা দেখ।]

2. Distinguish between State and other Associations. (C. U. 1955)

(৪১-৪৩ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the *significance* and *meaning* of 'territory' as a constituent element of the State. What are the exceptions to the principle of exclusive jurisdiction of a State over its own territory ? (C. U. 1960) (৩১-৩৩ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অধ্যায়

জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ এবং জাতি

(PEOPLE, NATIONALITY AND NATION)

অনেক সময় জনসমাজ (People), জাতীয় জনসমাজ (Nationality), জাতি (Nation) এবং রাষ্ট্র (State)—এই শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ লোকে শব্দগুলির ব্যবহার ঐরূপভাবে করিলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যসমূহকে উপলব্ধি করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। পার্থক্যসমূহকে উপলব্ধি করিবার জন্য এই ধারণাগুলির প্রত্যেকটির সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র শব্দ সমার্থবোধক নহে

জনসমাজ (People) **:** বার্জেসের (Burgess) মতে, যদি একই ভূখণ্ডে এমন কিছুসংখ্যক লোক বাস করে যাহাদের ভাষায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে, আচার-ব্যবহারে, অধিকারবোধে এবং অভিযোগে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবে তাহাই হইল জনসমাজ। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে জনসমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যায়—যথা, একই ভূখণ্ডে বসবাস বা ভৌগোলিক সান্নিধ্য, ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস ও অধিকারবোধে ঐক্য এবং অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সমচেতনা। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই সমাজবন্ধনের সূত্র—ইহারাই বিশৃংখল জনসমষ্টিকে জনসমাজে পরিণত করে। এই সূত্রগুলির সহিত লীককের (Leacock) মত অনেকে আবার উদ্ভবগত ঐক্য যোগ করেন।

জনসমাজের বৈশিষ্ট্য

জাতীয় জনসমাজ (Nationality) **:** জনসমাজের মধ্যে যদি রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় তবে তাহাকে জাতীয় জনসমাজ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং জনসমাজ ও জাতীয় জনসমাজের মধ্যে পার্থক্য হইল যে, জাতীয় জনসমাজ বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়, জনসমাজ হয় না। এই কারণে জাতীয় জনসমাজকে 'রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ' (a politically conscious people) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। মিলের মতে (J. S. Mill), "এই রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ফলে তাহারা একই সরকারের অধীনে বাস করিতে চায় এবং ইচ্ছা করে যে সরকার হইবে তাহাদের নিজস্ব সরকার বা তাহাদের এক অংশের নিজস্ব সরকার।"*

রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন জনসমাজই জাতীয় জনসমাজ

---

* ইংরেজী শব্দ 'ন্যাশানালিটি'কে (Nationality) আবার জাতীয় ঐক্যের চেতনা বা অনুভূতি বা জাতীয় ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই অনুভূতি বা জাতীয় ভাবের উদ্ভব জনসমাজের ন্যায় নানা কারণে ঘটিতে পারে। ভৌগোলিক সান্নিধ্য, উদ্ভবগত ঐক্য, ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্যগত সমতা, সমস্বার্থ, অভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা প্রভৃতি বর্তমান থাকার জন্য কোন জনসমষ্টি নিজেদের পৃথিবীর অন্যান্য জনসমষ্টি হইতে পৃথক মনে করে।

জাতি (Nation) : (জাতীয় জনসমাজ পরের স্তরে উন্নীত হইলে জাতিতে পরিণত হয়। পরের স্তর বলিতে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার গভীরতা বুঝায়। এই যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার গভীরতা যাহা জাতির প্রাণ তাহা পরিণতি লাভ করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে।

জাতির ধারণা রাষ্ট্রের সহিত জড়িত

লর্ড ব্রাইস জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, "জাতীয় জনসমাজ হইল ভাষা এবং সাহিত্য, ধ্যানধারণা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ এমন এক জনসমষ্টি যাহা অনুরূপভাবে ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিসমূহ হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করে। (জাতি হইল রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত এক জনসমাজ যাহা বহিঃশাসন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে।" ব্রাইসের মত র‍্যামজে ম্যুরও (Ramsay Muir) জাতিগঠনের উপাদান হিসাবে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা সংগঠনের ইচ্ছাই জাতিকে জাতীয় জনসমাজ হইতে পৃথক করে।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের মুসলমানদের উদাহরণস্বরূপ লইয়া জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য বুঝান যাইতে পারে। ইংরাজ শাসনের যুগে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে দুঃখকষ্টের সমতা অনুভূত হওয়ায় এবং একই শাসনাধীনে থাকার ফলে চিন্তাগত ঐক্যের সৃষ্টি হওয়ায় তাহারা এক জনসমাজে পরিণত হইল। পরে মুসলমানরা যখন তাহাদের সম্প্রদায়গত ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া নিজেদের অবশিষ্ট ভারতবাসী হইতে পৃথক বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করিতে লাগিল তখন তাহারা এক পৃথক জাতীয় জনসমাজে পরিণত হইল। পরে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হইলে তাহারা জাতিতে পরিণত হইল। প্যালেষ্টাইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিল এবং তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাও বিশেষ জাগ্রত হইয়াছিল। সুতরাং তখন তাহারা অন্যতম জাতীয় জনসমাজ ছিল। পরে ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহুদিরা জাতিতে পরিণত হয়।

উদাহরণ

এইভাবে জাতি ও রাষ্ট্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইলেও ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিলেই জাতি সৃষ্ট হইবে বা রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিলেই জাতির বিলুপ্তি ঘটিবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অষ্ট্রিয়া-হাংগেরী এবং বর্তমানের জার্মেনী ও জাপানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অষ্ট্রিয়া-হাংগেরী এক শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল কিন্তু ইহার অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধন ছাড়া অন্য কোন বন্ধন না থাকায় ইহা জাতিতে পরিণত হইতে পারে নাই। ১৯৪৫ সালে জার্মেনী ও জাপানের সার্বভৌমিকতা লুপ্ত হওয়ায় ইহাদের রাষ্ট্রত্ব লোপ পায় ; কিন্তু জার্মান ও জাপান জাতি বিলুপ্ত হয় নাই।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই জাতির উদ্ভব হয় না বা রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইলেই জাতি বিলুপ্ত হয় না

জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য দেখান সম্ভব হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশেষ করিয়া ১৯২০ সাল হইতে 'জাতি' ও 'রাষ্ট্র' শব্দ দুইটি সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সংঘের নাম দেওয়া হয় জাতিসংঘ (League of Nations) এবং বর্তমানের রাষ্ট্রগুলির সংঘের নাম হইতেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)।

বর্তমানে 'জাতি' ও 'রাষ্ট্র' সমাথকভাবে ব্যবহৃত হয়

জাতীয় জনসমাজ ও জাতীয়তাবাদ (Nationality and Nationalism) : আমরা দেখিলাম যে, জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ এবং জাতি গঠনের উপাদানের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। যে-উপাদানে জনসমাজ গঠিত হয় তাহার উপর মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা থাকিলেই তাহা জাতীয় জনসমাজে পরিণত হয়। এই রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা গভীর হইলে জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়। এখন জাতীয় জনসমাজের উপাদানগুলি সম্বন্ধে সামান্য বিশদ আলোচনা করা হইবে, কারণ বিশদ আলোচনা ব্যতিরেকে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়।

জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগুলির মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য, উদ্ভবগত ঐক্য, ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্যগত সমতা, অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সমচেতনা এবং অভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষাই প্রধান। এই উপাদানগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—বাহ্যিক ও ভাবগত। অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সমচেতনা ও অভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা হইল ভাবগত উপাদান ; বাকিগুলিকে 'বাহ্যিক উপাদান' বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই বাহ্যিক উপাদানগুলির কোনটিই জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয়।

জাতীয় জনসমাজ গঠনের দুইপ্রকার উপাদান—বাহ্যিক ও ভাবগত

ভৌগোলিক সান্নিধ্যকে জাতীয় জনসমাজ গঠনের অন্যতম উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। কোন নির্দিষ্ট দেশে বসবাসের ফলে লোকেরা তাহাদের দেশকে পিতৃভূমি (father land) বলিয়া মনে করে এবং এই পিতৃভূমিকে ঘিরিয়া তাহাদের স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত হইয়া উঠে। এই পিতৃভূমির নামে তাহারা যুদ্ধ করে এবং জীবন পর্যন্ত দান করিতে দ্বিধাবোধ করে না।* কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, ভৌগোলিক সান্নিধ্য ব্যতিরেকেও জাতীয় জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। প্যালেষ্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইহুদিরা পৃথিবীর নানাদেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা জাতীয় জনসমাজে পরিণত হইয়াছিল। পোল জাতীয় জনসমাজ (Polish Nationality) গঠনের পক্ষেও ভৌগোলিক সান্নিধ্যও অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাস করা সত্ত্বেও পোলরা একই জাতীয় জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কোন বাহ্যিক উপাদানই অপরিহার্য নয়

* Christopher Lloyd, Democracy and its Rivals.

উদ্ভবগত ঐক্যকে পূর্বে একরূপ অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গণ্য করা হইত, কিন্তু আজকাল ইহার বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না, কারণ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে কোন দেশের লোকের রক্তই অমিশ্রিত নয়। পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ জাতি—ইংরাজ ও ফরাসী—বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছে। মার্কিনদের জাতি বলিয়া অভিহিত করিতে কেহই আপত্তি করিবেন না; কিন্তু তাহাদের উদ্ভবগত ঐক্য নাই।* যাঁহারা উদ্ভবগত বা রক্তের পবিত্রতার বিষয় উল্লেখ করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইল নির্দিষ্ট জাতীয় জনসমাজের লোকদের মধ্যে দম্ভ ও ঘৃণার মনোভাব উদ্রেক করিতে চান। †

ভাষাগত ঐক্যকেও অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। সুইসরা বিভিন্ন ভাষাভাষী হইয়াও এক জাতি; বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতবাসীও এক জাতি। ভাষার মত ইতিহাস, কৃষ্টি, ঐতিহ্য প্রভৃতিতে সমতা না থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ বা জাতি গঠিত হইতে পারে। ধর্মগত ঐক্য অনেক সময় অবশ্য জনসমাজ সৃষ্টির পথে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ভারতবর্ষেই মুসলমানেরা ধর্মকে ভিত্তি করিয়া প্রথমে জাতীয় জনসমাজ ও পরে জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাকেও জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গণ্য করা যায় না। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আছে; কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও তাহারা এক জাতি। বর্তমান পৃথিবীতে ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভাব বিশেষ প্রসারিত হওয়ায় জাতীয় জনসমাজ গঠনে ধর্মের ভূমিকার গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে।

রেনানের মতে, জাতীয় জনসমাজ সম্বন্ধে ধারণা ভাবগত

এইরূপে জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে কোন অপরিহার্য বাহ্যিক উপাদানের সন্ধান না পাইয়া অধ্যাপক রেনান (Renan) বলিয়াছেন, "জাতীয় জনসমাজ সম্বন্ধে ধারণা মূলত ভাবগত।"†† জাতীয় জনসমাজকে তিনি 'প্রাণ' বা 'ভাবগত নীতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ভাবগত নীতি দুইটি বিষয়ের দ্বারা গঠিত হয়—একটি হইল অতীতের স্মৃতি এবং অপরটি হইল একসংগে বসবাস ও ঐতিহ্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার আকাংক্ষা।

জাতীয় জনসমাজ সম্বন্ধে বাট্রাণ্ড রাসেল

ঐ একই কারণে অধ্যাপক গেটেল জাতীয় জনসমাজকে "বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, সম-অর্থনৈতিক জীবনের বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভাবগত উপলব্ধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রখ্যাত দার্শনিক বাট্রাণ্ড রাসেলও (Bertrand Russel) অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন, মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে জাতিকে শুশুকের দল, বা কাকের ঝাঁক বা গরুর পালের সংগে তুলনা করা যায়। এক ভাষা, একই বংশোদ্ভব সম্প্রদায় বলিয়া বিশ্বাস, এক কৃষ্টি অথবা একই স্বার্থ এবং বিপদে যে-কোনটির দরুন

* Modern Nations are "notoriously of very mixed race." Sidgwick

† 'The attempt to stress racial unity......can be traced to the desire of jingoists and chauvinists to play on the feelings of pride and hatred of the members of their nationality.' Renan

†† "The idea of nationality is essentially spiritual in character."

ঐক্যবোধ জাগ্রত হইতে পারে। সাধারণত জাতীয় মনোভাব উদ্রেকে এই উপাদানগুলির প্রত্যেকটিরই কিছু না কিছু অবদান রহিয়াছে। তবে যেভাবেই জাগ্রত হউক না কেন, এই ঐক্যবোধই জাতীয় অস্তিত্বের একমাত্র অপরিহার্য সম্বল। জাতীয়তাবাদের উপাসকেরা যতটা বংশের (Race) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, প্রকৃত তথ্যাদির দিকে লক্ষ্য দিলে ততটা গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব নয়। জনসমষ্টি নানা কারণে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ বলিয়া মনে করিয়া জনসমাজে বা পরবর্তী স্তর জাতীয় জনসমাজে পরিণত হয়। এই ঐক্যবোধের ফলে তাহাদের মধ্যে জাতীয় ভাব (Nationalism) বা স্বাজাত্যবোধের সৃষ্টি হয়।

জাতীয় ভাব

জাতীয় ভাব বা স্বাজাত্যবোধ বলিতে বুঝায় যে, ঐ জাতীয় জনসমাজের সভ্যেরা নিজেদের পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত মনুষ্য হইতে পৃথক করিয়া দেখে। সুতরাং নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত মনুষ্য-সম্প্রদায় হইতে পার্থক্যবোধ হইল জাতীয় ভাবের বৈশিষ্ট্য। জাতীয় ভাবের উন্মেষের ফলে ভারতবর্ষের মুসলমানরা বিশ্বাস করিতে শিখিল যে, তাহারা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ এবং পৃথিবীর অন্যান্য মনুষ্য-সম্প্রদায় বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের হিন্দুগণ হইতে পৃথক। ঐ একই কারণে ইহুদিরা বিশ্বাস করিল যে, পৃথিবীর সকল ইহুদিই এক জনসমাজের অন্তর্গত এবং ইহুদি জনসমাজ অন্য সকল জনসমাজ হইতে পৃথক। জাতীয় জনসমাজের মধ্যে জাতীয় ভাব মূর্ত হইয়া উঠে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে এবং পরিণতি লাভ করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও—অর্থাৎ, জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হইলেও জাতীয় ভাব লোপ পায় না। তখন ইহা স্বাদেশিকতায় (Patriotism) রূপান্তরিত হয়।*

জাতির জাতীয় ভাবকে স্বাদেশিকতা বলা যায়

---

* জাতি ও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে উপরি-উক্ত ধারণা মার্কসের অনুগামীদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয় নাই। স্তালিনের মতে, জাতি হইল 'ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, সম-অর্থনৈতিক জীবনের বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতে সংগঠিত ইতিহাস বিবর্তিত স্থায়ী সমাজ বা সম্প্রদায় (A nation is a historically evolved, stable community of language, territory, economic life, and psychological make-up manifested in a community of culture)। এই সংজ্ঞা অনুসারে এক ভাষা, এক বাসভূমি, এক অর্থনৈতিক জীবন এবং এক কৃষ্টি হইল জাতি-গঠনের অপরিহার্য উপাদান। ইহাদের মধ্যে যে-কোনটির অভাব হইলেই জাতিগঠন আর সম্ভব হইবে না। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে জাতি উদ্ভবগত (racial) নয়, উহা ইতিহাস-বিবর্তিত জনসমাজ। এই জনসমাজের আবার ভাষাগত ঐক্য থাকা চাই। আবার ভাষাগত ঐক্য থাকিলেই জাতি হয় না। ইংরাজ ও আমেরিকাবাসীদের একই ভাষা কিন্তু তাহারা দুইটি পৃথক জাতি। অতএব প্রয়োজন ভৌগোলিক সান্নিধ্য। একই ভূখণ্ডে বংশপরম্পরায় বসবাসের ফলে জনগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সহজ হয়, ফলে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সুতরাং ভৌগোলিক সান্নিধ্য জাতিগঠনের পক্ষে অপরিহার্য উপাদান। আবার ভৌগোলিক সান্নিধ্যই যথেষ্ট নয়। জাতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্যসাধনের

***জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার* (Nationalism and the Right of Self-determination) :** জাতীয়তাবাদ বা স্বাতন্ত্র্য-বোধ মূর্ত হইয়া উঠে রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষার মধ্যে। জাতীয় জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা ও জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা এক নহে। জাতীয় সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা হইল নিজের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করিবার বা স্বাধীন হইবার আকাংক্ষা। ইহাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-determination) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অপরদিকে, জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা বা জাতির জাতীয়তাবাদ স্বজাতীয় সকলকে এক শাসনাধীনে আনয়ন করিবার আকাংক্ষা হইতে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার আকাংক্ষা পর্যন্ত যে-কোন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমে জাতীয় জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা বা আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

জাতীয় জনসমাজ ও জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষার মধ্যে পার্থক্য

জাতীয় জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি পুরাতন ধারণা। তবে ইহা প্রধানত ১৭৭২ সালে যখন পোল্যাণ্ড খণ্ডিত হয় তখন হইতেই কার্য করিতে থাকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে। এই সময় হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ প্রচার করিতে থাকেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করিবার অধিকার জাতীয় জনসমাজের স্বাভাবিক অধিকার। ইহার ফলে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের সমবায়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলিকে (poly-national States) অস্বাভাবিক রাজ্যসংঘ (unnatural union) বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিলেন, "যে-রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ বাস করে সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্ভবপর হয় না"; এবং ইহার জন্য "জাতীয় জনসমাজের সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সমানুপাতিক হওয়া উচিত।"* প্রত্যেক রাষ্ট্র একটি মাত্র জাতীয় জনসমাজ

জাতীয় জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

মিল ও একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ

জন্য প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বন্ধন। শ্রমবিভাগের বিস্তার, পরিবহণের প্রসার প্রভৃতির ফলে একই অর্থনৈতিক জীবন বিবর্তিত হয় এবং জাতীয় ভাব উদ্ভূত হয়। পরিশেষে, 'জাতীয় চরিত্রের' (National Character) কথা উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বংশপরম্পরায় বসবাস করিবার ফলে বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকের মধ্যে বিশিষ্ট মনোভাব (peculiar psychological make-up) গড়িয়া উঠে। এই বিশিষ্ট মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায় বিশিষ্ট কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে। সুতরাং জাতীয় ভাব সম্পূর্ণ ভাবগত ধারণা নহে, ইহা কয়েকটি অপরিহার্য উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত মূর্ত রূপ।

* "It is a necessary condition of free institutions that the boundaries of states should coincide in the main with those of nationalities."

বা জাতি লইয়া গঠিত হওয়ার এই যে আদর্শ ইহাকে একজাতীয় রাষ্ট্রের (Mono-national States) আদর্শ বলা হয়।

রাষ্ট্রপতি উইলসন এই একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার চিরন্তন সমাধানের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি পূর্ণ করিয়া পৃথিবী হইতে যুদ্ধের দূষিত আবহাওয়া চিরতরে দূরীভূত করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। এইজন্য তিনি বলিয়াছেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে উপেক্ষা করিলে রাষ্ট্রনেতাগণ অমংগলকেই আহ্বান করিবেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁহার এই ধারণাকে কার্যকর করা হয় ১৯১৯ সালের শান্তি-সম্মেলনে (Peace Conference)। এই সম্মেলনে প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করিবার দাবিকে সর্বসম্মতিক্রমে মানিয়া লওয়া হয় এবং নীতিকে কার্যকর করিবার জন্য ইউরোপকে নূতন করিয়া গঠনের চেষ্টা হয়। ফলে অনেক নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং কয়েকটি পুরাতন রাষ্ট্র পুনর্গঠিত হয়।

ইউরোপে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রয়োগ

এই পুনর্গঠন ও নবরাষ্ট্র সৃষ্টির পরেও দেখা গেল যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান হইল না ; যুদ্ধের আশংকাও বিলুপ্ত হইল না। ইহার কারণ হইল যে, জাতীয় জনসমাজের সমানুপাতিক করিয়া নবগঠিত রাষ্ট্রসমূহের সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হইল না ; অধিকাংশ সময় ইহা সম্ভবও নয়। নবগঠিত ও পুরাতন রাষ্ট্রসমূহে অন্যান্য জাতির অংশবিশেষ রহিয়া গেল। পরবর্তী কালে এই অংশ-বিশেষসমূহকে একই শাসনাধীনে আনয়ন করিবার জন্য প্রচারকার্য চালান হইতে লাগিল এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে লাগিল। ফলে ইউরোপে অশান্তি নূতন প্রেরণা লাভ করিয়া নূতন রূপ ধারণ করিল।

শান্তি-সম্মেলনের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রয়োগ লইয়া আলোচনা-কালে লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এমন একটি অস্ত্র যাহার দুই দিকে ধার। একদিকে ইহা যেমন ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রেরণা যোগায়, অন্যদিকে আবার তেমনি বিচ্ছিন্ন হইতেও উন্মাদিত করে। এই বিচ্ছিন্ন হইবার উন্মাদনার পরিসমাপ্তি নাই। কার্জনের যুক্তির সারবত্তা শীঘ্রই অধিকাংশ রাষ্ট্রকে স্বীকার করিতে হইল। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রয়োগের ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ার সৃষ্টি হইল ; চেকোশ্লোভাকিয়ায় কিন্তু জার্মান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়া গেল। তাহারা চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার দাবি করিতে লাগিল। শুধু চেকোশ্লোভাকিয়ার বেলায় নহে, অন্যান্য নবগঠিত এবং কয়েক ক্ষেত্রে পুরাতন রাষ্ট্রগুলিতেও সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের দাবি করিতে লাগিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হওয়া কখনই সম্ভব নয়, এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রয়োগ দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান নহে

সমস্যা মিটান যায় না। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাতেও আমরা এই মন্তব্যের সমর্থন পাই। জাতীয় জনসমাজের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে কিন্তু ভারত বা পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান হয় নাই।

যুক্তি দ্বারা অস্বীকার করিলেও রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে মানিয়া লইতে হইতে পারে

এইভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করা হইলেও, অনেক সময় যুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া শুধু রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনেই (political expediency) ইহাকে মানিয়া লইতে হয়। যে-রাষ্ট্রে বা সাম্রাজ্যে জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশ অসন্তুষ্টির সহিত বাস করিতেছে এবং যাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়াছে সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লওয়াই রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তাহা না করিলে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও শক্তি বিপন্ন হইতে পারে। এই আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে অস্বীকার করা হইয়াছিল বলিয়াই ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের বিদ্রোহ ও বুয়র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল; এবং অপরদিকে ইহাকে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল বলিয়াই কানাডা, ভারত ও পাকিস্তান (ব্রিটিশ) কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ১৮৩৯ সালে লর্ড ডারহামকে (Lord Durham) যখন কানাডার শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য পাঠান হয় তখন তিনি রিপোর্টে বলিয়াছিলেন যে, কানাডার অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের বা স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে মানিয়া লওয়াই ব্রিটেনের পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে। এ দাবি মানিয়া না লওয়া হইলে কানাডাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে রাখা সম্ভব হইবে না। লর্ড ডারহামের এই নির্দেশমূলক নীতি ব্রিটেন অনুসরণ করিয়াছিল বলিয়াই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সংহতি রক্ষা সম্ভব হইয়াছে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি হইতে বলা যায় যে, ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রনায়কগণ কারেণদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি মানিয়া লইয়া রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্

জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা (Political Aspirations of the Nation): পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জাতীয়তাবাদ মূর্ত হইয়া উঠে রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষার মধ্যে। সুতরাং জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হইলে জাতীয়তাবাদ যে-রূপ ধারণ করে তাহাকে 'জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা' বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়। ইহাও বলা হইয়াছে, জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা স্বজাতীয় সকলকে একই শাসনাধীনে আনয়ন করার আকাংক্ষা হইতে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার আকাংক্ষা পর্যন্ত যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারে। সাধারণত জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা বা জাতির জাতীয়তাবাদ প্রথমে স্বাদেশিকতার (patriotism) রূপ ধারণ করে। স্বাদেশিকতা বলিতে বুঝায় স্বদেশের প্রতি ভক্তি এবং স্বজন বা স্বদেশবাসীর

স্বাদেশিকতা ও দৃষ্টি-ভংগির সংকীর্ণতা

প্রতি অনুরাগ। স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি অনুরাগের ফলে জাতির সভ্যগণ নিজেদের সকল কিছুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া এবং অপরাপর জাতির সকল কিছুকেই হেয় বলিয়া গণ্য করিতে থাকে। তাহারা বিশ্বাস করিতে থাকে যে তাহাদের জাতির মত জাতি নাই, ভাষার মত ভাষা নাই, সাহিত্যের মত সাহিত্য নাই, সংস্কৃতির মত সংস্কৃতি নাই। ইহার ফলে জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিভংগি সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া আসে। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি তাহাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে যে অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার তাহাদের আছে। ফলে তাহারা সাম্রাজ্যবাদের পথে অগ্রসর হয়।

জাতীয়তাবাদের জনক ইতালীয় দার্শনিক ম্যাট্‌সিনি (Giuseppe Mazzini) বিশ্বাস করিতেন যে, প্রত্যেক জাতির কোন-না-কোন বিষয়ে বিশেষ প্রতিভা আছে।* জাতীয়তাবাদের মধ্যে তিনি দেখিয়াছিলেন এই প্রতিভার বিকাশের সম্ভাবনা। তাই তিনি মানবসমাজকে 'স্বাজাত্যাভিমানী বিভিন্ন জাতির সমবায়' বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সংঘাত বা বিরোধের সহিত এই সমবায়ের কোন সংস্রব নাই। বিভিন্ন জাতি স্বাধীনতা শান্তি মৈত্রী ও সাম্যের পথে আপনাপন পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়।

ম্যাট্‌সিনির আদর্শ জাতীয়তাবাদ

সাধারণত ম্যাট্‌সিনির এই আদর্শ স্মরণ রাখিয়া জাতীয়তাবাদীরা পথ চলে না। মানবতার কথা ভুলিয়া গিয়া তাহারা রাষ্ট্রীয় স্বার্থকেই ধ্রুবতারকা গণ্য করিয়া অগ্রসর হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, "স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ"। ফলে জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করে এবং দেখা দেয় 'সভ্যতার সংকট'। সভ্যতার এই সংকট ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিতে অন্যতম সক্রিয় শক্তি হিসাবে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, জাতীয়তাবাদ ও জাতিগঠনের সুরু হয় ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রসারের সংগে। সামন্তযুগের বিচ্ছিন্নতা ও অরাজকতার বিরুদ্ধে বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী শ্রেণীর সংগ্রাম জাতীয়তাবাদের গোড়াপত্তন করে। ধনতন্ত্রের প্রসারের সংগে সংগে জাতীয়তাবাদ মূর্ত হইয়া উঠে এবং সামন্ত যুগের বিচ্ছিন্নতার স্থলে অর্থনৈতিক ঐক্য ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা প্রসারলাভ করে। যদিও জাতীয়তাবাদ ব্যবসায়শ্রেণীর আশা-আকাংক্ষার প্রকাশ হিসাবে উদ্ভূত হয়, তবুও প্রথম যুগে সমাজের অগ্রগতিকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তারপর ইউরোপে ধনতন্ত্র ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসর হয় ও ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ অসংগতি প্রকট হইতে থাকে, মুনাফার প্রেরণায় জাতীয় রাষ্ট্রগুলি বিদেশী বাজারের প্রসার, কাঁচামাল সংগ্রহ ও বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে দৃষ্টি দেয়।

এই জাতীয়তাবাদ আজ উপেক্ষিত

বর্তমানের বিকৃত ও উগ্র জাতীয়তাবাদ

* Mazzini thought "each nation possessed certain talents which, taken together, formed the wealth of the human race." Lloyd, Democracy and its Rivals

এই সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রাম ও দুর্বল জাতিদের শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয় জাতীয়তাবাদকে—কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা জানে জনসাধারণের সমর্থন ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিক সংগ্রাম পরিচালনা অসম্ভব। এইজন্যই জাতীয় গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের ধুয়া তুলিয়া স্বার্থান্বেষী শ্রেণী জনসাধারণকে উত্তেজিত করে। বর্তমান পৃথিবীতে এই বিকৃত ও উগ্র জাতীয়তাবাদ মানবসমাজের ভয়াবহ ব্যাধি হিসাবে দেখা দিয়াছে এবং মানব-সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় আদর্শ জাতীয়তাবাদ সম্ভব নয়

এখানে সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে বিকৃত জাতীয়তাবাদের ধ্বংসাত্মক সম্ভাবনার কথাই বলা হইতেছে। যে-ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ সাম্য, সৌভ্রাত্র এবং সহযোগিতার উপর ভিত্তিশীল সে-ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ সমাজের উপকার সাধনই করিবে। তবে পরস্পর নির্ভরশীল জগতে সংকীর্ণ জাতীয় সার্বভৌমিকতাকে (exclusive national sovereignty) ত্যাগ করিতে হইবে।* কিন্তু আর্থিক বৈষম্য ও উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকাকালীন জাতীয়তাবাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ হওয়া এবং জাতীয় শোষণ ও সংগ্রামের অবসান হওয়া সম্ভব নয়।

সংক্ষিপ্তসার

জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি এবং রাষ্ট্র সমার্থবোধক নহে—ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ভাষা, সাহিত্য, আচার-ব্যবহার, অধিকারবোধ প্রভৃতির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিকেই জনসমাজ বলে। জনসমাজ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইলে জাতীয় জনসমাজে পরিণত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা গভীর হইলে উহা আবার জাতিতে পরিণত হয়।

জাতীয় জনসমাজ বা জাতিগঠনের উপাদানের মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য, উদ্ভবগত ঐক্য, ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্যগত সমতা, অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সমচেতনা এবং অভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষাই প্রধান। ইহার মধ্যে অধিকাংশই হইল বাহ্যিক। কোন বাহ্যিক উপাদানই অপরিহার্য নহে। ফলে জাতীয় জনসমাজকে 'ভাবগত ধারণা' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। [মার্কসের অনুগামীরা অবশ্য জাতীয় জনসমাজ বা জাতিকে কয়েকটি অপরিহার্য উপাদানের সমবায়ে গঠিত জনগোষ্ঠীর এক বিশেষ মূর্ত রূপ বলিয়া মনে করেন।]

জনসমাজ নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ অনুভব করে। ফলে তাহাদের মধ্যে জাতীয় ভাব বা স্বাজাত্যবোধের সৃষ্টি হয়। স্বাজাত্যবোধের দরুন তাহারা নিজেদের অন্য সমস্ত মনুষ্য-সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়া দেখে।

জাতীয় জনসমাজ রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষায় উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠী। এই আকাংক্ষাকে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি' বলিয়া অভিহিত করা হয়। অনেকের মতে, জাতীয় জনসমাজের এই দাবি মানিয়া না

* "A world of competing nation-states, each of which is a law unto itself, produces a civilisation incapable of survival." Laski, The Danger of Being a Gentleman

লইলে (১) প্রকৃত স্বাধীনতার আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যায় না ; (২) যুদ্ধের দুষিত আবহাওয়াও দূর করা যায় না। কিন্তু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে (১) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেই যুদ্ধের আশংকা দূরীভূত হয় না ; এবং (২) সংখ্যালঘুর সমস্যা অধিকতর গুরুতর আকারই ধারণ করিতে পারে। তবে উপসংহারে বলা যায় যে, নীতি হিসাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিচারবিহীন প্রয়োগ অস্বীকার করা হইলেও রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতার দিক দিয়া ইহাকে মানিয়া লইবার প্রয়োজন হইতে পারে।

জাতির রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা প্রথমত স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি করিয়া পরে উগ্র জাতীয়তাবাদে এবং সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হইতে পারে। ফলে দেখা দেয় 'সভ্যতার সংকট'। সভ্যতার এই সংকট দূর করিতে হইলে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যবস্থার বিলোপসাধন প্রয়োজন।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the factors that tend to create a Nationality ? How does a nation come into being in a country of diverse nationalities ? [C. U. 1954, '57]

[ইংগিত : জাতীয় জনসমাজ যে যে উপাদান লইয়া গঠিত হয় তাহাদের মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য, উদ্ভবগত ঐক্য, ভাষা ধর্ম সাহিত্য ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত সমতা, অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সমচেতনা এবং অভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষাই প্রধান। ইহাদের মধ্যে কোনটিই অপরিহার্য নয়, অথচ কয়েকটির অস্তিত্ব বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের সমবায়ে একটি জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে যদি তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সমচেতনা থাকে। এই কারণে এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে যে সমচেতনাই জাতি গঠন করিয়া থাকে (equal feeling makes a nation)...এবং ৪৫-৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

2. Discuss the importance of the 'Principle of Nationality' in the organization of modern States. [C. U. 1951, '52] (৫০-৫২ পৃষ্ঠা)

3. What is meant by the doctrine of self-determination ? Discuss in this connection the value and limitations of this doctrine. [C. U. 1958, '61] (৫০-৫২ পৃষ্ঠা)

4. How far is Nationalism a menace to Civilization ?

[ইংগিত : জাতীয়তাবাদ মূর্ত হইয়া উঠে রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষার মধ্যে। জাতির এই রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষা স্বজাতীয় সকলকে একই শাসনাধীনে আনয়ন করার আকাংক্ষা হইতে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার আকাংক্ষা পর্যন্ত যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারে। যখনই জাতীয়তাবাদ এই উগ্র রূপ ধারণ করে তখনই দেখা দেয় যুদ্ধের সম্ভাবনা এবং সভ্যতার সংকট। শক্তিশালী জাতিগুলি জাতীয় সার্বভৌমিকতার সাহায্যে সংরক্ষণমূলক শুল্ক প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। ফলে জাতিতে জাতিতে দেখা দেয়

হিংসা, বিদ্বেষ ও হানাহানি। এই দ্বন্দ্বের ফলে বর্তমানে মানবজাতির সভ্যতা এক সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। বিশেষত সাধারণের জাতীয়তাবোধের মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা ভাবপ্রবণতা থাকে বেশী। এই ভাবপ্রবণতার প্রাবল্যের দরুন জাতীয় মর্যাদার দোহাই দিয়া ও স্বদেশপ্রেমের ধ্বনি তুলিয়া বিশেষ স্বার্থসমূহ নিজেদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। বর্তমান সভ্যতার একটি প্রধান সমস্যাই হইল এই বিকৃত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। আজ সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয়তাবাদের অর্থ এই নয় যে এক জাতি অন্য জাতিকে শোষণ ও শাসন করিবে। সৌভ্রাত্র ও সহযোগিতার উপর ভিত্তি স্থাপন করিলেই জাতীয়তাবাদ মংগলসাধন করিতে সমর্থ হয়। পরস্পর নির্ভরশীল জগতে সংকীর্ণ জাতীয় সার্বভৌমিকতা (exclusive national sovereignty) ধ্বংসাত্মক না হইয়া পারে না। সুতরাং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণসাধনের জন্য একদিকে যেমন বিভিন্ন জাতির আপনাপন বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধান হওয়াও একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইহা হইলেই জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতিকে ব্যাহত না করিয়া সহায়তা করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সভ্যতার পরিপন্থী হইল বিকৃত বা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, প্রকৃত জাতীয়তাবাদ নয়।...এবং ৫২-৫৪ পৃষ্ঠা দেখ।]

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ

(THEORIES OF THE ORIGIN OF THE STATE)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তার উদ্ভব

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের উদ্ভবের কারণ হইল মানুষের সংঘবদ্ধতা। উদ্ভবের পর বহুদিন পর্যন্ত এই সকল সংগঠন মানুষের কোন প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই স্বাভাবিকভাবে বিবর্তিত হইতেছিল। তাহার পর এমন এক অবস্থা আসিল যখন মানুষ এই সকল প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল এবং ইহাদিগকে পরিকল্পিত পথে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট হইল। এই চিন্তা ও প্রচেষ্টার ফলে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইল।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতবাদগুলির শ্রেণীবিভাগ

এইভাবে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সৃষ্ট মতবাদগুলিকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় —(১) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ, এবং (২) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ। এই অধ্যায়ে আমরা উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদগুলিকে লইয়াই আলোচনা করিব।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতবাদগুলিকে উপরি-উক্তভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হইলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কতকগুলি মতবাদ আছে যাহা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি উভয়ই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ বলপ্রয়োগ মতবাদ, ঐশ্বরিক মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। সুতরাং উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে। বিজ্ঞানসম্মত না হইলেও রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতবাদগুলিকে সাধারণত এইভাবেই আলোচনা করা হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, মানুষের সংঘ-বদ্ধতার ফলেই সমাজ-বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। বর্তমান কালে নৃবিদ্যা, জাতিবিদ্যা, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিদ্যার চর্চার ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘন তমসাবৃত ছিল। তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেন। ফলে অনেক কল্পনাপ্রসূত মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির পর্যালোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে কারণ তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু সত্য নিহিত আছে। উপরন্তু, কোন মতবাদকে যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তবে তাহার বিপরীত মতবাদগুলিকে খণ্ডন করা প্রয়োজন। এই দিক দিয়াও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদ-গুলির পর্যালোচনার সার্থকতা রহিয়াছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কাল্পনিক মতবাদ-গুলির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ (Theory of Divine Origin): রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের আলোচনা সর্বাগ্রে করিতে হয় কারণ ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মতবাদ। এই মতবাদের মূলকথা এইভাবে বর্ণনা করা যায়: রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাহারই ইচ্ছায় পরিচালিত। ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রাজা হইলেন ঈশ্বরের এই প্রতিনিধি। সুতরাং রাজার ইচ্ছাকে অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অমান্য করা—অর্থাৎ, রাজদ্রোহিতার অর্থ ধর্মদ্রোহিতা। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া তিনি একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়িত্বশীল; প্রজাদের নিকট তাহার কোন দায়িত্ব নাই। তিনি প্রজাদের মতবাদ ও প্রচলিত আইনকানুনের উর্ধ্বে।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের মূল বক্তব্য

অনেক সময় রাজাবিহীন রাষ্ট্রেও ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রকারের রাষ্ট্র ধর্মীয় নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রধানত এই সকল নীতির অনুশাসনেই রাষ্ট্রাদর্শ নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হইলেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় নীতি অনুসারে।

রাজতন্ত্র ছাড়াও অন্যান্য শাসন-ব্যব-স্থাতেও এই মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়

ঐশ্বরিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত উপরি-উক্ত উভয় ধরনের রাষ্ট্রগুলিকে ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocratic State) বলে। ধর্মীয় রাষ্ট্রের সন্ধান অতি প্রাচীনকালের ইতিহাস ও সাহিত্যে পাওয়া যায়। মহাভারতে

ধর্মীয় রাষ্ট্র

আছে যে, অরাজকতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে সমবেত হইয়া প্রার্থনা স্থরু করিল, "হে ঈশ্বর! আমরা ধ্বংসের পথে চলিয়াছি। তুমি আমাদের নায়কত্ব করিবার জন্য এমন কাহাকেও দাও যাঁহাকে আমরা সকলে মিলিয়া পূজা করিব এবং যিনি আমাদের অরাজকতার অভিশাপ হইতে রক্ষা করিবেন।" অন্যান্য প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য এবং বাইবেলেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা অবশ্য এই মতবাদ বিশ্বাস করে নাই। রোমানদের ধারণা ছিল যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উৎস হইল জনসাধারণ। এই ধারণার সহিত সেণ্ট্ পলের (St. Paul) মতবাদ যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত মিলাইয়া সেণ্ট্ টমাস এ্যাকুইনাস্ (St. Thomas Aquinas) এই মতবাদের সৃষ্টি করিলেন: সমস্ত ক্ষমতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইলেও জনসাধারণের মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং ইহার ব্যবহার নির্ধারিত হয় জনসাধারণ দ্বারা। সেণ্ট্ টমাসের এই মতবাদই মধ্যযুগে গৃহীত মতবাদ ছিল। স্থতরাং মধ্যযুগ পর্যন্ত ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ চরম রূপ ধারণ করে নাই। চরম রূপ ধারণ করিল ষোড়শ শতাব্দীতে আসিয়া। এই সময়ে এই মতবাদ হইতে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ অংশটুকু বাদ দেওয়া হইল। অর্থাৎ, ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতার ব্যবহার পদ্ধতি যে জনসাধারণ দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহা অস্বীকার করিয়া প্রচার করা হইতে লাগিল যে, রাজার ক্ষমতা সরাসরি বা উত্তরাধিকার-সূত্রে ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত এবং রাজা এই ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়ী। ইহার ফলে চরম রূপ ধারণ করে এবং রাজার স্বৈরাচারিতার পথ প্রশস্ত হয়।

প্রাচীন সাহিত্যে ধর্মীয় রাষ্ট্র বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়াছে

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের চরম রূপ পরিগ্রহকরণ

কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই এই মতবাদের প্রভাব কমিয়া আসিতে থাকে। ইহার মূলে কার্য করে—সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচার, ইউরোপে নবজাগরণ (Renaissance) এবং জাতীয়তাবাদ ও জনগণের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণার উদ্ভব।

সমালোচনা: বর্তমানে কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই বিশ্বাস করেন না যে রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। উপরন্তু, ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের অবদান চরম রাজতন্ত্রেও বর্তমানে একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। রাষ্ট্র মানুষের প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবে বিবর্তিত প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের আইনকানুন মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রণীত হয়। রাষ্ট্রকে ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়া মানিয়া লইলে আইনকানুনকে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখিতে হয়। ইহার অর্থ স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করা। বুদ্ধি দিয়া, যুক্তি দিয়া বিচার করিলে স্বৈরাচারিতাকে কোনমতেই সমর্থন করিতে পারা যায় না।

১। ইহা স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করে

রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইলেও অত্যাচারী রাজাকে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিতে মন চায় না। ঈশ্বর তাহার সৃষ্ট জীবের প্রতি এত নির্মম হইতে পারেন না যে, অধিকাংশ সময়

২। ইহা অযৌক্তিক

তিনি নির্মম অত্যাচারীকে তাহার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিবেন। বস্তুত, কোন যুগেই মানুষ অত্যাচারী নৃপতিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লয় নাই। মহাভারতের যুগে ভারতে "রাজাকে দেবতুল্য জ্ঞান করা হ'ত; কিন্তু অনুশাসন পর্বে ১৩ পরিচ্ছেদে ভীষ্ম বলেছেন, 'যিনি প্রজারক্ষার আশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না, সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত।' "*

ধর্মযাজকগণই অনেক সময় ঐশ্বরিক মতবাদকে অস্বীকার করিয়া ইহার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন। বিখ্যাত ধর্মযাজক হুকার (Hooker) বলেন, "কেবল ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারেই ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা কল্পনা করা যায়, লৌকিক ব্যাপারে নহে।" যিশুখ্রীষ্টের অন্যতম বিখ্যাত উক্তি হইল, "সীজারের যাহা কিছু প্রাপ্য তাহা সীজারকে দাও; ঈশ্বরের যাহা কিছু প্রাপ্য তাহা ঈশ্বরকে সমর্পণ কর।"** সীজার কথার অর্থ সম্রাট এবং এই উক্তির তাৎপর্য হইল ধর্মীয় ও লৌকিক ব্যাপার পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ধর্মীয় ব্যাপারে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়, লৌকিক ব্যাপারে নহে। ধর্মযাজক হুকারের উক্তি যিশুখ্রীষ্টের উক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

৩। লৌকিক ব্যাপারে ঈশ্বরের কল্পনা করা যায় না

পরিশেষে, এই মতবাদের সন্ধান বিভিন্ন শাসন-ব্যবস্থাতে পাওয়া গেলেও ইহা রাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কাহারও উপর আলোকসম্পাত করে না। প্রজাতন্ত্রে ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে? এ প্রশ্নের উত্তর ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদে পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু ধর্মীয় রাষ্ট্রের প্রতি আগ্রহের সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ইসলামের নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৪। ইহা রাজতন্ত্র ছাড়া অন্য শাসন-ব্যবস্থার উপর আলোকসম্পাত করে না

ঐতিহাসিক মূল্য: ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য যে আছে সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করিয়া লোকের মনে ধর্মের ভাব জাগান হইয়াছিল। প্রাচীনকালের মানুষের নিকট মানুষের প্রণীত আইনকানুন অপেক্ষা ধর্মের বিধানই ছিল বড়। ধর্মের বিধান মান্য করার ফলে তাহারা আনুগত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিল; এবং ইহার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের পথ সুগম হইয়াছিল। গেটেলের ভাষায়, "মানুষ যখন স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত ছিল না তখন এই মতবাদ মানুষকে আনুগত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া রাষ্ট্রের বিবর্তনে সহায়তা করিয়াছিল।" উপরন্তু, "ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে সুনীতির সহিত সংযুক্ত করিয়া সুন্দর জীবন সংগঠনে সহায়তা করিয়াছিল।"

ইহা রাষ্ট্র-বিবর্তনের প্রথম অধ্যায় মানুষকে আনুগত্যের শিক্ষা দিয়াছিল

---

* মহাভারত, রাজশেখর বসু।

** "Render unto Cæsar the things that are Cæsar's, and render unto God the things that are God's."

বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force): রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত আর একটি মতবাদ হইল বলপ্রয়োগ মতবাদ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই মতবাদ উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ভিত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে মতবাদটিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে: মানুষ যে শুধু সামাজিক জীব তাহা নহে, কলহপ্রিয় জীবও বটে। ক্ষমতালিপ্সা মানুষের অন্যতম প্রবৃত্তি। কলহপ্রীতি ও ক্ষমতা-লিপ্সার জন্য সে আদিম কাল হইতেই বলপ্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। বলপ্রয়োগের দ্বারা বলবান ব্যক্তি বা বলশালী গোষ্ঠী (clan) কতিপয় দুর্বল ব্যক্তি বা কোন দুর্বল গোষ্ঠীকে বশীভূত করিয়া তাহার বা তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিল। এইভাবে উপজাতির (tribe) উদ্ভব হইল। তাহার পর বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বাধিল সংঘর্ষ। সংঘর্ষের ফলে বিজয়ী উপজাতি বিজিত উপজাতির উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিল। বিজয়ী উপজাতির দলপতি নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইল। এইভাবে উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের।

বলপ্রয়োগ মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি উভয়ই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে এই মতবাদের সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উৎপত্তির এই বলপ্রয়োগ মতবাদ ডাঃ লীকক (Dr. Stephen Leacock) সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিলে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সন্ধান করিতে হইবে মানুষের দ্বারা মানুষের উপর আক্রমণ ও মানুষকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করার মধ্যে, দুর্বল উপজাতিসমূহের উপর আক্রমণ ও তাহাদের অধীনতায় আনয়ন করার মধ্যে, স্বার্থান্ধ বলবানের প্রভুত্বলিপ্সার মধ্যে।" ওপেনহাইমার (Franz Oppenheimer) বলেন, "উৎপত্তিতে সম্পূর্ণভাবে এবং অস্তিত্বের প্রথম পর্যায়ে অপরিহার্যরূপে ও সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র হইল বিজয়ীর বলপ্রয়োগ দ্বারা বিজিত মনুষ্য-সম্প্রদায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান।"*

এইভাবে বলপ্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে পর আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা ও বহিরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষাকল্পে বল বা শক্তিকে নিয়োজিত করিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা হইতে লাগিল। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মূলেও রহিয়াছে পাশবিক বল।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মতবাদের বক্তব্য

বলপ্রয়োগ মতবাদকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নীতির সমর্থনে ব্যবহার করা হইয়াছে। হেরাক্লিটাস প্রভৃতি কোন কোন গ্রীক দার্শনিক মনে করিতেন যে মাত্র বলপ্রয়োগ দ্বারাই সাধারণ লোককে সুপথে পরিচালিত করা যায়। সুতরাং রাষ্ট্র সকল সময়ই বলপ্রয়োগ

এই মতবাদ বিভিন্ন নীতির সমর্থনে ব্যবহৃত হইয়াছে

---

* The State "completely in its genesis, essentially and almost completely during first stages of its existence is a social institution forced by a victorious group of men on a defeated group..".

করিয়া যাইবে।* মধ্যযুগে ধর্মযাজকগণ রাষ্ট্রকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম সংগঠনের (Church) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে ইহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দাবি করিতেন যে খ্রীষ্টধর্ম সংগঠন ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে পাশবিক বলপ্রয়োগের দ্বারা।

সাম্প্রতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অপছন্দ করেন বলিয়া রাষ্ট্রকে অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একদলের মতে, জীবন একটি যুদ্ধক্ষেত্র; এখানে যোগ্যতমেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। সুতরাং শক্তিমান অস্তিত্ব বজায় রাখিবে ও প্রভুত্ব করিবে এবং বলহীন বিনষ্ট হইবে। রাষ্ট্র দুর্বলকে রক্ষা করিয়া প্রকৃতির এই বিধানের বিরুদ্ধে কার্য করে। অতএব, রাষ্ট্র অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান।

অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদিগণের অধিকাংশের মতে, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হইল সবলের স্বার্থে দুর্বলকে নিয়োজিত করিতে সহায়তা করা। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে যে-যন্ত্রশিল্প সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা শ্রমিকশ্রেণীকে চিরকালই দমন করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। এই দমন ও বঞ্চনার জন্যই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয়। সুতরাং যেদিন এই দুই অন্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে সেদিন রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

আধুনিক জার্মান রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে বলপ্রয়োগ মতবাদ এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই জার্মান দার্শনিকগণ পাশবিক বলকে জাতীয় সম্মান, সংস্কৃতিগত প্রভাব ও বাণিজ্যিক প্রভুত্বকে বজায় রাখার অপরিহার্য মাধ্যম বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে, রাষ্ট্র 'শক্তির'ই প্রতীক। বলপ্রয়োগ দ্বারা বা বলপ্রয়োগের ভয়ে ভীত করিয়া প্রভুত্ব বিস্তার এই দর্শনের উদ্দেশ্য। কোকার (Coker) এই জার্মান দর্শনকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন, "...ইহা হইল ভীতি প্রদর্শন দ্বারা প্রভুত্ব বিস্তার, পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যুদ্ধবাদ এবং বলপূর্বক আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা দমনের নীতি।"**

সমালোচনা : রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিবর্তনে পাশবিক বলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। তরবারি দ্বারাই পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতেই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গেল। ইহা বলপ্রয়োগ নীতিই সমর্থন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিপুঞ্জ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সম্মিলিত হইয়াছে যে, ভাবীকালকে তাহারা যুদ্ধের আতংক হইতে নিরাপদ করিবে। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা যুদ্ধের আতংকও দূর হয় নাই। ইহা হইতে

বলপ্রয়োগ মতবাদের সপক্ষে যুক্তি : ইহাতে কিছু সত্য নিহিত আছে

* Bertrand Russel, A History of Western Philosophy

** It is.."a creed of dominance by intimidation—militancy in international relations and forcible suppression of political dissent in domestic Government."

অনুমান হয়, পাশবিক বলই যে রাষ্ট্রের ভিত্তি ইহাতে রাষ্ট্রনায়কদের অধিকাংশ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন।

বলা যায় যে রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান হইল পাশবিক বল। প্রকৃতপক্ষে, সার্বভৌমিকতা শক্তিরই উপর প্রতিষ্ঠিত। ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, "সামরিক শক্তির ভিতরই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নিহিত থাকে।"* রাষ্ট্র সামরিক শক্তি ও পুলিস বাহিনী দ্বারা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া নিজের সার্বভৌম শক্তির পরিচয় দেয়। ডাঃ ফাইনার বলেন, প্রধানত ধ্যানধারণা ও সামাজিক আদর্শের উপর যখনই আঘাত লাগে তখনই রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও বলপ্রয়োগের এই চরম ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকে। সৈন্যবাহিনী পুলিস জেল জরিমানা তল্লাসী প্রভৃতি হইল বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত। তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণ সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া এই বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি করা হয় না। বলা হয় যে, গণতন্ত্রে সংখ্যা-গরিষ্ঠের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য কতিপয় সমাজবিরোধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা হইয়া থাকে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণী আপনাপন স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তিকে প্রয়োগ করিতে সুযোগ পায়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বলপ্রয়োগ

উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি হইতে কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না যে, একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে এবং একমাত্র ইহার দ্বারাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়। রাষ্ট্রগঠনে পাশবিক শক্তি অন্যতম উপাদান সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাই একমাত্র উপাদান নহে। রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে পাশবিক বল ছাড়াও মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ধর্মের বন্ধন, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা প্রভৃতি শক্তি কার্য করিয়াছে। সুতরাং পাশবিক বল রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নহে; একমাত্র রক্ষিবাহিনীর দ্বারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা যায় না। সুতরাং লীককের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, অন্যতমকে একমাত্র বলিয়া কল্পনা করায় এই মতবাদ ভ্রান্ত।

বিপক্ষে যুক্তি : ১। এই মতবাদ বলপ্রয়োগকে রাষ্ট্র-গঠনের একমাত্র উপাদান হিসাবে গণ্য করে বলিয়া ইহা ভ্রান্ত

এই প্রসংগে রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিলে মানুষের সামাজিক প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে হয়—অস্বীকার করিতে হয় যে সংঘবদ্ধতার জন্য সমাজের এবং রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব হইয়াছে, বিশ্বাস করিতে হয় যে সংগঠন সম্ভব হইয়াছে একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা। কিন্তু বলপ্রয়োগের দ্বারা সংগঠন সম্ভব হইলেও সংগঠনকে চিরস্থায়ী করিতে পারা যায় না। অধ্যাপক ম্যাক্‌আইভার

২। রাষ্ট্রের ভিত্তির ব্যাখ্যা হিসাবেও ইহা গ্রহণযোগ্য নয়

* In the armed forces "lies the heart of sovereignty."

বলিয়াছেন, "একমাত্র পাশবিক বল জনসমষ্টিকে বেশীদিন সংগঠিত রাখিতে পারে না, কারণ জনসাধারণের সম্মতির অনুবর্তী না হইলে পাশবিক শক্তি বিভেদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে।"* ইংরাজ দার্শনিক গ্রীণ (T. H. Green) বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল জনসাধারণের সম্মতি, আসুরিক বল নহে।"† গ্রীণ আর একস্থানে বলিয়াছেন যে, সর্বসাধারণের কল্যাণের সচেতন উপলব্ধিই রাষ্ট্রনৈতিক সমাজকে সংঘবদ্ধ রাখে। গ্রীণের এই উক্তিদ্বয়ের সহজ অর্থ হইল জনসাধারণ রাষ্ট্রকে সর্বজনের পক্ষে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে; এইজন্যই তাহারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত। যদি তাহারা রাষ্ট্রকে অকল্যাণকর বলিয়া মনে করিত তবে শত শক্তি প্রয়োগেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হইত না। গ্রীণের এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। উক্তিটি হইল, "প্রজার শক্তিতেই রাজা শক্তিমান, নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত?"

ম্যাকআইভার ও গ্রীণ

বঙ্কিমচন্দ্র

নীতির দিক দিয়াও বলপ্রয়োগ মতবাদ সমালোচিত হইয়াছে। এই মতবাদ স্বৈরাচারিতার সমর্থন করে; ইহা স্বাধীনতা, অধিকার, গণতন্ত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং নৈতিক বিধানে বিশ্বাসী ও রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত কেহই ইহাকে সমর্থন করিতে পারে না। উপরন্তু, এই মতবাদ পৃথিবীতে এক বন্য পরিবেশের কল্পনা করে যেখানে 'জোর যার মুলুক তার'—এই বন্য আইন একমাত্র কার্যকর। এই বন্য আইন যুদ্ধবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব ইহা আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতির বিরোধী। পরিশেষে বলা যায়, এই মতবাদ মানবচরিত্রের শুধু ক্ষুদ্রতা, নীচতার উপরই আলোকসম্পাত করে। কিন্তু মানব-চরিত্রে শুধু নীচতারই সন্ধান পাওয়া যায় না। যাহারা মানবকে শুধু নীচ বলিয়াই মনে করে তাহারা মানবঘৃণাকারী। বলপ্রয়োগ মতবাদ মানব ঘৃণাকারিগণের (misanthrope) মতবাদ; সুতরাং অপরে ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারে।

৩। নীতির দিক দিয়াও এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য নহে

৪। ইহা আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতির বিরোধী

ইহা মানব ঘৃণা-কারীদের মতবাদ

***পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ* (Patriarchal and Matriarchal Theories) :** পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে পরিবারই রাষ্ট্র-বিবর্তনের প্রথম স্তর এবং পরিবার সম্প্রসারিত হইয়াই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। এই দুই মতবাদ কিন্তু অনেকাংশে পরস্পরবিরোধী। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে আদিমতম সমাজে পিতাই ছিলেন গৃহস্বামী এবং পিতার দিক হইতে উত্তরাধিকার, বংশ প্রভৃতি

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃ-তান্ত্রিক মতবাদ পরস্পরবিরোধী

* "..force always disrupts—unless it is made subservient to common will."

† "Will, not force, is the basis of the State."

নির্ধারিত হইত। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে বংশ ও উত্তরাধিকার নির্ধারিত হইত মাতার দিক হইতে, পিতার দিক হইতে নহে।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদঃ পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের একরূপ সমর্থন এ্যারিষ্টটলের লেখায় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে প্রথমে আসিল পরিবার, পরে কয়েকটি পরিবার একত্রিত হইয়া একটি গ্রামের সৃষ্টি করিল; এবং সর্বশেষে কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া উদ্ভূত হইল রাষ্ট্র। আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে স্যর হেনরী মেইনই এই মতবাদের সর্বপ্রধান সমর্থক। তিনি বলেন, আদিম যুগের সমাজ ছিল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি; পরিবারই হইল সমাজ-সংগঠনের আদিমতম রূপ। পরিবারের উপরে প্রাচীনতম পুরুষ সভ্যের বা গৃহস্বামীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। এক পরিবার যখন কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হইল তখন এই সকল পরিবারের উপর বংশপতি বা আদি পরিবারের গৃহস্বামীর কর্তৃত্ব বজায় রহিল। এইভাবে 'উপজাতি'র (Tribe) উদ্ভব হইল। উপজাতির মধ্য হইতে কেহ কেহ ভিন্ন স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিল এবং ফলে একটির স্থলে কয়েকটি উপজাতির উদ্ভব হইল। রক্তের সম্বন্ধ এই উপজাতিগুলির সংহতি বজায় রাখিল; তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিয়া কার্য করিতে লাগিল এবং ক্রমে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল।

স্যর হেনরী মেইন পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের প্রধান সমর্থক

বাইবেল, গ্রীসের এথেন্স নগরী ও রোমের প্রাচীন ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া এবং কিছু একান্নবর্তী পরিবারের নিদর্শন দিয়া মেইন প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, প্রাচীন যুগে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বর্তমান ছিল।

সমালোচনা: ম্যাক্‌লেনান (McLennan), মর্গান (Morgan), জেংকস (Jenks) প্রভৃতি পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, মেইনের ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রাচীনকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সর্বজনীনতা প্রমাণ করিতে পারে না। এই সমালোচকগণের ধারণা হইল সমাজ প্রথমে মাতৃতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পূর্ববর্তী।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনৈতিহাসিক, অতি সরল এবং ফলে অসম্পূর্ণ মতবাদ

অন্য এক শ্রেণীর সমালোচকগণের মতে, সমাজ-সংগঠনের আদিমতম রূপ হইল উপজাতি, পরিবার নহে। পারিবারিক জীবন সুরু হইয়াছিল উপজাতি সংগঠিত হওয়ার পরে। অপরদিকে, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পরিবারের পরই উপজাতির উদ্ভব হয় নাই। উপজাতি আসিয়াছিল গোষ্ঠীর পরে। উপসংহারে বলিতে পারা যায় যে, আদিম সমাজ-সংগঠন জটিলতায় আবৃত। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের মত অত সরলভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদঃ মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের মতে, প্রাচীনকালে বহুপতি গ্রহণ প্রথা (polyandry) প্রায় সর্বজনীন ছিল; সুতরাং বংশ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি মাতার দিক হইতেই নির্ণীত হইত। জেংকস এই মতবাদের সমর্থনে অষ্ট্রেলিয়া ও মালয়ের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে তৎকালীন প্রচলিত বহুপতি গ্রহণ প্রথা বর্ণনা করিয়াছিলেন।

সমালোচনা: প্রাচীনকালে যে কোন কোন সমাজে মাতার দিক হইতে রক্তের সম্বন্ধ নির্ণীত হইত, কারণ এই সকল সমাজে স্ত্রীলোকের বহুপতি গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল—ইহা সত্য। কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক সমাজ যে কখনই সর্বজনীন ছিল না একথাও জোর করিয়া বলা চলে। দৈহিক গঠনের দিক দিয়া স্ত্রীলোকেরা পুরুষের অপেক্ষা ন্যূন, সুতরাং আদিম যুগে স্ত্রীলোক চিরকালই পুরুষের উপর প্রভুত্ব করিয়াছে এইরূপ মতবাদ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সুতরাং মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অযৌক্তিক; ইহার সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণও যথেষ্ট নহে।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory):

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই মতবাদ অনুসারে আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব কল্পনা করিয়া এই মতবাদের সমর্থকগণ কয়েক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রকৃতিও ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং বলপ্রয়োগ মতবাদের ন্যায় ইহাও একাধারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ। এ-সম্বন্ধে পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে।

এই মতবাদ একাধারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ

মতবাদের সংক্ষিপ্তসার: সংক্ষেপে সামাজিক চুক্তি মতবাদকে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থার (state of nature) মধ্যে বাস করিত। কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, এই প্রাকৃতিক অবস্থা মানুষের প্রাক্-সামাজিক—অর্থাৎ, এই অবস্থায় সমাজেরও উদ্ভব হয় নাই; আবার কয়েকজনের মতে, ইহা প্রাক্-রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা মাত্র—অর্থাৎ, তখন সমাজের উদ্ভব হইয়াছে কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। প্রাকৃতিক অবস্থা প্রাক্-সামাজিক হউক আর প্রাক্-রাষ্ট্রনৈতিক হউক, ইহা নিশ্চিত যে মানুষ তখন রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত হয় নাই। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের উদ্ভব তখন হয় নাই। রাষ্ট্রের উদ্ভব না হওয়ায় তখন মানুষের প্রণীত কোন আইনকানুন ছিল না; মানুষ তখন যথেচ্ছভাবে বিচরণ এবং যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিত। এই যথেচ্ছাচারিতার উপর একমাত্র বাধা ছিল কতকগুলি স্বাভাবিক আইন (Natural Laws)। এই সকল স্বাভাবিক আইনের ফলে মানুষের জিঘাংসা, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি দমিত থাকিত। কিন্তু এই অবস্থায় বেশী দিন বাস করা সম্ভব না হওয়ায় আদিম মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করিল। রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে স্বাভাবিক আইনের স্থান অধিকার করিল মানুষের প্রণীত আইনকানুন।

প্রাকৃতিক অবস্থা

স্বাভাবিক আইন

মতবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে—এই মতবাদ অতি প্রাচীন। ইহা প্রাচীন গ্রীসে উদ্ভূত হইলেও আমাদের

দেশের মহাভারতের শান্তিপর্বে উহার উল্লেখ আছে। আমাদের দেশের সাহিত্যেও ইহার সমর্থন মিলে। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে লিখিয়াছেন যখন রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সুরু হইল তখন মানুষ অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একজনকে রাজা নির্বাচিত করিল। নির্বাচিত রাজাকে তাহারা নিয়মিত কর প্রদান করিতে লাগিল; এবং রাজাও প্রজাদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

ইহা অতি প্রাচীন মতবাদ

প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্ট দার্শনিকেরা (Sophists) রাষ্ট্রকে চুক্তির ফলে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সোফিষ্টদের পরে প্লেটো এবং এ্যারিষ্টটলের লেখাতে এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্লেটো এবং এ্যারিষ্টটল কিন্তু ইহাকে মোটেই সমর্থন করেন নাই; বরং তীব্র সমালোচনা দ্বারা ইহাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল ইহাকে সমর্থন করেন নাই

প্লেটো এবং এ্যারিষ্টটলের পর বাইবেলে সামাজিক চুক্তি মতবাদের উল্লেখ অনেক স্থানে পাওয়া গেলেও প্রধানত রোমক সংহিতা (Roman Law) ইহাকে সঞ্জীবিত রাখে। রোমক আইন অনুসারে জনগণই সর্ব ক্ষমতার উৎস। রোমক আইনানুগ আলপিয়ান (Ulpian) বলিয়াছেন, "সম্রাটের ইচ্ছাই আইন, কারণ জনগণ সকল ক্ষমতাই সম্রাটকে অর্পণ করিয়াছে।" সকল রোমান আইনানুগই অবশ্য সামাজিক চুক্তি মতবাদকে সমর্থন করেন নাই। রোমক যুগের পরে ফিউডাল বা সামন্ততান্ত্রিক যুগে দেখা যায় যে, সামন্তপ্রথা এই মতবাদেরই সমর্থন করে, কারণ রাজা ও সামন্তবর্গের মধ্যে চুক্তিই হইল ফিউডাল প্রথার ভিত্তি। মধ্যযুগের লেখকদের লেখাতেও এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। এ-পর্যন্ত কিন্তু মতবাদটি সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই; রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের রচনায় প্রসংগক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং বলা যায় যে এ-পর্যন্ত ইহা মতবাদে পরিণত হয় নাই, অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা ছিল মাত্র। মতবাদে পরিণত হইল সপ্তদশ শতাব্দীর যাজক ম্যানিগোল্ডের (Manigold) রচনায়।

রোমক সংহিতা ও ফিউডাল প্রথায় ইহা সমর্থিত হইয়াছিল

সপ্তদশ শতাব্দীতে ম্যানিগোল্ডের রচনায় সামাজিক চুক্তি সম্বন্ধে ধারণা মতবাদে পরিণত হয়

ম্যানিগোল্ড কিন্তু সামাজিক চুক্তি মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন নাই, তদানীন্তন শাসনতান্ত্রিক ধারণা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। ম্যানিগোল্ডের পরে এই মতবাদ সম্পর্কে তিনজন রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকের নাম অবশ্য স্মরণীয়। ইঁহারা হইলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ দার্শনিক হবস্ ও লক এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো। সমষ্টিগতভাবে এই তিনজন দার্শনিক "চুক্তি মতবাদী" (Contractualists) বলিয়া পরিচিত। এই চুক্তি মতবাদীদের মতবাদই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

চুক্তি মতবাদী হবস্, লক ও রুশো

হবস্ঃ ১৬৬১ সালে প্রকাশিত একদা দ্বিতীয় চার্লসের গৃহশিক্ষক হবসের লেভায়াথান (**Leviathan**) রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই পুস্তকে সামাজিক চুক্তিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য ছিল চরমতন্ত্র বা চরম রাজতন্ত্র (**absolutism**) সমর্থন করা। স্বৈরাচার সমর্থনোদ্দেশ্যে হবস্ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন।

হবসের মতবাদের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

হবস্ ছিলেন রাজতন্ত্রের উপাসক। তাঁহার সময় ইংল্যাণ্ডে প্রজাবিদ্রোহ এবং ক্রমওয়েলের সাধারণতন্ত্র সাধারণ লোকের জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলে। কি করিয়া ইংল্যাণ্ডে শান্তি আনয়ন করা যায়, কি করিয়া সাধারণ লোকের দুঃখকষ্টের অবসান ঘটান যায়—ব্যাকুল হইয়া হবস্ এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, রাজতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তিসম্মত কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে ইংল্যাণ্ডে স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না; এবং স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা না হইলে ইংল্যাণ্ডে শান্তি আসিবে না, লোকের দুঃখকষ্টের অবসান হইবে না। তাহার পরের চিন্তা হইল, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনগণের মনে রাজতন্ত্রের সমর্থনে কোন্ মতবাদের প্রচার করা যায়? যুক্তি দিয়া বিচার করিয়া তিনি ঐশ্বরিক উৎপত্তিতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারী রাজাকে ঈশ্বরের প্রেরিত প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতে গেলে যুক্তির নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লইয়া একমাত্র কল্পনারই দ্বারস্থ হইতে হয়। যুক্তিবাদী হবসের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। সুতরাং তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদেরই আশ্রয় লইলেন এবং ইহার নূতন রূপদান করিলেন।

মানুষের প্রকৃতিই হবসের মতবাদের ভিত্তি

হবস্ মানুষের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার মতবাদের ইমারত নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মানুষ চরম মাত্রায় স্বার্থপর ও ক্ষমতালিপ্সু। তাহার সকল কর্মের পিছনে এই স্বার্থসাধনের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতালিপ্সা কার্য করে। প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই প্রকৃতির পরিবর্তন হয় নাই।

হবসের কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থা প্রাক্-সামাজিক

হবস্ যে-প্রাকৃতিক অবস্থার কল্পনা করিয়াছেন তাহা প্রাক্-সামাজিক (**pre-social**) —অর্থাৎ, হবসের মতে, এই অবস্থা সমাজের উদ্ভবের পূর্বে বর্তমান ছিল। এই অবস্থা অতি ভয়াবহ। আদিম মানুষের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিত। কোনরূপ বাধা ছিল না বলিয়া মানুষ তখন অসৎ উপায়ে ও নির্মমভাবে তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করিত। ফলে প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু এবং প্রত্যেকেই ছিল প্রতিবেশীর ভয়ে ভীত—সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ প্রতিবেশীকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। প্রতিবেশীকে এড়াইবার একমাত্র উপায় ছিল নিঃসংগ জীবনযাপন করা।

আদিম মানুষ তাহাই করিতে লাগিল। ফলে জীবন হইয়া উঠিল নিঃসংগ, ঘৃণ্য, দরিদ্র, পাশবিক এবং অনিশ্চিত।*

এই দুর্বিসহ অবস্থা হইতে মানুষ মুক্তিলাভের উপায় খুঁজিতে লাগিল। মুক্তি আসিল সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া। প্রাকৃতিক অবস্থায় বসবাসকারী আদিম মনুষ্যসকল নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া সমস্ত ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের (assembly of men) হস্তে তুলিয়া দিল। এইভাবে পূর্ব ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ হইলেন সার্বভৌম। সার্বভৌম শক্তির সৃষ্টির ফলে প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটিল, বিরোধ সংযত হইল এবং প্রতিষ্ঠিত হইল সুশৃংখল সমাজজীবন ও রাষ্ট্র।

প্রাকৃতিক অবস্থার দুঃসহ জীবন হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করিল সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া

হবসের মতবাদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে: (ক) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ হইলেন চরম ক্ষমতার অধিকারী, কারণ দুর্বিসহ প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য আদিম মনুষ্যসকল নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিয়া আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহার বা তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

হবসের মতবাদ সম্পর্কে স্মরণযোগ্য বিষয়সমূহ: ১। রাজা চরম ক্ষমতার অধিকারী

(খ) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী শুধুমাত্র চরম ক্ষমতার অধিকারীই নহেন, তিনি বা তাঁহারা চুক্তিরও উর্ধ্বে কারণ তিনি বা তাঁহারা চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করেন নাই, চুক্তির ফলেই উদ্ভূত হইয়াছেন। অধ্যাপক ডানিং-এর (Dunning) ভাষায় বলিতে পারা যায়, "এই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারীর উদ্ভব হইয়াছে চুক্তির ফলে, চুক্তির পূর্বে নহে।†

২। রাজা চুক্তির উর্ধ্বে

চুক্তির উর্ধ্বে বলিয়া সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর বিরুদ্ধে চুক্তিভংগের অভিযোগ আনয়ন করা যায় না। সুতরাং তিনি অত্যাচারী হইলেও চুক্তিভংগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা চলে না। হবসের নিজের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী যাহাই করুন না কেন প্রজাদের পক্ষে তাঁহাকে শাস্তি দিবার কোন অধিকার নাই।

৩। রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহের অধিকার নাই

প্রজাদের যখন বিদ্রোহ করিবার অধিকার নাই তখন ষ্টুয়ার্ট রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকার ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের নাই। ইহাই ছিল হবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

---

* Conditions in the state of nature made man's life 'solitary, poor, nasty, brutish and short'.

† "A superior, or sovereign, exists only by virtue of the pact, not prior to it."

(গ) চুক্তির দ্বারা প্রজারা নিঃস্ব হইয়াই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে অধিকার প্রদান করিয়াছে। একমাত্র আত্মরক্ষার অধিকার প্রদান করা যায় না বলিয়াই ইহা প্রদান করে নাই। চুক্তিভংগ করিলে প্রজাদের সমস্ত অধিকার ফিরিয়া আসিবে সত্য, কিন্তু ফিরিয়া আসিবে সেই ভয়ংকর প্রাকৃতিক অবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের মধ্য দিয়া।* সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই প্রজাদের চুক্তিভংগ করা উচিত নয়।

৪। প্রজাদের পক্ষে চুক্তিভংগ করা অযৌক্তিক

নিজেদের স্বার্থেই যখন প্রজাদের চুক্তিভংগ করা উচিত নয় তখন ইংল্যাণ্ডে প্রজাবিদ্রোহ অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

৫। রাজার আদেশই আইন।

(ঘ) সার্বভৌম শক্তির অধিকারী চরম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের আদেশই আইন।

(ঙ) প্রজাদের স্বাধীনতা সার্বভৌম শক্তিরই দান। ইহা কখনও অব্যাহত স্বাধীনতা নহে। সার্বভৌম শক্তির অধিকারীকৃত আইন যতটুকু স্বাধীনতা দেয় প্রজাদের পক্ষে ততটুকুই প্রকৃত এবং আইনসংগত স্বাধীনতা। ইহার সহিত অবশ্য আত্মরক্ষার অধিকার বা স্বাধীনতা যোগ করিতে হইবে, কারণ চুক্তি দ্বারা প্রজাদের আত্মরক্ষার অধিকার সার্বভৌম শক্তির হস্তে হস্তান্তরিত হয় নাই, হইতে পারেও না।

৬। স্বাধীনতা সার্বভৌম শক্তিরই দান

সমালোচনা: হবসের মতবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় যে, হবস্ যে-উদ্দেশ্যে মতবাদের সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সফল হয় নাই। তিনি চরম রাজতন্ত্রের সমর্থন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সমর্থন করিয়াছেন চরমতন্ত্রকে—যাহা রাজতন্ত্রও হইতে পারে, আবার সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রও (Republic) হইতে পারে। হবসের মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায় আদিম মনুষ্যগণ পূর্ণ ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। এই 'ব্যক্তি-সংসদ' (assembly of men) কথাটি সাধারণতন্ত্রের সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়। চরম সাধারণতন্ত্র সমর্থন করিবার উদ্দেশ্য হবসের ছিল না কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি তাহাই করিয়াছেন। এইজন্য অধ্যাপক স্যাবাইন (Sabine) বলিয়াছেন, "হবস্ চরম রাজতন্ত্রের সমর্থনে মতবাদ রচনা করিতে গিয়া কার্যক্ষেত্রে বিরুদ্ধকার্যই করিয়াছেন।"

হবসের উদ্দেশ্য তাঁহার চুক্তি মতবাদের দ্বারা সাধিত হয় নাই

১। কার্যক্ষেত্রে হবস্ চরম সাধারণতন্ত্রকেই সমর্থন করিয়াছেন

দ্বিতীয়ত, হবস্ তাঁহার মতবাদে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই। ইহা তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হয় নাই যে, রাষ্ট্রের ধ্বংস ব্যতিরেকেও সরকারের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অত্যাচারী রাজা সিংহাসনচ্যুত হইলেও রাষ্ট্রের ধ্বংস হইয়া আদিম প্রাকৃতিক অবস্থা ফিরিয়া না-ও আসিতে পারে—ইহা তিনি

*For Hobbes "there is no choice except between absolute power and complete anarchy, between an omnipotent sovereign and no society whatever." Sabine

বুঝিতে পারেন নাই বা বুঝিয়াও প্রকাশ করেন নাই। উপরন্তু, সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, সরকারের নহে। সুতরাং যাহারা সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকারী তাহাদিগকেই ঐ শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক। হবসের মত যে রাজা সার্বভৌম শক্তির অধিকারী ইহা ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

২। তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই

তৃতীয়ত, বলা হয় যে, হবস্ যে চুক্তির কল্পনা করিয়াছেন তাহাতে একটিমাত্র পক্ষ আছে। চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী প্রাকৃতিক অবস্থার আদিম অধিবাসিগণকে একই পক্ষ বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু একটিমাত্র পক্ষ থাকিলে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় না। উপরন্তু, হবসের কল্পিত চুক্তি এক পক্ষের উপরই প্রযোজ্য, অপর পক্ষ চুক্তির ঊর্ধ্বে—ইহা সভ্য মানুষের ধারণায় সমর্থিত হয় না।

৩। হবসের কল্পিত চুক্তি অস্বাভাবিক চুক্তি

হবসের মতবাদের এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যুক্তির দিক দিয়া হবস্ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। হারন্‌স (Hearnshaw) বলেন, "হবসের ধারণাগুলি মানিয়া লওয়া হইলে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিবিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে যতদূর নির্ভুল হইতে পারে, ততদূরই নির্ভুল।" গেটেলের মতে, হবসের উদ্দেশ্য ছিল চরম রাজতন্ত্র এবং উত্তরোত্তর বর্ধমান রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা যে জনসাধারণই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী—এই দুই-এর মধ্যে সমন্বয়সাধন। এই সমন্বয়সাধনে হবসের প্রচেষ্টা যে যুক্তিবিজ্ঞানের দিক দিয়া অনন্যসাধারণ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় হবসের দান

ইহা ছাড়াও আইভর ব্রাউনকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, হবস্ হইলেন নিয়মানুবর্তিতার প্রথম দার্শনিক।* হবসের পূর্বে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আর কেহ এরূপভাবে দর্শন রচনা করেন নাই।

নিয়মানুবর্তিতার দর্শন রচনা করিতে গিয়া হবস্ আইনসংগত সার্বভৌমিকতা এবং রাষ্ট্রনৈতিক আনুগত্যকে (political obligation) বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। পরবর্তী যুগে ইহাই হইয়া দাঁড়ায় অষ্টিনের সার্বভৌম তত্ত্বের ভিত্তি।

লক : হবস্ তাঁহার সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন চরমতন্ত্র বা আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, চরম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠারই উদ্দেশ্যে। লক কিন্তু এই মতবাদই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন সসীম রাজতন্ত্র বা নিয়মতন্ত্রের সমর্থনে। লক ছিলেন ইংল্যাণ্ডের ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের রক্তহীন বিপ্লবের অন্যতম প্রধান সমর্থক। তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের অনেকে দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজ্যচ্যুতি ও বিদেশী উইলিয়মের সিংহাসনারোহণ প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। সুতরাং বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন ছিল। এই ব্যাখ্যার ভার লইয়াছিলেন লক। শুধু দ্বিতীয় জেমসের নহে, তিনি সকল অত্যাচারী

লকের উদ্দেশ্য ছিল সসীম রাজতন্ত্র বা নিয়মতন্ত্রের সমর্থন করা

* "Hobbes is the first philosopher of discipline."

রাজারই রাজ্যচ্যুতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়াছেন এবং এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রশক্তি শাসিতের ইচ্ছার (consent of the governed) উপরই প্রতিষ্ঠিত।

লকের পরিকল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থা প্রাক্-রাষ্ট্রনৈতিক, প্রাক্-সামাজিক নহে

লক যে প্রাকৃতিক অবস্থার কল্পনা করিয়াছেন তাহা প্রাক্-সামাজিক অপেক্ষা অধিকতর প্রাক্-রাষ্ট্রনৈতিক। অর্থাৎ, লকের মতে, এই প্রাকৃতিক অবস্থায় একপ্রকার সমাজজীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমাজজীবনের অস্তিত্বের জন্য লকের কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থা হবস্-কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থার মত ভয়াবহ নহে। লকের মতে, প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল শান্তি, শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার রাজ্য। এই অবস্থায় মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত স্বাভাবিক আইন দ্বারা। এই স্বাভাবিক আইনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সাম্য। এইভাবে লক প্রাকৃতিক অবস্থায় সাম্যের কল্পনা করিলেন এবং সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহার 'স্বাভাবিক অধিকার' সম্বন্ধে মতবাদকে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় যে শুধু মানুষে মানুষে সাম্য ছিল তাহা নহে, সকল মানুষের সমান অধিকারও ছিল। এই অধিকার বাস্তব, সর্বজনীন, চিরন্তন এবং অবাধ।* ইহারা স্থানকাল ও সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার অপেক্ষা রাখে না। প্রাকৃতিক অবস্থায় সকল মানুষ অপরের এই স্বাভাবিক অধিকারগুলি মান্য করিয়া চলিত। ফলে প্রাকৃতিক অবস্থায় বিরাজ করিত সুখ ও শান্তি, এবং জীবন ছিল সুশৃংখল।

স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে তাহার মতবাদ

লকের মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবন সুশৃংখল হইলেও এই অবস্থা ছিল অসম্পূর্ণ

তবুও প্রাকৃতিক অবস্থা আদর্শ অবস্থা ছিল না। ইহাতে সুখ, শান্তি ও শৃংখলা বিরাজ করিলেও প্রধানত তিনটি কারণে ইহা ছিল অসম্পূর্ণ। প্রথমত, স্বাভাবিক আইনের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ছিল না; দ্বিতীয়ত, এই আইনের ব্যাখ্যার কোন ব্যবস্থা ছিল না; এবং তৃতীয়ত, এই আইন বলবৎ করিবারও কোন উপায় ছিল না। এই সকল অসম্পূর্ণতার জন্য প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবনযাপন নিরাপদ হইতে পারে নাই, কারণ তখন স্বাভাবিক অধিকার নানাভাবে ব্যাহত হইত। সুতরাং জীবনকে সহজ ও নিরাপদ করিবার জন্য, স্বাভাবিক অধিকারগুলিকে যথাসম্ভব অব্যাহতভাবে ভোগ করিবার জন্য মানুষ প্রতিষ্ঠা করিল রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের। এই রাষ্ট্রনৈতিক সমাজে স্বাভাবিক আইনের স্থানাধিকার করিল মানুষের প্রণীত আইন, প্রতিষ্ঠিত হইল শাসনযন্ত্র বা সরকার যাহার প্রাথমিক কর্তব্য হইল মানুষের স্বাভাবিক বা সহজাত অধিকারের সংরক্ষণ করা।

অসম্পূর্ণতার কারণ

এইভাবে লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থার অসম্পূর্ণতার জন্য যে-রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল তাহা হবসের মত চুক্তিরই ফল। লকের মতে কিন্তু চুক্তি হইয়াছিল

* "Objective, eternal, immutable and universal."

দুইটি : প্রথম চুক্তিটি হইয়াছিল আদিম সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণের নিজেদের মধ্যে। ইহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল রাষ্ট্র। দ্বিতীয় চুক্তিটি হয় সমগ্র সম্প্রদায়ের সহিত রাজা বা প্রধান বলিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তির সংগে। এই দ্বিতীয় চুক্তির দ্বারা ব্যবস্থা করা হয় রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের বা সরকারের। প্রথম চুক্তিটিকে সামাজিক চুক্তি (Social Contract) এবং দ্বিতীয় চুক্তিটিকে সরকারী চুক্তি (Governmental Contract) বলিয়া অভিহিত করা যায়।* সরকারী চুক্তি দ্বারা সমাজ বা সম্প্রদায় সরকারকে স্বাভাবিক আইনের সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করিতে, আইনানুসারে শাসন করিতে এবং আইনানুসারে বিচারের ব্যবস্থা করিতে ক্ষমতা দেয়। সরকারকে এই ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ হইল মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের কিয়দংশ সমর্পণ করা। লকের মতে, সরকারী চুক্তি দ্বারা মানুষ কিছু পরিমাণ স্বাভাবিক অধিকারই সরকারকে সমর্পণ করিয়াছিল। এই সমর্পণ বিনা উদ্দেশ্যে করা হয় নাই। সমর্পণ করা হইয়াছিল এই উদ্দেশ্যে—যাহাতে অবশিষ্ট স্বাভাবিক

লকের মতে, চুক্তি হইয়াছিল দুইটি

তাঁহার মতে, চুক্তি দ্বারা মানুষ স্বাভাবিক অধিকারের কিয়দংশ সমর্পণ করিয়াছিল অবশিষ্টাংশকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে

* দ্বিতীয় বা সরকারী চুক্তির কথা লক পরিষ্কারভাবে বলেন নাই ; তবে বিশেষভাবে ইংগিত দিয়াছেন। কিন্তু বার্কার প্রভৃতি লেখকের মতে, লক কোন সরকারী চুক্তির কথা চিন্তা করেন নাই, একমাত্র সামাজিক চুক্তির কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষ সামাজিক চুক্তির দ্বারা সমাজগঠনের পর অছি বা জিম্মাদার হিসাবে সরকার (a fiduciary sovereign) সৃষ্টি করে। অনেকে হয়ত' বলিবেন, এই জিম্মার ধারণার (the notion of trust) মধ্যেই সরকারী চুক্তির কথা নিহিত রহিয়াছে। বার্কার বলেন, লক এই অভিমত পোষণ করেন নাই। যখনই জিম্মার (trust) কথা বলা হয় তখনই তিনটি পক্ষের কথা ধারণা করিতে হয়—(১) যে বা যাহারা জিম্মা বা ট্রাষ্ট সৃষ্টি করে (trustor) ; (২) জিম্মাদার (trustee) এবং (৩) যে বা যাহারা ঐ জিম্মার সুবিধা ভোগ করে (the beneficiary of the trust)। জিম্মার ব্যাপারে প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে—অর্থাৎ, যাহারা ট্রাষ্ট সৃষ্টি করে এবং যাহারা জিম্মাদার হয় তাহাদের মধ্যেই চুক্তি হয় ; তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ যাহারা জিম্মা হইতে সুবিধা ভোগ করে তাহাদের সংগে জিম্মাদারের কোন চুক্তি হয় না। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এই ট্রাষ্টের ধারণা প্রয়োগ করা হইলে অবস্থা দাঁড়ায় যে সমাজ একদিকে ট্রাষ্টের স্রষ্টা এবং ট্রাষ্টের সুবিধা ভোগকারী ; অপরদিকে সরকার হইল জিম্মাদার বা ট্রাষ্টী। এখন ট্রাষ্টের স্রষ্টা হিসাবে সমাজ এবং জিম্মাদার হিসাবে সরকার এই দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তির কল্পনা করা যায় ; কিন্তু ট্রাষ্টের সুবিধাভোগকারী হিসাবে সমাজ এবং জিম্মাদার হিসাবে সরকারের মধ্যে কোন চুক্তির কথা চিন্তা করা যায় না। লক সমাজকে প্রধানত ট্রাষ্টের সুবিধাভোগকারী হিসাবেই দেখিয়াছেন। সুতরাং সমাজের সংগে সরকারের কোন চুক্তি হইতে পারে না। সরকার এককভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। জিম্মাদার হিসাবে সরকারের হাতে যে-সকল ক্ষমতা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে তাহার কোনরূপ অপব্যবহার হইলে সরকারকে অপসারিত করা যায়। Barker, Social Contract—Locke, Hume and Rousseau

অধিকার, বিশেষ করিয়া জীবনের অধিকার, কিছু পরিমাণ স্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। সুতরাং সরকারের কর্তব্য হইল সাধারণের এই সকল অধিকারকে সংরক্ষিত করা; চুক্তি অনুসারে সংরক্ষণের এই দায়িত্ব সরকার (রাজা) গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং হবসের ন্যায় সরকার (রাজা) চুক্তির উর্ধ্বে নহেন। সরকার যদি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করে তবে চুক্তি ভংগ করা হইবে এবং জনসাধারণের পক্ষে সরকারের পরিবর্তন করার পথে আইনসংগত কোন বাধা থাকিবে না।*

হবসের মত লকের মতবাদে রাজা চুক্তির উর্ধ্বে নহেন; প্রজাবিদ্রোহও বেআইনী নহে

সমালোচনা: এইভাবে লক সরকারের ক্ষমতাকে সংকুচিত করিয়া এবং সরকারকে সাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিদ্রোহের অধিকারকে সমর্থন করেন। ইহার দ্বারা তিনি স্বৈরাচারিতাকে সংকুচিত করিয়া গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে লকের রাষ্ট্রনীতি চিন্তায় ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

গুণ: ১। গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর সরকারের প্রতিষ্ঠা লকের সর্বশ্রেষ্ঠ দান

লকের আর একটি মূল্যবান অবদান হইল রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কারভাবে দেখান। হবস্ এই পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই। স্বৈরাচারিতার সমর্থন করিতে গিয়া তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা মাত্র। লক কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন "রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা নহে," এবং "রাষ্ট্রের ইচ্ছা সরকারের ইচ্ছা ও কার্যাবলীর সীমা নির্দেশ করে।"† রাষ্ট্রের ইচ্ছা হইল জনসাধারণের ইচ্ছা—জনমত। রাজা বা সরকার জনমতের অনুশাসন অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। জনমত যদি উপেক্ষিত হয়, জনসাধারণ যদি অত্যাচারিত হয় তবে সরকার বা রাজার পরিবর্তন আইনসংগতভাবেই করা যাইতে পারে। অধ্যাপক ডানিং-এর ভাষায় বলিতে গেলে, "ব্যক্তির সুখ ও নিরাপত্তার জন্য সরকারের অস্তিত্ব শুধু যে আবশ্যকীয় তাহাই নহে, ইহাই হইল সেই উদ্দেশ্য যাহা সাধন করিবার জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।" কোন সরকার যদি ব্যক্তিকে সুখী করিতে না পারে, নিরাপত্তা রক্ষা করিতে না পারে তবে ঐ সরকারের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নাই; তাহার পরিবর্তনসাধন করা আইন ও যুক্তি সংগত।

২। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য লকের মতবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য

৩। সরকারের পরিবর্তন আইনসংগত—ইহাও লক হইতে উদ্ভূত

---

* "In Locke's form of doctrine,....the Government is a party to the contract, and can be justly resisted if it fails to fulfil its part of the bargain." Bertrand Russel, A History of Western Philosophy

† Sovereignty of the State is not sovereignty of the ruler and "...the will of the State may limit the will and actions of a ruler."

লকের মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, আমরা বর্তমানে যাহাকে 'আইনসংগত সার্বভৌমিকতা' (legal sovereignty) বলি তাহাকে তিনি কতকটা উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি জনমত বা সাধারণের ইচ্ছাকেই একমাত্র সার্বভৌম বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা, আইনসংগত সার্বভৌমিকতা নহে। এই দিক দিয়া তিনি ঠিক হবসের বিপরীত কার্য করিয়াছেন। হবস্ শুধু আইনসংগত সার্বভৌমিকতা লইয়া চিন্তা করিয়াছেন, রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। লক রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম শক্তিকেই বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন, আইনসংগত সার্বভৌমিকতাকে সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা উপেক্ষা করিয়াছেন। আইনসংগত সার্বভৌমিকতাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিলে লক বিপ্লবের অধিকারকে সমর্থন করিতে পারিতেন না, কারণ আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ কাম্য হইলেও আইনসংগত হইতে পারে না।*

ত্রুটি : লক আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতাকে উপেক্ষা করিয়াছেন

রুশো : রুশোর হস্তে আসিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদ এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। তাঁহার অননুকরণীয় গ্রন্থ 'সামাজিক চুক্তি' (Social Contract), যাহাতে তিনি তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ১৭৬২ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁহার পূর্ববর্তী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদ্বয় হবস্ ও লকের মত তিনি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া এই মতবাদ প্রচার করেন নাই। অর্থাৎ, কোন প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতি বা মতবাদের সমর্থনে তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচার করেন নাই। রুশোর উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত ধারণাকে রূপদান করা। অর্থাৎ, যাহা তিনি নিজে বিশ্বাস করিতেন তাহাকে মতবাদের মাধ্যমে মূর্ত করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। ডানিং বলেন, রুশোর সামাজিক চুক্তির ন্যায় প্রভাবশালী মতবাদের উৎসের সন্ধান যে লোকের ব্যক্তিগত ধারণায় পাওয়া যায়, এইরূপ ঘটনা রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে অতি বিরল।

রুশোর মতবাদ প্রচারের পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য ছিল না

তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণাকেই রূপদান করিয়াছেন

রুশোর ব্যক্তিগত ধারণার দুইটি দিক আছে,—যথা, সামাজিক সচেতনা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ। সামাজিক জীবন সম্বন্ধে রুশো প্লেটোর মতই সচেতন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহে তিনি লককেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন।† সুস্থ সামাজিক জীবন থাকিতে হইলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হইল চূড়ান্ত

তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণার দুইটি দিক

---

* Locke "failed...to see that revolution, however desirable, is never legal."

Gettell

† "His sense of community was as keen as Plato's and his love for individual freedom was more consuming than Locke's." Hearnshaw

সার্বভৌমিকতা বা ক্ষমতা। কি করিয়া রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমন্বয়সাধন করা যায় ইহাই হইল রুশোর চিন্তার বিষয়। যদিও তিনি সফল হন নাই তবুও এই সমন্বয়সাধন করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন 'সাধারণের ইচ্ছা' (general will) মতবাদের সৃষ্টি করিয়া। এই মতবাদ সৃষ্টির জন্য তিনি রাষ্ট্রের উদ্ভবের একটি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি রাষ্ট্রের সার্ব-ভৌমিকতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা করিয়াছেন

'গতানুগতিকভাবে' রুশোও প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে সুরু করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থা বলিতে কি বুঝায়, ইহার স্বরূপ কি—এ-সম্বন্ধে বর্ণনায় তিনি সংগতি বজায় রাখিতে পারেন নাই। মর্লে (Morley) বলেন, তিনি যে প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে সুরু করিয়াছিলেন তাহার কারণ তখন তাঁহার জগতের সকলেই প্রাকৃতিক অবস্থা লইয়া চিন্তা করিতেছিলেন এবং প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেছিলেন।* প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনায় রুশো অসংগতির পরিচয় বিশেষভাবে দিলেও, একটি বিষয়ে তিনি সর্বদা সংগতি বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। ইহা হইল যে, প্রাকৃতিক অবস্থা বর্তমানের 'সুসভ্য' রাষ্ট্রনৈতিক জীবন অপেক্ষা অনেকগুণে বাঞ্ছনীয় ছিল; এবং এই প্রাকৃতিক অবস্থার মানদণ্ড দিয়াই বর্তমানের সভ্যজীবনের ভালমন্দ বিচার করিতে হইবে। বিচারে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা গেলে তাহা সংশোধন করিতে হইবে।

প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে রুশোর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না; তবে ইহাকে তিনি মর্তের স্বর্গরূপে বর্ণনা করিয়াছেন

তাঁহার মতে, প্রাকৃতিক অবস্থার মানদণ্ডে সভ্যতার বিচার করিতে হইবে

সভ্য রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি অসংখ্য। প্রাকৃতিক অবস্থার মানদণ্ডে বিচার করিয়া রুশো তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। সুতরাং তিনি ধ্বনি তুলিলেন, "আদিম সরল সহজ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া যাও—সুখী হইতে পারিবে।" ইহার অর্থ এই নয় যে রুশো রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের অবসান ঘটাইয়া প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। ইহার অর্থ হইল, বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের নিয়ামক হইবে প্রকৃতি। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের যেরূপ অবাধ স্বাধীনতা ও পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে তাহা আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

তিনি প্রাকৃতিক অবস্থাকে রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনের নিয়ামক করিতে চাহিয়াছেন

স্বাধীনতা ও সাম্যের রাজ্য প্রাকৃতিক অবস্থাকে রুশো মর্তের স্বর্গ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবস্থায় মানুষ সুন্দর সহজ সরল ও সুখী জীবনযাপন করিত। কিন্তু এই স্বর্গে অধিক দিন বাস করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইল না। দুইটি কারণ রুশোর

দুইটি কারণে মানুষের প্রাকৃতিক জীবনের অবসান ঘটিল

* Rousseau had thought and talked about the state of nature "because all his world was thinking and talking about it."

কল্পিত স্বর্গরাজ্যের সুখশান্তি, সাম্য-স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া দিল। ইহারা হইল জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও মানুষের মধ্যে চিন্তার উন্মেষ (dawn of reason)।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে বর্তমানে যাহাকে আর্থিক সংঘাত বলে তাহা দেখা দিল ; এবং ইহার ফলে আদিম সরলতা ও সুখ অন্তর্হিত হইল। তখন মানুষের মধ্যে চিন্তার উন্মেষ হইল ; এবং মানুষ নিজের ও অপরের দ্রব্যের মধ্যে প্রভেদ করিতে শিখিল।

রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে স্বাভাবিক স্বাধীনতার স্থানাধিকার করিল সামাজিক স্বাধীনতা

প্রাকৃতিক অবস্থার সাম্য ও সুখশান্তি এইভাবে নষ্ট হওয়ায় প্রাকৃতিক অবস্থা হবসের কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি হইয়া দাঁড়াইল। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সংঘর্ষ, নরহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি জঘন্যতা প্রাকৃতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ায় মানুষ ইহা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। এখানেও হবসের মতবাদের মত মুক্তি আসিল চুক্তির মধ্য দিয়া, সামাজিক জীবন বা রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া। সামাজিক জীবনে প্রাকৃতিক অবস্থার স্বাভাবিক স্বাধীনতার স্থানাধিকার করিল সামাজিক স্বাধীনতা।

রুশোর মতে, একটি-মাত্র চুক্তি হইয়াছিল

সাধারণের ইচ্ছা (General Will): হবসের মত রুশোর মতে, চুক্তি হইয়াছিল মাত্র একটি। তবে রুশোর কল্পিত চুক্তির দ্বারা কোন রাজার সৃষ্টি হয় নাই। অর্থাৎ, আদিম মনুষ্যসকল চুক্তি করিয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষের হাতে সকল ক্ষমতা সমর্পণ করে নাই। ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিল চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজকে যাহাকে রুশো 'সাধারণের ইচ্ছা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

রুশোর চুক্তি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সকলের

যাহাকে রুশো 'সাধারণের ইচ্ছা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য রুশোর কল্পিত চুক্তির আরও একটু পর্যালোচনার প্রয়োজন। এই চুক্তি প্রাকৃতিক অবস্থায় বসবাসকারী ব্যক্তি-সকলের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি। ইহাতে কোন দ্বিতীয় পক্ষ নাই। এই চুক্তি দ্বারা আদিম ব্যক্তিসমূহের প্রত্যেকে, "তাহার নিজস্ব সত্তা ও সকল ক্ষমতা সাধারণের ইচ্ছার চূড়ান্ত নির্দেশের অধীনে সমর্পণ করিয়াছিল।" এবং প্রত্যেকেই সাধারণের ইচ্ছা বা নবগঠিত সমাজের অংগ বলিয়া, ব্যক্তিসমূহ যৌথভাবে যাহা সমর্পণ করিয়াছিল তাহাই ফিরিয়া পাইল। সুতরাং সকল কিছু সমর্পণ করিয়াও কেহ নিঃস্ব হইল না। সামাজিক বা রাষ্ট্রিক জীবনে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল—কারণ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার অনুবর্তী ও অংগীভূত।

ব্যক্তিগত ইচ্ছা সাধারণের ইচ্ছার অংগীভূত

এইভাবে সৃষ্ট সাধারণের ইচ্ছা হইল সার্বভৌম। ইহাকে বিভক্ত বা হস্তান্তরিত করা যায় না। হস্তান্তরিত করা যায় না বলিয়াই রুশো-কল্পিত চুক্তিতে রাজার স্থান

থাকিতে পারে না। সরকার যে-ক্ষমতার ব্যবহার করে তাহা রুশোর মতে চুক্তি দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতা নহে, অর্পিত ক্ষমতা (delegated powers) মাত্র। এই ক্ষমতা সাধারণের সার্বভৌম ইচ্ছার দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত।

সাধারণের ইচ্ছার একটি বৈশিষ্ট্য

সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছার আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত। চূড়ান্ত বলিয়া ইহাকে সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ইচ্ছার ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হইবে। অর্থাৎ, সাধারণের ইচ্ছার সহিত যদি ব্যক্তিগত ইচ্ছার সংঘর্ষ বাধে তবে সাধারণের ইচ্ছাই বজায় থাকিবে, ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে দমন করিতে হইবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে দমন করা কি যুক্তিযুক্ত? ইহার উত্তরে রুশোর প্রতিপ্রশ্ন হইবে, কেন নয়? সাধারণের ইচ্ছা যে অভ্রান্ত; ইহা সকল ব্যক্তির 'প্রকৃত ইচ্ছা'র (real will) সমন্বয় মাত্র। যদি ব্যক্তির ইচ্ছার সহিত সাধারণের ইচ্ছার সংঘর্ষ বাধে তবে বুঝিতে হইবে যে ব্যক্তি 'অপ্রকৃত ইচ্ছা'র (unreal will) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে—সে জানে না যে তাহার 'প্রকৃত ইচ্ছা' কি। সুতরাং তাহার উপর বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, তাহার প্রকৃত ইচ্ছা ও সাধারণের ইচ্ছার মধ্যে কোন অসংগতি নাই—থাকিতে পারে না।

সাধারণের ইচ্ছার আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত ইহার সম্পর্ক

সমালোচনা: এই 'প্রকৃত' ও 'অপ্রকৃত' ইচ্ছা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যাহা প্রকৃত ইচ্ছা বা সাধারণের ইচ্ছা বলিয়া পরিগণিত তাহা হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা এবং যাহা অপ্রকৃত ইচ্ছা—অর্থাৎ, যাহা সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা হইল সংখ্যালঘিষ্ঠের ইচ্ছা। সংখ্যালঘিষ্ঠ সাধারণের ইচ্ছা বা ইহার প্রকাশ আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহাদিগের উপর বলপ্রয়োগ করিতে হইবে—তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, তাহারা তাহাদের প্রকৃত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করিতেছে। সুতরাং আইনের বিরুদ্ধাচারণ করা চলিবে না। অতএব রুশোর সাধারণের ইচ্ছাতেও বলপ্রয়োগের ক্ষেত্র বাড়িয়াছে, দমন করার প্রশ্ন রহিয়াছে, স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে হবসের সহিত ইহার পার্থক্য এইখানে যে, হবস্ করিয়াছিলেন ব্যক্তিগত স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন আর রুশো করিয়াছেন সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন। সুতরাং রুশোর সমস্যা যে সাধারণের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার মধ্যে সমন্বয়সাধন—তাহা সম্ভব হইল না।*

সাধারণের ইচ্ছা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা মাত্র

রুশোর সাধারণের ইচ্ছাতেও বল-প্রয়োগের ক্ষেত্র রহিয়াছে

* "Rousseau's problem of combining State sovereignty with the freedom of the subject remained unsolved." Hearnshaw

মূল্য : সার্বভৌমিকতা ও সাধারণের স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে অক্ষম হইলেও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ সৃষ্টিতে রুশোর যে বিশেষ দান রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস হইল জনসাধারণ এবং সাধারণের মংগলসাধনই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা হইতে তিনি গণতান্ত্রিক নীতিকে সমর্থন করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি হইল সাধারণের সম্মতি, বলপ্রয়োগ নয়। তিনি আরও দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, রাষ্ট্রকে প্রাণিদেহের সহিত তুলনা করা যায়, এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তি রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংগ। পরিশেষে, রুশো জানাইতে চাহিয়াছেন, একদিন না একদিন একভাবে বা অন্যভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও সাধারণের স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্পূর্ণ সম্ভব। তাঁহার এই নীতি ও বিশ্বাসগুলি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে, চিরকালই থাকিবে।

ত্রুটি সত্ত্বেও রুশোর মতবাদ বিশেষ মূল্যবান

রুশোর প্রচারিত নীতি উচ্চ রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসাবে স্থানাধিকার করিয়া আছে

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা : সামাজিক চুক্তি মতবাদ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। হবস্, লক ও রুশোর মতবাদের দ্বারা যাঁহারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন তাঁহাদের মধ্যে স্পিনোজা (Spinoza), মণ্টেস্কু, টমাস পেইন (Thomas Paine) ও জার্মান দার্শনিক কান্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এই মতবাদের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর সুরু হইতেই কমিয়া আসিতে থাকে। রুশোর গ্রন্থ 'সামাজিক চুক্তি' প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ইংরাজ দার্শনিক হিউম (Hume) ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে চুক্তিকে কল্পনা করা ইতিহাসকে অস্বীকার করা মাত্র। বাস্তবিকই এই মতবাদ অনৈতিহাসিক। আদিম যুগে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশূন্য মনুষ্যগণ হঠাৎ একদিন পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র গঠন করিল, এইরূপ উদাহরণ কোন দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায় না। এই মতবাদের ঐতিহাসিক সত্যতায় বিশ্বাসীকে দুইটি ধারণার অন্তত একটির উপর নির্ভর করিতে হইবে :

১। ইহা অনৈতিহাসিক

(ক) প্রাকৃতিক অবস্থায় আদিম মনুষ্যগণ কোন দৃষ্টান্ত দেখিয়া চুক্তি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়াছিল এবং রাষ্ট্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল; অথবা

(খ) আদিম মনুষ্যগণের মধ্যে বিশেষভাবে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল।

চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র-গঠনের সন্ধান যখন পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না তখন দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষালাভের কথাই উঠিতে পারে না। আদিম মনুষ্যগণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সঞ্চারের কল্পনাও করা যায় না। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়

সমাজের মধ্যে বসবাস করিলে, রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সংস্রবে আসিলে। সমাজজীবনের সূত্রপাতের পূর্বে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষের কল্পনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদ ভ্রান্ত।

সামাজিক মতবাদের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে অনেক সময় ১৬২০ সালের মেফ্লাওয়ার চুক্তি (Mayflower Pact) প্রদর্শিত হয়। এই মেফ্লাওয়ার চুক্তি সম্পাদিত হয় আমেরিকায় পিউরিটান দেশান্তরবাসীদের দ্বারা। এই দেশান্তরবাসিগণ পরস্পরের মধ্যে মেফ্লাওয়ার চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। এই দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, পিউরিটান দেশান্তরবাসিগণ আদিম রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশূন্য মনুষ্য ছিল না; তাহারা সমাজে বাস করিত। সুতরাং পুনরুক্তি করিলে অন্যায় হইবে না যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ভ্রান্ত—সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

এই মতবাদের ঐতিহাসিক সত্যের সপক্ষে প্রদর্শিত উদাহরণ

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদে কল্পনা করা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ পূর্ণ স্বাধীন ছিল। স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই ধারণা ভ্রান্ত, কারণ স্বাধীনতার ভিত্তি হইল রাষ্ট্রনৈতিক আইন। রাষ্ট্রনৈতিক আইন ব্যতিরেকে যে-স্বাধীনতার কল্পনা করা যাইতে পারে তাহা স্বৈরাচারিতার নামান্তর মাত্র। প্রাকৃতিক অবস্থায় যে-স্বাভাবিক আইনের (natural law) কল্পনা করা হইয়াছে তাহা নৈতিক আইন মাত্র। ইহার পশ্চাতে এমন কোন শক্তি ছিল না যাহা এই আইন মান্য করিতে বাধ্য করাইতে পারে। নৈতিক আইন কখনও স্বাধীনতার রক্ষক হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাকৃতিক অবস্থায় স্বৈরাচারিতা থাকিতে পারে, প্রকৃত স্বাধীনতা কখনই থাকিতে পারে না।

২। প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না

তৃতীয়ত, চুক্তির ভিত্তি হইল রাষ্ট্রনৈতিক আইন। নৈতিক অর্থে যে-সহজাত আইনের অস্তিত্ব প্রাকৃতিক অবস্থায় কল্পনা করা হইয়াছে তাহা কখনও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে না। রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে চুক্তির কল্পনা রক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার সমর্থক হিসাবে রাষ্ট্রনৈতিক আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় নাই। সুতরাং এই দিক দিয়াও এই মতবাদ অযৌক্তিক।

৩। ইহা অযৌক্তিক

চতুর্থত, সামাজিক অবস্থায় যে-সহজাত অধিকারের কল্পনা করা হইয়াছে তাহা নৈতিক অধিকার ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। উভয়েরই উদ্ভব হয় সমাজে বাস করার ফলে মানুষের সমাজবোধ হইতে। গ্রীণের মতে, যতক্ষণ না মানুষ সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে, ততক্ষণ অধিকারের প্রতিষ্ঠা হয় না। সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন সমাজজীবন প্রতিষ্ঠার পরই কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহার পূর্বে নহে। সুতরাং সমাজজীবনের উদ্ভবের পূর্বে অধিকারের কল্পনা করিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদ চুক্তির সূত্রকে বিকৃত করিয়াছে মাত্র।

৪। ইহা চুক্তির সূত্রকে বিকৃত করিয়াছে

পঞ্চমত, চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করা বা না-করা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আদিম মানুষের সকলেই চুক্তিতে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল—ইহাও মাত্রাতিরিক্ত কল্পনা। উপরন্তু, চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল আদিম মনুষ্যসম্প্রদায়। এই চুক্তি পরবর্তীকালে উত্তরপুরুষের উপর প্রযোজ্য হইবে কেন? আইনের দৃষ্টিতে চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী আদিম মনুষ্যসকলের জীবনাবসানের সংগে সংগে চুক্তিরও অবসান ঘটিয়াছিল। সুতরাং বর্তমানে রাষ্ট্রের ভিত্তির ব্যাখ্যাহিসাবে চুক্তি মতবাদকে কোনক্রমেই গ্রহণ করা যায় না।

৫। ইহা বর্তমান রাষ্ট্রের ভিত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে কোন গ্রহণযোগ্য মতবাদ নহে

পরিশেষে বলা যায় যে, অনেকের মতে, এই মতবাদ বিপজ্জনক মতবাদ। ব্লুণ্টস্‌লির ভাষায় বলিতে গেলে, "এই মতবাদ রাষ্ট্রকে মানুষের খেয়ালের ফলে সৃষ্ট এইরূপ কল্পনা করে বলিয়া ইহা যতটা কল্পনা করা যায় ততটাই বিপজ্জনক।" বার্ক স্বাভাবিক আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক চুক্তি মতবাদকে 'অরাজকতার সংক্ষিপ্তসার' (digest of anarchy) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইটি প্রধান বিপ্লব—ফরাসী বিপ্লবও আমেরিকার বিদ্রোহ বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল সামাজিক চুক্তি মতবাদ হইতে। এইভাবে সমালোচকের দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারায় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। স্যর হেনরী মেইনও ইহাকে সম্পূর্ণ মূল্যহীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তমানে রাষ্ট্রের ভিত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে ইহা পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক যে চুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমানে ইহাতে আর কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন না। গার্ণারের ভাষায় বলিতে পারা যায়, "ইহা মানুষের কল্পনাপ্রসূত একটি নিছক মতবাদ মাত্র।"

৬। ইহা বিপজ্জনক মতবাদ

ইহা মানুষের কল্পনা-প্রসূত নিছক মতবাদ

ঐতিহাসিক মূল্য: রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদ সম্পূর্ণ মূল্যহীন হইলেও ইহার মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। বার্কারকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, যুক্তিবাদের মধ্যে দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি হইল স্বাধীনতার আদর্শ এবং অপরটি হইল ন্যায়ের আদর্শ।* এই মতবাদ অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ গণতন্ত্র এবং অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা সার্বভৌমিকতার বিবর্তনে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে।

ইহা গণতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল

* '....it was....a way of expressing two fundamental ideas or values to which human mind will always cling—the value of Liberty, or the idea that will, not force, is the basis of government, and the value of Justice, or the idea that right, not might, is the basis of all political society and of every system of political order.'

গণতন্ত্রের বিবর্তনে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ভূমিকা অনুধাবন করিতে হইলে আমাদিগকে হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদে ফিরিয়া যাইতে হইবে। হবসের পূর্ব পর্যন্ত ঐশ্বরিক মতবাদই ছিল প্রচলিত মতবাদ। হবস্ রাজতন্ত্রের উপাসক হইয়াও যুক্তি দিয়া বিচার করিয়া ঐশ্বরিক মতবাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি করিয়াছিলেন চুক্তি মতবাদের প্রচার। এই চুক্তি মতবাদ রক্ষণশীল মতবাদ ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। লক ও রুশোর হস্তে আসিয়া যখন চুক্তি মতবাদ এই রূপ গ্রহণ করিল যে, রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল 'শাসিতের সম্মতি' (consent of the governed) তখন মুমূর্ষু ঐশ্বরিক মতবাদের জীবনাবসান ঘটিল।* শাসিতের সম্মতি রাষ্ট্রের ভিত্তিরূপে গৃহীত হওয়ায় আধুনিক গণতন্ত্রের বিবর্তনের ইতিহাসের সুরু হইল।

ইহা ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের জীবনাবসান ঘটাইয়াছিল

'শাসিতের সম্মতি'—এই মতবাদ ফ্রান্সে ও আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে বিপ্লব ঘটাইল এবং ইংল্যাণ্ডের ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব সংঘটিত করিল। 'শাসিতের সম্মতি' মতবাদের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে গণতান্ত্রিক নীতিগুলি—যথা, জনগণের সার্বভৌমিকতা, সকলের স্ব-শাসনের মৌলিক অধিকার, অন্যান্য মৌলিক অধিকার এবং মানুষে মানুষে সাম্য। জনগণের সার্বভৌমিকতা ও মৌলিক অধিকারের দাবিতে ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায় এবং প্রধানত সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবিতে ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হইল। এই তিন বিপ্লবের ফলে জনগণ রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদা পাইল, অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল এবং গণতন্ত্র বর্তমান রূপ গ্রহণ করিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক ধারণা 'সার্বভৌমিকতা'র যে-রূপ তাহাও অধিকাংশে সামাজিক চুক্তি মতবাদের অবদান। হবসের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদ মাত্র আইনসংগত সার্বভৌমিকতার (legal sovereignty) পথ প্রস্তুত করে। লক বর্তমানে যাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলে অনেকাংশে তাহার রূপদান করেন; এবং রুশো জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার মন্ত্রের প্রধান প্রচারকের কার্য করেন।

ইহা সার্বভৌমিকতার রূপদানে সহায়তা করিয়াছে

এই জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার মন্ত্রই বর্তমানে গণতন্ত্রের উপাসককে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহশীল করিয়া তুলিয়াছে। তাই এখন অনেক রাষ্ট্রে দেখিতে পাওয়া যায় গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখার প্রচেষ্টা।

পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বর্তমানে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে-পার্থক্য রহিয়াছে তাহা লকেরই সৃষ্টি। লকের পূর্বের কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই ধারণাকে পরিস্ফুট করিয়া প্রদর্শন করেন নাই।

এই মতবাদের ফলে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে

* "Theory of Social Contract became the chief enemy of the Theory of Divine Origin."

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary Theory) : দেখা গেল যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ—কোনটিই গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ কোনটিই যথেষ্ট নহে। এ-সম্বন্ধে গার্ণার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে, পাশবিক শক্তিরও ফল নহে, প্রস্তাব বা চুক্তি দ্বারাও সৃষ্ট হয় নাই, শুধু পরিবারের সম্প্রসারণ বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করা যায় না।" তবে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ব্যাখ্যা করা যাইবে কিভাবে? রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণযোগ্য মতবাদ কি? রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনবাদে। বর্তমানে ইহাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে গৃহীত মতবাদ। এই মতবাদ মানুষের অলস কল্পনা মাত্র নহে, ইহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফল। এই মতবাদ অনুসারে মানবসমাজ দীর্ঘ দিন ধরিয়া স্বাভাবিকভাবে বিবর্তিত হইয়া বর্তমানের জটিল রূপ গ্রহণ করিয়াছে—হঠাৎ একদিন ঈশ্বরের খেয়াল বা মানুষের প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট হয় নাই। এ-সম্পর্কে বার্জেসের উক্তি হইল, "রাষ্ট্র মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ফল।"* এই সমাজের সূত্রপাত হইয়াছিল অতি সাধারণভাবে কিন্তু ইহা দিন দিন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া চলিয়াছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক মতবাদে পাওয়া যায়

রাষ্ট্র মানবসমাজের বিরতিবিহীন বিবর্তনের ফল

কবে, কিভাবে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না; কারণ মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব অতি আদিমকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং কবে এই সামাজিক কর্তৃত্ব রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হইল তাহার ইতিহাস তমসাবৃত। যাহা হউক প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতির গবেষণালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে প্রধান হইল যে রাষ্ট্র-গঠনের সূত্রপাতের সন্ধান পাওয়া যাইবে মানুষের স্বভাবের মধ্যে। মানুষের এই স্বভাবের দুইটি দিক আছে—সংঘবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতা। আদিম কাল হইতেই এই দুইটি দিক মানুষকে প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে। সংঘবদ্ধতার কারণে মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না। এই কারণে সে আদিম যুগেই পরিবার গঠন করিয়াছিল। বিচ্ছিন্ন হইবার প্রেরণায় মানুষ আদিম যুগেই সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে বিভিন্ন দল গঠন করিয়াছিল। এক একটি দলে অনেকগুলি করিয়া পারিবারিক সংগঠন থাকিত। প্রত্যেক দল ইহার অন্তর্গত পারিবারিক সংগঠনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিত

রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সূত্রপাতের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন

রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রাথমিক কারণ মানুষের স্বভাব

* The State is the product of "continuous development of human society..."

এবং তাহাদের জন্য নানারূপ কার্য সম্পাদন করিত। এইভাবে সংগঠিত সমাজজীবনের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন দলের অস্তিত্বের জন্য পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। ফলে প্রয়োজন হইত রক্ষিবাহিনীর এবং রক্ষিবাহিনীকে পরিচালনা করিবার জন্য কর্তৃত্বের (authority)। অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে রক্ষিবাহিনীকে পরিচালনা করা ছাড়াও এই কর্তৃত্ব আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করিত এবং আভ্যন্তরীণ সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিত। এই কর্তৃত্ব পরে সরকারে পরিণত হইল এবং উদ্ভব হইল রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের বা রাষ্ট্রের। সরকার প্রথমে সমাজজীবনকে কতকটা মাত্র নিয়ন্ত্রিত করিত; কিন্তু ক্রমে ইহার কার্যাবলী সংখ্যায় বাড়িতে লাগিল এবং ব্যক্তির জীবন অধিকতর পরিমাণে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে আসিতে লাগিল। অবশেষে দেখা দিল বর্তমান দিনের জটিল রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন।

কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ও সরকারের সৃষ্টি

রাষ্ট্রের উদ্ভবের উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে এ-ধারণা করা ভুল হইবে যে, সকল রাষ্ট্রের জন্মেতিহাস এক এবং অভিন্ন। উপরি-উক্ত ইতিহাস সাধারণভাবে রাষ্ট্রের জন্মেতিহাস মাত্র। এই সাধারণ ইতিহাসের মধ্যে অনেক সময় প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতিগত কারণ প্রভৃতির জন্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। ব্যতিক্রম দেখা গেলেও বলা যায় যে, অন্তত কয়েকটি শক্তি রাষ্ট্রের বিবর্তনে সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই শক্তি কয়টি হইল, রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা। এখন বিষয়গুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনাকালে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহাদের আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবে করা হইলেও তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে কার্য করে নাই। রাষ্ট্র-বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিমাণে পরস্পরের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া তাহারা সকলেই একসংগে কার্য করিয়াছে। তবে কোন্‌টি কোন্ সময় কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে কার্যকর হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না।

সকল রাষ্ট্রের জন্মেতিহাস এক এবং অভিন্ন নহে

রাষ্ট্র-গঠনে ভূমিকা গ্রহণকারী শক্তিসমূহ

শক্তিগুলি পৃথক পৃথক ভাবে কার্য করে নাই

(১) রক্তের সম্বন্ধ (Kinship): রক্তের সম্বন্ধ রাষ্ট্র-গঠনের প্রাথমিক উপাদান। রাষ্ট্র পারিবারিক সংগঠন হইতেই বিবর্তিত হইয়াছে; এবং এই পারিবারিক সংগঠনের ভিত্তি হইল রক্তের সম্বন্ধ। পরিবারের মধ্যেই মানুষ প্রথমে আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা লাভ করে। এই নীতি দুইটিই হইল রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মূল নীতি। রাষ্ট্র-পরিচালকগণের আদেশ ও আইনের মত গৃহকর্তার আদেশ সকলের পালনীয়।

পরিবারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মূল নীতি

পরিবারের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একই পরিবার বহু পরিবারে বিভক্ত হইয়া গেল। তখন আর এক গৃহকর্তার পক্ষে সকল পরিবারের উপর কর্তৃত্ব বজায়

রাখা সম্ভব হইল না। এই অবস্থাতেও বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সংহতি বজায় রাখিল রক্তের সম্বন্ধ। এই বিভিন্ন পরিবারের সকল সভ্য একই পূর্বপুরুষের বংশধর বলিয়া মানিয়া লইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রহিল। পূর্বপুরুষের নাম হইল সংহতির প্রতীক।* ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন পরিবার এই অবস্থায় সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠী (Clan) বলিয়া পরিচিত হইল। সমগ্র গোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্ব করিতেন গোষ্ঠীপতি বা গোষ্ঠীপ্রধান। গোষ্ঠীপ্রধানগণের কার্য ছিল পূর্বপুরুষগণের পূজাপদ্ধতি অনুসরণ করা এবং ধর্মাচরণ করা।

সম্প্রসারিত পরিবারে সংহতি বজায় রাখিল রক্তের সম্বন্ধ

এইভাবে গোষ্ঠী সম্পর্কে চেতনাই রাষ্ট্রের উদ্ভবের পথ প্রস্তুত করে। অধ্যাপক ম্যাক্আইভার এ-সম্পর্কে সংক্ষেপে বলিয়াছেন, "উত্তর-পুরুষের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ ধীরে ধীরে ব্যাপকতর সামাজিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে রূপান্তরিত হইল। গৃহকর্তার কর্তৃত্ব গোষ্ঠীপতির কর্তৃত্বে পরিণত হইল।...তাহার পর রাজতন্ত্রের অধীনে উদ্ভব হইল সমাজের। রাজতন্ত্র সৃষ্টি করিল সমাজের এবং সমাজ পরে সৃষ্টি করিল রাষ্ট্রের।"

গোষ্ঠী সম্পর্কে চেতনাই রাষ্ট্রের উদ্ভবের পথ প্রস্তুত করে

(২) ধর্ম (Religion): রক্তের সম্বন্ধের সমজাতীয় আর একটি শক্তি যাহা প্রাচীন সমাজকে রক্ষা করিয়াছিল তাহা হইল ধর্ম। গোষ্ঠীর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যখন রক্তের সম্বন্ধের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল তখন ধর্ম না থাকিলে সমাজ ভাঙনের পথে চলিত। বস্তুত, প্রাচীন সমাজে—অর্থাৎ, গোষ্ঠীজীবন অবধি রক্তের সম্বন্ধ ও ধর্ম এই দুইটি উপাদান ছিল একই জিনিসের দুইটি দিক। উভয়েই একসংগে এবং কতকটা সমভাবেই পারিবারিক ও গোষ্ঠীজীবন গঠনে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। রাষ্ট্রপতি উইলসন বলিয়াছেন, "ধর্ম ছিল রক্তের বন্ধনের চিহ্ন এবং প্রতীক, ইহার ঐক্যের, ইহার বিশুদ্ধতার এবং কর্তব্যসমূহের প্রকাশ।"**

রক্তের সম্বন্ধের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িলে নূতন বন্ধন যোগাইল ধর্ম

প্রাচীন ধর্ম প্রথমে প্রকৃতিপূজা এবং পরে পূর্বপুরুষদের পূজা ও ধর্মাচরণের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। আদিম মানুষ প্রকৃতির দিকে ভীত ও বিস্ময়ের দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া থাকিত। ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ঋতু পরিবর্তন, জীব ও উদ্ভিদের মৃত্যু প্রভৃতিকে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রকাশ বলিয়া মনে করিত। এই অতিপ্রাকৃত শক্তির কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে তাহাদিগকে পূজা করিত। কালক্রমে এই পূজা একমাত্র পুরোহিতদের হস্তে গিয়া পড়িল। পুরোহিতরা অলৌকিক কার্য সম্পাদন করিয়া লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করাইত যে, প্রাকৃতিক রহস্যের সূত্র একমাত্র তাহাদেরই জানা আছে এবং একমাত্র তাহারাই এই

পুরোহিতশ্রেণীর উদ্ভব ও ক্ষমতা করায়ত্তকরণ

* "The children of Abraham considered themselves God's chosen people—all others were Gentiles.." Gettell

** "Religion was the seal and sign of common blood, the expression of its oneness, its sanctity, its obligations."

সকল ঘটনার কবল হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে। ফলে তাহারা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতার আসনে বসিয়া শাসন করিতে লাগিল।

ধর্ম যখন পূর্বপুরুষদের পূজা ও ধর্মাচরণের রূপ গ্রহণ করিল তখন গোষ্ঠীপতির আধিপত্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, কারণ গোষ্ঠীপতিরই অধীনে ধর্মাচরণ পরিচালিত হইত। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে, পূর্বপুরুষদের আত্মার সহিত প্রবীণ ব্যক্তিদের আত্মার যোগাযোগ আছে। গোষ্ঠীপতিই ছিলেন প্রবীণতম ব্যক্তি। তাঁহাকে অমান্য করার অর্থ হইল মৃত আত্মার অভিশাপগ্রস্ত হওয়া। এইভাবে গোষ্ঠীর উপর ধর্মাচরণের প্রধান পুরোহিত হিসাবে গোষ্ঠীপতির ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক সময় অবশ্য গোষ্ঠীর প্রবীণতম ব্যক্তিকে গোষ্ঠীপতির আসন হইতে সরাইয়া ঐন্দ্রজালিকের দল তাহাদের স্থানাধিকার করিত। ঐন্দ্রজালিকের দল অথবা প্রবীণ গোষ্ঠীপতি ক্রমে রাজার আসনে বসিলেন।

প্রধান পুরোহিত হিসাবে গোষ্ঠীপতির কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্রের বিবর্তনে ধর্মের এই ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখা শক্ত। অধ্যাপক গেটেলের মতে, "রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের প্রাথমিক এবং সর্বাপেক্ষা সংকটময় অবস্থায় একমাত্র ধর্মই বর্বরসুলভ অরাজকতাকে দমন করিয়া মানুষকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের নীতি শিক্ষা দিতে পারিয়াছিল।"* শুধু প্রাথমিক স্তরেই নয়, আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে ধর্মকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ঐশ্বরিক অধিকারে বর্তমানে কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিশ্বাস না করিলেও, ধর্মীয় রাষ্ট্রের অবসান ঘটে নাই। আজিকার এই সকল ধর্মী পুরোহিতদের অপ্রতিহত ক্ষমতা না থাকিলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজও পরিলক্ষিত হয়

(৩) যুদ্ধবিগ্রহ (War): সমাজ-বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর—অর্থাৎ, গোষ্ঠী অবধি সামাজিক সংগঠনকে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব হইল তৃতীয় স্তরে। এই তৃতীয় স্তরের নূতন সংগঠনকে উপজাতি (Tribe) বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ববর্তী সংগঠনসমূহ—যথা, পরিবার ও গোষ্ঠীর সহিত উপজাতির পার্থক্য হইল যে, উহার সামরিক সংগঠন ছিল না —কিন্তু উপজাতীয় সংগঠন হইল সম্পূর্ণভাবে সামরিক সংগঠন—ইহার উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য উপজাতিকে আক্রমণ করা এবং অন্যান্য উপজাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করা। উপজাতির উদ্ভব হইল তখন, যখন গোষ্ঠী সম্প্রসারিত হওয়ায় গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের বন্ধন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল এবং আঞ্চলিক ও পারিবারিক ধর্মের স্থানাধিকার করিল ধর্মের ব্যাপকতর রূপ—যাহার দ্বারা সম্প্রসারিত গোষ্ঠীকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ

সমাজ-বিবর্তনের যে-স্তরে উপজাতির সৃষ্টি হইল সেই স্তরেই উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের

উপজাতীয় সংগঠন ছিল সম্পূর্ণ সামরিক সংগঠন

* "In the earliest and most difficult periods of political development, religion alone could subordinate barbaric anarchy and teach reverence and obedience."

রাখা সম্ভব হইল। সংগে সংগে আক্রমণ ও আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে উদ্ভব হইল একটি বলপ্রয়োগকারী শক্তির (coercive power)। এই শক্তি ক্রমে সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হইল; এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর নিকট লোকে আনুগত্য স্বীকার করিল।)

সার্বভৌম শক্তির উদ্ভব

এখন প্রশ্ন উঠে, উপজাতির মধ্যে সার্বভৌম হইলেন কে? সাধারণত সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হইলেন যুদ্ধনায়ক। এই যুদ্ধনায়ক সম্প্রদায়ের সকলের দ্বারা অনেক সময় নির্বাচিত হইতেন, অনেক সময় আবার পূর্বতন যুদ্ধনায়কের মনোনীত ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ের সকলে মানিয়া লইত। যুদ্ধের সময় নায়কতা করা ছাড়াও শান্তির সময় তিনি দ্বন্দ্ব-মীমাংসা করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি আবার উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিতের কার্যও করিতেন। এইভাবে যুদ্ধনায়ক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই উক্তি প্রচলিত আছে যে 'রাজার জন্ম হইল যুদ্ধের ফলে'।*

'রাজার জন্ম যুদ্ধের ফলে'

প্রথমে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন ছিল এইরূপ সরল এবং ইহার কর্ণধার ছিল সংখ্যায় নগণ্য; এবং ফলে সাধারণ লোকের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্বও ছিল অত্যল্প। কালক্রমে নানা কারণে সার্বভৌম রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল এবং রাষ্ট্রকর্তৃত্ব প্রসারিত হইল; এবং ফলে শাসনযন্ত্রের গঠন জটিলতর হইল। তখন আর রাষ্ট্রকে যুদ্ধের ফল বলিয়া সহজে চেনা গেল না।

(৪) (ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি (Private Property): রাষ্ট্র-উদ্ভবের পশ্চাতে শক্তি হিসাবে অর্থনৈতিক কাজকর্ম (economic activity) সমাজজীবনের সূত্রপাত হইতেই কার্য করিয়া আসিয়াছে। মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম জনসমষ্টিকে বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। অর্থনৈতিক কাজকর্ম দ্বারা মানুষ প্রথমে খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিত; পরে ইহার দ্বারা ধনসম্পত্তি অর্জন ও সঞ্চয় করিতে শিখিল। ধনসম্পত্তি অর্জন ও সঞ্চয়ের সংগে সংগে রাষ্ট্র-বিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা হইল।)

ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব রাষ্ট্র-বিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়

(সংঘবদ্ধ জীবনের ভিত্তি হইল সহযোগিতা এবং সহযোগিতার মূলমন্ত্র হইল কতকগুলি সাধারণভাবে স্বীকৃত বিধিনিয়ম। অর্থনৈতিক জীবনে এই সাধারণভাবে স্বীকৃত বিধিনিয়মের ভিত্তিতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হইয়াছিল।) প্রথমে মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে পশুপক্ষী শিকার করিত তখনও পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারেই শিকারলব্ধ পশুপক্ষী বণ্টিত হইত। শিকারে যাহা পাওয়া যাইত তাহা সকলে সমভাবে ভোগ করিত। ক্রমে এই সাম্যের অবস্থা অন্তর্হিত হইল। তারপর শিকার জীবন হইতে মানুষ ক্রমে যখন

বণ্টনের নীতি নির্ধারণ

* "War begot the king."

পশুচারণ জীবনে গিয়া পড়িল তখন ধনবৈষম্য দেখা দিল এবং ধনবৈষম্যের ভিত্তিতে সমাজের মধ্যে গড়িয়া উঠিল বিভিন্ন শ্রেণী। তখন চৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে এই সম্পর্কে প্রণীত হইল বিভিন্ন আইন। পশুচারণ জীবনের পর মানুষ যখন কৃষিজীবন সুরু করিল তখন ভূমি এবং ক্রীতদাসকেই প্রধান সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হইতে লাগিল। কৃষিজীবনে অধিকতর ধনবৈষম্যের জন্য ধন-সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে দ্বন্দ্ব-মীমাংসার জন্য আরও অধিকসংখ্যক আইন প্রণীত হইল। তারপর পণ্য-বিনিময়ের ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বাণিজ্যের প্রসার হইল এবং ইহার ফলে উদ্ভব হইল বণিকশ্রেণীর এবং সমাজ আরও শ্রেণীবিভক্ত হইল। ব্যবসায়ীশ্রেণীর স্বার্থের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রদায়কে অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ সংযত করিতে হইত; অনেক ক্ষেত্রে আবার বিরোধে লিপ্ত হইতে হইত।

সমাজে শ্রেণীর স্বষ্টি

বণিকশ্রেণীর উদ্ভব

এইভাবে অর্থনৈতিক কাজকর্ম রাষ্ট্র-গঠনে নানাভাবে সহায়তা করিতে লাগিল — সমাজে ধনবৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব, ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বষ্টি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বিরোধ সংযত রাখা ও বিরোধে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আইন প্রণয়ন ও শাসন-যন্ত্রের স্বষ্টি অপরিহার্য করিয়া তুলিল। সমাজে শক্তিশালীশ্রেণী এই শাসনযন্ত্র বা সরকারকে করতলগত করিয়া কায়েম হইয়া বসিল এবং অপরাপর শ্রেণীকে নিজ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির কার্যে নিয়োজিত করিতে লাগিল।

শক্তিশালীশ্রেণী কর্তৃক শাসনযন্ত্র করায়ত্তকরণ

(৫) রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (Political Consciousness): রাষ্ট্রের বিবর্তনে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। আদিম কাল হইতেই মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করিলেও সংঘবদ্ধতার আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন আদিম কাল হইতেই ছিল না। প্রথমে রক্তের সম্বন্ধ ও ধর্মের বন্ধন পরিবার ও গোষ্ঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের স্বষ্টি করিয়াছিল। এই অন্ধ আনুগত্যের যুগকে রাষ্ট্রনৈতিক অবচেতনার যুগ বলিয়াই অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু গোষ্ঠী যখন পরবর্তী অধ্যায় উপজাতিতে উপনীত হইল তখন এই অবচেতনা অকস্মাৎ ঘুচিয়া গেল। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে মানুষ উপজাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইল—বুঝিল ঐক্য ব্যতিরেকে সংঘাতে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা উন্মেষিত হওয়ায় উপজাতীয় সংহতি বিশেষভাবে সাধিত হইল এবং ইহাতে শাসনযন্ত্রের কর্তৃত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে লোকে সচেতনভাবে যুদ্ধ-নায়কদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিল এবং ইহার ফলে যুদ্ধনায়কদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বীকৃত হইল। ক্রমে তাঁহারা রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ

উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি রাষ্ট্রের উদ্ভব সূচিত করিল

শান্তির সময়েও লোকে রাজশক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল। রাজশক্তি প্রধানত ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিল। এইভাবে উপযোগিতার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজশক্তি রাষ্ট্রের উদ্ভব সূচিত করিল।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদগুলি প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ, এবং (২) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ। কতকগুলি মতবাদ অবশ্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি উভয়ই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদ ছাড়া আর সকল মতবাদই কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু এই সকল কল্পনাপ্রসূত মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অনেক কিছু দান করিয়াছে।

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ: ইহা কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এই মতবাদের মূল কথা হইল: রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত; রাজা ইশ্বরের প্রতিনিধি; এই কারণে তিনি একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়ী।

সমালোচনা—ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করে বলিয়া, অযৌক্তিক বলিয়া, লৌকিক ব্যাপারে ঈশ্বরের কল্পনা করে বলিয়া এবং রাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থার উপর আলোকসম্পাত করে না বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। তবুও এই মতবাদ মানুষকে আনুগত্যের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসের দিক দিয়া কিছুটা মূল্যবান।

বলপ্রয়োগ মতবাদ: ইহা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি উভয়ই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। একমাত্র বলপ্রয়োগ দ্বারাই রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছে এবং বলপ্রয়োগ দ্বারাই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা হইয়াছে—ইহাই হইল এই মতবাদের মূল বক্তব্য। খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠানের সমর্থকগণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ, সমাজতন্ত্রবাদিগণ জার্মান আদর্শবাদিগণ প্রভৃতির দ্বারা এই বলপ্রয়োগের মতবাদ বিশেষ বিশেষ দিক দিয়া সমর্থিত হইয়াছে।

সমালোচনা—বলপ্রয়োগ মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত থাকিলেও বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ বা রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নহে। উপরন্তু, এই মতবাদ নৈতিক দিক দিয়া সমর্থিত হইতে পারে না। ইহা আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতির বিরোধী। পরিশেষে ইহা মানব ঘৃণাকারীদের মতবাদ।

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ: এই দুই মতবাদ অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়াই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত আছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ: রাষ্ট্রের কল্পনাপ্রসূত মতবাদের মধ্যে এই মতবাদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা চলিয়া আসিলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক হবস্, লক ও রুশো ইহাকে পরিস্ফুট করেন।

এই তিন জন দার্শনিকের মতেই রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বাস করিত। এই প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে দার্শনিক তিন জন পরস্পরের সহিত একমত নহেন। প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল (১) হবসের মতে, বর্বর সুলভ অবস্থা, (২) লকের মতে, শান্তি শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার রাজ্য কিন্তু অসম্পূর্ণ, এবং (৩) রুশোর মতে, মর্ত্যের স্বর্গ।

ফলে (১) হবসের মতে, মানুষ দুর্বিসহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাজার হস্তে আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া আর সমস্ত অধিকার সমর্পণ করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল ; (২) লকের মতে, অসম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ বা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আদিম মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের পত্তন করিয়াছিল ; (৩) রুশোর মতে, জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও চিন্তার উন্মেষের ফলে মর্ত্যের স্বর্গের সুখশান্তি বিনষ্ট হওয়ার জন্যই মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র-গঠন করিয়াছিল পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে (১) হবসের উদ্দেশ্য ছিল চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করা ; এবং (২) লকের উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া উহাকে শাসকের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠা করা। (৩) রুশোর ব্যাখ্যার পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য না থাকিলেও তিনি জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার সমর্থনে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।

সমালোচনা : সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক এবং বিপজ্জনক মতবাদ বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ব্যবহারিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। ইহা গণতন্ত্রের উদ্ভবে এবং সার্বভৌমিকতার বিবর্তনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

ঐতিহাসিক মতবাদ : ঐতিহাসিক মতবাদ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফল। ইহা অন্যতম কল্পনাপ্রসূত মতবাদ নহে। এই মতবাদ অনুসারে মানবসমাজ দীর্ঘ দিন ধরিয়া বিবর্তিত হইয়া বর্তমানের জটিল রাষ্ট্ররূপ ধারণ করিয়াছে। এই বিবর্তনে প্রধানত পাঁচটি শক্তি—যথা, রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা—ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ পর্যায়ে কি পরিমাণ কার্য করিয়াছে তাহা অবশ্য নির্ণয় করা কঠিন। তবে বলা যায় যে, প্রথম পর্যায়ে রক্তের বন্ধন, দ্বিতীয় পর্যায়ে ধর্ম, তৃতীয় পর্যায়ে যুদ্ধবিগ্রহ এবং চতুর্থ পর্যায়ে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির গুরুত্ব কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনের সূত্রপাতের সংগে সংগেই অনুভূত হইয়াছিল।

প্রশ্নোত্তর

1. "Government rests on force." "Government rests on opinion." Discuss these statements carefully. (C. U. 1942, '44, '56) (৬০-৬৩ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the Social Contract Theory of the origin of the State. (C. U. 1947, '49) (৬৫-৮০ পৃষ্ঠা)

3. State the points of agreement and difference between Hobbes and Locke as expounders of the Social Contract Theory. (C. U. 1950, '51, '57)

[ইংগিত : চুক্তি মতবাদের অন্যান্য সমর্থকগণের মত হবস্ ও লক উভয়েই 'প্রাকৃতিক অবস্থায়' মানুষের অসুবিধা এবং চুক্তির মধ্য দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র প্রবর্তনের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই দুই বিষয় সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্যও রহিয়াছে যথেষ্ট।

প্রথমত, হবস্ যে প্রাকৃতিক অবস্থার কল্পনা করিয়াছেন তাহা হইল এক ভয়াবহ যুদ্ধমান প্রাক-সামাজিক অবস্থা। তাঁহার মতে, মানুষ চরমমাত্রায় স্বার্থপর ও ক্ষমতালিপ্স। স্বার্থসিদ্ধির সন্ধানে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ যে-কোন পন্থা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না, ফলে মানুষের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষ চলিতে থাকিত। এই অবস্থায় বলপ্রয়োগ ছিল অধিকারের ভিত্তি ;

স্বাধীনতা বলিতে উচ্ছৃংখলাকেই বুঝাইত। লক-কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থা কিন্তু প্রাক-সামাজিক অপেক্ষা অধিকতর প্রাক-রাষ্ট্রনৈতিক। অর্থাৎ, লকের প্রাকৃতিক অবস্থায় একপ্রকার সমাজজীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক অবস্থার যে ভয়াবহ চিত্র হবস্‌ আঁকিয়াছেন তাহাকে অস্বীকার করিয়া লক বলেন, প্রাকৃতিক অবস্থা বিচার-বুদ্ধি ও ন্যায়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল, এবং শান্তি, শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বিরাজ করিত। মানুষ স্বাভাবিক আইনের দ্বারা পরিচালিত হইত এবং তাহার অধিকারও ঐ আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। এই স্বাভাবিক আইনের অংগীভূত জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার সকলেই সমভাবে ভোগ করিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হবসের মত লক প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলিতে পাশবিক বলকে বুঝিতেন না। তাঁহার মতে, প্রত্যেকের স্বাধীনতা অপরের স্বাভাবিক অধিকারের দ্বারা সীমিত ছিল।

হবস্‌-কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থার অসুবিধা সহজেই অনুমেয়। ভয়াবহ যুদ্ধমান প্রাকৃতিক অবস্থার হাত হইতে মানুষ মুক্তির সন্ধান পাইল সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া। লক-কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থায় সুখ, শান্তি ও শৃংখলা বিরাজ করিলেও উহাতে কতকগুলি অসুবিধা ছিল—যথা, (১) স্বাভাবিক আইনের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ছিল না, (২) এই আইনের ব্যাখ্যার কোন ব্যবস্থা ছিল না, এবং (৩) আইন বলবৎ করিবারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত ছিল না। যাহাতে এই স্বাভাবিক অধিকারগুলি অব্যাহতভাবে ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য মানুষ প্রতিষ্ঠা করিল সমাজ ও রাষ্ট্র।

দ্বিতীয়ত, চুক্তির মধ্য দিয়া সমাজ বা রাষ্ট্র প্রবর্তিত হইয়াছে এ-বিষয়ে উভয়েই একমত হইলেও চুক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করেন। হবসের মতে, আদিম মনুষ্যসকল নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া সমস্ত ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদই হইলেন সার্বভৌম। সার্বভৌম শুধুমাত্র চূড়ান্ত ক্ষমতারই অধিকারী নহেন, তিনি বা তাঁহারা চুক্তিরও উর্ধ্বে কারণ তিনি বা তাঁহারা চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করেন নাই—চুক্তির ফলেই উদ্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং সার্বভৌম শক্তির বিরুদ্ধে চুক্তিভংগের কোন অভিযোগ আনয়ন করা যায় না, এবং অত্যাচারী হইলেও প্রজাদের উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকার নাই। প্রজারা চুক্তিভংগ করিলে সেই ভয়ংকর প্রাকৃতিক অবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হইবে। এইভাবে হবস্‌ চরমতন্ত্রের সমর্থন করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের ষ্টুয়ার্ট রাজাদের সমর্থনোদ্দেশ্যেই ইহা করিয়াছেন। লকের মতে, কিন্তু চুক্তি হইয়াছিল দুইটি—প্রথমটি হয় আদিম সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণের নিজেদের মধ্যে। ইহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্র। আর দ্বিতীয় চুক্তিটি হয় সমগ্র সম্প্রদায়ের সহিত রাজা বা প্রধান বলিয়া নির্বাচিত ব্যক্তির সংগে। এই দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকার প্রবর্তিত হয়। সরকারী চুক্তির দ্বারা মানুষ কিছু পরিমাণ স্বাভাবিক অধিকার সরকারকে সমর্পণ করিয়াছিল এই উদ্দেশ্যে যে, যাহাতে অবশিষ্ট স্বাভাবিক অধিকার, বিশেষ করিয়া জীবনের অধিকার, কিছু পরিমাণ স্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হবসের ন্যায় লকের ধারণায় সরকার (রাজা) চুক্তির উর্ধ্বে নহে। সরকার যদি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করে তাহা হইলে চুক্তি ভংগ করা হইবে এবং জনসাধারণের পক্ষে সরকারের পরিবর্তন করার পথে আইনসংগত কোন বাধা থাকিবে না। লক ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক।

তৃতীয়ত, লক রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন ; হবস্ কিন্তু তাহা করেন নাই। রাষ্ট্রের ধ্বংস ব্যতিরেকেও সরকারের পরিবর্তন ঘটিতে পারে ইহা হবসের নিকট প্রতীয়মান হয় নাই। তবে লক আইনগত সার্বভৌমিকতাকে কতকটা উপেক্ষা করিয়াছেন। জনমত বা সাধারণের ইচ্ছাকেই একমাত্র সার্বভৌম বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা, আইনগত সার্বভৌমিকতা নহে। অপরদিকে হবস্ শুধু আইনসংগত সার্বভৌমিকতা লইয়াই চিন্তা করিয়াছেন, রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।.... এবং ৬৭-৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।]

4. Critically examine the main features of the Social Contract Theory of Hobbes and Locke. (B. U. 1961)

[পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরের ইংগিত এবং ৬৭-৭৪ পৃষ্ঠা দেখ।]

5. Explain how Rousseau in his Theory of Social Contract seeks to combine the theories of Hobbes and Locke. (C. U. 1951, 1961)

[ইংগিত : রুশোর মতবাদের মধ্যে হবস্ ও লক উভয়েরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। হবসের মত রুশোর মতে চুক্তি হইয়াছিল একটি এবং এই চুক্তিতে সরকার কোন অংশ গ্রহণ করে নাই। আবার হবসের মত রুশোর মতে, মনুষ্যসম্প্রদায় চুক্তি করিয়া সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিল। তবে হবস্-কল্পিত চুক্তির মত কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ক্ষমতা সমর্পিত হয় নাই ; ইহা সমর্পিত হইয়াছিল চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজের বা সার্বভৌম জনসাধারণের হস্তে। রুশোর ভাষায় বলিতে গেলে, প্রত্যেকে "তাহার নিজস্ব সত্তা ও সকল ক্ষমতা সাধারণের ইচ্ছার চূড়ান্ত নির্দেশের অধীনে সমর্পণ করিয়াছিল।" জনসাধারণের সার্বভৌমিকতার ধারণা সম্পর্কে রুশো হবসের নহে, লকের মতবাদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তবে লকের মতে, জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা সকল সময়ই প্রযুক্ত হয় না, কিন্তু রুশোর মতে জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতা সকল সময়ই প্রয়োগ করিয়া থাকে। অপরদিকে, রুশো হবসের সংগে একমত যে, সার্বভৌম ক্ষমতা চরম এবং উহাকে বিভক্ত বা হস্তান্তরিত করা যায় না।.... এবং ৬৮-৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

6. Discuss the points of agreement and difference between Hobbes and Rousseau and expounders of the Social Contract Theory. (C. U. 1959)

[পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরের ইংগিত এবং ৬৭-৭০, ৭৪-৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

7. Discuss the practical importance of the Social Contract Theory in actual political development. (C. U. 1949) (৮০-৮১ পৃষ্ঠা)

8. "The accepted Theory of the origin of the State is the Historical or Evolutionary Theory." (C. U. 1952) (৮২-৮৮ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ

(THEORIES OF THE NATURE OF THE STATE)

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতবাদগুলির কয়েকটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি উভয়ই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে-সকল মতবাদ শুধু রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে এবং যে-সকল মতবাদ উৎপত্তি ও প্রকৃতি উভয়ই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সেই মতবাদগুলিই আলোচিত হইবে যাহারা শুধু রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। অবশ্য এই গোত্রীয় সকল মতবাদই আলোচনা সম্ভব হইবে না; মাত্র গুরুত্বপূর্ণ মতবাদগুলিই আলোচিত হইবে।

আইনমূলক মতবাদ (The Juristic Theory of the State) : কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শুধু আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রকে দেখার ফলে এই মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র একটি আইনমূলক ব্যক্তি (legal person) বা আইনমূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই নহে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য আইন প্রণয়ন এবং আইন প্রবর্তন করা এবং আইনসংগত অধিকারের সংরক্ষণ করা। রাষ্ট্রকে আইনমূলক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরা যায় বলিয়া কল্পনা করা হয় যে, রাষ্ট্রের একটি ইচ্ছা আছে, অধিকার ও স্বার্থ আছে। এই ইচ্ছা, অধিকার ও স্বার্থের সহিত রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তির ইচ্ছা, অধিকার ও স্বার্থের কোন গভীর সম্পর্ক নাই। রাষ্ট্রের ইচ্ছা হইল সমষ্টির ইচ্ছা, রাষ্ট্রের অধিকার সমষ্টির অধিকার এবং রাষ্ট্রের স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থ। ব্যক্তির ইচ্ছা, ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থের সহিত ইহাদের সমতা এবং সংগতি নাও থাকিতে পারে। রাষ্ট্রকে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনা করা যায়। যৌথ প্রতিষ্ঠান শুধু বর্তমানের স্বার্থেই পরিচালিত হয় না; ভাবীকালের প্রতিও ইহার সমান কর্তব্য রহিয়াছে। সুতরাং প্রয়োজন হইলে সমষ্টির জন্য ব্যক্তির এবং ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করিতে হইবে—ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিতে হইবে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র তাহাই করে।

আইনমূলক মতবাদ রাষ্ট্রকে আইনের দৃষ্টিতে দেখার ফল

এই মতবাদে রাষ্ট্রের ইচ্ছা, অধিকার ও স্বার্থের কল্পনা করা হয়

রাষ্ট্র ব্যক্তির ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিতে পারে

রাষ্ট্র আইনসংগত অধিকার ও কর্তব্যের সমষ্টি বলিয়া এই মতবাদে রাষ্ট্রকে আইনসংগত ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলিয়া ধরা হয়। ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলিয়া

রাষ্ট্র ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে, বিচারালয়ে অভিযোক্তা ও অভিযুক্তের স্থানাধিকার করে, বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা করে, ইত্যাদি। রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান যেহেতু ইহার আইনসংগত অধিকার ও কর্তব্য অপর কোন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত হয় নাই।

রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান

জৈব মতবাদ (The Organismic Theory of the State)ঃ

জৈব মতবাদের সমর্থকগণ জীববিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখার চেষ্টা করিয়াছেন। এই মতবাদে দেখান হয় যে, জীবদেহের বিভিন্ন অংশের সহিত জীবের যেরূপ সম্পর্ক, রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রেরও সেইরূপ সম্পর্ক। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ যেরূপ পরস্পরের এবং সমগ্র জীবদেহের উপর নির্ভরশীল, তাহাদের যেরূপ কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই—তেমনি রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তি পরস্পরের এবং রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল তাহাদেরও পৃথক সত্তা বলিয়া কিছু নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রাণীর প্রকৃতিরই অনুরূপ এবং রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা কোষ বলিয়া গণ্য করা চলে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, জীবদেহ যেরূপ কোষের সমবায়ে সৃষ্ট হয় রাষ্ট্রও সেইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট হয় এবং জীবের কোন অংগ ও সমগ্র জীবের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক, বৃক্ষপত্রের সহিত বৃক্ষের যেরূপ সম্পর্ক—ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রেরও সেইরূপ সম্পর্ক।*

এই মতবাদের মূল বক্তব্য রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রাণীর প্রকৃতির অনুরূপ

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রাণী ও রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনাকে আরও এক স্তর উপরে উঠাইয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের প্রকৃতি শুধু প্রাণিদেহের অনুরূপ নহে, রাষ্ট্র একটি জীবন্ত সামাজিক প্রাণী—প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র নহে। রাষ্ট্রের মধ্যে জীবের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের —যথা জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, মৃত্যু প্রভৃতির সন্ধান মিলে। রাষ্ট্র সামাজিক প্রাণী বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ ও জৈবিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে একজাতীয়। জৈব মতবাদ এইরূপ চরম রূপ গ্রহণ করিয়াছিল ব্লুন্টস্‌লি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের হস্তে।

অনেকে রাষ্ট্রকে জীবন্ত সামাজিক প্রাণী বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হইতেই জৈব মতবাদের একরূপ সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো রাষ্ট্রকে মানুষের সহিত তুলনা করিয়া উভয়ের কার্যাবলীর মধ্যে সংগতির নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রের গঠন ব্যক্তির গঠনের অনুরূপ হইলে রাষ্ট্র সংগঠিত হয়। এ্যারিষ্টটলও এইরূপ জৈব ধারণার অনুবর্তী ছিলেন। তাঁহার মতে, দেহচ্যুত হস্ত যেমন হস্ত নহে, তেমনি রাষ্ট্র-বহির্ভূত ব্যক্তিও ব্যক্তি নহে—কারণ উভয়েই

জৈব মতবাদের সন্ধান রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হইতেই পাওয়া যায়

* "...as is the relation of the hand to the bod ,or the leaf to the tree, so is the relation of man to society." Leacock

নিরর্থক।* প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের পর রোমক দার্শনিক সিসেরো (Cicero) এবং মধ্যযুগের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবীর সলস্‌বেরির জন (John of Salisbury), মারসিগ্‌লিও (Marsiglio of Padua) প্রভৃতি রাষ্ট্র ও প্রাণিদেহের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। তারপর হবস্‌ ও রুশোর লেখায় এই মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। রুশো আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের হৃদয় এবং শাসনক্ষমতাকে রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

রুশো পর্যন্ত জৈব মতবাদ সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই

বলা যায়, রুশোর সময় পর্যন্ত জৈব মতবাদ সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই। কারণ, এই সময় পর্যন্ত দার্শনিকগণ প্রধানত রাষ্ট্র ও জীবের মধ্যে এইরূপ বাহ্য সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন যাহার উপর বৈজ্ঞানিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। উপরন্তু, জৈব মতবাদের অবতারণাও বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এবং বিবর্তনবাদের উদ্ভবের ফলে জৈব মতবাদ প্রবল হইয়া উঠে

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই কিন্তু জৈব মতবাদ বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যার ফলে ইহা একটি সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। ইহার কারণ হইল সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং বিবর্তনবাদের উদ্ভব। সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রকে চুক্তির দ্বারা সংগঠিত একটি কৃত্রিম সংগঠন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। যে-সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রকে কৃত্রিম সংগঠন হিসাবে দেখিতেন না তাঁহারা সাধারণভাবে রাষ্ট্রকে ক্রমবিকশিত সংগঠন বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বিবর্তনবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাষ্ট্র ও প্রাণিদেহের মধ্যে নানারূপ কল্পিত ও প্রকৃত সাদৃশ্য বর্ণনার দ্বারা এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলেন যে, রাষ্ট্র একটি জীবন্ত প্রাণী—প্রাণহীন যন্ত্র বা চুক্তিগত সংগঠন নহে। এইভাবে বর্তমানে যাহাকে জৈব মতবাদ বলা হয় তাহার উদ্ভব হইল। এক সময় জৈব মতবাদ এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রায় জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল বলা চলে।

এক সময় সমগ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল

জৈব মতবাদের পরিস্ফুটন প্রসংগে অন্তত দুইজন দার্শনিকের নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইঁহারা হইলেন জার্মান দার্শনিক ব্লুণ্টস্‌লি এবং ইংরাজ চিন্তাবীর হার্বার্ট স্পেন্‌সার। বলা যায় যে, ব্লুণ্টস্‌লির হস্তেই জৈব মতবাদ পূর্ণ ও চরম রূপ গ্রহণ করে। ব্লুণ্টস্‌লির মতে, রাষ্ট্র মানবের প্রতিমূর্তি। তিনি বলেন যে, কোন তৈলচিত্র যেমন শুধু কয়েক ফোঁটা তৈলের সমষ্টি অপেক্ষা আরও কিছু, কোন মর্মর মূর্তি যেমন কয়েকটি মর্মর

জৈব মতবাদকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করেন ব্লুণ্টস্‌লি ও হার্বার্ট স্পেন্‌সার

* "..a hand is to be defined by its purpose—that of grasping—which it can only perform when joined to a living body. In like manner all individual cannot fulfil his purpose unless he is a part of a State." Bertrand Russel, Aristotle's Politics

প্রস্তরের টুকরার সমষ্টি অপেক্ষাও অধিক....তেমনি রাষ্ট্র কয়েকটি বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি ছাড়া আরও কিছু। অর্থাৎ, রাষ্ট্র অন্যতম প্রাণবন্ত জীব, নিয়মশৃংখলার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান মাত্র নহে। এই জীববিজ্ঞানমূলক সাদৃশ্য বর্ণনায় আরও অগ্রসর হইয়া ব্লুণ্টস্‌লি বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের মধ্যে পুরুষের প্রকৃতিরই সন্ধান পাওয়া যায়।

ব্লুণ্টস্‌লি

হার্বার্ট স্পেন্‌সারই রাষ্ট্রের জৈব মতবাদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কথার অবশ্য এই অর্থ নয় যে, তিনি বিজ্ঞানের মাধ্যমে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বরং ঘটনাটি সম্পূর্ণ ইহার বিপরীত। বার্কারের মতে, স্পেন্‌সারের কয়েকটি রাষ্ট্রনৈতিক পূর্বধারণা (political preconceptions) ছিল, এবং তিনি এই সকল পূর্বধারণাকে মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকল সম্ভাব্য উপমা এবং সাদৃশ্য আহরণ করিয়াছিলেন। এইভাবে বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হইয়া স্পেন্‌সার রাষ্ট্র সম্বন্ধে জৈব ও বিবর্তনমূলক ধারণায় উপস্থিত হন।

হার্বার্ট স্পেন্‌সার

সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধেই স্পেন্‌সারের ধারণা ছিল বিবর্তনমূলক। তাঁহার মতে, জীবদেহ ও সমাজদেহ—উভয়েই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে জীবন স্বরু করে। তাহার পর একই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উভয়েই বিবর্তিত হয়। বিবর্তনের বিশেষ এক স্তরে আসিলে তাহাদের গঠন জটিল হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্যের সরলতা থাকে না বটে, কিন্তু সাদৃশ্য নির্দেশ করা কঠিন হয় না। বিবর্তনের সূত্রপাত হইতে আজ পর্যন্ত যে-কোন স্তরে জীবদেহ ও সমাজদেহের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের সমতার সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নতন জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য যেমন উদর-বৃত্তি, আদিম মানুষেরও তেমনি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যুদ্ধ-বৃত্তি। সমাজ-বিবর্তনের সংগে সংগে অংগ-প্রত্যংগের মধ্যে কর্মবিভাগও লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য

জীবদেহ ও সমাজদেহ—উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিবর্তনের সকল স্তরেই রহিয়াছে। "হস্ত যেরূপ বাহুর উপর নির্ভরশীল এবং বাহু যেরূপ শরীর ও মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল, সমাজদেহের বিভিন্ন অংশও সেইরূপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।"*

স্পেন্‌সার সমাজ ও প্রাণীর মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্যও বর্ণনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রের মধ্যে সরকার বিভিন্ন ব্যক্তির কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া ইহা প্রাণীর নিয়মিতকরণ-পদ্ধতির (regulating system) অনুরূপ।

গঠনগত সাদৃশ্য

* "....Just as the hand depends on the arm and the arm upon the body and the head, so do the parts of the social organism depend on each other."

এইভাবে রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য বর্ণনার দ্বারা স্পেন্সার রাষ্ট্র যে একটি জীবন্ত প্রাণী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহিয়াছেন। অবশ্য, রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে যে-বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তাহা সম্পূর্ণভাবে স্পেন্সারের লক্ষ্য এড়াইয়া যায় নাই। বস্তুত, এই বৈসাদৃশ্যের উপর তিনি তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ জৈব মতবাদের অন্যতম অস্বীকার মাত্র।

স্পেন্সারের মতবাদের ত্রুটি

সমালোচনা: জৈব মতবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া অধ্যাপক গার্ণার বলিয়াছিলেন, যদি এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হয় যে সমাজের সভ্যরা ব্যক্তিগত-ভাবে সমগ্র বা সমাজের উপর নির্ভরশীল এবং সমাজও ইহার অংশ বা ব্যক্তিসমূহের উপর নির্ভরশীল তবে এই মতবাদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিপূর্ণ সমালোচনার অবতারণা করা যায় না। বস্তুত, সাদৃশ্য এমনকি বর্ণনার দিক দিয়া দেখিলেও অনেকদূর পর্যন্ত ইহার কোন যুক্তিসংগত বিরোধিতা করা যায় না। কারণ, ইহা অনস্বীকার্য যে প্রাণীর গঠন ও কার্যাবলী এবং রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যাবলীর মধ্যে কিছু সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা অযৌক্তিক। সাদৃশ্য বর্ণনা দ্বারা অভিন্নতা প্রমাণ করিতে হইলে সকল দিকেই সাদৃশ্যের নির্দেশ করিতে হইবে এবং দেখাইতে হইবে যে সাদৃশ্য প্রকৃতপক্ষেই মূলগত—উপরিতলগত নহে। জৈব মতবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা পারে না। ইহা এইরূপ সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে যাহা সম্পূর্ণ উপরিতলগত এবং সকল ক্ষেত্রে ইহা সাদৃশ্যের নির্দেশও করিতে পারে না—পারা সম্ভবও নহে।

বহুদূর পর্যন্ত জৈব মতবাদের যুক্তিসংগত বিরোধিতা করা যায় না।

কিন্তু উপরিতলগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা অযৌক্তিক :

ব্যাখ্যা করিয়া ইহা সহজেই দেখাইতে পারা যায় যে রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তি জীবদেহের কোষের সাদৃশ্য নহে। ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ব আছে, ইচ্ছা আছে এবং এইরূপ অনেক কার্য ও স্বার্থ আছে যাহা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। অপরদিকে, জীবদেহের কোষের কোন স্বতন্ত্র জীবন নাই, ইচ্ছা নাই এবং সমগ্র জীবের অস্তিত্ব বজায় রাখা ছাড়া ইহার আর কোন উদ্দেশ্য বা কার্য নাই। ব্যক্তিকে সমাজ বা রাষ্ট্র হইতে বিচ্যুত করিলেও সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কোষকে জীবদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে সংগে সংগেই তাহা বিনষ্ট হয়।

১। রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তি জীবদেহের কোষের সাদৃশ্য নহে

কোন কোষের পক্ষে একসংগে দুইটি জীবদেহের অংগীভূত হওয়া অসম্ভব ; কিন্তু কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক সংগঠনের সভ্য হইতে পারে। প্রত্যেক জীবদেহ প্রাণ

ও বৈশিষ্ট্যসমূহ লাভ করে পূর্ববর্তী কোন জীবদেহ হইতে। রাষ্ট্রের বেলায় কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় আপনা হইতেই। জীবের জন্মপদ্ধতির সহিত রাষ্ট্রের জন্মবৃত্তান্তের কোন সংগতি নাই। জেলিনেক প্রমাণ করিয়াছেন যে অনেক রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে শুধু তরবারির দ্বারা, জীবের জন্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া নহে। উপরন্তু, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু যেরূপ প্রাণিজীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, রাষ্ট্রজীবনের সহিত সেইরূপ নহে। রাষ্ট্রের ক্ষয় ও মৃত্যু না-ও হইতে পারে।

২। রাষ্ট্র ও প্রাণিদেহের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যও রহিয়াছে

পরিশেষে বলা যায় যে, জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের উপর বিশেষ আলোকপাত করে না। ইহা হইতে আমরা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের গণ্ডি নির্ধারণ করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জৈব মতবাদকে তাঁহাদের বিভিন্ন মতবাদের সমর্থনে ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার ইহাকে তাঁহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রের কার্যাবলী হইবে সংখ্যায় ন্যূনতম। রাষ্ট্র মাত্র শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করিবে এবং শঠতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবে। অপরদিকে, ব্লুণ্টস্‌লি প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে প্রাণী বলিয়া কল্পনা করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে কোনরূপে গণ্ডি দিয়া সংকুচিত করা চলিবে না। ইহার ফলে রাষ্ট্র সর্বময় ও সর্বাত্মক বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধে আদর্শবাদ জন্মগ্রহণ করিল। এইভাবে জৈব মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হইতে চরম সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থনে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩। জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের উপর আলোকসম্পাত করে না

আদর্শবাদ জৈব মতবাদেরই ফল

উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য অধ্যাপক গেটেল বলেন, যদিও রাষ্ট্রজীবন ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবুও জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য নির্দেশ নহে।* অধ্যাপক হবহাউসের (**L. T. Hobhouse**) মতে, রাষ্ট্রকে প্রাণী বলিয়া কল্পনা করা অর্থহীন। জৈব মতবাদের উপযৌক্তিকতা সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করা চলে না যে, ইহার কিছু তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইহার তত্ত্বগত মূল্য হইল, ইহা রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের মূলগত ঐক্যের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। ইতিহাসের দিক দিয়া এই মতবাদ রাষ্ট্র বিবর্তনের ফলে স্বষ্ট ইহা প্রচার করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মতবাদ যে, রাষ্ট্র কৃত্রিম

উপসংহার

জৈব মতবাদের তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক মূল্য

* "....the organismic theory is neither a satisfactory explanation of the nature of the State nor a trustworthy guide to state activity."

প্রতিষ্ঠান তাহার বিরোধিতা করিয়াছে। ইহার ফলে তৎকালীন প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল, সমাজে ভাঙনের পথ রুদ্ধ হইয়া সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অংগাংগি সম্বন্ধের নির্দেশই জৈব মতবাদের শ্রেষ্ঠ দান। জৈব মতবাদের প্রধান দুর্বলতা—ভ্রান্ত বা উপরিতলগত সাদৃশ্যের উপর ইহার নির্ভরশীলতা—ইহার গুরুত্বকে অনেকাংশে লঘু করিয়াছে। এই কারণে জেলিনেক বলেন, আমাদের পক্ষে মতবাদটিকে সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যাগ করা উচিত।

সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অংগাংগি সম্বন্ধ নির্দেশ এই মতবাদের শ্রেষ্ঠ দান

বস্তুত, এই মতবাদ বর্তমানে পরিত্যক্তই হইয়াছে। কোকার বলেন, বর্তমানে ইহার অস্তিত্বের সন্ধান একমাত্র হেগেলীয় (Hegel) দর্শনেই পাওয়া যাইবে যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিজের জন্যই, ইহার বিবর্তন ইহার নিজের দ্বারাই নির্ধারিত হয়, ইহার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং সকল অংশই জাতীয় সমষ্টিগত জীবনের উপর নির্ভরশীল।

বর্তমানে ইহার অস্তিত্ব একরূপ নাই বলিলেই চলে

আদর্শবাদ (Idealistic Theory of the State) : আদর্শবাদ হইল রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব বা মতবাদ। ইহাকে চরম মতবাদ (Absolute Theory) এবং আধ্যাত্মবাদ (Metaphysical Theory) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। জোডের (C. E. M. Joad) মতে, এই মতবাদের উদ্ভবের সন্ধান পাওয়া যায় রাষ্ট্র ও মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকদের বিশেষ করিয়া প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের ধারণার মধ্যে। প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল রাষ্ট্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করিয়াছিলেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই।* মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই দুই দার্শনিকের ধারণা ছিল যে, মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীব। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীব বলিয়া একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের মধ্যেই সে তাহার জীবনকে সুন্দর করিয়া, সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

প্রাচীন গ্রীক ধারণার মধ্যেই আদর্শবাদের সন্ধান পাওয়া যায়

গার্ণার বলেন, উপরি-উক্ত অখণ্ডনীয় মতবাদ হইতে নূতন এক রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের উদ্ভব হইল যাহা রাষ্ট্রকে আদর্শের দৃষ্টিতে দেখিল এবং ইহাতে প্রায় দেবত্ব আরোপ করিয়া ইহার স্তবস্তুতি সুরু করিল। এই স্তবস্তুতিকে এইভাবে বর্ণনা করা যায়: রাষ্ট্রের সার্থকতা আপনার মধ্যেই নিহিত, ইহা মানুষের স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও চূড়ান্ত সংগঠন। পরিণতিতে ইহা চরম ও সর্বাত্মক; ইহা কোন অন্যায় করিতে পারে না; ইহা ভাল-মন্দ—যাহাই হউক না কেন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ব্যক্তির পক্ষে

আদর্শবাদের সংক্ষিপ্তসার

* ৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

অবশ্য কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধাচরণ বা ইহার আজ্ঞাপালনে অস্বীকার করা অযৌক্তিক ও অন্যায়।

এইভাবে রাষ্ট্রকে উচ্চ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইল এবং রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তিকে আজ্ঞা দেওয়া হইল বেদীমূলে প্রণাম করিতে এবং বেদীতে অধিষ্ঠিত দেবতাকে পূজা করিতে। দেবত্ব আরোপের ফলে হেগেলের ভাষায় রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইল, "অন্যতম আত্মসচেতন নৈতিক বস্তু এবং আত্মসচেতনা-সম্পন্ন আত্মোপলব্ধিকারী ব্যক্তি।"* এই অতি-মানবীয় ব্যক্তি বা বস্তুর স্থান নির্দিষ্ট হইল সংগঠিত জনসমাজের উপরে। প্রচার করা হইতে লাগিল যে, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের নিজস্ব ইচ্ছা আছে, অধিকার আছে, স্বার্থ আছে, এমনকি নির্দিষ্ট নৈতিক মানও আছে। এই ইচ্ছা, অধিকার, স্বার্থ ও নৈতিক মানের সহিত ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রভৃতির সংগতি নাও থাকিতে পারে। যদি না-থাকে তবে বুঝিতে হইবে, ব্যক্তি তাহার অপ্রকৃত ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে—কারণ রাষ্ট্রের ইচ্ছা হইল রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়। এইভাবে ব্যক্তির প্রকৃত ও অপ্রকৃত ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করিয়া রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হইল, রাষ্ট্রে দেবত্ব আরোপ করা হইল—গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের মত রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের স্বাভাবিক ও 'প্রয়োজনীয়' অধিকার প্রদান করা হইল।** আদর্শবাদী দার্শনিকের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র দেবতাই সভ্যতা ও প্রগতির মূলসূত্র, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ নহে।

আদর্শবাদী হেগেলের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের ইচ্ছা আছে—ইহা রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়

আদর্শবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ আদর্শবাদের উৎসের সন্ধান গ্রীক রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে পাওয়া গেলেও ইহা রূপগ্রহণ করে জার্মান দার্শনিকগণের হস্তে; এবং অনেকের মতে, এই জার্মান দার্শনিকগণের মধ্যে কান্তকেই (Immanuel Kant) আদর্শবাদের জনক বলিয়া অভিহিত করা যায়। কান্ত রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে ঐশ্বরিক অবদান বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্র কোন ভুল করিতে পারে না এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ঐশ্বরিক অবদান বলিয়া ইহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা অন্যতম পবিত্র কর্তব্য।

কান্তকে অনেকে আদর্শবাদের জনক বলিয়া অভিহিত করেন

কান্তের পর তাঁহার শিষ্য হেগেলের হস্তে আসিয়া আদর্শবাদ চরম পরিণতি লাভ করে। বস্তুত, জার্মান আদর্শবাদ হেগেলের নামের সহিত বিশেষভাবে জড়িত এবং অনেকে হেগেলকেই, কান্তকে নহে, আদর্শবাদের জনক বলিয়া গণ্য করেন। জোড বলেন, ব্যক্তির প্রকৃত ব্যক্তিত্বের স্রষ্টা ও সংরক্ষক হিসাবে রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে-ধারণা

আদর্শবাদ হেগেলের হস্তে চরম পরিণতি লাভ করে

* "...a self-conscious ethical substance and a self-knowing and self-actualising individual."

** "Every beast is driven to the pasture with blows"...similarly "only force will compel mankind to act for their own good." Heraclitus

তাহা হেগেলীয় দর্শনেই পরিস্ফুট হয়। হেগেলের মতে, সমাজে বাস করিয়া মানুষ যে-স্বাধীনতা ভোগ করে তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। রাষ্ট্রের অধীনে বাস করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মানুষ এই স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে না। ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধিতে রাষ্ট্রই এই অদ্বিতীয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে বলিয়া ইহা প্রকৃত ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। রাষ্ট্রের এই ইচ্ছা রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়। ইহাকে সাধারণের ইচ্ছা (General Will) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের কার্যাবলী এই সাধারণের ইচ্ছারই প্রকাশ বলিয়া ইহা সকল সময়ে আলোচনার উর্ধ্বে। সাধারণের ইচ্ছার সহিত ব্যক্তির ইচ্ছার সংঘর্ষ বাধিলে ব্যক্তির ইচ্ছাকে পরিবর্তিত করিতে হইবে, কারণ সাধারণের ইচ্ছা সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়।

রাষ্ট্র সাধারণের ইচ্ছার ভাণ্ডার

রাষ্ট্রকে এইভাবে সাধারণের ইচ্ছার ভাণ্ডার বলিয়া কল্পনা করিলে সহজেই ধারণা করা যায় যে, রাষ্ট্রের সার্থকতা তাহার আপনার মধ্যেই নিহিত এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তির জীবনের উপর পূর্ণভাবে পরিব্যাপ্ত। ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে চরম মতবাদ। রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে বলি দেওয়াই এই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে, হেগেলীয় দর্শনে ইহা এই রূপই গ্রহণ করিয়াছে। হেগেলীয় রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঐশ্বরিক অবদান —"বিশ্বে ঈশ্বরের পদক্ষেপ।"*

রাষ্ট্রের সার্থকতা আপনার মধ্যেই নিহিত

"বিশ্বে ঈশ্বরের পদক্ষেপ"

হেগেলের পর জার্মান দার্শনিকগণ আদর্শবাদকে আরও চরম করিয়া তুলিয়া ইহাকে যুদ্ধবাদে (Militarism) পরিণত করিলেন। ট্রিটস্‌কে (Treitschke) মেকিয়াভেলির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন যে, রাষ্ট্র শক্তিরই প্রতীক এবং সকলকে নির্দেশ দিলেন এই শক্তির পূজা করিতে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে ট্রিটস্‌কে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রত্ব তাহার পাপেরই প্রতীক। সুতরাং রাষ্ট্রকে বৃহৎ হইতে হইবে। বৃহৎ হওয়ার জন্য প্রয়োজন যুদ্ধের। অতএব, যুদ্ধ অন্যায় নয়; বরং ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে মহান ও আবশ্যিক কর্তব্য। অনেকের মতে, ট্রিটস্‌কে ও তাঁহার অনুবর্তিগণের এইরূপ প্রচারের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

জার্মান দার্শনিকগণ দ্বারা পরিকল্পিত আদর্শবাদ ইংরাজ আদর্শবাদিগণের হস্তে আসিয়া সামান্য পরিবর্তিত হয়। ইংরাজ আদর্শবাদিগণের মধ্যে ব্রাড্‌লি (Frances Herbert Bradley), গ্রীণ (T. H. Green) এবং বোসানকেতের (Bernard Bosanquet) নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের কেহই ট্রিটস্‌কের দর্শনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন নাই। গ্রীণ আবার হেগেলকেই সমর্থন করিতে পারেন নাই। গ্রীণের মতে, ব্যক্তির কতকগুলি মৌলিক অধিকার রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে জীবনের অধিকার হইল প্রাথমিক। ব্যক্তির

ইংরাজ আদর্শবাদিগণ

* "March of God on earth."

জীবনের অধিকার আছে বলিয়া ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের যুদ্ধের সময়ও পূর্ণ ও অব্যাহত কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বেরও সীমা আছে।

ডাঃ বোসানকেতকেও হেগেলের প্রকৃত শিষ্য বলিয়া অভিহিত করা যায় না। বোসানকেতের দর্শনে হেগেল অপেক্ষা রুশোর প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার দার্শনিক ধারণায় রাষ্ট্র চরম বলিয়া গৃহীত হইলেও তিনি রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও কর্তৃত্বের সীমানির্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ব্যক্তির বিকাশের পথে যে-সকল বাধা আছে রাষ্ট্র তাহা অপসারিত করিবে; রাষ্ট্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ গড়িয়া তুলিবে—ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ তাঁহার দর্শনে স্থান নাই; রাষ্ট্র দেবতা হইলেও ব্যক্তির বলি চাহে নাই।

ডাঃ বোসানকেত

সমালোচনা: আদর্শবাদের প্রথম বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল যে, ইহা অবস্থা লইয়া আলোচনা করে না—আদর্শ বা ধারণা লইয়া আলোচনা করে। আদর্শবাদ যে-রাষ্ট্রের কল্পনা করে—অর্থাৎ, প্রত্যেকের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় ও নৈতিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র—তাহা মাটির পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কোনদিন হইতেও পারে না। ইহা কল্পিত স্বর্গরাজ্যের কল্পিত রাষ্ট্র।*

রাষ্ট্র মানুষের আবশ্যিক প্রতিষ্ঠান; আবশ্যিকভাবেই মানুষ ইহার সভ্য হয়। ইহার ভিত্তি হিসাবে ব্যক্তিসমূহের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় ও নৈতিক সহযোগিতার কল্পনা করার অর্থ হইল রাষ্ট্রকে মাত্র আদর্শের দৃষ্টিতে দেখা, বাস্তব দৃষ্টিতে নহে।

আদর্শবাদ রাষ্ট্রকে আদর্শের দৃষ্টিতে দেখে, বাস্তব দৃষ্টিতে নহে

এই আদর্শের দৃষ্টিতেই দেখা হয় বলিয়া রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়। সমালোচকগণ বলেন, ইহাও ভুল—সম্পূর্ণ ভুল। রাষ্ট্র ও সমাজ এক এবং অভিন্ন নহে। সমাজের মধ্যে আবশ্যিক সংগঠন রাষ্ট্র ছাড়াও স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত নানারূপ সংগঠন—যথা আর্থিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সংগঠন প্রভৃতি থাকে। আধুনিক কালে মানুষ উত্তরোত্তর ইহাদের সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতেছে এবং রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন হইতে ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইতেছে।

আদর্শবাদের সহিত বর্তমানের ব্যবহারিক জীবনের সংগতি নাই

বর্তমানে ব্যক্তিকে যখন কর প্রদান করিতে হয়, নির্বাচনে ভোট দিতে হয়, কিংবা জুরী বিচারে অংশগ্রহণ করিতে হয়—মাত্র তখনই সে রাষ্ট্রের সংস্রবে আসে। এ-ঘটনাগুলি ব্যক্তির জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে না। অপরদিকে, তাহার ব্যক্তিগত জীবনে শ্রমিক-সংঘ অথবা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান একটি বিশেষ স্থানাধিকার

* "The state of which it conceives...may be laid up in heaven, but it is not established on earth." Barker

করিয়া আছে। প্রতিনিয়তই তাহাকে ইহাদের দৈনন্দিন কর্মপরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং, সাধারণ নাগরিকের নিকট তাহার সংঘই রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শবাদ সমাজজীবনে এই সকল সংঘের অস্তিত্ব উপেক্ষা করিয়া কল্পনা করে যে, রাষ্ট্রই সর্বাত্মক এবং এই সংগঠন সকলের নৈতিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—রাষ্ট্রের ইচ্ছা সকলের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়। এই দিক দিয়া আদর্শবাদ বাস্তব জীবনের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে ব্যবহারিক জীবনে রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ বলিয়া কোনমতেই গ্রহণ করা চলে না।

আদর্শবাদ রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলিয়া গণ্য করে

২। আদর্শবাদ মানুষের প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করে বলিয়া ইহা আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ

দ্বিতীয়ত, আদর্শবাদে ব্যক্তির আত্মচেতনা ও বিচারশক্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ব্যক্তি যেমন তাহার চেতনা ও বিচার-শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি সে প্রবৃত্তির দ্বারাও পরিচালিত হয়। আদর্শবাদ মানুষের প্রবৃত্তির দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করে না। সুতরাং, ইহা আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ।

তৃতীয়ত, আদর্শবাদে ব্যক্তির প্রকৃত ও অপ্রকৃত ইচ্ছার মধ্যে যে-পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাও সমর্থনযোগ্য নহে। রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে সকল ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তির ইচ্ছা যদি রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায় তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি তাহার অপ্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। বলপ্রয়োগের দ্বারা ইহা তাহাকে বুঝাইতেও হইবে। সুতরাং চোরকে যখন পুলিস ধরিয়া লইয়া যায় তখন পুলিস চোরের প্রকৃত ইচ্ছার উপলব্ধিতে সহায়তা করে মাত্র। এই প্রকৃত ইচ্ছার উপলব্ধিই প্রকৃত স্বাধীনতা; সুতরাং আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে আইন ও স্বাধীনতা এক এবং অভিন্ন।

৩। আদর্শবাদ যাহাকে স্বাধীনতা বলে তাহা স্বাধীনতার অস্বীকার মাত্র

এইভাবে আইনকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া কল্পনা করিয়া আদর্শবাদে ন্যায় ও গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচারিতার সমর্থন করা হইয়াছে, ব্যক্তিসত্তার বিনাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হবহাউসের মতে, আদর্শবাদে যাহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা স্বাধীনতার অস্বীকার মাত্র।

হেগেলীয় দর্শন সম্পর্কে হবহাউস বলেন যে, রাষ্ট্র একটি কল্যাণকর সংগঠন। ইহার কল্যাণের স্থান যে-কোন ব্যক্তির কল্যাণের ঊর্ধ্বে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার সার্থকতা ইহারই মধ্যে নিহিত বলিয়া মনে করিয়া ইহাকে পূজা করিলে মিথ্যা দেবতার কল্পনা করিতে হয়।

ব্যক্তির আত্মোপ-লব্ধিতে সহায়তা করাই রাষ্ট্রের সার্থকতা

হবহাউসের ন্যায় বহু দার্শনিক এইরূপ মিথ্যা দেবতার কল্পনা করিয়া ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়ার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে, ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। ইহাতেই রাষ্ট্রের সার্থকতা।

পরিশেষে, সমাজ-সংস্কারকগণ বলেন যে আদর্শবাদ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে চায় না, সমাজের অপূর্ণ অবস্থাকেই আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতে চায়। এ্যারিষ্টটল ক্রীতদাস প্রথাকে আদর্শের রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন; গ্রীণ ধনতন্ত্রবাদকে আদর্শ বলিয়া অভিহিত করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং, সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিতে, আদর্শবাদ রক্ষণশীলতার কলাকৌশলের অন্যতম মাত্র।* ইহা সংস্কারকের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিতে চায়।

৪। আদর্শবাদ রক্ষণশীলতার অন্যতম কলাকৌশল

উপসংহার: এইভাবে আদর্শবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হইলেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, রাষ্ট্রের আদর্শগত ধারণা হিসাবে এই মতবাদের কিছু মূল্য আছে। রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির অন্ধ আনুগত্য যে কতকটা প্রয়োজনীয়, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তিকে যে কখনও কখনও আত্মোৎসর্গ করিতে হয়—তাহা সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তত্ত্বের দিক দিয়াও বলা যায়, আদর্শবাদের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় যে, রাষ্ট্রই আইনের উৎস এবং বলপ্রয়োগের দ্বারাই শেষ পর্যন্ত আইনকে বলবৎ করা হয়—তাহাও অখণ্ডনীয়। তবে, আদর্শবাদ বলপ্রয়োগকে যে নীতির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা যুক্তিসংগত নহে।

বলা যায়, আদর্শবাদের বিরুদ্ধে যে-প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে তাহা আদর্শবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যারই ফল। আদর্শবাদ যদি ট্রিটস্‌কে, প্রভৃতির হস্তে যুদ্ধবাদে পরিণত না হইত তাহা হইলে আদর্শবাদকে এত হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বোধ হয় হইত না।

আদর্শবাদের অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় মতবাদ **(Marxian Theory of the State):** মার্ক্সীয় মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হইল বলপ্রয়োগের বিশেষ প্রতিষ্ঠান। জেল পুলিস সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র আইন-আদালত সরকারী আমলা ইত্যাদির মাধ্যমে এই বলপ্রয়োগ করা হয়। দমন শুধু শারীরিকই নয়, মানসিকও বটে। উপযুক্ত ধ্যানধারণা ও মতাদর্শের প্রচারের সাহায্যেও মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করা হয়। সমাজের অভ্যন্তরে যখন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব থাকে তখনই বিরোধ বা দ্বন্দ্বকে সংযত রাখিবার জন্য বলপ্রয়োগের এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্র কোন শাশ্বত বা চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়। এমন এক সময় ছিল যখন রাষ্ট্র ছিল না। সমাজের কাজকারবার ও শৃংখলা আচার ও রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত হইত। সমাজ-বিবর্তনের যে-স্তরে উৎপাদনের উন্নতি ও শ্রমবিভাগের ফলে ব্যক্তিগত ধনগত বৈষম্য এবং মানুষে

রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের বিশেষ প্রতিনিধি

রাষ্ট্র চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়

* "Idealism is a part of the tactics of capitalism." Hobson

মানুষে ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিল সেই সময়ই উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের ।*

প্রত্যেক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে-শ্রেণী আর্থিক বলে সর্বাপেক্ষা বলীয়ান—অর্থাৎ, উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর মালিকানা যাহাদের, সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করে এবং যে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় তাহারা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়োগ করে। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যেই মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর নিকট হইতে উদ্‌বৃত্ত সময় বা মূল্য আদায় করে। সুতরাং শ্রেণীদ্বন্দ্ব রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশিত হয়। সামাজিক বিপ্লবের অর্থ দাঁড়ায় একশ্রেণী হইতে অন্য একশ্রেণীর হস্তে রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি বা ক্ষমতার হস্তান্তর।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শ্রেণী-সম্পর্ক বজায় রাখা

তাহা হইলে দেখা গেল, কোন সমাজে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল প্রচলিত শ্রেণী-সম্পর্ককে (class-relations) ঠেকাইয়া রাখা। যে শ্রেণী উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর মালিকানাস্বত্ব ভোগ করে তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যতটা শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়, ততটা শক্তিপ্রয়োগই রাষ্ট্র করে। শ্রেণীসম্পর্কের প্রকৃতি আবার বিশেষ সমাজে মানুষ যেভাবে জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন ও বণ্টন করে তাহার উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ, উৎপাদন-পদ্ধতির (mode of production) উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে নির্দিষ্ট ধরনের সমাজ ও শ্রেণীসম্পর্ক। উৎপাদন-পদ্ধতির দুইটি দিক আছে : (১) উৎপাদন-শক্তি (The Forces of Production), এবং (খ) উৎপাদন-সম্পর্ক (The Relations of Production)। উৎপাদন-শক্তি বলিতে একদিকে যেমন উৎপাদনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতিকে বুঝায়, অন্যদিকে তেমনি আবার এই যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী শ্রমিক ও তাহার দক্ষতাকে বুঝায়। প্রচলিত ধনসম্পত্তি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া মানুষে মানুষে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই হইল উৎপাদন-সম্পর্ক। এখন উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে শ্রেণী প্রতিপত্তিশালী—অর্থাৎ, যাহাদের হাতে উৎপাদন-উপকরণের উপর মালিকানা থাকে তাহারা ঐ প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্ককে প্রচলিত রাখিতে চেষ্টা করে এবং অন্যান্য শ্রেণীকে শোষণ করিতে থাকে। ইহার ফলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বাধে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ। এই দ্বন্দ্বে মালিকশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তিকে নিজস্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করে। এই দ্বন্দ্ব তীব্র হইয়া উঠে যখন উৎপাদন-শক্তির উন্নতির সংগে সংগে নূতন উৎপাদন-সম্পর্কের

শ্রেণীসম্পর্কের প্রকৃতি

* "The State has not existed from all eternity. There have been societies which have managed without it, which had no notion of the state or state power. At a definite stage of economic development, which necessarily involved the cleavage of society into classes, the state became a necessity because of this cleavage." Engels—*Origin of the Family, Private Property and the State*

প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ, পূর্বতন প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী পূর্বেকার প্রতিক্রিয়াশীল উৎপাদন-সম্পর্ককে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে বলিয়া উন্নততর উৎপাদন-শক্তি বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে না।

শ্রেণী-সম্পর্কের বিবর্তন :

সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিলে বিষয়টি সহজে উপলব্ধি করা যাইবে। আদিম যুগে মানুষ যখন বনবনান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফলমূল আহরণ এবং পশুপক্ষী ও মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত তখন উৎপাদনের উপকরণ ছিল অতি সামান্য, এবং তখন ব্যক্তিগত মালিকানাও উদ্ভূত হয় নাই। যে-সামান্য শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ হইত তাহা গোষ্ঠী বা দলের সকলেই সমভাবে ভোগ করিত—শোষণের কোন প্রকার সুযোগ বা অবকাশই ছিল না এবং বলপ্রয়োগের যন্ত্র রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। ইহার পর যখন মানুষ পশুপালন, কৃষিকার্য, ধাতুর ব্যবহার এবং উৎপাদনের কলাকৌশল শিখিল তখন শ্রমবিভাগের উন্নতির পণ্য-বিনিময় ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হইল। এখন শ্রমবিভাগের উন্নতির ফলে মানুষের পক্ষে জীবনরক্ষার প্রয়োজনের তুলনায় অধিক উৎপাদন সম্ভব হইল। ইহাতে উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের অন্যের পরিশ্রমের উদ্বৃত্তাংশ (surplus) ভোগ করিবার সুযোগ ঘটিল। মানব-ইতিহাসে প্রথম শোষণমূলক ব্যবস্থা দাস-সমাজ (Slave Society) প্রবর্তিত হইল। দাসরা পণ্যে পরিণত হইল এবং দাস-প্রভুরা (Slave Owners) দাস কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যের উদ্বৃত্তাংশ ভোগ করিতে লাগিল। এই দাস-সমাজে দাস-প্রভুরা রাষ্ট্রকে দাসদের উপর শাসন ও শোষণ করিবার জন্য ব্যবহার করে। ইহার পরবর্তী সমাজ হইল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ (Feudal Society)। এই সমাজে ভূমিদাস (serfs) সামন্ত-প্রভুর জমিতে আবদ্ধ থাকিত এবং অংশত নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কিন্তু প্রধানত সামন্তপ্রভুর জন্য কার্য করিতে বাধ্য থাকিত। ভূমিদাসের শাসন ও শোষণ এবং নিজেদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখিবার জন্যই সামন্ত-প্রভুরা রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করিত।

সমভোগী সমাজ

দাস-সমাজ

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

তারপর সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে ধনতন্ত্রের বীজ অংকুরিত হইতে থাকে ; ক্রমে পণ্যের বাজার প্রসারিত হয়, উৎপাদনের কলাকৌশলের উন্নতি হয় এবং শিল্পের আবির্ভাব হয়। এই অবস্থায় নূতন ব্যবসায়ীশ্রেণী বা বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় এবং ধনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। এখন আবার সমাজের শ্রেণীবিন্যাস পরিবর্তিত হয়। সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসের স্থলে মালিকশ্রেণী ও মজুরশ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। শ্রমিকরা আইনত স্বাধীন হইলেও তাহাদের শ্রমবিক্রয় ব্যতীত জীবিকার্জনের আর কোন উপায় থাকে না—কারণ, উৎপাদন-উপায়সমূহ মূলধন-মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যমূল্য ও শ্রমমূল্যের মধ্যে পার্থক্যের ফলে যে-উদ্বৃত্ত মূল্যের

ধনতান্ত্রিক সমাজ

(surplus) সৃষ্টি হয় তাহাই মূলধন-মালিকের আয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিকশ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবহার করে। আইনকানুন প্রধানত মালিকশ্রেণীর অনুকূলে রচিত হয়। মোটকথা, যে-প্রচলিত উৎপাদন ও সম্পত্তি ব্যবস্থায় মালিকশ্রেণী সুবিধা ভোগ করিতে সমর্থ, সেই ব্যবস্থাকে চালু রাখিবার জন্যই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা হয়।

ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি হইল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। অন্যান্য বিপ্লব হইতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য হইল এই যে, অন্যান্য বিপ্লবের মাধ্যমে এক মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণীর পরিবর্তে অন্য এক মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে কোন নূতন শোষকশ্রেণীর অভ্যুত্থান হয় না। মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান হয়। ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় উৎপাদনযন্ত্রের উপর সামাজিক কর্তৃত্ব। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই সমস্ত শ্রেণীসংগ্রামের অবসান হয় না। পরাভূত ধনিকশ্রেণী প্রমুখ সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিপ্লবকে বানচাল করিয়া দিতে চেষ্টা করে। সুতরাং সর্বহারার দল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে দমন ও বিলুপ্ত করিবার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে। যখন মালিকশ্রেণীর সম্পূর্ণরূপে বিলোপসাধন করা হয় এবং উৎপাদনের উপায়সমূহ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় তখন শ্রমিক-শ্রেণীকে 'সর্বহারা' বলা চলে না। রাষ্ট্র তখন শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের বিলুপ্তির সম্ভাবনা

রাষ্ট্রের বিলুপ্তি (withering away of the State) সম্পর্কে বলা হয় যে সমাজের বুক হইতে যতই শোষণ এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান হইতে থাকিবে, যতই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রসার ও অগ্রগতি লাভ করিবে, ততই রাষ্ট্রের পক্ষে শক্তিপ্রয়োগ এবং সামাজিক সম্পর্কে হস্তক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। অবশেষে শ্রেণীবিহীন সমাজে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র থাকে কেন

এখন প্রশ্ন করা স্বাভাবিক যে, সোবিয়েত ইউনিয়নে যদি সকল শোষণকারী শ্রেণীর অবসান হইয়া থাকে তাহা হইলে সেখানে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইতেছে না কেন? ইহার উত্তরে বলা হয়, সোবিয়েত রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত, যুদ্ধ ও গুপ্তচরের কার্যকলাপের সম্ভাবনা সকল সময়ই রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য সোবিয়েত রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

যে-সকল মতবাদ রাষ্ট্রের মাত্র প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে তাহাদের মধ্যে (ক) আইন-মূলক মতবাদ, (খ) জৈব মতবাদ, (গ) আদর্শবাদ এবং (ঘ) মার্ক্সীয় মতবাদই প্রধান।

(ক) আইনমূলক মতবাদ : রাষ্ট্রকে আইনের দৃষ্টিতে দেখার ফলেই এই মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে রাষ্ট্রকে একটি আইনমূলক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরিয়া কল্পনা করা হয় যে রাষ্ট্রের নিজস্ব ইচ্ছা, অধিকার ও স্বার্থ আছে। সুতরাং রাষ্ট্র ব্যক্তির ইচ্ছা, অধিকার ও স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত নাও হইতে পারে।

(খ) জৈব মতবাদ : রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রাণীর প্রকৃতির অনুরূপ—ইহাই জৈব মতবাদের মূল বক্তব্য। কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবার ইহা অপেক্ষা এক ধাপ উপরে উঠিয়া রাষ্ট্রকে জীবন্ত সামাজিক প্রাণী বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রাচীন রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় জৈব মতবাদের সন্ধান পাওয়া গেলেও উনবিংশ শতাব্দী হইতেই ইহা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে। এই মতবাদের প্রধান সমর্থক হিসাবে—ব্লুণ্টস্‌লি এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের নামোল্লেখ করিতে হয়। ব্লুণ্টস্‌লির মতে, রাষ্ট্র অন্যতম প্রাণবন্ত জীব, নিয়মশৃংখলার ভিত্তিতে গঠিত কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান মাত্র নহে। স্পেন্সারও রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতিগত ও গঠনগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে জীবন্ত প্রাণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সমালোচনা : বহুদূর পর্যন্ত জৈব মতবাদের যুক্তিসংগত বিরোধিতা করা যায় না কারণ রাষ্ট্র ও প্রাণীর মধ্যে গঠন ও প্রকৃতিগত বেশ কিছু সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্র ও প্রাণী অভিন্ন প্রকৃতির নহে—উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নহে। উপরন্তু, উহা রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের উপর কোন আলোকসম্পাত করে না। ফলে এই মতবাদ বর্তমানে একরূপ পরিত্যক্তই হইয়াছে।

ইতিহাসের দিক দিয়া ইহা কিন্তু একেবারে মূল্যহীন নয়। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অংগাংগি সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়া অতীতে ইহা ভাঙনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

(গ) আদর্শবাদ : আদর্শবাদ রাষ্ট্রকে আদর্শের দৃষ্টিতে দেখিয়া ইহার এইরূপ স্তবস্তুতি করে : রাষ্ট্রের সার্থকতা আপনার মধ্যেই নিহিত, ইহা মানুষের স্বাভাবিক অপরিহার্য ও চূড়ান্ত সংগঠন। রাষ্ট্র চরম ও সর্বাত্মক ; ইহা কোন অন্যায় করিতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।

আদর্শবাদ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় জার্মান রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে।

সমালোচনা : আদর্শবাদ রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করে, ইহা মানুষের প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করে ; ইহা মিথ্যা স্বাধীনতার কল্পনা করিয়া রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে বলি দিতে চাহে ; ইহা রক্ষণশীলতা সমর্থন করে। তবে রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তিকে যে কিছুটা আত্মোৎসর্গ করিতে হয় তাহাতে ভুল নাই। এই কিছুটাকে সম্পূর্ণ বলিয়া প্রচার করিয়া আদর্শবাদ বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে ; ফলে দার্শনিকের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে।

(ঘ) রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতবাদ : মার্ক্সীয় মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের বিশেষ প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র কোন চিরন্তন বা শাশ্বত প্রতিষ্ঠান নয়। এমন এক সময় ছিল যখন রাষ্ট্র ছিল না। ধনগত বৈষম্য এবং শ্রেণীসংঘর্ষের ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সমাজে শ্রেণীসম্পর্ক বজায় রাখা। শ্রেণীসম্পর্কের প্রকৃতি উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই দুইটি বিষয় পরিবর্তিত হয় বলিয়া শ্রেণীসম্পর্কও পরিবর্তিত হয়। যখন কোন শ্রেণীসম্পর্ক ছিল না তখন সমাজ ছিল সমভোগী। তারপর ক্রমে দাস-সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক

সমাজ ও ধনতান্ত্রিক সমাজ উদ্ভূত হয়। ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে আসে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলে। যেদিন পৃথিবী হইতে শোষণ ও শ্রেণীসম্পর্ক দুর হইবে সেদিন রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি ঘটিবে।

প্রশ্নোত্তর

1. "The Organismic Theory is neither a satisfactory explanation of the nature of the State nor a trustworthy guide to state activity." Elucidate. (৯৩ এবং ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা)
2. Discuss critically Idealistic Theory of the State. (৯৮-৯৯ এবং ১০১-১০৩ পৃষ্ঠা)
3. Describe briefly Marxian Theory of the State. (১০৩-১০৬ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা
(SOVEREIGNTY OF THE STATE)

রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠন হইতে পৃথক করে এবং সার্বভৌমিকতা হইল আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

এখন সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন, কারণ বিশদ আলোচনা ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংঘের সম্বন্ধ এবং রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। গেটেলের ভাষায় বলিতে পারা যায়, "সার্বভৌমিকতার ধারণাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি। ইহাই সমগ্র আইন ও সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের মূলে অবস্থিত।" এই সকল আইন ও সম্বন্ধই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অপরিহার্য।

সার্বভৌমিকতার স্বরূপ (Nature of Sovereignty) ঃ সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা আইনগত। রাষ্ট্রও আইনানুসারে সংগঠিত জনসমাজ।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা আইনগত

বার্কার বলেন, "এই আইনানুসারে সংগঠিত জনসমাজ বা রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে উদ্ভূত সমগ্র আইনসংগত দ্বন্দ্বের আইনসংগত মীমাংসার জন্য একটি চূড়ান্ত ক্ষমতা অবশ্যই থাকিবে।"* এই চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই সার্বভৌমিকতা বলা হয়। এখানে পুনরুক্তি করা যাইতে পারে

* "There *must* exist in the State, as a legal association, a power of final legal adjustment of all legal issues which arise in its ambit."

যে, ইহা হইল আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা। ষ্ট্রং (C. F. Strong) বলেন, "শব্দগত অর্থে সার্বভৌমিকতা বলিতে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইলেও, রাষ্ট্রের প্রসংগে এই শব্দের ব্যবহারে বিশেষ এক শ্রেষ্ঠত্ব—অর্থাৎ, আইন বলবৎকরণের ক্ষমতা বুঝায়।" আইন রাষ্ট্রের নিয়মাবলী মাত্র। ইহা রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও সংঘের উপর প্রযোজ্য। এককথায় রাষ্ট্রের মধ্যে আইন সর্বব্যাপী। রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংঘ আইন কি হইবে বা আইনসংগত অধিকার কি এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিতে পারে। তাই প্রয়োজন হয় একটি শক্তির যাহা এই সকল ধারণার মধ্যে সমন্বয়সাধন করিবে। এই সমন্বয়সাধন করিবার ক্ষমতাকেই সার্বভৌমিকতা বলা হয়। ইহা চূড়ান্ত, চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা। ইহার সহিত সংঘর্ষ বাধিলে ব্যক্তি বা সংঘকে তাহার ইচ্ছা পরিবর্তিত করিতে হইবে।

রাষ্ট্রের আইনগত চূড়ান্ত, চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতাই সার্বভৌমিকতা

অপ্রতিহতভাবে বিভিন্ন আইনসংগত দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার জন্য রাষ্ট্রকে শুধু আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেই চলিবে না, সর্বতোভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতেও মুক্ত হইতে হইবে। কোন জনসমাজ যদি বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তবে তাহার আইন প্রণয়ন এবং বলবৎ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে না। তখন এই চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে প্রভু-রাষ্ট্রের হস্তে এবং পরাধীন জনসমাজ বা দেশকে তখন আর রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হয় না। অতএব সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইলে, রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে, জনসমাজকে চূড়ান্ত, চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে এবং এই অধিকারী হইবার জন্য সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে—আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ও চরম ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা। সমগ্র আধুনিক রাষ্ট্রই এইরূপ সার্বভৌম রাষ্ট্র।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক—চূড়ান্ত ও চরম ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা

সার্বভৌমিকতার এই দুইটি দিক সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতাকে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছেঃ রাষ্ট্র ইহার এলাকাধীন সমগ্র ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর আদেশ জারি করে, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে আদেশ গ্রহণ করে না।"* কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার—অর্থাৎ আদেশ জারি—করে না, এবং রাষ্ট্রের এলাকাধীন ব্যক্তি ও সংঘসমূহ নিজেদের মধ্যেই অনেক সময়

আভ্যন্তরীণ সার্ব-ভৌমিকতার পর্যালোচনা

* "The State is internally supreme over the area that it controls. It issues orders to all men and associations within that area ; it receives orders from none of them."

সম্বন্ধ স্থির করিয়া লয়—তাহারা রাষ্ট্রের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। অনেক সময় আবার ইহাও দেখা যায় যে, বিভিন্ন সংঘ নিজেদের কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্র ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে না। ব্যবহারিক জীবনের এইরূপ উদাহরণ হইতে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিলে ভুল করা হইবে। রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংঘের সম্বন্ধ নির্ণয় বা কার্যক্ষেত্র নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করে না বটে, কিন্তু করিতে পারে। রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তি ও সংঘের অনেক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আছে রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে মাত্র। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে যে-কোন সময় এই সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সার্বভৌমিকতা চরম ক্ষমতা হইলেও ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই চরমতা পরিব্যাপ্ত নহে, ইহা চূড়ান্ত ক্ষেত্র—শেষ পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় মাত্র। রাষ্ট্র যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জীবনের কোন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে চায় এবং সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি তাহাতে বাধা দেয় তবেই সার্বভৌম শক্তি প্রকাশিত হইবে—তখনই মাত্র রাষ্ট্র প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইবে যে, সকল সময়ই সকল ব্যক্তি ও সংঘের ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে শেষ কথাটি বলিবার, শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার, চূড়ান্ত আদেশ জারি করিবার ক্ষমতাকেই আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলা হয়।

সার্বভৌমিকতা চূড়ান্ত ক্ষমতা মাত্র—ইহা শেষ পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়

আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার স্বরূপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আন্তর্জাতিক আইনের লেখকরা অনেক সময় বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে রাষ্ট্রের অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার ক্ষমতা হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত বুঝেন। অন্যান্য লেখকের মতে, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে এই ধারণা আপত্তিজনক, কারণ ইহার দ্বারা বুঝায় যে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অপরাপর রাষ্ট্রের এলাকাতেও প্রযোজ্য। কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অপর কোন রাষ্ট্রের এলাকাতে প্রযুক্ত হইতে পারে না; হইলে যে রাষ্ট্রের এলাকাতে প্রযুক্ত হইবে সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বিনষ্ট হইবে। সুতরাং অন্যান্য লেখক বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে শুধু স্বাধীনতা ও বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বুঝেন। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে যখন স্বাধীনতাকেই বুঝায় তখন গেটেল প্রভৃতি লেখকের মতে, 'বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা' (external sovereignty) কথাটি ব্যবহার না করিয়া 'স্বাধীনতা' (independence) শব্দটি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতাকে স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করিলে সার্বভৌমিকতা বলিতে শুধু আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বুঝায় এই আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বা চূড়ান্ত ক্ষমতার জন্যই বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বা স্বাধীনতা প্রয়োজন। গেটেলের ভাষায় বলিতে পারা যায়, "প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সেই সকল অধিকারের সমষ্টি যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্র অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ব্যবহারে নিজের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা প্রকাশিত করে।"

বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার স্বরূপ

রাষ্ট্রের যে শেষ কথাটি বলিবার, চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিবার, চূড়ান্ত আদেশ জারি করিবার শক্তি আছে অপরাপর রাষ্ট্রকে ইহা জ্ঞাত করানই—আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিতে এই সম্বন্ধে মতবিরোধ দূরিকরণই বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা। ইহাকেই আমরা স্বাধীনতা বা সর্বতোভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বলি। ইহা আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত।

বলা হইয়াছে যে, আধুনিক রাষ্ট্র সার্বভৌম রাষ্ট্র—অর্থাৎ, প্রত্যেক আধুনিক রাষ্ট্রই আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ও সম্পূর্ণভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত। অনেকের মতে, বর্তমান দিনে এই ধারণা সম্পূর্ণ তত্ত্বগত, ব্যবহারিক জীবনের সহিত ইহার কোন সংগতি নাই। ইহারা বলেন, বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে শেষ কথাটি বলিবার, চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই। অনেকে আবার আরও বলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মাত্র দুইটি ছাড়া অপর সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। এই রাষ্ট্র দুইটি হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত ইউনিয়ন। অপর সকল রাষ্ট্রের ইচ্ছা যে কার্যক্ষেত্রে এই দুই রাষ্ট্রের উপর অল্পবিস্তর নির্ভরশীল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

অনেকের মতে, সার্বভৌমিকতা বর্তমান দিনে শুধু তত্ত্বগত ধারণা মাত্র

এইভাবে যুদ্ধোত্তর যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে সন্দেহকে কেন্দ্র করিয়া যে-বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আলোচনা না করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণাই তত্ত্বগত বা আইনগত। আইনের চক্ষে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে কিনা তাহাই দেখা প্রয়োজন। আইনের দৃষ্টিতে দেখিলে অধিকাংশ রাষ্ট্রই আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতাসম্পন্ন ও স্বাধীন। যদি তাহারা অপর কোন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লইয়া থাকে তবে তাহা স্বেচ্ছাকৃত কার্য। এই নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করিলে আইনসংগতভাবে নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ মান্য করিতে বাধ্য করিতে পারে না। আন্তর্জাতিক সন্ধি, সর্ত, আইন প্রভৃতি পালন যেমন সার্বভৌমিকতাকে বিনষ্ট করে না, তেমনি স্বেচ্ছাস্বীকৃত নিয়ন্ত্রণও সার্বভৌমিকতার বিলুপ্তি ঘটায় না। যতক্ষণ আইনসংগতভাবে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করিবার কোন কর্তৃত্ব না থাকিবে, ততক্ষণ রাষ্ট্রসমূহ কার্যক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হইলেও তাহাদের সার্বভৌম বলিয়া স্বীকার করা চলিতে পারে। আজ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোবিয়েত ইউনিয়নের অপরাপর রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করিবার কোন কর্তৃত্ব আইনসংগত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং অপরাপর রাষ্ট্রও সার্বভৌম।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণাই তত্ত্বগত

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রের উপর যে-বহিঃনিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে তাহা স্বেচ্ছাস্বীকৃত ; সুতরাং রাষ্ট্রগুলি সার্বভৌম

সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sovereignty) : সার্বভৌমিকতার উপরি-উক্ত প্রকৃতি হইতে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের সন্ধানসহজেই পাওয়া যায়।

(১) পূর্ণতা বা চরমতা (Absoluteness): সার্বভৌম ক্ষমতা বা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা চরম ক্ষমতা। ইহা কোন কিছু দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। রাষ্ট্রের মধ্যে আইনানুমোদিত আর কোন ক্ষমতা থাকিতে পারে না যাহা সার্বভৌমিকতার উর্ধ্বে; রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোন বিষয়ের উদ্ভব হইতে পারে না যাহার সম্বন্ধে সার্বভৌম শক্তি ইচ্ছা প্রকাশে অসমর্থ। সার্বভৌমিকতার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, সার্বভৌমিকতা আইনসংগতভাবে সীমাবদ্ধ না হইলেও নৈতিক সূত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। স্যর হেনরী মেইনের মতে, নৈতিক প্রভাব প্রতিনিয়তই সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ব্লুণ্টস্‌লি ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বাহ্যিক দিক দিয়া অপরাপর রাষ্ট্রের অধিকার এবং আভ্যন্তরীণ দিক দিয়া ইহার নিজস্ব প্রকৃতি ও ব্যক্তিসমূহের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের চিরন্তন বিধান এবং ইতিহাসের ঘটনার নিকট রাষ্ট্র চিরদিনই দায়িত্বশীল থাকিবে।

সার্বভৌমিকতা আইনসংগতভাবে না হইলেও নৈতিক সূত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ

ঈশ্বরের বিধান ও নৈতিক সূত্র দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ কিনা তাহা আমাদের বিচার্য বিষয় নহে—কারণ সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা আইনগত, নীতিগত নহে। এই আইনের দৃষ্টিতেই দেখিলে সার্বভৌমিকতা যে সীমাবদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। বার্কারের মতে, এই সীমাবদ্ধতা হইল সার্বভৌমিকতার নিজস্ব প্রকৃতি ও কার্যপদ্ধতির জন্য।*

বার্কারের মতে, সার্বভৌমিকতা নিজস্ব প্রকৃতি ও কার্যপদ্ধতির দ্বারা সীমাবদ্ধ

প্রথমে প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সার্বভৌমিকতা হইল চূড়ান্ত কর্তৃত্ব; শেষ কথাটি বলিবার, চূড়ান্ত বিচার করিবার ক্ষমতাকেই সার্বভৌমিকতা বলা হয়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের এই শেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই বহু সমস্যার সমাধান হইয়া যায়, বহু দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া যায়। সুতরাং সার্বভৌমিকতার সীমাবদ্ধতা হইল যে, ইহা সকল বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করে না, সকল বিষয়ের মীমাংসা করে না—মাত্র চূড়ান্ত ব্যাপারেই নিজেকে প্রকাশিত করে।

দ্বিতীয়ত, কার্যপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিলে সার্বভৌমিকতা আইনমূলক বলিয়া ইহা যাহা আইনের এলাকাধীন নহে তাহার সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট নহে। বার্কারের ভাষায় বলিতে পারা যায়, সার্বভৌমিকতা হইল "আইনসংগতভাবে আইনসম্মত প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার আইনানুমোদিত ক্ষমতা।"† সুতরাং ইহা আইনের গণ্ডি দ্বারা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। সমাজের মধ্যে এমন অনেক বিষয় উদ্ভূত হয় যাহা আইনের এলাকায় পড়ে না। ফলে, তাহাদের উপর সার্ব-

আইনের গণ্ডির বাহিরের কোন ব্যাপারের মীমাংসা সার্বভৌম শক্তি দ্বারা হয় না

* Sovereignty is "limited......by its own *nature* and its own *mode of action*."

† "......it is a legal power of settling finally legal questions in a legal way."

ভৌমিকতার এক্তিয়ারও নাই। আবার অনেকের মতে, সার্বভৌমিকতা ব্যবহারিক জীবনেও সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

(২) সর্বজনীনতা (**Universality**): সার্বভৌমিকতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল সর্বজনীনতা। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে এমন কোন ব্যক্তি বা সংঘ থাকিতে পারে না, যাহা সার্বভৌম শক্তির অধীন নহে। অবশ্য, পররাষ্ট্রদূতেরা রাষ্ট্রের অধীন নন। তবে রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে যে-কোন সময় অপসারিত করিতে পারে।

সার্বভৌমিকতার সর্বজনীনতা আইনের গণ্ডি দ্বারা সীমাবদ্ধ

সর্বজনীনতা সার্বভৌমিকতার সীমাহীনতার আর একটি লক্ষণ। এই সীমাহীনতা সম্বন্ধে বলা যায় যে, সকল ব্যক্তি বা সংঘের উপর সার্বভৌমিকতার এক্তিয়ার থাকিলেও এই এক্তিয়ার আইনের গণ্ডি দ্বারা সীমাবদ্ধ। আইনানুমোদিতভাবে ছাড়া অন্যভাবে সার্বভৌম শক্তি কোন ব্যক্তি বা সংঘের উপর নিজস্ব অবাধ ইচ্ছা চাপাইয়া দিতে পারে না।

সার্বভৌমিকতা স্থায়ী হইলেও চিরস্থায়ী নহে

(৩) স্থায়িত্ব (**Permanence**): স্থায়িত্ব সার্বভৌমিকতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। যতদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকে সার্বভৌমিকতা ততদিনই স্থায়ী থাকে। রাষ্ট্রের কার্যপরিচালকগণের বা সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকারিগণের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহাতে সার্বভৌমিকতা বিলুপ্ত হয় না। যদি অবশ্য রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সংঘটিত হয় তবে সার্বভৌমিকতারও অবসান ঘটে।

জনসমাজের ঐক্যের জন্য সার্বভৌমিকতার অবিভাজ্যতা প্রয়োজন

(৪) অবিভাজ্যতা (**Indivisibility**): সার্বভৌমিকতাকে বিভক্তও করা যায় না। আইনানুসারে ঐক্যবদ্ধ জনসমাজই রাষ্ট্র। এই ঐক্যবদ্ধতার জন্য প্রয়োজন হয় সার্বভৌমিকতার ঐক্যের। সার্বভৌমিকতাকে যদি বিভক্ত করা হয় তবে জনসমাজ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া জনসমাজে পরিণত হইবে না। প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থায় চূড়ান্ত বিচারের জন্য একটি মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে। বহু কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিলে চূড়ান্ত বিচারের ক্ষমতা কাহারও হস্তে থাকিতে পারে না। ফলে সার্বভৌমিকতাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্যবহারিক জীবনে অবশ্য দেখা যায় যে, সরকারের বিভিন্ন অংগ সার্বভৌম শক্তির ব্যবহার করিতেছে; কিন্তু ইহাকে বিভক্তিকরণ বলা চলে না। ইহা শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রয়োগক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতার বণ্টন মাত্র।*

সার্বভৌমিকতার অবিভাজ্যতার বিরুদ্ধে সমালোচনা

সার্বভৌম শক্তির অবিভাজ্যতা সম্বন্ধে যে-মতবাদ সাম্প্রতিক যুগে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। এই সমালোচনা করা হইয়াছে প্রধানত আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের দৃষ্টিকোণ এবং রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংঘের স্বার্থের দিক হইতে। এ-সম্বন্ধে এই অধ্যায়েই পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

* সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থা কিন্তু সার্বভৌমিকতা বিভাজ্য, এই ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ-সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় প্রসংগে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

(৫) হস্তান্তরযোগ্যতাহীনতা (Inalienability): সার্বভৌমিকতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা হস্তান্তরযোগ্য নহে। অধিকাংশ আইনানুগের মতে, মানুষ যেমন নিজের জীবন অপরকে দান করিলে বাঁচিতে পারে না, বৃক্ষ যেমন বৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিলে বাঁচিতে পারে না তেমনি সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরিত করিলে রাষ্ট্রও বাঁচিতে পারে না। সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরিত করা রাষ্ট্রের পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল।

সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরিত করা রাষ্ট্রের পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল

'সার্বভৌমিকতাকে হস্তান্তরিত করা' বলিতে অবশ্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের কোন অংশ হস্তান্তরিত করা বা সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারীর পরিবর্তন বুঝায় না। রাষ্ট্র অনেক সময় ভূখণ্ডের অংশ হস্তান্তরিত করে বা সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারী অনেক সময় অপরের হস্তে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেয়। ইহাতে রাষ্ট্র লোপ পায় না।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরিত করা যায় কিনা, ইহা লইয়া তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। হবসের ন্যায় রাজতন্ত্রের সমর্থকগণের মতে, সার্বভৌমিকতা আদিতে জনগণের হস্তে থাকিলেও রাজার নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজার নিকট হইতে জনগণের নিকট ইহার পুনর্হস্তান্তর কোনমতেই সম্ভবপর নহে। অপরদিকে, জনগণের প্রাধান্যের সমর্থকগণের মতে, সার্বভৌমিকতা কোন পর্যায়েই হস্তান্তরযোগ্য নহে। সুতরাং জনগণ রাজাকে ব্যবহারের জন্য অস্থায়ীভাবে সার্বভৌমিকতা সমর্পণ করিয়াছে মাত্র, রাজার নিকট হস্তান্তরিত করে নাই। গার্ণার বলেন, "এই বিতর্কের মূল্য যাহাই হউক না কেন, বর্তমানে আইনানুগগণ ইহাই প্রচার করেন যে, সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরযোগ্য নহে।"

***সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদের পরিস্ফুটন* (Development of the Theory of Sovereignty):** সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের উদ্ভব ষোড়শ শতাব্দীতে হইলেও ইহার স্বরূপ প্রাচীন লেখকগণের নিকটেও অজ্ঞাত ছিল না। সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিবার কারণ হইল, মধ্যযুগ পর্যন্ত বর্তমান দিনের সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা মধ্যযুগে সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে

মধ্যযুগ ছিল সামন্তপ্রথার যুগ। এই যুগে ব্যক্তির আনুগত্য ছিল উর্ধ্বতন সামন্তের প্রতি। কেবল সামন্তপ্রধানরা রাজার প্রতি অনুগত ছিলেন। এইভাবে আনুগত্য বিভক্ত হওয়ায় সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভবের পথ সুগম হইয়া উঠিতে পারে নাই। সামন্তপ্রথার সংগে আবার ছড়াইয়া ছিল সাম্রাজ্য ও খ্রীষ্টধর্মপ্রতিষ্ঠানের (Church) পরস্পরবিরোধী শ্রেষ্ঠত্বের দাবি। এই দাবির মীমাংসা সমগ্র মধ্যযুগ ধরিয়া হয় নাই। ফলে রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায় রাষ্ট্রও সার্বভৌম হইতে পারে নাই। উপরন্তু, সাধারণের ছিল স্বাভাবিক আইনের (Natural Law) উপর বিশ্বাস। মানুষের প্রণীত আইনকে যে সকল সময় স্বাভাবিক আইনের অনুবর্তী হইতে হইবে এ-ধারণা সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভবের পথে ছিল এক বিরাট বাধাস্বরূপ। এইভাবে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও

আনুগত্য সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট না হওয়ায় ভূমিগত সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হইতে পারে নাই, ভূমিগত সার্বভৌম রাষ্ট্রেরও উদ্ভব হয় নাই।

ভূমিগত সার্বভৌমিকতার উদ্ভব

মধ্যযুগের শেষ দিকে নানা কারণে সামন্তপ্রধানরা দুর্বল হইয়া পড়ায় রাজা ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকেন এবং অবশেষে তিনি রাষ্ট্রমধ্যে সর্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সামন্তপ্রথা একরূপ ভূমিপ্রথা। রাষ্ট্রমধ্যে রাজার সর্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ভূমিগত প্রাধান্য বা ভূমিগত সার্বভৌমিকতার সূত্রপাত হইল।

অপরদিকে পোপের সহিত রাজার প্রাধান্য লইয়া যে-সংঘর্ষ বাধে তাহা লুথারের (Martin Luther) ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে নূতন রূপ গ্রহণ করিল। লুথার ইয়োরোপীয় নৃপতিগণের সহায়তায় পোপের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করিলেন। আন্দোলনের ফলে রাষ্ট্রের উপর পোপের কর্তৃত্ব কমিল, কিন্তু নৃপতিগণের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাইল। লুথার প্রচার করিয়াছিলেন, রাজা সার্বভৌম এবং রাজার প্রতি প্রজার আনুগত্য অবিভাজ্য।

জাতীয় রাষ্ট্র ও সার্বভৌমিকতা

পরে যখন পোপের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা গেল তখন নৃপতিগণ লুথারের প্রচারিত নীতির শরণ লইলেন। নৃপতিগণের এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে তাঁহাদের সপক্ষে যে-কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবিদ যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ফরাসী দার্শনিক বোদাঁই (Bodin) প্রধান। ইঁহাদের প্রচারের ফলে পোপের কর্তৃত্ব হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত জাতীয় রাষ্ট্রের (National State) উদ্ভব হইল। এই জাতীয় রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌমিকতা এবং সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্দেশ করা হইল নৃপতির মধ্যে।

বোদাঁ সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের প্রথম ব্যাখ্যাকর্তা

বোদাঁ সার্বভৌমিকতার অবস্থান নৃপতির মধ্যে নির্দেশ করিলেও সার্বভৌমিকতা যে রাষ্ট্রেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য—রাজার নহে, এ-সম্বন্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার রিপাবলিকেই (Republic) সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের প্রথম ব্যাখ্যা করা হয়। সার্বভৌমিকতাকে তিনি প্রজা ও নাগরিকগণের উপর 'রাষ্ট্রের' চরম ক্ষমতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই ক্ষমতা কোনরূপ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ নহে।* এই অর্থে সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের চরম অপরিত্যাজ্য, অবিভাজ্য এবং চিরন্তন ক্ষমতা। ইহার এলাকা রাষ্ট্রের সমগ্র ভূখণ্ড ব্যাপিয়া।

---

* "......the supreme power of the State over citizens and subjects unrestrained by law."

বোদাঁ অবধি রাষ্ট্র বর্তমান অর্থে সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম হইয়া উঠিতে পারে নাই। অন্যভাবে বলিতে গেলে, বোদাঁ আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যাহাকে 'বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা' বলে তাহার রূপদান করিতে পারেন নাই। এই দ্বিতীয় কার্যটি সমাপ্ত করিলেন ডাচ্ আন্তর্জাতিক আইনবিদ গ্রোটিয়াস (Grotius)। তিনি বলিলেন, সকল রাষ্ট্রই সমমর্যাদাসম্পন্ন ও সর্বপ্রকারে বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। গ্রোটিয়াসের এই মতবাদের ফলে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় পুরাপুরি সার্বভৌম হইয়া উঠিল।

গ্রোটিয়াস কর্তৃক বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার স্বরূপ ব্যাখ্যা ও বোদাঁর আরব্ধ কার্য সমাপ্ত

বোদাঁ ও গ্রোটিয়াসের পর হবসের হস্তে আসিয়া সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদ আরও পরিস্ফুট হইল। হবস্ এক সামাজিক চুক্তির কল্পনা করিয়া রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাকে সমর্থন করিয়া সার্বভৌমিকতার পথ আরও প্রশস্ত করেন।

হবসের পর রুশো প্রচার করিলেন যে, সার্বভৌমিকতা জনগণের—রাজার নহে। অবশ্য, এই জনগণের সার্বভৌমিকতাও চরম ও অনিয়ন্ত্রিত। ইহার ফলে জনগণের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদের উদ্ভব হইল।

রুশো ও জনগণের সার্বভৌমিকতা

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদের পরিস্ফুটনে ইতিহাসের দিক দিয়া সর্বশেষে আছেন ইংরাজ আইনবিদ জন অষ্টিন (John Austin)। ইতিহাসের দিক দিয়া সর্বশেষে হইলেও গুরুত্বের দিক দিয়া বোধ হয় সর্বাগ্রেই অষ্টিনের নামোল্লেখ করিতে হয়। অষ্টিনের হস্তেই সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা আইনসংগতভাবে বিশ্লেষিত হয় এবং ইহা পরিপূর্ণ মতবাদে পরিণত হয়। বস্তুত, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বর্তমান মতবাদকে 'অষ্টিনের মতবাদ' (Austinian Theory) বলা চলে।

অষ্টিন সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণাকে মতবাদে পরিণত করেন

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে যে-মতবাদ অষ্টিনের হস্তে আসিয়া পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করিল তাহাকে অনেক সময় পরম্পরাগত (classical or traditional) মতবাদ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এই মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল, রাষ্ট্র বহিঃনিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং রাষ্ট্রাভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব চরম ও অনিয়ন্ত্রিত। সাম্প্রতিক যুগে সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে এই পুরাতন মতবাদের বিশেষ বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচনা করিয়াছেন প্রধানত আন্তর্জাতিক মতবাদীরা এবং বহুত্ববাদী নামে অভিহিত একদল মতবাদী। আন্তর্জাতিক মতবাদিগণের মতে, রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বিশ্বশান্তির ও বিশ্বসমাজ-গঠনের পরিপন্থী। বহুত্ববাদিগণের মতে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ চরম ক্ষমতা সমাজের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং সেইজন্য ইহা সুন্দর সমাজজীবন গঠনের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে গতানুগতিক মতবাদের বিরুদ্ধে এই দুই শ্রেণীর লেখকদের সমালোচনা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে পরম্পরাগত মতবাদ ও সাম্প্রতিক যুগে ইহার সমালোচনা

সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন রূপ (Different Forms of Sovereignty)**:** সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন ব্যাখ্যা, ইহার অবস্থান নির্দেশ সম্বন্ধে মতবিরোধ প্রভৃতির ফলে 'সার্বভৌমিকতা' শব্দটি বর্তমানে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে বলা চলে। এই বিভিন্ন রূপের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা (Titular Sovereignty): নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য ইহাকে প্রকৃত সার্বভৌমিকতা হইতে পৃথক করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকৃত চরম ক্ষমতার অধিকারীকে প্রকৃত সার্বভৌম এবং যাঁহার নামে সার্বভৌম শক্তি ব্যবহৃত হয় অথচ যিনি প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহেন, তাঁহাকে নামসর্বস্ব সার্বভৌম বলা হয়। ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী নামসর্বস্ব সার্বভৌমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তাঁহাকে সার্বভৌম (Sovereign) বলিয়াই অভিহিত করা হয়। তিনি নামে মাত্র সার্বভৌম কারণ তিনি 'রাজত্ব করেন মাত্র, শাসন করেন না।' শাসন করে পার্লামেন্টের নিকটে দায়িত্বশীল মন্ত্রিমণ্ডলী। এই মন্ত্রিমণ্ডলী বা ক্যাবিনেটই প্রকৃত শাসন বা সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারী; কিন্তু আইনের চক্ষে পার্লামেন্টই সার্বভৌম।

ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী নামসর্বস্ব সার্বভৌমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ

আইনসংগত সার্বভৌমিকতা (Legal Sovereignty): এককথায় আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতাই আইনসংগত সার্বভৌমিকতা। ইহা সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আইনের ধারণা মাত্র। এই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রের মধ্যে যে-ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ আইনত চরম আদেশ জারি করিবার বা চূড়ান্ত আইন প্রণয়নের অধিকারী তাহাকেই সার্বভৌম আখ্যা দেওয়া হয়। আইনসংগত সার্বভৌমের আদেশ কেহই অমান্য করিতে পারে না; ইহা কোনমতে নৈতিক সূত্র, ধর্মীয় বাধানিষেধ বা জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। বিচারকগণ একমাত্র আইনসংগত সার্বভৌমের আইন মানিয়া লইতে বাধ্য। অন্য যে-কোন সূত্র হইতে প্রণীত আইনকে আদালত স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিতে পারে।

আইনসংগত সার্বভৌমিকতা আইনের ধারণা মাত্র

আইনানুগের মতে, আইনসংগত সার্বভৌমিকতাই প্রকৃত সার্বভৌমিকতা। বস্তুত, আইনানুগের দৃষ্টিতে আইন ছাড়া আর কোন কিছুরই গুরুত্ব নাই। সুতরাং যে-সার্বভৌমিকতা আইনানুমোদিত নহে, তাহা আইনানুগের নিকট গুরুত্বহীন।

আইনসংগত সার্বভৌমিকতার স্বরূপ সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন অষ্টিন। ইংল্যাণ্ডের উদাহরণ দিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'রাজা-সহ-পার্লামেন্টের' (King-in-Parliament) মধ্যে সার্বভৌমিকতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। 'রাজা-সহ-পার্লামেন্ট' ইংল্যাণ্ডে চরম আইন প্রণয়নের অধিকারী। সুতরাং আইনানুগের দৃষ্টিতে ইহাই সার্বভৌম।

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা (Political Sovereignty): আইনসংগত সার্বভৌমের চরম, অপ্রতিহত এবং অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা আইনের কল্পনা মাত্র। বাস্তব

জগতে ইহার সন্ধান কোথাও মিলে না। চরম স্বেচ্ছাচারী শাসককেও বিভিন্ন প্রভাবের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংল্যাণ্ডে রাজা-সহ-পার্লামেণ্ট যে-কোন আইন প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইলেও, ইহা কি এমন কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে যাহা নাগরিকগণকে পরস্পরের সর্বস্ব অপহরণের ক্ষমতা প্রদান করিবে? সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে আইনসংগত সার্বভৌমিকতার পশ্চাতে আর একপ্রকার সার্বভৌমিকতার অনুসন্ধান করিতে হয় যাহা বাস্তব জগতে কার্যকর। ডাইসির ভাষায় বলিতে পারা যায়, "আইনবিদ যাহাকে সার্বভৌম বলিয়া স্বীকার করেন তাহার পশ্চাতে আরও একটি সার্বভৌম আছে যাহাকে আইনসংগত সার্বভৌম প্রণতি না জানাইয়া পারে না।"* ইহাকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম বলা হয়। অধ্যাপক গিলক্রাইষ্টের মতে, ইহা হইল আইনের পশ্চাতে যে-সকল প্রভাব কার্য করে তাহাদের সমষ্টি।

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার গুরুত্ব

ঠিক রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলিতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত নহেন। অনেক সময় ইহাকে জনমত, অনেক সময় ইহাকে নির্বাচকগণের মত এবং অনেক সময় আবার ইহাকে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসনের প্রভাব বলিয়া ধরা হয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, জনমত গঠনকারী বিভিন্ন প্রভাব এবং নির্বাচকগণকে সংযুক্তভাবে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহা আইনানুমোদিত পদ্ধতিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে না; তবুও ইহার ইচ্ছা দ্বারাই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শক্তির নিকট আইনসংগত সার্বভৌমিকতা অল্পবিস্তর অবনত থাকে। অধ্যাপক রিচি (Ritchie), গেটেল প্রভৃতির মতে, আইনসংগত ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণই সুশাসনের প্রধান সমস্যা।**

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা অনিশ্চিত

রাষ্ট্রনৈতিক ও আইনসংগত সার্বভৌমিকতার মধ্যে সমন্বয়সাধনের সমস্যা

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে আইনসংগত ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে সমন্বয়সাধনের কোন সমস্যাই নাই। কারণ, এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় আইনসংগত সার্বভৌমিকতা ব্যবহার করে সমগ্র নাগরিক সম্প্রদায়। সুতরাং নাগরিক সম্প্রদায়ের অভিমতই আইনে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বিশেষ কোথাও প্রবর্তিত নাই। তাই সার্বভৌমিকতার এই দুই রূপের মধ্যে সমন্বয়সাধনের সমস্যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইনের দৃষ্টিতে অবশ্য সার্বভৌমিকতার এই দুই রূপের মধ্যে সংঘাত বাধিলে আইনসংগত সার্বভৌমের ইচ্ছাই বলবৎ থাকিবে, কারণ আদালতগুলি কেবলমাত্র আইনসংগত সার্বভৌমের আইনকেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

* "Behind the sovereign which the lawyer recognises, there is another sovereign to whom the legal sovereign must bow."

** "The problem of good government is largely one of the proper relation between the legal and ultimate political sovereignty." Gettell

কিন্তু আইনের অনুশাসন দ্বারা বাস্তব জীবন সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয় না। আইনসংগত সার্বভৌম প্রণীত আইন লোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানিয়া লইলেও ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, মানুষ প্রাণ দিয়াও আইনের বিরোধিতা করিয়াছে।* আইনসংগত সার্বভৌম প্রণীত আইনের বিরুদ্ধাচরণ বিশেষ প্রবল আকার ধারণ করিলে বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে ; এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ আইনসংগত সার্বভৌম রূপে গণ্য তাহার ক্ষমতার অবসান ঘটিতে পারে। তাই আইনসংগত সার্বভৌমকে সর্বদাই রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে সার্বভৌমিকতা আখ্যা না দেওয়াই সমীচীন

উপসংহারে বলা যাইতে পারে, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ আইনগত। যাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলা হয় তাহাকে আইন স্বীকার করে না। সুতরাং তাহাকে 'সার্বভৌমিকতা' আখ্যা না দেওয়াই সমীচীন। আধুনিক লেখকগণের মতে, একমাত্র আইনসংগত সার্বভৌমিকতাকে 'সার্বভৌমিকতা' এবং রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে 'জনমত' বা 'সাধারণের ইচ্ছা' (General Will) বলিয়া অভিহিত করা উচিত।

আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতা (*De Jure* and *De Facto* Sovereignty): অনেক সময় আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা হইল আইনসংগত সার্বভৌমিকতা। আইনই ইহার ভিত্তি। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল আইনসংগতভাবে আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতা। আইনানুসারে ইহার প্রতিই লোকের আনুগত্য স্বীকার করিবার কথা। কিন্তু আইনানুমোদিত সার্বভৌম প্রণীত আইন কার্যকর নাও হইতে পারে, বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কোন সময় সাধারণে আইনসংগত সার্বভৌমিকতার প্রতি আনুগত্য স্বীকার নাও করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে যাঁহার আইন কার্যকর হয় এবং যাঁহার প্রতি জনসাধারণ আনুগত্য স্বীকার করে তাঁহাকেই বাস্তব সার্বভৌম বলিয়া অভিহিত করিয়া আইনসংগত সার্বভৌমিকতা হইতে পৃথক করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাস্তব সার্বভৌমিকতা আইনানুমোদিত নাও হইতে পারে।

বাস্তব সার্বভৌমিকতার স্বরূপ

বাস্তব সার্বভৌমিকতার ব্রাইস-প্রদত্ত সংজ্ঞা

লর্ড ব্রাইস বলেন, যে-ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের প্রতি প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য প্রদর্শন করা হয় এবং যে-ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ আইনসংগতভাবেই হউক আর আইনবিরুদ্ধভাবেই হউক নিজের বা নিজেদের চূড়ান্ত ইচ্ছা কার্যকর করিতে পারেন, তিনি বা তাঁহারা হইলেন বাস্তব সার্বভৌম।

* "Obedience is the normal habit of mankind, but marginal cases continually recur in history when decision to disobey is painfully taken and passionately defended." Laski, State in Theory and Practice

সাধারণ সময়ে আইনানুমোদিত বা বাস্তব সার্বভৌমিকতা একই হস্তে থাকে ; সুতরাং তাহাদের পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব হয় না। কিন্তু বিপ্লব, বিদ্রোহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে সার্বভৌমিকতার এই দুই রূপের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। বিপ্লবের ফলে নূতন শক্তি কর্তৃত্ব অধিকার করিলে ইহা বাস্তব সার্বভৌমে পরিণত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকে। তখন কর্তৃত্বের পুরাতন অধিকারী এবং এই বাস্তব সার্বভৌমের মধ্যে পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। বাস্তব সার্বভৌমিকতা কিছুদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আবার আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতায় পরিণত হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বিলুপ্ত হয়। বিদ্রোহের ফলে অল্প সময়ের জন্য আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা বাস্তব সার্বভৌমিকতা হইতে পৃথক হইতে পারে। পরে বিদ্রোহ দমিত হইলে এই পার্থক্য আবার বিলুপ্ত হয়। বহিঃশত্রু দেশ আক্রমণ করিয়া চিরকাল বা অল্পকালের জন্য বাস্তব সার্বভৌমিকতার অধিকারী হইতে পারে। চিরকালের জন্য অধিকারী হইলে ইহা কিছুদিন পরে আইনানুমোদিত সার্বভৌম হইয়া দাঁড়ায় এবং অল্পকালের জন্য হইলে বাস্তব সার্বভৌমিকতা আবার পূর্বের আইনানুমোদিত সার্বভৌমের নিকট ফিরিয়া আসে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান পার্থক্য স্বল্পকাল স্থায়ী। কিছু সময় অতিক্রান্ত হইলে উভয়ে মিলিয়া একাকার হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব, চীনে অন্তর্বিপ্লব, মিশরে সামরিক কর্তৃপক্ষের বিপ্লব, আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণ অঞ্চলের দেশগুলির বিদ্রোহ, মুসোলিনীর আবিসিনিয়া অধিকার, আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্রহ্মদেশ অধিকার, প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিপ্লব প্রভৃতির সময়ে আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে

আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান পার্থক্য স্বল্পকাল স্থায়ী

আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য আলোচনার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা আইনগত। সুতরাং যাহা আইনানুমোদিত নহে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাহাকে সার্বভৌমিকতা বলিয়া অভিহিত করা যায় না। এই দিক দিয়া বাস্তব সার্বভৌমিকতা সার্বভৌমিকতাই নহে এবং আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার পার্থক্য নির্দেশ করা অযৌক্তিক। গেটেল বলেন, আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ না করিয়া আইনানুমোদিত ও বাস্তব সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করাই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত।

আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা বিজ্ঞানসম্মত নহে

জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty): সার্বভৌমিকতাকে অনেক সময় জনগণের বলিয়া বর্ণনা করা হয়। জনগণই যে প্রকৃত চরম ক্ষমতার অধিকারী এ-ধারণা প্রাচীন রোমে বর্তমান ছিল। পরে অবশ্য ইহা লুপ্ত হইয়া যায়। জনগণের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট হয়। ইহার উদ্ভব হয় চরম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের ফলে। স্বাভাবিক আইন ও সামাজিক

চুক্তির ভিত্তিতে এই দুই শতাব্দীতে অনেক লেখক জনগণের চরম ক্ষমতা সমর্থন করিয়াছিলেন। এই লেখকগণের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, আদিতে সার্বভৌমিকতা জনগণেরই ছিল এবং তাহা হস্তান্তরযোগ্য নহে বলিয়া কোনরূপে হস্তান্তরিত হয় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই জনগণের সার্বভৌমিকতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আসিয়াই জনগণের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে এই ধারণা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এই শতাব্দীতে রুশো ও আমেরিকান লেখক জেফারসন (Jefferson) জনগণই যে চরম ক্ষমতার চূড়ান্ত অধিকারী ইহা বিজয়ীর কণ্ঠে ঘোষণা করেন এবং এই শতাব্দীতেই অনুষ্ঠিত দুইটি বিপ্লবের—ফরাসী ও আমেরিকান—ভিত্তি হিসাবে ইহা গৃহীত হয়। ব্রাইস বলেন, এই সময় হইতেই জনগণের সার্বভৌমিকতা গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।*

রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ।

জনগণের সার্বভৌমিকতার অর্থ অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট

সমালোচনা : জনগণের সার্বভৌমিকতা যে গণতন্ত্রের ভিত্তি ইহা অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। ইহার প্রতি শ্রদ্ধা না জানাইয়া পারা যায় না। কিন্তু 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' সম্বন্ধে ধারণায় একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত অর্থ করিয়া ইহাকে মতবাদের রূপ দেওয়া কঠিন। গার্ণার বলেন, বিভিন্ন লেখক 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' বিভিন্নভাবে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করায় ধারণায় বিশেষ অস্পষ্টতা—এমনকি অনির্দিষ্টতারও সৃষ্টি হইয়াছে। "যাঁহারা সার্বভৌমিকতাকে জনগণের বলিয়া অভিহিত করেন ...তাঁহারা 'জনগণ' বলিতে কি বুঝেন, তাহা অধিকাংশ সময় আমাদের জানান না।" এক অর্থে জনগণ বলিতে রাষ্ট্রাধীন সমগ্র অনির্দিষ্ট জনসাধারণ বা জনতাকে বুঝায়। কিন্তু এই অনির্দিষ্ট জনতা কখনও সার্বভৌম শক্তির ব্যবহার করিতে পারে না। জনগণের মতামত থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা সুসংগঠিত নহে বলিয়া ইহাকে ঠিক জনমত (Public Opinion) বলা যায় না। জনতার মত যদিও জনমতে পরিণত হয় তবে ইহাকে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে মাত্র। সুতরাং জনগণের সার্বভৌমিকতা আইনানুমোদিত নহে। রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলিতে সমগ্র জনসাধারণ বা অসংগঠিত জনতার মতামত বুঝাইলে ইহা আইনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

জনমত আইনসংগত সার্বভৌমিকতা নহে

জনগণের বিপ্লবের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাও সার্বভৌমিকতা নহে

জনগণের সার্বভৌমিকতা বলিতে জনতার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং বিপ্লবের দ্বারা আইনানুমোদিত সরকারের পরিবর্তনের সম্ভাবনাও বুঝাইতে পারে। জনগণের সার্বভৌমিকতার এই অর্থের বিরুদ্ধে বলিবার বিষয় হইল যে, বিপ্লব কখনই আইনসংগত নহে কিন্তু সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণাই আইনগত। সুতরাং জনগণের বিপ্লবের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে 'সার্বভৌমিকতা' আখ্যা কোনমতেই দেওয়া যাইতে পারে না।

* Since the American Declaration of Independence and the French Revolution "popular sovereignty has become basis and watchword of democracy".

'জনগণের সার্বভৌমিকতা' সম্বন্ধে অনেক সময় সংকীর্ণ ধারণা করা হয়। এই অর্থে সমগ্র জনসাধারণ নহে, মাত্র ভোটাধিকারিগণকে সার্বভৌম বলিয়া গণ্য করা হয়।

ভোটাধিকারিগণের ক্ষমতাও জনগণের সার্বভৌমিকতা নহে

ভোটাধিকারিগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে তাহাদের ইচ্ছাকে আইনের রূপদান করিয়া চূড়ান্ত ক্ষমতার ব্যবহার করে। কিন্তু অধিকাংশ রাষ্ট্রে ভোটাধিকারিগণের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম। আবার দলপ্রথা প্রবর্তিত থাকায় সকল ভোটাধিকারীর নির্বাচিত প্রতিনিধিই আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে না, মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিগণ আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে। সুতরাং কার্যত এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিদের নির্বাচকগণই সার্বভৌম শক্তির ব্যবহার করে। গেটেলের হিসাবে, এই শ্রেণীর নির্বাচকগণ সমগ্র জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মাত্র। এক-পঞ্চমাংশের যদিও চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে, তবুও ইহাকে 'জনগণের' বলিয়া অভিহিত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

মূল্য

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'জনগণের সার্বভৌমিকতা' ধারণাটি বিশেষ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট—অন্তত আইনসংগত নহে। ইহা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, এই ধারণার কিছু মূল্য আছে। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে শাসনকার্য জনমতের অনুকূলেই পরিচালনা করা হয় এবং জনমত যাহাতে শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হয়। গণতান্ত্রিক আদর্শকে রূপ দিবার জন্য যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহার মধ্যে লিখিত শাসনতন্ত্র, ব্যাপক ভোটাধিকার,

জনগণের সার্ব-ভৌমিকতার বর্তমান ব্যবহারিক রূপ

স্বায়ত্তশাসন, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের নিকট সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রভৃতিই প্রধান। অনেক সময় আবার গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative), পদচ্যুতি (Recall) প্রভৃতিরও ব্যবস্থা থাকে। বস্তুত, এই সকল ব্যবস্থাই বর্তমানে জনগণের সার্বভৌমিকতার ব্যবহারিক রূপ। ইহাদের দ্বারা জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। গিলক্রাইষ্টের মতে, জনগণের সার্বভৌমিকতা বলিতে এই নিয়ন্ত্রণই বুঝায়।*

***সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অষ্টিনের মতবাদ* (Austinian Theory of Sovereignty) :** আইনসংগত সার্বভৌমিকতার প্রধান ব্যাখ্যাকর্তা হইলেন ইংরাজ আইনানুগ দার্শনিক অষ্টিন (John Austin)। ১৮৩২ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'আইনশাস্ত্রের উপর বক্তৃতা' (Lectures on Jurisprudence) নামক পুস্তকে এই মতবাদ প্রথম প্রচারিত হয়।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদ পরিস্ফুটনে অষ্টিন হবস্ ও হিতবাদী বেন্থাম (Jeremy Bentham) দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। প্রধানত

* "The phrase 'popular control' better indicates the idea underlying 'popular sovereignty."

বেন্থামকে অনুসরণ করিয়াই তিনি আইন এবং প্রথার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছিলেন।

অষ্টিনের মতে, সার্বভৌম ক্ষমতাই আইনের একমাত্র উৎস

অষ্টিনের মতে, আইন হইল অধস্তনের প্রতি ঊর্ধ্বতনের আজ্ঞা বিশেষ; ইহার সহিত নৈতিক সূত্র বা প্রচলিত প্রথার কোন সংস্রব নাই। রাষ্ট্র মধ্যে সার্বভৌম শক্তির অধিকারই চরম, চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ইহার আদেশই একমাত্র আইন। এইভাবে অষ্টিন সমাজে সংহতি আনয়ন ও রক্ষার উদ্দেশ্যে আইনের একটি মাত্র উৎসের নির্দেশ দিয়াছেন।

সার্বভৌমিকতার অষ্টিন-প্রদত্ত সংজ্ঞা

আইন সম্বন্ধে এই ধারণা হইতে অষ্টিন সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট করিলেন এবং সার্বভৌমিকতার এইরূপ সংজ্ঞা দিলেন: যদি কোন সমাজে কোন নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ অপর কোন ঊর্ধ্বতনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে কিন্তু সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য পাইয়া আসিতে থাকে, তবে সেই সমাজে ঐ নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদই সার্বভৌম এবং এইরূপ সমাজ রাষ্ট্রনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।*

অষ্টিন-প্রদত্ত সার্বভৌমিকতার উপরি-উক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ নিম্নলিখিতভাবে করা চলে:

অষ্টিনের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদের বিশ্লেষণ

(ক) প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রেই কোন-না-কোন ব্যক্তি-সংসদের সন্ধান পাওয়া যায় যিনি বা যাঁহারা সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করেন।

(খ) এই সার্বভৌম হইলেন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ যাঁহারা নির্দিষ্ট—জনসাধারণের মত অনির্দিষ্ট বা সাধারণের ইচ্ছার মত নির্বৈক্তিক (impersonal) নহেন।

(গ) সার্বভৌমিকতার অধিকারী বা অধিকারিগণকে অষ্টিন ঊর্ধ্বতন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ কাহারও আনুগত্য স্বীকার করেন না এবং ইঁহার বা ইঁহাদের ইচ্ছা কোন কিছু দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতা চরম ও অসীম! সার্বভৌমিকতা কোনরূপ আইনসংগত বাধা মানে না।

সার্বভৌমিকতা চরম, অসীম, সর্বপরিব্যাপ্ত ও অবিভাজ্য

চরম ও অসীম বলিয়া সার্বভৌমিকতা সর্বপরিব্যাপ্ত। রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও বিষয়ের উপর ইহার এক্তিয়ার রহিয়াছে। এই এক্তিয়ারকে বিভক্ত করা যায় না। বিভক্ত করিলে সার্বভৌমিকতা আর সর্বপরিব্যাপ্ত থাকিবে না। সুতরাং সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য।

* "If a *determinate human superior*, not in a habit of obedience to a like superior, receives habitual obedience from the *bulk* of a given society, that determinate superior is sovereign in the society, and the society...is a society political and independent."

(ঘ) জনসাধারণের স্বভাবজাত আনুগত্যই সার্বভৌমিকতার মানদণ্ড।

জনসাধারণের স্বভাবজাত আনুগত্যই সার্বভৌমিকতার মানদণ্ড

যে-নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের প্রতি জনসাধারণের অধিকাংশ স্বভাবত আনুগত্য স্বীকার করে তাহাই সার্বভৌম। আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যায় যে, সার্বভৌম শক্তির প্রতি জনসাধারণ স্বভাবতই আনুগত্য স্বীকার করিবে, সাময়িকভাবে নহে।

ল্যাস্কি কর্তৃক অষ্টিনের মতবাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ

ল্যাস্কির মতে, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অষ্টিনের মতবাদের তিনটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। প্রথমত, অষ্টিনের মতে, রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত এক সংস্থা (a legal order) যেখানে নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব সমগ্র ক্ষমতার উৎস হিসাবে কার্য করে। দ্বিতীয়ত, এই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমিকতা সম্পূর্ণ অপ্রতিহত; ইহা কোন কিছু দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অযৌক্তিকভাবে, অন্যায়ভাবে ও অনৈতিকভাবে যে-কোন কার্য করিতে পারে। এইরূপ কার্যের বিরুদ্ধে কোন আইনানুমোদিত বাধার সৃষ্টি করা যায় না। তৃতীয়ত, সার্বভৌমিকতার আদেশই হইল আইন। এই আদেশ পালন না করিলে বিধিমত শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়।

অষ্টিনের মতবাদের সংক্ষিপ্তসার

অষ্টিনের সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞার উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, অষ্টিনের মতে, সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের চরম, অপ্রতিহত এবং শাশ্বত ক্ষমতা যাহার অবস্থান নির্দেশ করা হয় নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের মধ্যে। সার্বভৌমের আদেশই আইন। আইন অমান্য করিলে সার্বভৌম শক্তি আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগ করিতে পারে।

সমালোচনা : সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অষ্টিনের মতবাদ সম্পূর্ণভাবে আইনমূলক মতবাদ। সুতরাং অন্যান্য দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে। ইতিহাসের দিক দিয়া স্যর হেনরী মেইন, সিজউইক প্রভৃতি লেখকগণ দেখাইয়াছেন যে, অষ্টিনের মতবাদ সম্পূর্ণ কৃত্রিম। মেইন বলেন, সার্বভৌমিকতার অবস্থান কোন নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের মধ্যে নির্দেশ করা যায় না। কোন সার্বভৌম আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হন নাই। আইনানুসারে হয়ত' তিনি সমাজজীবনের যে-কোন নিয়মপদ্ধতির পরিবর্তন করিতে পারিতেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ কোন নিয়মপদ্ধতির পরিবর্তন তিনি করিতে চাহেন নাই যাহা সংঘটিত করিতে পারিলে তাঁহাকে অষ্টিনের কল্পনা অনুসারে সার্বভৌম বলিয়া গণ্য করা যাইত। ইংল্যাণ্ডের উদাহরণ দিয়া অষ্টিন বলিয়াছেন যে, রাজা (বা রাণী) এবং লর্ড ও কমন্স সভার সমন্বয়ের মধ্যে সার্বভৌমিকতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। ল্যাস্কি বলেন, অষ্টিনের মতবাদের ইহাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ; কিন্তু ইহাকেও অষ্টিনের অর্থে সার্বভৌম বলিয়া গণ্য করা অসম্ভব। আইনের দিক দিয়া কোন বাধা না থাকিলেও কার্যত কোন পার্লামেণ্ট পরস্পরকে হত্যা করিবার, পরস্পরের সর্বস্ব অপহরণ করিবার,

শ্রমিক-সংঘগুলির অস্তিত্ব বিলোপ করিবার, ভোটাধিকার কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে আইন পাস করিতে পারে না। মেইনের মতে. সমাজজীবনে এরূপ অসংখ্য প্রভাব কার্য করে যাহা সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। অষ্টিন এই সকল প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অষ্টিন আইনসংগত সার্বভৌমিকতার স্বরূপই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করেন নাই।

১। অষ্টিন রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন

দ্বিতীয়ত বলা যায়, অষ্টিনের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদের সহিত বর্তমানের জনগণের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণার কোন সংগতি নাই। সুতরাং ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী। এই কারণে অষ্টিনের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদ লইয়া আইনানুগেরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তির নিকট ইহার কোন প্রয়োজন নাই।

২। ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী

তৃতীয়ত অনেকের মতে, অষ্টিন-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নহে। ল্যাস্কি বলেন, আইনকে শুধু আদেশ বলিয়া অভিহিত করিলে শালীনতার সীমারেখা অবধি পৌছিতে হয়।* প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এরূপ বহু প্রথাগত আইন থাকে যাহা ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের আদেশমাত্র নহে। ইচ্ছা করিলেই রাষ্ট্র এই সকল প্রথাগত আইনের বিলোপসাধন করিতে পারে না। বলা হয় যে, অষ্টিন এই প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

৩। বলা হয়, অষ্টিন প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করিয়াছেন

বস্তুত, অষ্টিন প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করেন নাই; তিনি ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতনই ছিলেন। তাই তিনি 'আদেশ' শব্দের অর্থ এইভাবে করিয়াছেন—সার্বভৌম যাহা অনুমোদন করেন তাহাই তাঁহার আদেশ।** অনেকগুলি প্রথাকে তিনি অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে তাহা তাঁহার অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া আইনে পরিণত হইয়াছে। এই অনুমোদন আসিয়াছে সার্বভৌমের আদালতসমূহের মাধ্যমে। যতক্ষণ আদালত কর্তৃক স্বীকৃত না হয়, ততক্ষণ কোন প্রথাই আইনে পরিণত হয় না।

চতুর্থত, অষ্টিনের পূর্ববর্তী যুগে প্রথমে নিয়ম-শৃংখলার ও পরে বলপ্রয়োগের কল্পনা করা হইত। কিন্তু অষ্টিন প্রমুখ আইনানুগগণ (Analytical Jurists) প্রথমে শক্তি ও পরে নিয়মশৃংখলার কল্পনা করিয়াছেন। সমালোচকগণ বলেন, অষ্টিন প্রমুখ আইনানুগের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, বলপ্রয়োগের দ্বারা নিয়মশৃংখলা বজায় রাখা হয়। বর্তমানের ধারণা হইল যে আইন শাস্তির ভয়ে মান্য করা হয় না, মান্য করা হয় সাধারণে নানা কারণে আইন মানিতে অভ্যস্ত বলিয়া।

৪। সমালোচকগণের মতে, অষ্টিন বলপ্রয়োগকে নিয়ম-শৃংখলার পূর্ববর্তী বলিয়া কল্পনা করিয়া ভুল করিয়াছেন

* "To think....of law as simply a command is....to strain definition to the verge of decency."

** What the sovereign *permits* he commands.

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না যিনি বা যাঁহাদের মধ্যে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এ-প্রসংগে আলোচনা পরে করা হইতেছে।

৫। যুক্তরাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সার্বভৌমের সন্ধান পাওয়া যায় না

পরিশেষে, অষ্টিনের মতবাদ অনুসারে সার্বভৌমের যে চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা আন্তর্জাতিকবাদী ও বহুত্ববাদিগণ দ্বারা সমালোচিত হইয়াছে। এ-সম্পর্কেও আলোচনা পরে করা হইতেছে।

৬। আধুনিক সমালোচনা

সাম্প্রতিক লেখকগণের অনেকে কিন্তু অষ্টিনের মতবাদ সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। ইঁহাদের মতে, মেইন মেটল্যাণ্ড সিজউইক ল্যাস্কি প্রভৃতি লেখক অষ্টিনকে এই বলিয়া ভুল বুঝিয়াছেন যে, অষ্টিন সার্বভৌমিকতা এবং পাশবিক বলকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কোকার স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন যে, অষ্টিনের মতবাদে এইরূপ অভিন্নতার ইংগিত কোথাও নাই। অধ্যাপক ফ্রান্সিস গ্রাহাম উইলসন বলেন, অষ্টিন নৈতিক ও ঐশ্বরিক আইনের শক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাস করিতেন এবং অষ্টিন এরূপ মূর্খ ছিলেন না যে তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বলিতে সরকারের যথেচ্ছাচারের ক্ষমতাকে বুঝিবেন ; তবুও তাঁহার সমালোচকরা একরূপ ধরিয়া লইয়াছেন যে অষ্টিন চূড়ান্ত রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা বলিতে ইহাই বুঝিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অষ্টিনের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জনগণের স্বভাবজাত আনুগত্যই যখন সার্বভৌমিকতার লক্ষণ তখন সাধারণের সম্মতিই ইহার ভিত্তি। সাধারণের সম্মতি না থাকিলে সার্বভৌমিকতার অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে না। সুতরাং অষ্টিন কখনও পাশবিক বলকে সার্বভৌমিকতা বলিয়া গণ্য করেন নাই।

আধুনিক লেখকগণের অনেকের মতে, অষ্টিনের মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে

উপসংহারে বলা যায়, অষ্টিনের মতবাদ কতকগুলি পূর্বধারণার (preconceptions) উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণাগুলি মানিয়া লওয়া হইলে মতবাদকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অষ্টিনের উদ্দেশ্য ছিল আইনসংগত সার্বভৌমিকতার স্বরূপ বর্ণনা করা। এই উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণভাবে সার্থক হইয়াছে সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই।

উপসংহার

***যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয়* (Location of Sovereignty in a Federation) :** সার্বভৌমিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অবিভাজ্যতা। ইহা মানিয়া লইলে যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সার্বভৌমিকতা যখন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এবং অবিভাজ্য তখন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার অবস্থান কোথায় নির্দেশ করা যাইবে? এই প্রশ্ন প্রথম উঠিয়াছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে পর এই সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বজায় না থাকিলেও স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। এই উদ্দেশ্যে শাসনক্ষমতা সমগ্র দেশের সরকার ও দেশের অংশগুলির সরকারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক সরকার নিজ নিজ নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে কার্য পরিচালনা করিয়া যায়—কেহ কাহারও অধীন থাকে না। এখন প্রশ্ন হইল, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার সন্ধান কোথায় পাওয়া যাইবে? কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন অংশের সরকার সার্বভৌম শক্তির ব্যবহারকারীরূপে গণ্য হইতে পারে না। কারণ, উভয়ের ক্ষমতাই শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট—অপ্রতিহত, চরম ও চূড়ান্ত নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ লইয়া বলা যায় যে কংগ্রেস ও রাজ্যের আইনসভাগুলির আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা নির্দিষ্ট। সীমা লংঘন করিয়া যদি কোন আইনসভা আইন প্রণয়ন করে তবে তাহা অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইবে এবং তাহা বাতিল হইয়া যাইবে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস বা রাজ্যের আইনসভা সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই উক্তি অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

যুক্তরাষ্ট্র কাহাকে বলে

অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই সার্বভৌম। কিন্তু এই ধারণা অস্টিনের সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, সংবিধান হইল ক্ষমতার প্রয়োগ সম্বন্ধে দলিল, প্রয়োগকারী মনুষ্য নহে। উপরন্তু, সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান চরম হইলেও পরিবর্তনীয়। সুতরাং সংবিধানকে সার্বভৌম হিসাবে গণ্য না করিয়া সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষমতাকে সার্বভৌম বলিয়া গণ্য করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ সময় আবার সংবিধানের সকল ধারার পরিবর্তন করা যায় না। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিধান আছে যে, স্বেচ্ছায় ব্যতীত কোন রাজ্যকে সিনেটে সমানসংখ্যক সদস্যপ্রেরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। সুতরাং সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ।

যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা কি সংবিধানের মধ্যে নিহিত?

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য ল্যাস্কি বলেন যে যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।* বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতাসমূহ বণ্টিত হয়, সার্বভৌমিকতা বণ্টিত হয় না। চরম ক্ষমতার বণ্টন অসম্ভব। চরম ক্ষমতার বণ্টন কল্পনা করিলে সার্বভৌমিকতার সম্পূর্ণ নূতন সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হয়।

ল্যাস্কি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব

এই আলোচনা প্রসংগে সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রচলিত মতবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ মতবাদ অনুসারে সার্বভৌমিকতা বিভাজ্য এবং সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এই নীতিকে অনুসরণ করিয়াই সংগঠিত হইয়াছে। বলা হয় যে ঐ রাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির মধ্যে বণ্টিত হইয়াছে।†

* "...discovery of sovereignty in a federal state is...an impossible adventure."

† The Constitution of the Union of Soviet Socialist Republics-এর ১৪-১৮ (খ) ধারা।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বহুত্ববাদ (Pluralistic Conception of Sovereignty) : বোদাঁ, হবস্, বেন্থাম ও অস্টিনের দ্বারা পরিস্ফুটিত সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে পরম্পরাগত (Traditional) মতবাদ সাম্প্রতিক যুগে বহুত্ববাদী (Pluralists) নামে অভিহিত একদল লেখকের দ্বারা বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে। বহুত্ববাদিগণের মতে, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আইনসংগত মতবাদ সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও বিপজ্জনক মতবাদ। লিণ্ড্সে (A. D. Lindsay) বলেন, "ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে সার্বভৌম রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতবাদ ভাঙিয়া পড়িয়াছে।" বার্কারের মতে, "অপর কোন প্রচলিত রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতবাদ অপেক্ষা শুষ্ক ও মূল্যহীন হইয়া উঠে নাই।"* ল্যাস্কি বলেন, "সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে আইনসংগত মতবাদকে রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের উপযোগী করিয়া তোলা অসম্ভব।" এবং "সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে সমগ্র ধারণাটিকেই পরিত্যাগ করিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে স্থায়ী উপকার হইত।"

বহুত্ববাদিগণের মতে, আইনসংগত সার্ব-ভৌমিকতা মূল্যহীন ও বিপজ্জনক মতবাদ

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে পরম্পরাগত বা আইনসংগত মতবাদকে একত্ববাদ (Monism) বলা হয়। একত্ববাদ অনুসারে সার্বভৌমিকতা এক এবং অবিভাজ্য। ইহা একমাত্র রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এই কারণে রাষ্ট্র তাহার ভূখণ্ডের অন্তর্গত সমগ্র ব্যক্তি ও সংঘের উপর অপ্রতিহত কর্তৃত্বের অধিকারী। ইহার বিরুদ্ধে আইনানুমোদিত কোন বাধাই নাই। রাষ্ট্রের ইচ্ছাই চরম; প্রত্যেক ব্যক্তি বা সংঘকে ইহা মানিয়া লইতে হইবে। না মানিলে রাষ্ট্র আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগ করিতে পারে। একমাত্র রাষ্ট্রই বলপ্রয়োগের অধিকারী। সুতরাং একত্ববাদ অনুসারে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্গত সকল ব্যক্তি ও সংঘ রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীন, তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে রাষ্ট্রের উপর এবং তাহারা যে-সকল অধিকার ও ক্ষমতা ভোগ করে তাহা রাষ্ট্র-প্রদত্ত।

একত্ববাদ

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একত্ববাদ বা রাষ্ট্রের আইনসংগত সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন সংঘের নিজস্ব সত্তা অথবা স্বাভাবিক ক্ষমতার (রাষ্ট্র-প্রদত্ত নহে) সমর্থনে যে-মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহাকেই বহুত্ববাদ বলা হয়।

সংক্ষেপে বহুত্ববাদ কাহাকে বলে

বহুত্ববাদের উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। এই শতাব্দীতে জৈব মতবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, বেন্থামের আশাবাদ (Optimistic Theory) যে আইন প্রণয়ন দ্বারা সংস্কারসাধন করা সম্ভব প্রভৃতির প্রচারের ফলে রাষ্ট্র অভূতপূর্বভাবে ব্যাপক ক্ষমতা অধিকার করে। এইভাবে সমাজজীবনের প্রায় সমগ্র কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সংঘ ও ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র ব্যক্তির যথাসর্বস্ব

বহুত্ববাদের উদ্ভব হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে

* "No political commonplace has become more arid and unfruitful than the doctrine of sovereign State."

দাবি করিতে থাকে ; শান্তির সময়েও নিত্য নূতন আইনের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সংঘের জীবনে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে দেখা যায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিক্রিয়া। ইহা বার্কারের ভাষায়, "রাষ্ট্র বনাম সংঘ" (Group *vs.* State) এই রূপ ধারণ করে। সংক্ষেপে ইহাকেই বহুত্ববাদ বলা হয়।

বহুত্ববাদ রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে চায় না, সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে চায় মাত্র

বহুত্ববাদের বর্ণনা : বহুত্ববাদ, নৈরাজ্যবাদের (Anarchism) মত রাষ্ট্রের বিলুপ্তিসাধন করিতে চায় না। বহুত্ববাদিগণ রাষ্ট্রকে বজায় রাখিয়া মাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে চান। ইঁহারা বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্রের হস্ত হইতে সমস্ত অনাবশ্যকীয় ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বণ্টন না করিলে স্বাধীনতার সংরক্ষণ সম্ভবপর নহে।

বহুত্ববাদিগণ মানুষের সামাজিক প্রকৃতিতে অবিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষের সামাজিক প্রকৃতি পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে না। একত্ববাদ যে রাষ্ট্র ও সমাজকে একরূপ অভিন্ন বলিয়া এবং সমাজকে 'অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের সংগঠন'* বলিয়া মনে করে, বহুত্ববাদিগণের মতে তাহা ভুল। রাষ্ট্র ও সমাজ এক ও অভিন্ন নহে এবং সমাজও অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহের সংগঠন নহে। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সংগঠনের যুক্তসংঘ। বস্তুত, সমাজ সংঘমূলক। এই নানাপ্রকার সংঘের মধ্যেই মানুষের সত্তা বিকশিত হয়, একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের মধ্যে নহে। বহুত্ববাদিগণ স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, এই কারণে রাষ্ট্র কোন অসাধারণ সংগঠন নহে ; বলপ্রয়োগের ক্ষমতা ইহাকে কোন প্রকার অসাধারণত্ব দান করে না। রাষ্ট্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে ; এই কারণে ইহা নিজস্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম হইতে পারে। অন্যান্য সংঘও মানুষের আত্মবিকাশের পথ সুগম করে ; সুতরাং তাহারাও রাষ্ট্রের মত স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম। এই সকল সংঘের উপর কর্তৃত্ব বা ইহাদের কার্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার রাষ্ট্রের নাই। ইহারা ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য, ব্যক্তিসত্তার বিশেষ বিশেষ দিক বিকশিত করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহারা রাষ্ট্র হইতে উদ্ভূত হয় নাই ; এবং রাষ্ট্র হইতে ইহারা কোন প্রেরণাও লাভ করে না। বর্তমানে দেখা যায়, এই সকল সংঘ ব্যক্তি-স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক করে বলিয়া ব্যক্তি ইহার প্রতি রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর আনুগত্য স্বীকার করে। সুতরাং ইহাদের মতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছা বলবৎ করিতে পারে না। বহুত্ববাদিগণ অস্বীকার করেন যে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের

সমাজ সংঘমূলক বলিয়া অন্যান্য সংঘও স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম

রাষ্ট্র আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগ করিতে পারে—ইহা বহুত্ববাদ অস্বীকার করে

* "....association of unassociated individuals."

ক্ষমতা রহিয়াছে বলিয়া ইহা আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগের অধিকারী। সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য নহে ; ইহা একমাত্র রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য নহে। অন্যান্য সংঘও সার্বভৌমিকতার অধিকারী। ইহাদের সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতার সীমানির্দেশ করে। রাষ্ট্রের আইনসংগত সার্বভৌমিকতা একটি কুসংস্কার মাত্র যাহাকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।* বহুত্ববাদিগণের মতে, এই কুসংস্কার হইতে মুক্ত হওয়াই অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ।

বহুত্ববাদ অনুসারে রাষ্ট্রের আইনসংগত সার্বভৌমিকতা একটি কুসংস্কার মাত্র

পরম্পরাগত সার্বভৌমিকতার আর একটি সমালোচনা— রাষ্ট্র আইনের উর্ধ্বে নহে

বহুত্ববাদের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত পরম্পরাগত সার্বভৌমিকতার আরও দুইটি বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে। প্রথমটি হইল যে, রাষ্ট্র আইনের উৎস নহে ; সুতরাং রাষ্ট্র আইনের উর্ধ্বে নহে ; বরং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আইনের দ্বারাই সীমাবদ্ধ।

পরম্পরাগত সার্বভৌমিকতার এই শ্রেণীর সমালোচকগণের মতে, সমাজের সংহতিই আইনের ভিত্তি ; সমাজবদ্ধ মানুষ সচেতনভাবে আইনকে স্বীকার করিয়া লয়। সমাজজীবনের সূত্রপাতের সংগে সংগেই, যখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই, মানুষ কতকগুলি সামাজিক বিধিনিয়মকে মানিয়া লইয়াছিল। এগুলিই আইন। ইহারা রাষ্ট্রের পূর্ববর্তী ও উর্ধ্বতন। আইন মান্য করা সকল সামাজিক ব্যক্তি ও সংঘের পক্ষে বাধ্যতামূলক। অন্যতম সামাজিক সংঘ হিসাবে রাষ্ট্রও আইনের কর্তৃত্বাধীন। অতএব জনমত ও জনকল্যাণের দিক দিয়া দৃষ্টি রাখিয়া আইন দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাষ্ট্র মাত্র নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবে ; কর্তৃত্ব প্রকাশের চেষ্টা করিবে না। বস্তুত, রাষ্ট্র কর্তব্যের সমষ্টি মাত্র, অপ্রতিহত কর্তৃত্বের অধিকারী নহে।

বহুত্ববাদের সহিত সম্পর্কিত পরম্পরাগত সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সমালোচনা করা হইয়াছে আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে। সংক্ষেপে এই সমালোচনাকে এইভাবে বিবৃত করা যায় : আন্তর্জাতিক আইনের পরিস্ফুটন ও সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রের আইনসংগত সার্বভৌমিকতা নিছক কল্পনাপ্রসূত মতবাদে পরিণত হইয়াছে। কারণ, বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার অধিকারী নহে—সকল রাষ্ট্রেরই বাহ্যিক চরম ক্ষমতা আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। বর্তমানে এই সকল আন্তর্জাতিক আইন জনমতের দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা বিশেষ কঠিন। দ্বিতীয়ত, বর্তমান যুগের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে মানুষ আন্তর্জাতিক আইনকে জাতীয় আইনের মতই বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া

আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে পরম্পরাগত সার্বভৌমিকতার সমালোচনা

* "The theory of sovereign state is a venerable superstition."

উঠিয়াছে। তৃতীয়ত, বলা যায় যে বর্তমান জগৎকে কয়েকটি রাষ্ট্রের সমষ্টি হিসাবে দেখা ভুল। বর্তমান জগৎ হইল এক বিশ্বজনীন সম্প্রদায়; বিভিন্ন দেশবাসী মানুষ একটি বৃহৎ পরিবার। এক্ষেত্রে আইনবিদগণের পক্ষে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার কল্পনা করা অযৌক্তিক। ইহা রক্ষণশীল অথবা প্রতিক্রিয়াশীলের দৃষ্টিভংগি মাত্র। প্রগতিতে বিশ্বাসী প্রত্যেকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে বাধ্য।

প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভংগি লইয়াই সার্বভৌম রাষ্ট্রের কল্পনা করা যাইতে পারে

এইভাবে সার্বভৌম রাষ্ট্রকে অভ্যন্তর ও বাহির উভয় দিক হইতেই আক্রমণ করা হইয়াছে। গেটেলকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, আন্তর্জাতিকতাবাদীরা সার্বভৌম রাষ্ট্রকে যখন শৃংখলাবদ্ধ করেন বহুত্ববাদিগণ তখন অস্ত্রোপচার দ্বারা উহার আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা হ্রাসে অগ্রসর হন।*

বহুত্ববাদের পরিস্ফুটন (Development of the Pluralistic Conception of Sovereignty) : বহুত্ববাদিগণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের জার্মান আইনানুগ গিয়ার্কে (Gierke) এবং সমসাময়িক ইংরাজ চিন্তাবীর মেটল্যাণ্ডের (Maitland) নিকট ঋণ স্বীকার করেন। গিয়ার্কে ও মেটল্যাণ্ডের মতে, সামাজিক সংঘগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট নহে। তাহারা নিজস্ব সত্তার অধিকারী। ইঁহাদের পরই নামোল্লেখ করিতে হয় ফিগিসের (Figgis)। খ্রীষ্টধর্মপ্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ফিগিস বিভিন্ন সংঘের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্র এক এবং অবিসংবাদী সার্বভৌমিকতার অধিকারী নহে। ইহা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধনকারী মাত্র। সুতরাং অন্যান্য সংঘের কর্মক্ষেত্রে অহেতুকভাবে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার ইহার নাই।

বহুত্ববাদের সূত্রপাত—গিয়ার্কে ও মেটল্যাণ্ড

ফিগিসের পর ফ্রান্সে ডুগুই (Leon Duguit), হল্যাণ্ডে ক্র্যাব (Krabbe) এবং ইংল্যাণ্ডে অধ্যাপক ল্যাস্কি বহুত্ববাদকে আরও পরিস্ফুট করেন। ডুগুই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া সংঘস্বাতন্ত্র্যের পথ অধিকতর প্রশস্ত করেন। ক্র্যাব প্রায় ডুগুইকে অনুসরণ করিয়াই ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্র আইনের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং আইনই সার্বভৌম—রাষ্ট্র নহে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, রাষ্ট্রের আইনসংগত সার্বভৌমিকতা হইল অন্যতম "আইনের কল্পনা এবং শূন্যগর্ভ ধারণা।"** তিনি বলেন, সামাজিক জীবনে এমন বহু কার্য আছে যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত হয় না—হইতে পারে না। সুতরাং নিজস্ব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রও যেমন সার্বভৌম, অন্যান্য সংঘও তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে

বহুত্ববাদের পরিস্ফুটন—ফিগিস, ডুগুই, ক্র্যাব, ল্যাস্কি প্রভৃতি

ল্যাস্কির বহুত্ববাদ—সমাজ সংঘমূলক বলিয়া কর্তৃত্বও সংঘমূলক

* "The Internationalists would shackle the Leviathan with chains while the Pluralists would perform the necessary operations of his interior."

** The doctrine of absolute sovereignty is "a legal fiction and a barren concept."

তেমনিই সার্বভৌম। এক কথায় সমাজ যুক্ত-প্রতিষ্ঠান বা সংঘমূলক বলিয়া কর্তৃত্বও সংঘমূলক। কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার নহে।

উপরি-উক্ত বহুত্ববাদিগণের পর কোল (G. D. H. Cole), হবসন (S. G. Hobson), লিণ্ডসে, বার্কার, ম্যাক্‌আইভার, ফলেট প্রভৃতি বহুত্ববাদকে সমর্থন করিয়াছেন। কোল ও হবসন বহুত্ববাদের মাধ্যমে সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদের (Guild Socialism) প্রচার করিয়াছেন। কোল বলেন মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে; সুতরাং মানুষই ইহার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। অধিকতর কাম্য সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় মানুষ রাষ্ট্রকে কর্তৃত্বের আসন হইতে নীচে নামাইয়া আনিতে পারে। ফলেট সংঘগুলির দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক কার্য সম্পাদনের পক্ষপাতী। ম্যাক্‌আইভারের মতে, রাষ্ট্রের কার্যাবলী একটু বিশেষ ধরনের হইলেও রাষ্ট্র কোন অসাধারণ সংগঠন নহে। বার্কার বিভিন্ন সংঘের নিজস্ব ক্ষমতায় বিশ্বাস না করিলেও তাহাদের নিজস্ব কার্যাবলী ও স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করেন।

বহুত্ববাদের সমর্থকগণ

সমালোচনা : বহুত্ববাদ অন্যতম আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ। সর্বাত্মক, সর্বময়, অপ্রতিহত ও চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে-প্রতিক্রিয়া তাহাই একদিকে মতবাদের জগতে বহুত্ববাদের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রতিক্রিয়াকে স্বাভাবিক বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের আইনসংগত সার্বভৌমিকতা ব্যবহারিক জীবনে সরকার কর্তৃকই প্রযুক্ত হয়। সরকার গঠিত হয় সাধারণ লোককে লইয়া। তাহারা আমাদের মতই দোষত্রুটিসম্পন্ন। সুতরাং তাহাদের হস্তে চরম, অপ্রতিহত, সর্বাত্মক ক্ষমতা অর্পণ করা বিপজ্জনক। ইহাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিনাশ ও স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলা হয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বেরও যে একটা সীমা আছে তাহা বহুত্ববাদিগণ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন। এই দিক দিয়া বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের আদর্শবাদের বিরুদ্ধে অন্যতম কাম্য প্রতিক্রিয়া।

গুণ : ১। মতবাদের জগতে সর্বময়, সর্বাত্মক, চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াই বহুত্ববাদ

২। বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের আদর্শবাদের বিরুদ্ধে কাম্য প্রতিক্রিয়া

দ্বিতীয়ত, সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইলে সমাজ-কল্যাণ ব্যাহত হয়, কারণ "রাষ্ট্রযন্ত্র জটিল, ধীরগতিসম্পন্ন ও অপচয়পূর্ণ।" সুতরাং বহুত্ববাদিগণ যুক্তিসংগতভাবেই 'সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা' সমগ্র সামাজিক সংঘের মধ্যে বণ্টনের পক্ষপাতী।

৩। বহুত্ববাদ যুক্তিসংগতভাবেই চরম ক্ষমতা বণ্টনের পক্ষপাতী

তৃতীয়ত, সমাজ-সংগঠনকে পরম্পরাগত সার্বভৌমিকতার মত শুধু আইনের দৃষ্টিতে দেখা যে ত্রুটিপূর্ণ তাহা বহুত্ববাদ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করে। সমাজজীবনে যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে এবং বর্তমানে সংঘজীবন যে বিশেষ স্থানাধিকার করিয়া আছে তাহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া বহুত্ববাদিগণ রাষ্ট্রনীতিকে বিশেষভাবে বাস্তবধর্মী করিয়া তুলিয়াছেন। প্রধানত বহুত্ববাদের ফলেই আইনসভা-সমূহে সংঘপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইয়াছে।

৪। বহুত্ববাদ রাষ্ট্রনীতিকে অনেকাংশে বাস্তবধর্মী করিয়াছে

কিন্তু উপরি-উক্ত গুণ সত্ত্বেও বহুত্ববাদ ত্রুটিহীন নহে। বহুত্ববাদের বিশেষ ত্রুটি একত্ববাদিগণের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। একত্ববাদের সমর্থকগণ বিশ্বাস করেন যে, বহুত্ববাদিগণ নৈতিক ও আইনসংগত ধারণার মধ্যে পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অন্যতম আইনমূলক ধারণা, ইহার সহিত নীতিশাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই; রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যে নীতিশাস্ত্রের সূত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ তাহা অস্বীকার করা হয় না। বিভিন্ন সংঘের স্বাতন্ত্র্যের যে অধিকার রহিয়াছে বলিয়া বহুত্ববাদিগণ প্রচার করেন তাহা নৈতিক অধিকার মাত্র, আইনসংগত অধিকার নহে। বহুত্ববাদিগণ কিন্তু ইহাকে অনেক সময় আইনসংগত অধিকারের পর্যায়ভুক্ত করিয়া নৈতিক ও আইনমূলক ধারণার মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলেন।

ত্রুটি: ১। ইহা নৈতিক ও আইনসংগত ধারণার মধ্যে পার্থক্য করে না

একত্ববাদের সমর্থকগণ আরও বিশ্বাস করেন যে বহুত্ববাদিগণ সার্বভৌমিকতা ও ব্যক্তির আনুগত্যকে বিভক্ত করিয়া বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যবাদের পথিকৃৎ হিসাবে কার্য করিতেছেন। এই দিক দিয়া বহুত্ববাদ ইতিহাসের পশ্চাৎগতির লক্ষণ। কারণ, ইহা রাষ্ট্র সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ধারণা পোষণ করে।

২। বহুত্ববাদিগণ বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যবাদের পথিকৃৎ হিসাবে অভিযুক্ত হইয়াছেন

বহুত্ববাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা সমাজজীবনে সমগ্র আইনসংগত দ্বন্দ্ব-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য একটি চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেও স্পষ্টভাবে ইহা স্বীকার করে না। বহুত্ববাদের নির্দেশমত সমাজজীবনে বিভিন্ন সংঘকে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব করিলেও রাষ্ট্রের অসাধারণত্ব বজায় থাকিবে। কারণ, বিভিন্ন স্বতন্ত্র সংঘের মধ্যে দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা তখনও কোন একটি সংগঠনকেই করিতে হইবে। বহুত্ববাদিগণ স্বীকার করেন যে রাষ্ট্রের হস্তেই এই দ্বন্দ্ব-মীমাংসার বা সমন্বয়সাধনের ভার দেওয়া উচিত। ইহার ফলে রাষ্ট্র কি সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে না? একত্ববাদিগণের এই প্রশ্নের উত্তর বহুত্ববাদে পাওয়া যায় না।

৩। বহুত্ববাদ সমাজজীবনে চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে না

ল্যাস্কির মতে, রাষ্ট্র যে শ্রেণীসম্বন্ধের প্রকাশ বহুত্ববাদ তাহা বিশেষ উপলব্ধি করে না।* ইহা বহুত্ববাদের আর একটি ত্রুটি। সমাজে যে-শ্রেণীর হস্তে উৎপাদনের উপাদানগুলি থাকে রাষ্ট্র তাহাদের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন সর্বাত্মক, সর্বময়, চূড়ান্ত অপ্রতিহত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের একটি আইনগত ব্যাখ্যা। এদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সংঘস্বার্থে গুরুত্ব আরোপ করে বলিয়া বহুত্ববাদ একদিকে বিশেষ বাস্তবধর্মী নহে।

৪। ল্যাস্কির মতে, বহুত্ববাদ রাষ্ট্রকে শ্রেণীসম্বন্ধের প্রকাশ হিসাবে দেখে না

উপসংহারে বলা যায়, যে-যুগে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও বিশেষ স্বার্থের মধ্যে ব্যক্তির আনুগত্য লইয়া সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় সেই যুগেই বহুত্ববাদের উদ্ভব হয়। মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্ম-

* It does not sufficiently "realise the nature of the state as an expression of class-relations."

প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংঘ এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে বহুত্ববাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থ ও আর্থিক সংঘ প্রবল হওয়ায় বহুত্ববাদ আবার বিশেষভাবে প্রবল হইয়াছিল। রাষ্ট্র যখন এই সকল স্বার্থ ও সংঘকে মানিয়া লইয়া তাহাদের কর্মক্ষেত্রের সীমা নির্দেশ করিয়া দিল তখন আবার বহুত্ববাদ একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গেল। বর্তমানে শ্রমিক-সংঘের ন্যায্য অধিকার আছে, শ্রমিক-স্বার্থ আইনানুমোদিত হইয়াছে। সুতরাং বহুত্ববাদ আধুনিক হইলেও একরূপ ঐতিহাসিক মতবাদে পরিণত হইয়াছে।

উপসংহার

সংক্ষিপ্তসার

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ আইনগত। রাষ্ট্রের প্রসংগে সার্বভৌমিকতা শব্দটি দ্বারা আইন প্রণয়ন ও বলবৎকরণের ক্ষমতা বুঝায়। সংক্ষেপে, রাষ্ট্রের আইনগত চূড়ান্ত, অপ্রতিহত এবং চরম ক্ষমতাই হইল সার্বভৌমিকতা।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে শেষ কথাটি বলিবার, শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার, চূড়ান্ত আদেশ জারি করিবার ক্ষমতাকেই আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলা হয়। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীন বা স্বাধীনতা বুঝায়।

বলা হয়, এই যুদ্ধোত্তর যুগে অধিকাংশ রাষ্ট্রই প্রকৃত সার্বভৌমিকতার অধিকারী নহে। ইহার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে, সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণাই তত্ত্বগত বা আইনগত। আইনের দৃষ্টিতে এই সকল রাষ্ট্রের প্রত্যেকটিই সার্বভৌম।

সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য হইল সংখ্যায় পাচটি—(১) পূর্ণতা বা চরমতা, (২) সর্বজনীনতা, (৩) স্থায়িত্ব, (৪) অবিভাজ্যতা, এবং (৫) হস্তান্তর-যোগ্যতাহীনতা।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণার ক্রমবিকাশ : সার্বভৌমিকতার স্বরূপ প্রাচীন লেখকগণের নিকট অজ্ঞাত না থাকিলেও এই সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে মধ্যযুগে। মধ্যযুগে জাতীয় রাষ্ট্রের (National State) উদ্ভব হয়। সার্বভৌমিকতাকে এই জাতীয় রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা হয়।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদ পরিস্ফুটনে যে কয়জন দার্শনিকের নিকট রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিশেষ ঋণ স্বীকার করেন তাহারা হইলেন বোদাঁ, গ্রোটিয়াস, হবস্, রুশো এবং অষ্টিন। অষ্টিনের হস্তেই সার্বভৌমিকতা পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে।

সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন রূপঃ সার্বভৌমিকতা বর্তমানে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—যথা, নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা, আইনসংগত সার্বভৌমিকতা, রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা, আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতা এবং জনগণের সার্বভৌমিকতা।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অষ্টিনের মতবাদ ঃ আইনসংগত সার্বভৌমিকতার প্রধান ব্যাখ্যাকর্তা হইলেন ইংরাজ আইনানুগ দার্শনিক জন অষ্টিন। অষ্টিনের মতে, প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক ও স্বাধীন সমাজে এমন এক ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের সন্ধান পাওয়া যায় যিনি বা যাঁহারা কাহারও প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন না, কিন্তু অধিকাংশের নিকট হইতে স্বভাবজাত আনুগত্য পাইয়া থাকেন। এইরূপ সমাজে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদই হইলেন সার্বভৌম।

বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, অষ্টিনের মতে, সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের চরম, অপ্রতিহত এবং শাশ্বত ক্ষমতা যাহা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের মধ্যে অবস্থিত। এই সার্বভৌমের আদেশই আইন।

সমালোচনা ঃ সমালোচকগণ বলেন, অষ্টিন রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন—সমাজজীবনে যে-সকল প্রভাব আইনসংগত সার্বভৌমকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহাদের প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করেন নাই। দ্বিতীয়ত, অষ্টিনের ধারণা জনগণের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে বলিয়া ইহা গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী। তৃতীয়ত, অষ্টিন প্রথাগত আইনকেও উপেক্ষা করিয়াছেন। চতুর্থত, তিনি মনে করিয়াছেন যে বলপ্রয়োগের ভয়েই লোকে আইন মান্য করে। পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় অষ্টিন-নির্দিষ্ট সার্বভৌমিকতার সন্ধান পাওয়া যায় না। পরিশেষে, সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য এবং অনিয়ন্ত্রিত নহে, ইহা বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিভাজ্য এবং আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

অষ্টিনের মতবাদের সমালোচনা অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই অযৌক্তিক হইয়াছে। অষ্টিন পাশবিক বলকে কখনই সার্বভৌমিকতার ভিত্তি বলিয়া মনে করেন নাই। যাহা হউক, শুধু আইনসংগত সার্বভৌমিকতার স্বরূপ বর্ণনার দিক হইতে দেখা হইলে অষ্টিনের মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম সার্থক সৃষ্টি।

যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় ঃ যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় লইয়া মতদ্বৈধতা আছে। অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা সংবিধানের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু সংবিধান অপরিবর্তনীয় নহে বলিয়া এই মতকে মানিয়া লওয়া যায় না। ল্যাস্কির মতে, যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বহুত্ববাদ ঃ একত্ববাদ বা রাষ্ট্রের আইনসংগত সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধ মতবাদকেই বহুত্ববাদ বলে। বহুত্ববাদিগণের মতে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা একটি কুসংস্কার মাত্র। সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য নহে এবং রাষ্ট্রেরও একচেটিয়া অধিকার নহে। সমাজ সংঘমূলক বলিয়া সংঘসমূহও স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম। সুতরাং ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার, ইহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার এক্তিয়ার রাষ্ট্রের নাই। উপরন্তু রাষ্ট্র আইনের উৎস নহে ; রাষ্ট্র আইনের ঊর্ধ্বেও নহে। সুতরাং, রাষ্ট্র ও সংঘসমূহ নিজ নিজ এলাকার মধ্যে থাকিয়া আপনাপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবে।

সমালোচনা ঃ সর্বময়, সর্বাত্মক, চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াই বহুত্ববাদ। ইহা যুক্তিসংগতভাবেই সমাজের চরম ক্ষমতা বণ্টনের পক্ষপাতী। ইহা সংঘসমূহের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাষ্ট্রনীতিকে বাস্তবধর্মী করিয়াছে।

কিন্তু বহুত্ববাদ ত্রুটিবিহীন নহে। ইহা নৈতিক ও আইনসংগত ধারণার মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করে না। ইহা সমাজজীবনে চূড়ান্ত ক্ষমতার অবস্থান সম্পর্কে কোন ইংগিত দেয় না। ইহা রাষ্ট্রকে শ্রেণীসম্বন্ধের প্রকাশ হিসাবেও দেখে না। পরিশেষে, ইহা বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যবাদকে আহ্বান করে।

বহুত্ববাদ সাম্প্রতিক রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ নহে, ইহা একরূপ ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Diccuss the nature of Sovereignty. How far can Sovereignty be said to belong to the people ? (C. U. 1947, '49, '54) (১০৮-১১১ এবং ১২০-১২২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the nature of Sovereignty, and distinguish between (a) Legal and Political Sovereignty, (b) *De Jure* and *De Facto* Sovereignty. (C. U. 1960)
(১০৮-১১১ এবং ১১৭-১২০ পৃষ্ঠা)

3. Give a critical estimate of the Pluralistic attacks on the traditional theory of Sovereignty. (C. U. 1954) (১২৮-১২৯, ১৩৩-১৩৪ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the pluralistic criticism of the classical theory of Sovereignty.
(B. U. 1961) (১২৮-১২৯, ১৩৩-১৩৪ পৃষ্ঠা)

5. "The State is limited within ; it is also limited without." Examine the statement. (C. U. 1957)

[ইংগিত : বোদাঁ, হবস্, বেন্থাম ও অষ্টিনের দ্বারা পরিস্ফুটিত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা সাম্প্রতিক যুগে দুই দিক দিয়া আক্রান্ত হইয়াছে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক দিয়া। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার সমালোচনা করিয়াছেন বহুত্ববাদিগণ এবং বাহ্যিক সার্বভৌমিকতার সমালোচনা করিয়াছেন আন্তর্জাতিকতাবাদিগণ। এবং ১২৮-১৩১, ১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।]

6. Discuss the Austinian Theory of Sovereignty. (C. U. 1954)

[ইংগিত : আইনসংগত সার্বভৌমিকতার প্রধান ব্যাখ্যাকর্তা হইলেন অষ্টিন। তাঁহার সংজ্ঞানুসারে "যদি কোন সমাজে কোন নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ অপর কোন ঊর্ধ্বতনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে কিন্তু সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য পাইয়া আসিতে থাকে, তবে সেই সমাজে ঐ নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদই সার্বভৌম এবং এইরূপ সমাজ রাষ্ট্রনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।" এবং সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে সার্বভৌমিকতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় : (ক) প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সমাজে কোন-না-কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের সন্ধান পাওয়া যায় যিনি বা যাঁহারা সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করেন। (খ) এই সার্বভৌম ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ হইলেন নির্দিষ্ট। (গ) সার্বভৌমিকতার অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ কাহারও আনুগত্য স্বীকার করেন না এবং ইঁহার বা ইঁহাদের ইচ্ছা কোন কিছু দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সুতরাং সার্বভৌমিকতা চরম, অসীম, সর্বপরিব্যাপ্ত ও অবিভাজ্য। (ঘ) এই সার্বভৌম শক্তির প্রতি জনসাধারণ স্বভাবতই আনুগত্য স্বীকার করে। আইন বলিতে সার্বভৌমের আদেশকেই বুঝায়।

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে অষ্টিনের মতবাদ বিভিন্নভাবে সমালোচিত হইয়াছে। বলা হয় যে, এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে আইনমূলক মতবাদ। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। বর্তমানে গণতন্ত্রের ভিত্তি জনগণের সার্বভৌমিকতার আদর্শের সহিত ইহার সংগতি নাই। ইহা ছাড়া কোন সার্বভৌম আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হন নাই। অষ্টিন-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নহে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে বহু প্রথাগত আইন আছে যাহা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের আদেশমাত্র নহে। ইহার উত্তরে অবশ্য অষ্টিন বলিয়াছেন যে সার্বভৌম যাহা অনুমোদন করেন তাহাই তাঁহার আদেশ। আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের সন্ধান পাওয়া যায় না যাঁহার বা যাঁহাদের মধ্যে সার্বভৌমিকতার অবস্থান নির্ণয় করা যায়। পরিশেষে, আন্তর্জাতিকতাবাদী ও বহুত্ববাদিগণ কর্তক চরম ও অপ্রতিহত সার্বভৌমের ধারণা সমালোচিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিকতাবাদিগণের মতে, সকল রাষ্ট্রেরই বাহ্যিক চরম ক্ষমতা আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। বহুত্ববাদিগণ বলেন যে সমাজ সংঘমূলক। সমাজের মধ্যে যে নানাপ্রকার সংঘ আছে তাহাদের মধ্যেই মানুষের সত্তা বিকশিত হয়—একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের মধ্যে নয়। এই সমস্ত সংঘও রাষ্ট্রের মত স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম। সম্প্রতি অবশ্য সমালোচকগণ অষ্টিনের মতবাদ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করিতেছেন। ...এবং ১২২-১২৬ পৃষ্ঠা দেখ।]

সপ্তম অধ্যায়

আইন

(LAW)

সার্বভৌমিকতার পরই আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়, কারণ সার্বভৌমিকতা হইল আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়।

আইনের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা **(Nature and Definition of Law) :** আইনকে নিয়মকানুন বা বিধি বলিয়া অভিহিত করা যায়। ব্যাপকভাবে দেখিলে এই নিয়মকানুন বা বিধির বিভিন্ন অর্থ করা যায়। প্রাকৃতিক জগতে ঘটনাবলীর মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক দেখা যায় তাহাকে বৈজ্ঞানিক বিধি (Scientific Law) বলা হয়। আবার সমাজজীবনে মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অনেক রকমের বিধি আছে। যে সকল নিয়মকানুন ভালমন্দ ন্যায়অন্যায় ইত্যাদি নৈতিক প্রশ্নের সহিত জড়িত তাহাদিগকে নৈতিক বিধি (Moral Laws) বলা হয়। ব্যক্তির উদ্দেশ্য (motives) এবং বিবেক (conscience) লইয়াই নৈতিক বিধির কাজ-

আইন ও অন্যান্য সামাজিক বিধির মধ্যে পার্থক্য

কারবার। আবার দেখা যায়, মানুষের বাহ্যিক আচরণকে (external behaviour) নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সমাজে নানাপ্রকার রীতিনীতি (custom), চিরাচরিত প্রথা, ফ্যাশন প্রভৃতি প্রচলিত থাকে। এগুলিকে সামাজিক বিধি বা আইন (Social Laws) বলা হয়। জনমতের চাপে মানুষ এই সকল সামাজিক বিধি মানিয়া চলে, কারণ অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সকলের উপহাস বা নিন্দার পাত্র হইয়া দাঁড়ায়। পরিশেষে, মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বা স্বীকৃত যে সকল নিয়মকানুন থাকে তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় বিধি (political laws and positive laws) বলা হয়। রাষ্ট্রের বিধি বা আইনের সংগে সমাজজীবনের অন্যান্য বিধির প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। আইন মান্য না করিলে সার্বভৌম শক্তি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদান করিতে পারে;* অন্য কোন প্রকার বিধি অমান্য করিলে ব্যক্তিকে বিবেকের দংশন অথবা সমাজের সমালোচনা অথবা সভ্যপদচ্যুতির শাস্তি সহ্য করিতে হইতে পারে মাত্র। সভ্য সমাজে আইন ছাড়া অন্য কোন প্রকার বিধি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বলবৎ করা হয় না;** তাহারা সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্টও নহে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একমাত্র রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট বিধি বা আইন লইয়াই আলোচনা করা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একমাত্র রাষ্ট্রের বিধি লইয়া আলোচনা করা হয়

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট বিধি বা আইনের সংজ্ঞা দিয়াছেন। অষ্টিনের ন্যায় বিশ্লেষণী আইনানুগগণের (Analytical Jurists) মতে, আইন হইল নিম্নতনের প্রতি উর্ধ্বতন রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ মাত্র। সুতরাং আদেশ বা আজ্ঞাই আইনের ভিত্তি। সাম্প্রতিক কালের বিশ্লেষণীপন্থী লেখক হল্যাণ্ড (Holland) বলেন, "সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়মই আইন।"† স্যর হেনরী মেইনের ন্যায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন লেখকগণ আইনের এই সংজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। মেইন বলেন, সকল প্রচলিত আইনকেই সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলিয়া অভিহিত করা অযৌক্তিক—কারণ এমন অনেক আইন আছে যাহা সম্পূর্ণ প্রথাগত, সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কখনও প্রণীত হয় নাই। এই ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকগণের মতে, সাধারণের সম্মতি ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব উভয়ে মিলিয়াই আইনের সৃষ্টি করে, একমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব নহে।

আইনের প্রকৃতি লইয়া বিশ্লেষণী আইনানুগ ও ঐতিহাসিক আইনানুগগণের মধ্যে মতবিরোধ

ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকগণের সমালোচনার উত্তরে অষ্টিনের অনুগামীরা বলেন যে, প্রথা আপনা হইতেই আইনে পরিণত হয় না; আইনে পরিণত হইবার

* "The last resort of enforcement lies behind law." MacIver

** "The law of the State alone, in a demarcated and advanced society, is coercive." MacIver

† "A law is a general rule of external action enforced by the sovereign political authority."

জন্য প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। ইহা অবশ্য সত্য যে, বহুদিন পর্যন্ত প্রথাগত আইনই একমাত্র আইন ছিল এবং আজও আইনের উপর প্রচলিত প্রথার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। জনমতের চাপ এবং সাধারণভাবে গ্রাহ্য নৈতিক বিধি আজও আইনকে রূপদান করিয়া থাকে; সম্পূর্ণভাবে জনমতবিরোধী কোন আইন কার্যকর হয় না। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন প্রথা বা নৈতিক বিধি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হয় ততক্ষণ ইহা আইনে পরিণত হয় না। সমাজজীবনে অসংখ্য প্রচলিত প্রথা আছে। ইহাদের কতকগুলি স্পষ্ট, কতকগুলি অস্পষ্ট; কতকগুলির পশ্চাতে বিপুল জনমতের সমর্থন আছে, অন্যগুলির সমর্থক সংখ্যায় নগণ্য। এইরূপ অসংখ্য প্রথার মধ্যে কতকগুলিকে বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে সর্বজনগ্রাহ্য করিয়া তোলাই রাষ্ট্রের কার্য। ইহাকেই ব্যাপক অর্থে 'আইন প্রণয়ন' (Law-making) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সার্বভৌম শক্তি তাহাই করে। সুতরাং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা অনুমোদিত ও প্রযুক্ত বিধিনিয়মই আইন।

আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব দ্বারা অনুমোদিত ও প্রযুক্ত বিধিনিয়মই আইন

আইনের উপরি-উক্ত প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে রাষ্ট্রপতি উইলসন প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞায়। উইলসনের মতে, "আইন হইল মানুষের স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে।"* অতএব, আইনের উপাদান হইল প্রচলিত আচার-ব্যবহার। এগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইলে তবেই আইনের মর্যাদালাভ করে। আইন সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয়, ইহাদের সাহায্যে সাধারণভাবে সকলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইহারা সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় বলিয়া ইহাদের অমান্য করিলে বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে।

রাষ্ট্রপতি উইলসন প্রদত্ত সংজ্ঞা

আইন কি সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ? (Is Law the Expression of the General Will of the Community ?):

রুশোকে অনুসরণ করিয়া অনেক সময় আইনকে 'সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। রুশো তাঁহার সামাজিক চুক্তি মতবাদে যে-রাষ্ট্রের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সাধারণের ইচ্ছায় পরিচালিত সর্বাত্মক ও সর্বক্ষম রাষ্ট্র। এই সাধারণের ইচ্ছা সকলের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয়। ইহার প্রকাশই আইন। রুশোর মতে, আইনের একটি মাত্র উৎস আছে এবং তাহা হইল সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছা। অন্য যে-কোন সূত্র হইতে উদ্ভূত আদেশ বা নিয়মকে আইন বলিয়া গণ্য করা চলিতে পারে না। ল্যাস্কি বলেন, আইনের এই অর্থ গ্রহণ করিলে কল্পনা করিতে হইবে

রুশোর মতে, আইনের উৎস

* 'Law is that portion of the established thought and habit which has found a distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the government.' Woodrow Wilson, The State

যে, সাধারণের ইচ্ছা সর্বদাই কার্য করিতেছে—রাষ্ট্র চিরন্তন গণভোট (permanent referendum) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। বস্তুত, এইরূপ চিরন্তন গণভোট দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রকেই রুশো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আখ্যা দিয়াছেন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণা

সমালোচনা ঃ আইনকে সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ করিয়া এইভাবে অভিহিত করার বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল যে, রুশো তাঁহার তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে—যেখানে চিরন্তন গণভোট দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানের বিরাট রাষ্ট্রসমূহে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার কল্পনাই করা যাইতে পারে না। স্বতরাং আজিকার দিনে সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ সম্বন্ধে ধারণা করিতে হয় প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে। বার্কারকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, সাধারণে দেশের মৌলিক আইন বা সংবিধান প্রণয়ন করে—অন্তত অনুমোদন করিয়া লয় ; এবং সাধারণের প্রতিনিধিবর্গ সংবিধান-প্রদত্ত কর্তৃত্বানুসারে আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাধারণের সকলেই সংবিধান বা মৌলিক আইন অনুমোদন করে না—সংখ্যাগরিষ্ঠ দল করে মাত্র ; এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের (সংখ্যালঘিষ্ঠেরও হইতে পারে) প্রতিনিধিবর্গ সংবিধান-প্রদত্ত কর্তৃত্বের ব্যবহার করে। স্বতরাং যাহাকে সম্প্রদায়ের সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। বস্তুত, 'রুশোর সাধারণের ইচ্ছা মতবাদের' (Theory of General Will) ইহাই প্রধান ত্রুটি এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া আদর্শবাদে ন্যায় ও গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচারিতার সমর্থন করা হইয়াছে।*

১। আজিকার বিরাট রাষ্ট্রে ইহা অকল্পনীয়

২। ইহাতে আদর্শের নামে অন্যায়ানুষ্ঠান চলিতে পারে

এই মতবাদের বিরুদ্ধে আরও বক্তব্য হইল যে, রুশো সাধারণের ইচ্ছাকে সর্বদাই সাধারণের স্বার্থের অনুপন্থী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। স্বতরাং সাধারণের ইচ্ছায় প্রণীত সকল আইনই সাধারণের স্বার্থসাধন করিবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহু আইন মাত্র শ্রেণীবিশেষের স্বার্থসাধন করে। আইনের কাজ হইল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করা। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি হইবে না হইবে, তাহা মূলত নির্ধারিত হয় সম্পত্তি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তিশীল শ্রেণীসম্পর্কের দ্বারা। শ্রেণীবিভক্ত রাষ্ট্রে যে-শ্রেণী প্রতিপত্তিশালী তাহাদের স্বার্থেই প্রধানত আইন কার্য করে। যেমন, দাস সমাজে আইনের উদ্দেশ্য হইল দাসপ্রভুদের স্বার্থ চরিতার্থ করা। আবার সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন জমির মালিকদের অনুকূলেই কাজ করে। পুঁজিবাদী সমাজে আইন প্রধানত মূলধন-মালিকের স্বার্থসাধনই করিয়া থাকে, যদিও শ্রমিকদের তুলনায় মালিকরা সংখ্যায় নগণ্য। স্বতরাং রাষ্ট্রের আইনকানুন সাধারণত রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ অর্থ-ব্যবস্থা (economic

৩। আইন সর্বদা সাধারণের স্বার্থসাধন করে না

* ১০২ পৃষ্ঠা দেখ।

system) এবং শ্রেণীসম্পর্কেরই আপেক্ষিক হয়। এই দৃষ্টিভংগি হইতে আইনের সংজ্ঞা দাঁড়ায় এইরূপ ঃ আইন হইল মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সেই সকল নিয়মকানুন যাহা সমাজের প্রচলিত শ্রেণীবিন্যাসের (class-structure) উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে ও যাহা প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা বলবৎ করা হয়।* এই আলোচনার ভিত্তিতে বলিতে পারা যায়, যে-সমাজে উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা সমগ্র সমাজের হস্তে ন্যস্ত এবং শ্রেণীদ্বন্দ্ব নাই একমাত্র সেইরূপ সমাজেই আইন সমগ্র সমাজের অনুকূলে কার্য করে।

উপসংহার

সুতরাং দেখা যাইতেছে, তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয়ের কোনটির দিক দিয়াই আইনকে সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া গণ্য করা চলিতে পারে না। আদর্শের দিক দিয়া হয়ত' চলিতে পারে ; কিন্তু ইহাতে বিপদের বিশেষ আশংকা রহিয়াছে। ইহাতে আইন ও স্বাধীনতা অভিন্ন বলিয়া প্রচার করিয়া স্বৈরাচারিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আদর্শবাদে তাহাই করা হইয়াছে।

এক দিক দিয়া আইন সাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে

তবে 'সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছা' কথাটিকে যদি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়—অর্থাৎ সাধারণের ইচ্ছা (General Will) বলিতে যদি জনমতকে নির্দেশ করা হয়, তাহা হইলে আইনকে ইহার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আইন সাধারণ ক্ষেত্রে জনমতেরই অনুপন্থী হয়। যে-আইন জনমত-বিরোধী, যে-আইন জনসাধারণের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন। অনেক সময় তর্জন-গর্জন, গুলিগোলা দ্বারাও ইহাকে কার্যকর করা যায় না। শাসনের বেড়াজাল দিন দিন কঠিনতর করা যাইতে পারে, কিন্তু দুর্বলেরও বল আছে ; তাহারাও বিশেষ ক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আইনের বিরোধিতা করিতে চেষ্টা করে।** অতএব, অকাম্য আইন যদি চালু করিতে হয় তবে জনমতকেও প্রয়োজনমত গড়িয়া তুলিতে হইবে। একনায়কতন্ত্রের অধীনে এইরূপই করা হয়।

স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে ধারণার সংক্ষিপ্তসার

***স্বাভাবিক আইন* (Natural Law) ঃ** একদল লেখক আছেন যাঁহারা বলেন, আইন সার্বভৌম শক্তির আদেশও নয়, প্রচলিত আচার-ব্যবহারও নয়। ইঁহাদের মতে, ঐশ্বরিক অনুজ্ঞা কিংবা মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত ন্যায়ের মৌলিক নীতিগুলি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়াই আইন রূপে প্রচলিত থাকে। এই অর্থে আইন রাষ্ট্রের পূর্বতন ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ঊর্ধ্বতন।

* "Law is those rules of behaviour which secure the purposes of the society's class-structure and will be, if necessary, enforced by the coercive power of the State." Laski

** "Obedience is the normal habit of mankind, but marginal cases continuously recur in history when decision to disobey is painfully taken and passionately defended." Laski... ১১৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখ।

আইন সম্বন্ধে এই ধারণা প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক দার্শনিকগণ মানুষের প্রণীত আইন ও স্বাভাবিক আইনের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছিলেন। এ্যারিষ্টটল বিশেষ আইন (particular law) এবং বিশ্বজনীন আইনের (universal law) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া শেষোক্ত আইনকে স্বাভাবিক আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহা স্বাভাবিক কারণ, এ্যারিষ্টটলের মতে, সকল মানুষের মধ্যে যে-স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায়বোধ রহিয়াছে, ইহা তাহারই প্রকাশ। মানুষের স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায়বোধ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব, স্বাভাবিক আইন রাষ্ট্রের পূর্বতন। এ্যারিষ্টটলের পর জেনো (Zeno) এবং রোমক ষ্টোইক দার্শনিকগণ কর্তৃক স্বাভাবিক আইন পরিস্ফুটিত হইবার পর ইহা রোমক বিধিশাস্ত্রের (Roman Jurisprudence) অন্তর্ভুক্ত হয়। রোমক দার্শনিকগণ স্বাভাবিক আইনকে সহজাত, চিরন্তন, অপৌরুষেয় ও অবাধ বলিয়া কল্পনা করিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, মানুষের আইন সকল সময় এই স্বাভাবিক আইনের অনুবর্তী হইয়া চলিবে। রোমক বিধিশাস্ত্র পৌর আইনের (*jus civile*) সংগে ক্রমে এই স্বাভাবিক আইনকেও (*jus naturale*) মানিয়া লয়। রোমক বিচারালয়সমূহে এই আইন প্রযুক্ত না হইলেও রোমক বিচারপতিগণকে ইহা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তারপর মধ্যযুগে আসিয়া স্বাভাবিক আইন প্রকৃত আইনের মর্যাদা পাইবার জন্য নির্দিষ্ট আইনের (positive law) সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। খ্রীষ্টধর্মপ্রতিষ্ঠান (Church) ইহাকে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা বলিয়া প্রচার করিয়া ইহার প্রতি নতি স্বীকার করিতে নির্দেশ দেয়; এবং কিছু পরবর্তী যুগে ধর্ম-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদের (secular rationalism) প্রচারকেরা যুক্তির ভিত্তিতে স্বাভাবিক আইনকে মানিয়া লইতে বলেন। বার্কারের ভাষায় বলা যায়, এইভাবে নির্দিষ্ট আইন ও স্বাভাবিক আইন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়।

এ্যারিষ্টটলের ধারণা

স্বাভাবিক আইনের রোমক বিধিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্তি

প্রাচীন গ্রীক, রোম্যান ও মধ্যযুগের স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে এই ধারণা আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্তমানে কেহ স্বাভাবিক আইনের অস্তিত্ব বিশ্বাস না করিলেও অনেকে বিশ্বাস করেন যে, কতকগুলি অপরিবর্তনীয় নীতি আছে যেগুলি ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে বলবৎ করা উচিত। বস্তুত, এগুলিকে বলবৎ করাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অপরিহার্য কর্তব্য। স্বাভাবিক আইনের সমর্থকগণের মতে, প্রত্যেক ন্যায়বোধ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট এই অপরিবর্তনীয়, ন্যায্য ও যুক্তিসংগত নীতিগুলি স্বতঃপ্রকাশিত। সুতরাং, তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করার প্রশ্ন উঠে না।

স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা

কোকার বলেন, "এই বিশ্বজনীনভাবে বাধ্যতামূলক স্বাভাবিক আইনের ব্যবহারিক ফল বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম দেখা গিয়াছে। স্বাভাবিক আইন মধ্যযুগে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা বা বলপ্রয়োগের দ্বারা অপরের সিংহাসন অধিকারের পথরোধ করিতে পারে নাই।" স্বাভাবিক আইনকে বলবৎ করিবার কোন উপায় নাই—উপায় কোনকালেই ছিল না। স্বাভাবিক সময়ে যখনই নির্দিষ্ট আইনের সহিত স্বাভাবিক আইনের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তখনই দেখা গিয়াছে যে, নির্দিষ্ট আইনই বলবৎ হইয়াছে এবং স্বাভাবিক আইন যতদূর বিরোধ ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইয়া গিয়াছে। বিপ্লবের সময় অবশ্য বিপরীত ঘটিয়াছে; তখন স্বাভাবিক আইনই কার্যকর হইয়াছে। যথা, আমেরিকার বিদ্রোহ ও ফরাসী বিপ্লবের সময় মানুষের নির্দিষ্ট আইন উপেক্ষা করিয়া স্বাভাবিক আইনের স্বতঃপ্রকাশিত অনুশাসনগুলিকেই মান্য করা হইয়াছিল।

সমালোচনা :
১। ব্যবহারিক ফলে বিভিন্নতা
২। ইহা মাত্র বিপ্লবের জন্যই প্রযুক্ত হয়

বার্কার বলেন, যে-আইন কেবল বিপ্লবের সময় এবং রাষ্ট্রের ধ্বংস-কার্যেই প্রযুক্ত হয় তাহাকে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দেওয়া চলিতে পারে না। প্রকৃত আইন সর্বদাই কার্যকর হইবে; ইহা রাষ্ট্রের সংরক্ষণ করিবে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হইবে। স্বাভাবিক আইন এই সর্ত কখনই পূরণ করিতে পারে নাই। সুতরাং কোনমতেই ইহা প্রকৃত আইনের মর্যাদা পাইতে পারে না। উপরন্তু, চিরন্তন অপরিবর্তনীয় নীতি বলিয়াও কিছু নাই। মানুষের ধারণা ও নীতি বিবর্তনশীল। ইহারা সর্বদাই স্থান, কাল ও সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক। ফলে আইনও বিবর্তনশীল; আইনকেও আপেক্ষিক হইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, স্বাভাবিক আইন আদর্শবাদী বা উদ্দেশ্যবাদীর কল্পনা মাত্র। আদর্শ সমাজ-প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমানির্দেশের উদ্দেশ্যেই ইহার কল্পনা করা হইয়াছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই আদর্শ আজ পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারা যায় নাই; এই উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই।

এই কারণেই ইহা প্রকৃত আইন হইতে পারে না

৩। ইহা আদর্শবাদী বা উদ্দেশ্যবাদীর কল্পনা মাত্র

***আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ* (Different Theories of Law)**: আইনের স্বরূপ ও উৎস সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যে-মতবিরোধ রহিয়াছে সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। এই মতবিরোধ অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিলেও বর্তমানে ইহা বিভিন্ন সামাজিক শাস্ত্রের চর্চার ফলে বহু শাখায় পল্লবিত হইয়া আইন সম্বন্ধে ধারণায় কতকটা জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। সেইজন্য এই মতবিরোধ সম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণত আইনের স্বরূপ ও উৎস সম্বন্ধে ধারণাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়—যথা, বিশ্লেষণমূলক ধারণা, ঐতিহাসিক ধারণা, দার্শনিক ধারণা, তুলনামূলক ধারণা ও সমাজ-বিজ্ঞানমূলক ধারণা।

আইনের স্বরূপ ও উৎস সম্বন্ধে ধারণার শ্রেণীবিভাগ

বিশ্লেষণমূলক ধারণা (Analytical Concept)ঃ সংক্ষেপে এই ধারণা অনুসারে আইন হইল কতকগুলি বিষয় সম্পাদন করিবার জন্য বা কতকগুলি বিষয় সম্পাদন হইতে বিরত থাকিবার জন্য সার্বভৌম শক্তির অনুজ্ঞা মাত্র। এই অনুজ্ঞা উপেক্ষা করিলে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে নির্ধারিত সুস্পষ্ট শাস্তিভোগের সম্ভাবনা থাকে। আইনের বিশ্লেষণমূলক ধারণা বিশেষ করিয়া অষ্টিনের নামের সহিতই জড়িত। ইহা বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আইন সম্বন্ধে আলোচনা করে; কিভাবে আইন বিবর্তিত হইয়াছে তাহা ইহা অনুসন্ধান করিয়া দেখে না। বিশ্লেষণমূলক ধারণা আইনসভার মাধ্যমে আইন-প্রণয়নের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

বিশ্লেষণমূলক ধারণার প্রকৃতি

বিশ্লেষণমূলক ধারণার ত্রুটি হইল যে, ইহা আইনকে স্থিতিশীল বলিয়া মনে করে। ফলে বিশ্লেষণমূলক আইনানুগগণ অনেক সময় এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হন যাহার সহিত বাস্তবের বিশেষ সম্পর্ক নাই। বিশ্লেষণমূলক ধারণার প্রধান গুণ হইল যে, ইহা সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত। উপরন্তু, হিতবাদের (utilitarianism) সহিত জড়িত হইয়া ইহা সাধারণের কল্যাণে আইনের নানারূপ কাম্য সংস্কারসাধন করিয়াছে।

এই ধারণার গুণাগুণ

ঐতিহাসিক ধারণা (Historical Concept)ঃ আইন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ধারণা হইল বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ হইতে ধারণা। বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত দিক দিয়া আইনের উদ্ভব হইতে আজ পর্যন্ত ইহার পরিস্ফুটন পর্যালোচনা করিয়া যে-ধারণা সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকেই ঐতিহাসিক ধারণা বলা হয়। প্যাটারসন (C. P. Patterson) বলেন, "ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভংগি গতালোচনায় নিবদ্ধ।"* অর্থাৎ, ইহা মোটেই আইনের বর্তমান অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করে না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই দৃষ্টিভংগি অনুসারে আইন অতীতের প্রথা, রীতিনীতি, সাধারণের সম্মতি প্রভৃতি প্রভাব দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে—হঠাৎ একদিন কোন আইন-প্রণেতা দ্বারা প্রণীত হয় নাই; এবং আইনের পশ্চাতে সার্বভৌম শক্তি আছে বলিয়াই লোকে আইন মান্য করে না, আইন মান্য করে প্রধানত স্বভাবগত কারণে এবং কতকটা আইন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াও।

ঐতিহাসিক ধারণার প্রকৃতি

ঐতিহাসিক ধারণার বিরুদ্ধে বক্তব্য হইল যে, ইহা আইনকে লইয়াই ব্যস্ত; আইনের দর্শনের (Legal Philosophy) উপর ইহা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে না। তবুও ইহার সপক্ষে বলিতে হয় যে, ইহা সামাজিক অবস্থার চিরপরিবর্তনশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া আইনের সদা-পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

এই ধারণার গুণাগুণ

---

* "Its point of view is retrospective. It sees law as a resultant of the entire play of the forces of the past."

দার্শনিক ধারণা (Philosophical Concept)ঃ দার্শনিক ধারণার সহিত অতীত বা বর্তমানের আইনের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। দার্শনিক আইনানুগগণ সম্পূর্ণভাবে তত্ত্বগত ধারণা লইয়াই সন্তুষ্ট। তাঁহারা নৈতিক সূত্র হিসাবে ন্যায়বোধের পরিস্ফুটন লইয়া চিন্তা করিয়া যুগে যুগে আদর্শ আইন সম্বন্ধে ধারণার প্রচার করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা স্বাভাবিক আইন লইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন; উনবিংশ শতাব্দীতে সার্থক আইনের সৃষ্টিই ছিল তাঁহাদের প্রচেষ্টা; এবং এই বিংশ শতাব্দীতে তাঁহাদের কর্তব্য হইতেছে আইনের মাধ্যমে সামাজিক অন্যায়ের দূরিকরণ ও সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। লর্ড ব্রাইস বলেন, এই সকল দার্শনিকদের কল্পনাপ্রসূত ধারণার সহিত বাস্তব জীবনের সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করা বিশেষ কঠিন।

ইহা বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন

তুলনামূলক ধারণা (Comparative Concept)ঃ আইন সম্বন্ধে তুলনামূলক ধারণার সৃষ্টি এখনও হয় নাই বলা চলে, কেবলমাত্র তুলনামূলক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। তুলনামূলক পদ্ধতি ঐতিহাসিক পদ্ধতি অপেক্ষা ব্যাপকতর; এবং এই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেগুলি বিশেষভাবে সমালোচনামূলক। এই পদ্ধতিতে আইন সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই কোন মতবাদের ইংগিত দেওয়া হয় না। বিভিন্ন দেশের অতীত ও বর্তমানের বিধি-ব্যবস্থা (legal systems) আলোচনা ও তাহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত করা হয় যাহা বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রাহ্য।

তুলনামূলক ধারণার সবে সূত্রপাত হইয়াছে

তুলনামূলক পদ্ধতিতে আইনের প্রকৃতির পর্যালোচনা সবেমাত্র সুরু হইলেও ইতিমধ্যেই ইহার ফলে আইনের প্রকৃতির উপর নূতনভাবে আলোকসম্পাত করা সম্ভব হইয়াছে।

সমাজবিজ্ঞানমূলক ধারণা (Sociological Concept)ঃ সমাজবিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে আইন বিভিন্ন সামাজিক প্রভাবের ফলে উদ্ভূত হয় এবং ইহার উদ্দেশ্য হইল সুন্দর সমাজজীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। এই কারণে শুধু আইনের স্বরূপের আলোচনাই যথেষ্ট নহে; আইন কি ভাবে প্রযুক্ত হয় তাহাও দেখিতে হইবে।

সমাজবিজ্ঞানমূলক ধারণার প্রকৃতি

বিশ্লেষণী আইনানুগগণের ধারণা যে আইনের পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই আইন মান্য করা হয় তাহা, সমাজবিজ্ঞানমূলক ধারণা অনুসারে, সম্পূর্ণ ভুল। ঐতিহাসিকগণের ধারণা যে আইন মান্য করা হয় প্রধানত স্বভাবগত কারণে তাহাও, সমাজবিজ্ঞানী আইনানুগগণের মতে, ভুল। ইঁহাদের মতে, আইন মান্য করা হয় আইন সমাজের উপকার করে বলিয়া। রাষ্ট্রকে সার্বভৌম এবং আইনের উৎস বলিয়াও এই

সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকগণ স্বীকার করেন না। আইন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উর্ধ্বে এবং আইনের উদ্ভব হয় সামাজিক স্বার্থ হইতে—ইহাই ইঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপসংহার : আইন সম্বন্ধে উপরি-উক্ত পাঁচটি ধারণারই সমর্থকগণ স্বীকার করেন যে, সুশৃংখল সমাজ-জীবনের জন্য আইন অপরিহার্য। সকলে ইহাও একরূপ স্বীকার করেন যে, আইনের সুস্পষ্ট রূপদান ও প্রবর্তনের পথে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। কিন্তু আইন প্রণয়ন, ঘোষণা ও বলবৎ করায় রাষ্ট্র ঠিক কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে সে সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। এই মতবিরোধ আইনের উৎসের জটিলতার ফল। রাষ্ট্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনকেই যদি সম্পূর্ণ আইন-প্রণয়ন বলিয়া মনে করা হইত তবে রাষ্ট্রই একমাত্র আইনের উৎসরূপে গণ্য হইত। কিন্তু আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধে ধারণার অস্পষ্টতা ও মতবিরোধের জন্য আইন সম্পর্কে রাষ্ট্রের ভূমিকা লইয়াও মতবিরোধ রহিয়া গিয়াছে।

আইনের ধারণা সম্বন্ধে মতবিরোধ আইনের উৎসের জটিলতার ফল

***আইনের উৎস* (Sources of Law) :** আনুষ্ঠানিকভাবে ধরিলে সার্বভৌম শক্তির অনুমোদনকেই একমাত্র আইনের উৎস বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। কারণ, রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত না-হওয়া পর্যন্ত কোন প্রথা বা রীতিনীতি বা ধর্মীয় অনুশাসন আইন বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়া আলোচনা করিলে আইনের বিভিন্ন উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুত, আইন রাষ্ট্রের মতই ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল। প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় হইতে মানুষ আইন সম্বন্ধে ধারণা লাভ করিয়াছে। এই বিষয়গুলিকেই আইনের উৎস বলিয়া অভিহিত করা হয়। হল্যাণ্ডের মতে, নিম্নলিখিতগুলি হইল আইনের প্রধান উৎস :

আইন রাষ্ট্রের মতই ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল

প্রথা Custom) : প্রথাই আইনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস। আচার-ব্যবহার বহুদিন ধরিয়া প্রবর্তিত থাকিলে প্রথায় পরিণত হয়। প্রাচীনকালের আইন সাধারণত প্রথামূলকই ছিল। তৎকালীন সমাজে প্রথার সাহায্যে দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা করা হইত। প্রথমে যখন সমাজ-সংগঠনের রূপ ছিল সরল তখন পারিবারিক বা গোষ্ঠীয় বা উপজাতীয় আচার-ব্যবহারই ক্রমে প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। কবে, কিভাবে এবং কিজন্য এই সকল আচার-ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা অবশ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। যাহা হউক ইহা নিশ্চিত যে, ধর্মের ভয়েই হউক বা অপরকে অনুকরণ করিয়াই হউক বা উপযোগিতার জন্যই হউক তখন লোকে অধিকাংশ প্রথাকে মান্য করিয়া চলিত। রাষ্ট্রনৈতিক অর্থে প্রথাকে আইন বলিয়া গণ্য করা না গেলেও, বর্তমানে প্রথা যে প্রবর্তিত আইনসমূহের অন্যতম প্রধান উৎস সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ম্যাক্‌আইভারের ভাষায় বলিতে পারা যায়, "আইনের বিরাট গ্রন্থে রাষ্ট্র এখানে ওখানে মাত্র দু'একটি ছত্র সংশোধন করে বা দু'একটি ছত্র কাটিয়া বাদ দেয় ।....মানুষ যেমন তাহার শরীরকে

১। প্রথা সর্বপ্রাচীন উৎস

নূতন করিয়া গঠন করিতে পারে না, রাষ্ট্র তেমনি আইনকে কখনও নূতন করিয়া রূপ দিতে পারে না।"* প্রচলিত প্রথাকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র আইনের ইমারতের ভাঙাগড়ার কার্য করিয়া থাকে। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে প্রথাগত আইন তাহার বিধি-ব্যবস্থায় (legal system) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়া আছে।

বিধি-ব্যবস্থায় প্রথার গুরুত্ব

ধর্ম (Religion) : প্রাচীনকালে প্রথা ছিল আইন এবং আইন ছিল ধর্ম। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আদিম সমাজে আইন ও ধর্ম পরস্পরের সহিত এমনভাবে মিশিয়া ছিল যে, কোন্‌টি ধর্মীয় অনুশাসন আর কোন্‌টি আইন তাহা সকল সময় সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যাইত না। প্রকৃতপক্ষে, আদিমযুগে সমগ্র জীবনযাত্রার নীতির পশ্চাতে ধর্মের সমর্থন ছিল।

ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনের বিবর্তনে সহায়তা করিয়াছিল। পরোক্ষভাবে ইহা প্রথাকে সমর্থন করিয়া তাহাকে স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছিল এবং প্রত্যক্ষভাবে ইহা রাজা বা দলপতিকে ঈশ্বর বা পূর্বপুরুষের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করিয়া তাঁহার নির্দেশকেই ঈশ্বর বা পূর্বপুরুষের আদিষ্ট আইনরূপে মান্য করিতে শিখাইয়াছিল। রাষ্ট্রপতি উইলসন দেখাইয়াছেন যে প্রথম যুগে রোমক আইন কতকগুলি ধর্মীয় সূত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বর্তমানেও হিন্দু ও মুসলমান আইনে ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

২। ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনের বিবর্তনে সহায়তা করিয়াছিল

বিচারের রায় (Judicial Decisions) : গেটেল বলিয়াছেন, "আইন-প্রণেতা হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই, উদ্ভব হইয়াছিল প্রথার ব্যাখ্যাকর্তা ও প্রয়োগকারী হিসাবে।" আদিম যুগে প্রথা এবং ধর্মীয় নীতির সাহায্যে সহজেই দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু যখন সমাজ-জীবনে জটিলতার বৃদ্ধির ফলে প্রথা ও ধর্মের স্থান সংকুচিত হইয়া আসিল তখন প্রয়োজন হইল নূতন ধরনের বিচার-ব্যবস্থার। স্বভাবত দলপতি বা রাজার উপর বিচারের ভার ন্যস্ত হইল। দলপতি বা রাজা প্রথা ও ধর্মের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইলেন না; ফলে তিনি স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিচারের রায় ভবিষ্যতে বিচারকার্যে আইন হিসাবে গণ্য হইতে লাগিল।

৩। বিচারের রায় হইতে আইনের উদ্ভব

শুধু প্রাচীনকালেই নয়, বর্তমানেও বিচারের রায় হইতে অনেক আইনের সৃষ্টি হয়। আইন স্থিতিশীল, কিন্তু সমাজ গতিশীল। এই গতিশীল সমাজের সহিত সংগতিসাধনের

* "In the great book of law the State merely writes new sentences here and there and scratches out an old one...the State can no more reconstitute at any time the law as a whole than a man can remake his body."

জন্য আইনকে গতিশীল করিয়া তুলিবার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় আইনসভা দ্বারা আইনের সংশোধন আনুষ্ঠানিকভাবে করা হইলেও সকল সময় ইহা সম্ভব হয় না। সুতরাং বিচারপতিগণকেই এ-কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হয়। উপরন্তু, আইনের মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিতে পারে; আইন অস্পষ্টও হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ বিচারের রায় দ্বারা আইনের সৃষ্টি করেন। এই প্রসংগে আমেরিকার বিখ্যাত বিচারপতি হোমস্ (Holmes) বলিয়াছিলেন, বিচারপতিগণ অবশ্যই আইন প্রণয়ন করেন এবং চিরকালই করিয়া যাইবেন। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুধাবন করা যাইবে যে, হোমসের এই উক্তি সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্টভাবে বর্ণিত একটি সাধারণ সত্য মাত্র।

বর্তমানেও বিচারের রায় হইতে আইনের সৃষ্টি হয়

বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Scientific Commentaries): বিখ্যাত আইনানুগগণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাও আইনের আর একটি উৎস। প্রত্যেক সভ্য দেশেই আইন সম্বন্ধে প্রখ্যাত আইনানুগগণের মতামত ব্যবহারজীবী ও বিচারপতিগণ শ্রদ্ধার চ'ক্ষে দেখিয়া থাকেন। আইন কতকগুলি শব্দের সমষ্টিমাত্র, ইহা অনেক সময় দ্ব্যর্থবোধক হইতে পারে; আবার অনেক সময় সমাজের প্রচলিত ধারণার সহিত অসংগতও হইতে পারে। কারণ, যে-উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হয় তাহা লোকে অনেক সময় ভুলিয়া যায়। আইনানুগগণের টীকা ও আলোচনা এই সমস্ত ক্ষেত্রে আইনের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে, প্রকৃত মর্ম স্মরণ করাইয়া দেয়। আইনানুগগণ প্রাচীন ও বর্তমান তথ্যের আলোচনা করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া বর্তমান সময়ে প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা ও স্বরূপ বর্ণনা করেন। ইহা হইতে আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা হয়। ইংল্যাণ্ডে ব্ল্যাকষ্টোন, কোক প্রভৃতির টীকা ব্রিটেনের আইন-ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশেও মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারগণ হিন্দু আইনের পরিবর্তন ও সংস্কারে একরূপ অনন্যসাধারণ ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। আইনানুগগণের টীকা ও আলোচনা হইতেও নূতন আইনের সৃষ্টি হয়

ন্যায়বিচার (Equity): ন্যায়বিচার আইনের আর একটি উৎপত্তিস্থল। বিচারপতির কার্য ন্যায়বিচার করা। কিন্তু প্রচলিত আইনের সাহায্যে অনেক সময় ন্যায়বিচার করা সম্ভব হয় না। কোন আইন কিছুদিন প্রবর্তিত থাকিলে পর সমাজের ন্যায়বোধের (idea of justice) সহিত সম্পর্কবিহীন হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে নিজস্ব ন্যায়বোধ অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করিতে হয়। ফলে আইনের রূপ পরিবর্তিত হইতে পারে; নূতন আইনেরও সৃষ্টি হইতে পারে। স্যর হেনরী মেইন বলেন, আইনকে সমাজের ন্যায়বোধের সহিত সম্পর্কিত রাখিতে হইলে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে সর্বদা আইনের সংশোধনের

৫। ন্যায়বোধ অনুসারে বিচারের ফলেও আইনের সৃষ্টি হয়

ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থাই হইল ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচারের ফলে প্রণীত আইন বিচারপতিগণ কর্তৃক প্রণীত আইনের একটি অংশ।

আইন-প্রণয়ন (Legislation)ঃ ব্যাপক অর্থে 'আইন-প্রণয়ন' বলিতে বুঝায় বিচারপতিগণ বা আইনসভা বা অন্য কোন উপায়ে আইনের সৃষ্টি। সংকীর্ণ অর্থে আইন-প্রণয়ন বলিতে বুঝায় আইনসভা দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে আইন রচনা। বর্তমান যুগে সাধারণত 'আইন-প্রণয়ন' কথাটি এই সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়—অর্থাৎ আইন-প্রণয়ন বলিতে বুঝায় আনুষ্ঠানিকভাবে আইনসভা কর্তৃক আইন রচনা।

৬। আনুষ্ঠানিকভাবে আইন-প্রণয়ন বর্তমানে আইনের সর্বপ্রধান উৎস

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন-প্রণয়ন আইনের সর্বপ্রধান উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওপেনহিম (Oppenheim) জনমতকেই আইনের একমাত্র উৎস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্তমান সুসভ্য রাষ্ট্রসমূহের আইনসভাসমূহ জনমতকে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের রূপ দেয়। প্রথাগত বিধি, ন্যায়ের নীতি প্রভৃতি আইনসভার দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইয়া বিধিবদ্ধ হইতেছে। ফলে সমাজে ক্রমশ অন্যান্য আইন অপ্রচলিত হইয়া উঠিতেছে।

আইন-প্রণয়নকে সর্বপ্রধান উৎসরূপে গণ্য করা হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন উৎসগুলি অত্যধিক আইন-প্রণয়নের পথে আজও বাধার সৃষ্টি করে—প্রথা, রীতিনীতি, ধর্মীয় ধারণা প্রভৃতি আজও আইনের আমূল পরিবর্তনের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ।

উপসংহারঃ আইনের উৎস আলোচনার উপসংহার হিসাবে রাষ্ট্রপতি উইলসনের বিভিন্ন পর্যায়ে আইনের পরিস্ফুটন সংক্রান্ত মত উদ্ধৃত করা যায়। উইলসন বলেন, প্রথা আইনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস হইলেও ধর্ম সমসাময়িক ও প্রায় সমান ফলপ্রসূ উৎপত্তিস্থল। প্রথা ও ধর্মের পরবর্তী উৎস হইল বিচারকের রায় ও ন্যায়বিচার। ইহারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতেছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে আইন-প্রণয়ন এবং আইনানুগগণের আইন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার দ্বারা আইনের সৃষ্টি সভ্যতা এক বিশেষ স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত আইনের উৎসরূপে গণ্য হয় নাই।

***আইনের শ্রেণীবিভাগ* (Classification of Laws)ঃ** বিভিন্ন নীতি অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক আইনের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। তন্মধ্যে 'সম্বন্ধ নীতি'ই প্রধান। 'সম্বন্ধ নীতি' বলিতে বুঝায় অনুসন্ধান করা যে, আইন কি কি সম্বন্ধের সমন্বয়সাধন করিতেছে। এই নীতি অনুসরণ করিয়া হল্যাণ্ড আইনসমূহকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—জাতীয় আইন (Municipal Law), এবং আন্তর্জাতিক আইন (International Law)।

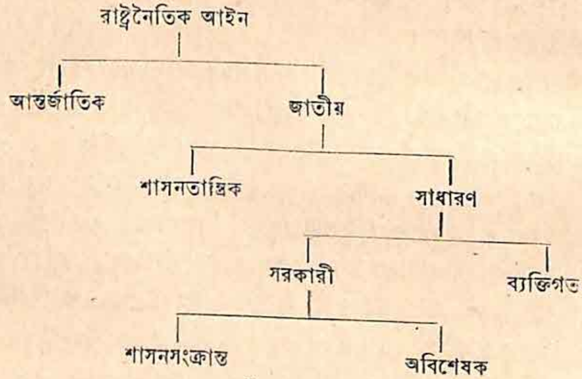
জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইন

জাতীয় আইন বলিতে সেই সকল আইনকেই বুঝায় যাহা রাষ্ট্রাভ্যন্তরে সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় এবং যাহা কোন ক্ষেত্রেই অপরাপর

রাষ্ট্রের সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় না। জাতীয় আইনকে আবার সরকারী আইন (Public Law) এবং ব্যক্তিগত আইন (Private Law)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সরকারী আইন রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করে। হল্যাণ্ডের অনুসরণকারিগণের মতে, শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law), শাসনসংক্রান্ত সরকারী আইন (Administrative Law), ফৌজদারী আইন ও দণ্ডবিধি—সকলই সরকারী আইনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ম্যাক্‌আইভার প্রভৃতি লেখক এই ধরনের শ্রেণীবিভাগের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে, আইন প্রধানত দুই প্রকারের—আন্তর্জাতিক ও জাতীয় (International and National)। জাতীয় আইন দুই অংশে বিভক্ত —যথা, শাসনতান্ত্রিক (Constitutional), এবং সাধারণ (Ordinary)। সাধারণ আইন আবার দুই প্রকারের—সরকারী ও ব্যক্তিগত। সরকারী আইনের কতকগুলির দ্বারা রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রভৃত্যদের সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়। এগুলিকে শাসনসংক্রান্ত আইন বলা যাইতে পারে। বাকিগুলির দ্বারা রাষ্ট্রের সহিত সাধারণ নাগরিকগণের সম্পর্ক নির্ণীত হয়। এগুলিকে অবিশেষক আইন (Gen ral Law) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ম্যাক্‌আইভার প্রমুখ লেখকগণকে অনুসরণ করিলে রাষ্ট্রনৈতিক বিধি বা আইনের নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়ঃ

সরকারী ও ব্যক্তিগত আইন

ম্যাক্‌আইভার প্রভৃতির শ্রেণীবিভাগ



শাসনতান্ত্রিক ও শাসনসংক্রান্ত আইন (Constitutional and Administrative Laws) ঃশাসনতান্ত্রিক আইনকে জাতীয় আইনের মধ্যে মৌলিক বলিয়া গণ্য করা হয়। মৌলিক অর্থে ইহা সকল প্রকার আইনের ঊর্ধ্বে। অন্য সকল প্রকার আইন শাসনতান্ত্রিক আইনের সহিত সংগতি বজায় রাখিয়াই প্রণীত হইবে—রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ইহা অন্যতম প্রধান নির্দেশ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রের সংগঠন এবং সরকারের ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করে। গেটেলের ভাষায় বলিতে পারা যায়, "ইহা রাষ্ট্র মধ্যে সার্বভৌম শক্তির অবস্থানক্ষেত্র নির্ণয় করে এবং আইনের উৎসের নির্দেশ করে।"

শাসনতান্ত্রিক আইনের স্বরূপ

শাসনতান্ত্রিক আইন লিখিত ও অলিখিত—উভয়ই হইতে পারে। ইহা গণপরিষদ দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণীত হইতে পারে; আবার ইহা ক্রমবিকাশের ফলও হইতে পারে। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন ক্ষেত্রেই শাসনতান্ত্রিক আইনের সম্পূর্ণটা লিখিত বা অলিখিত হইতে পারে না। শাসনতন্ত্র একবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণীত হইলেও সময়ের সংগে সংগে ইহার সহিত নানাপ্রকার শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি (Constitutional Conventions), বিচারকগণের ব্যাখ্যা ও নির্দেশ প্রভৃতি জড়িত হইয়া পড়ে। অপরদিকে, আবার অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে লিপিবদ্ধ অংশও গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক আইন লিখিত না অলিখিত, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণীত না ইতিহাসের ক্রমপরিণতির ফল—এই প্রশ্ন পরিমাণবাচক, গুণ বা প্রকৃতিবাচক নহে।

শাসনসংক্রান্ত আইনের স্বরূপ

'শাসনসংক্রান্ত আইনে'র বিভিন্ন অর্থ করা হয়। তন্মধ্যে যে-অর্থ বর্তমান সময়ে শাসনতন্ত্রবিদগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে তাহা হইল যে, ইহা সেই সকল আইনের সমন্বয়ে গঠিত যাহা শাসনকর্তৃপক্ষের সংগঠন, ক্ষমতা এবং কর্তব্য নির্ধারণ করে। যে-সকল দেশের রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন খুব উন্নত সেই সমস্ত দেশে শাসনসংক্রান্ত আইন হইল সমগ্র আইনের একটা বিরাট অংশ। এই শাসনসংক্রান্ত আইনের উৎস হইল একদিকে যেমন বিধিবদ্ধ আইন এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত—অন্যদিকে তেমনি আবার আইন-প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত নিয়মকানুন, নির্দেশ এবং শাসন বিভাগীয় আদালতের সিদ্ধান্ত।

আন্তর্জাতিক আইন—ইহার প্রকৃতি (International Law—Its Nature) : যে-সমস্ত নীতির দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারিত হয় সংক্ষেপে সমগ্রভাবে তাহাদিগকে আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া অভিহিত করা হয়। লরেন্সের (T. J. Lawrence) মতে, আন্তর্জাতিক আইন বলিতে সেই সমস্ত বিধিনিয়মকে বুঝায় যাহা সাধারণভাবে সুসভ্য রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে। আন্তর্জাতিক আইন বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকার, অধিকার সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং অধিকার ভংগ করা হইলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করে। মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে বিধিনিয়মের প্রয়োজন আছে, এই উপলব্ধিই অন্যান্য প্রকার আইনের মতই আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি। জাতীয় আইনের মত অবশ্য ইহাকে বলবৎ করিবার জন্য কোন চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতা নাই। তবুও আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রসমূহ সাধারণত ইহাকে মান্য করিয়াই থাকে।

আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি

দেখা গেল, আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রসমূহের অধিকার ও দায়িত্বের নির্দেশ করে। এইরূপ নির্দেশক আইন ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি সৌজন্যবিধি (Rules of Courtesy) আছে যাহাদিগকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার নির্দিষ্ট চুক্তি না থাকিলেও সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের খাতিরে সাধারণত মান্য করিয়া চলে—যথা, আশ্রয়গ্রহণকারী দণ্ডিত অপরাধীকে নিজ

আন্তর্জাতিক সৌজন্যবিধি

রাষ্ট্রে প্রেরণ, কূটনৈতিক প্রথাসমূহ পালন ইত্যাদি। এগুলিকে আন্তর্জাতিক সমাজের প্রথা হিসাবে গণ্য করা যায়। এই সৌজন্যবিধি বা আন্তর্জাতিক প্রথা ছাড়াও সাম্প্রতিক যুগে উদ্ভূত আর একপ্রকার আন্তর্জাতিক আইন আছে যাহাকে আন্তর্জাতিক শাসনসংক্রান্ত আইন (International Administrative Law) বলা হয়। এই প্রকার আন্তর্জাতিক আইনানুসারে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াত, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, পুস্তকের স্বত্ব সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়।

আন্তর্জাতিক শাসন-সংক্রান্ত আইন

যাহাকে শুধু আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন (Private International Law) এবং সরকারী আন্তর্জাতিক আইন (Public International Law)। ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইনানুসারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, কোন ব্যক্তির অধিকার বা স্বার্থ লইয়া যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের আইনের মধ্যে সংঘাত বাধে তবে তাহার বিচার ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইনানুসারেই হইবে। সরকারী আন্তর্জাতিক আইন ব্যক্তিগত অধিকারের সহিত সম্পর্কিত নহে; ইহা সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্বের নির্দেশক।

ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন

অনেকের মতে, ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইনকে আন্তর্জাতিক আইন হিসাবে গণ্য করা যায় না। কারণ, সংজ্ঞানুসারে আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রগত সম্বন্ধ নির্ধারণ করে মাত্র, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নহে। উপরন্তু, ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন আন্তর্জাতিক আদালত দ্বারা প্রযুক্ত হয় না, প্রযুক্ত হয় জাতীয় আদালত দ্বারা। অনেক সময় আবার যাহাকে বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) বলা হয় তাহাকে আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভুল করা হয়। রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি কতকগুলি প্রচলিত নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সত্য, কিন্তু এগুলিকে আইনের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কারণ, এই নিয়মাবলী জাতীয় স্বার্থ ও সুবিধার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকার ও কর্তব্যের ধারণার উপর নহে। প্রকৃতপক্ষে, বৈদেশিক নীতি আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত নহে, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ (International Relations) নামক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আন্তর্জাতিক আইন নহে

আন্তর্জাতিক আইন কি আইন? (Is International Law a Law?)

বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারক নীতিসমূহ যাহাদিগকে আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহারা কি প্রকৃত আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এই প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা আজ পর্যন্ত হয় নাই। অষ্টিন প্রমুখ বিশ্লেষণকারী আইনানুগগণ আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলিয়া অভিহিত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, আইন নিম্নতনের প্রতি সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের নির্দিষ্ট আদেশ

আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আইন কিনা? —বিপক্ষে যুক্তি

মাত্র; ইহাকে অমান্য করিলে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলপ্রয়োগ করিতে পারে। সুতরাং প্রকৃত আইন উৎস ও বাধ্যতার দিক দিয়া নির্দিষ্ট। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের উৎস নির্দিষ্ট নহে; ইহা কোন সার্বভৌম শক্তির আদেশ হিসাবে প্রচারিত হয় না। ইহাকে বলবৎ করিবারও কোন নির্দিষ্ট শক্তি নাই; যাহাদের উপর প্রযুক্ত হয় তাহাদের সম্মতিই ইহার একমাত্র সমর্থন। যদি আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষিত হয় তবে তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য আইনানুমোদিত কোন কর্তৃত্ব নাই। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক আইনের নীতিসমূহ অনির্দিষ্ট। কারণ, ইহাদের সম্পর্কে কোন বিশ্বজনীন মতৈক্য পরিলক্ষিত হয় না এবং দেখা যায় যে অবস্থা অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ সুবিধামত ইহাদের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য অষ্টিন প্রমুখ বিশ্লেষণী আইনবিদগণ আন্তর্জাতিক আইনকে 'আন্তর্জাতিক নীতিশাস্ত্রে'র (International Ethics) অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতী। অষ্টিন-অনুগামী আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের অন্যতম লর্ড সলস্‌বেরী বলিয়াছেন, "যে-অর্থে 'আইন' শব্দটি আমরা সচরাচর বুঝিয়া থাকি সে-অর্থে আন্তর্জাতিক, আইনের কোন অস্তিত্বই নাই।"*

সপক্ষে যুক্তি

অপরদিকে মেইন, স্যাভিগ্‌নি (Savigny) প্রভৃতি ঐতিহাসিক আইনানুগগণের সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলিয়াই গণ্য করিতে হয়। ঐতিহাসিক আইনানুগগণ বলেন যে, আইনকে সর্বদাই যে নির্দিষ্ট আদেশের রূপ ধারণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বরং দেখা যায় যে, আইন প্রধানত প্রথা এবং আচার-ব্যবহারের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠে। তাঁহাদের মতে, আইনের মূল ভিত্তি হইল সাধারণের সম্মতি। সাধারণে যদি নৈতিক কারণে বা উপযোগিতা হেতু কোন নিয়মকে মান্য করিয়া চলে তবে তাহাই আইন। এ-ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের কল্পনা করা অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক। যাহাদিগকে আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া অভিহিত করা হয় সেই সকল নীতি জনমত দ্বারা সমর্থিত এবং রাষ্ট্রসমূহ নানা কারণে তাহাদের মান্য করিয়াই চলে। সুতরাং তাহাদিগকেও আইন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবিরোধ আইনের সংজ্ঞা লইয়া মতবিরোধের ফল

দেখা যাইতেছে, আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃতপক্ষে আইন কিনা এই লইয়া যে-মতবিরোধ তাহা আইনের সংজ্ঞা লইয়া মতবিরোধেরই ফল। আইনকে যদি অষ্টিনের অর্থে ধরা হয়—অর্থাৎ যদি সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলিয়া গণ্য করা হয় তবে আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আইন হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। অপরদিকে, আবার যদি ঐতিহাসিক আইনানুগের দৃষ্টিতে দেখা হয় তবে আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইনের পর্যায়ভুক্ত করিতে হইবে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই দ্বিতীয় পন্থা অনুসরণেরই পক্ষপাতী। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই আমেরিকার বিখ্যাত বিচারপতি মার্শাল বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ সকল ব্যক্তি ও বিষয়ের উপর

* "International law has not any existence in the sense in which the term law is usually used."

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত হইলেও পারস্পরিক সুবিধা ও সহযোগিতার জন্য এই কর্তৃত্বকে শিথিল করিবার প্রয়োজন আছে। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের উপর বিখ্যাত লেখক সুম্যান (Frederick L. Schuman) বলেন, "যতদিন পর্যন্ত মানুষ প্রতিষ্ঠিত বিধি অনুসারে কার্য করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবে, ততদিনই আইনের নীতির জীবন্ত ও ক্রমবর্ধমান সমষ্টি হিসাবে আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান থাকিবে।" গেটেল বলেন, "আন্তর্জাতিক আইনের যে-ত্রুটি তাহা যে-কোন প্রকার আইনের প্রথম পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়।"

আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইনকে বলবৎ করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু এই দিকে গঠনকার্য যে চলিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনকে সুসংবদ্ধ ও বলবৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রচেষ্টায় ইহা কতকটা সফলকামও হইয়াছে। জাতিসংঘের (The League of Nations) স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারের আদালতও (Permanent Court of International Justice) এইদিকে কিছু কার্য করিয়াছিল। উপরন্তু, জাতীয় আদালতে আন্তর্জাতিক আইনকে সাধারণত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয় এবং জাতীয় আইনের সহিত সংঘর্ষ না বাধিলে সেগুলিকে বলবৎ করিবারই চেষ্টা করা হয়।

আন্তর্জাতিক আইনের গঠনকার্য চলিতেছে

উপসংহারে বলা যাইতে পারে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন নৈতিক বিধি এবং প্রকৃত আইনের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া আছে।* 'আইনের দৃষ্টি'তে দেখিলে আন্তর্জাতিক আইন 'আইন' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—কারণ এই দৃষ্টিভংগি অনুসারে আইনের একমাত্র উৎস হইল সার্বভৌম ক্ষমতা। বিশ্বজনীন সার্বভৌমিকতার সন্ধান যখন পাওয়া যায় না—পৃথিবী যখন বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত তখন আন্তর্জাতিক আইনকে 'আইন' বলিয়া গণ্য করা যায় কিরূপে ? এইজন্যই হল্যাণ্ড (Holland) আন্তর্জাতিক আইনকে 'বিধিশাস্ত্রের বিলয়স্থান' ** বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অপরদিকে কিন্তু অষ্টিনের মত আন্তর্জাতিক আইনকে শুধু নৈতিক বিধির সমষ্টি বলিয়াও অভিহিত করা যায় না। যদিও আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইন সুসংগঠিত হয় নাই তবুও ইহা আইনসংগত রূপ ও পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক আইন আইনভংগকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন করে। ইহা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকের মতে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইন নৈতিক বিধির স্তর হইতে প্রকৃত আইনের পর্যায়ভুক্ত হইতে চলিয়াছে।

হল্যাণ্ড আন্তর্জাতিক আইনকে 'বিধিশাস্ত্রের বিলয়স্থান' বলিয়াছেন

আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আইনের পর্যায়ভুক্ত হইতে চলিয়াছে

* "At present international law is in an uneasy stage between morality and law proper." Christopher Lloyd, Democracy and Its Rivals.

** "International Law is the vanishing point of Jurisprudence."

আন্তর্জাতিক আইনের রূপ পরিগ্রহের পথে প্রতিবন্ধক (Hindrances to the Growth of International Law) ঃ আন্তর্জাতিক আইনের গতি প্রকৃত আইনের দিকে হইলেও এই গতি মন্থর—কারণ বহু প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া ইহাকে পথ চলিতে হইতেছে। ল্যাস্কির মতে, প্রধান প্রতিবন্ধকের সন্ধান পাওয়া যাইবে অধিকাংশ রাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধের মধ্যে। এই সকল রাষ্ট্রে ধনবৈষম্যের ভিত্তিতে একপ্রকার শ্রেণীসম্বন্ধ রহিয়াছে। যে-শ্রেণীর হস্তে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানা রহিয়াছে তাহাদের স্বার্থেই রাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসাবে বর্তমান থাকে। রাষ্ট্র সার্বভৌম বলিয়া ইহা কোন প্রকার বাধানিষেধ মানিতে পারে না ; সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনও উপেক্ষিত হইতেছে।

১। শ্রেণীসম্বন্ধ

দ্বিতীয়ত, বলা যায়, এই যুদ্ধোত্তর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক আইনের রূপগ্রহণের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই দুই রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল এবং ইহাদের দ্বারা অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত। এ-ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করা এক বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইনভংগকারী কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিলে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র না হয় সোবিয়েত ইউনিয়ন তাহাতে বাধা দিবে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা রক্ষিত হইতেছে না। উপরি-উক্ত কারণেই আবার নূতন আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি হইতে পারিতেছে না। ফলে, যুদ্ধকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা, নিরস্ত্রিকরণ প্রভৃতি স্বপ্নই রহিয়া গিয়াছে। এই স্বপ্ন কি সফল হইবে না ? আদর্শবাদীর এই প্রশ্নের উত্তরে একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেন যে, পৃথিবীব্যাপী ধনবৈষম্যের ভিত্তিতে গঠিত বর্তমান সমাজ ও অর্থ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইলে পর হইবে—তাহার পূর্বে নহে।

২। সোবিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ

***আইন ও নৈতিক বিধি* (Law and Morality) ঃ** আইন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের সহিতও গভীরভাবে সম্পর্কিত।* রাষ্ট্রের ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে রূপগ্রহণ করে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আইনের মাধ্যমে সাধিত হয়। অপরদিকে, সমাজের নৈতিক বিশ্বাস সূত্রের রূপধারণ করিয়া সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং আইন ও নৈতিক সূত্রের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। এই সম্পর্ক এত গভীর যে, প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আইন ও নৈতিক সূত্রের মধ্যে পার্থক্য করিতেন না। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করায় উভয়ের মধ্যে গভীর পার্থক্যেরও নির্দেশ করা যাইতে পারে।

আইন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ঃ

প্রথম পার্থক্য হইল বিষয়বস্তু লইয়া। নৈতিক সূত্রগুলি মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও মনের চিন্তা উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে। এককথায় নৈতিক সূত্র সমগ্রভাবে

* ২১-২৩ পৃষ্ঠা।

মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। মানুষের চিত্তশুদ্ধিই নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। চিত্ত শুদ্ধ হইলে মানুষ চিন্তায় ও আচরণে উন্নত হইবে, ফলে সমাজজীবনেও মংগলের পদধ্বনি শুনা যাইবে। এই ধারণার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নৈতিক সূত্র রচিত হয়। অপরদিকে, আইন প্রধানত বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করে, যদিও বা অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক আচরণের পশ্চাতে উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হয়। স্বভাবের বশে চুরি করিলে যে-শাস্তি হয়, কয়েকদিন অনাহারে থাকিয়া সামান্য খাদ্যদ্রব্য চুরি করিলে তদপেক্ষা লঘুদণ্ডই হয়। উপরন্ত, আইন দ্বারা মানুষের সকল প্রকার বাহ্যিক আচরণই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয় না, কিন্তু নৈতিক সূত্রগুলি মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চায় বলিয়া কোন বাহ্যিক আচরণকেই বাদ দেয় না। ফলে দেখা যায় যে এরূপ অনেক কার্য দুর্নীতিমূলক বলিয়া ঘোষিত হয় যাহা আইনের দৃষ্টিতে অন্যায় নহে। মিথ্যাকথনকে নীতিশাস্ত্র কখনই সমর্থন করে না, কিন্তু মিথ্যাকথন দ্বারা যতক্ষণ না কাহারও ক্ষতি হয়, ততক্ষণ ইহা আইনের এলাকায় আসে না। আইন সাধারণত সামগ্রিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখে, নৈতিক সূত্র ব্যক্তিকে লইয়াও ব্যস্ত। এইজন্য সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া আইন প্রণীত হয়; কিন্তু নৈতিক সূত্র রচিত হয় একমাত্র ন্যায়-অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। ফলে যাহা বেআইনী তাহা দুর্নীতিমূলক না-ও হইতে পারে। রাস্তার কোন বিশেষ দিক দিয়া মোটর গাড়ী চালান বেআইনী, কিন্তু দুর্নীতিমূলক নহে।

প্রথম পার্থক্য হইল বিষয়বস্তু লইয়া

দ্বিতীয়ত, সমর্থনের দিক দিয়াও আইন ও নৈতিক সূত্রের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আইনের পশ্চাতে আছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সমর্থন। আইন ভংগ করিলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করিতে হয়, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক সূত্রের প্রয়োগ করে না। ফলে নৈতিক বিধি ভংগ করিলে কোন প্রকার নির্দিষ্ট দৈহিক শাস্তি ভোগের সম্ভাবনা নাই। নীতিগত অপরাধের শাস্তি সম্পূর্ণ মানসিক—বিবেকের দংশন সহ্য করা এবং লোকচক্ষে হেয় হইয়া থাকা। অনেক সময় অবশ্য ইহা অপেক্ষা নির্দিষ্ট দৈহিক শাস্তিও কাম্য হইতে পারে। তবে নৈতিক চেতনা ও বিবেক অনেকটা ব্যক্তিগত হওয়ায় সকলে একই প্রকার মানসিক শাস্তি অনুভব করে না।

দ্বিতীয় পার্থক্য সমর্থন লইয়া

তৃতীয়ত, আইন নির্দিষ্ট কিন্তু নৈতিক সূত্র অনির্দিষ্ট। কোনটি সুনীতি এবং কোনটি দুর্নীতি তাহা সকল সময় নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। নৈতিক বিশ্বাস কতকাংশে ব্যক্তিগত এবং কতকাংশে সামাজিক। অনেক সময় সমাজের সহিত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তির সহিত সমাজ সমান সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে না। ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহকে এক সময় সুনীতিমূলক বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশের ধারণা বিপরীত হইলেও এমন অনেক রক্ষণশীল ব্যক্তি আছে যাহারা ইহাকে এখনও ধর্ম বা নীতির অংগ বলিয়া মনে করে। গান্ধীজি যখন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেন তখন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও অস্পৃশ্যতাকে দুর্নীতিমূলক বলিয়া মনে

তৃতীয়ত, আইন নির্দিষ্ট কিন্তু নৈতিক সূত্র অনির্দিষ্ট

করিতেন না; কিন্তু আজ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুনীতি ও দুর্নীতির মধ্যে সীমারেখা অনেক সময় অতি অস্পষ্ট। আইনের ক্ষেত্রে কিন্তু এরূপ অস্পষ্টতা থাকিতে পারে না। থাকিলে আইনসভা বা আদালত তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া তোলে।

আইন ও নৈতিক সূত্রের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য দেখান হইলেও উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আজও বর্তমান আছে—চিরকালই থাকিবে। আমরা দেখিয়াছি, আদিতে আইন ও নৈতিক সূত্রগুলি অভিন্নই ছিল। পরে যখন আইনকে সচেতন সার্বভৌম শক্তির অনুশাসন বলিয়া গণ্য করা হইতে লাগিল, তখন ইহা নৈতিক আচরণের সূত্রগুলি হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। পৃথক হইয়া পড়িলেও উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছেদ পড়িল না। প্রকৃতপক্ষে, ছেদ পড়িতেও পারে না।

আইন ও নৈতিক সূত্রের মধ্যে সম্পর্ক

আইন ও নৈতিক সূত্র উভয়ই সমাজবদ্ধ জীব মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং উভয় পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে বাধ্য। ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা অনেক সময় আইনে রূপান্তরিত হইয়া মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। আইনও আবার অনেক সময় কুনীতি দূর করিয়া সুনীতিকে আহ্বান করে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, লর্ড এ্যাকটনের মতে, ইহাই রাষ্ট্রের প্রধান কার্য।* কিন্তু রাষ্ট্র যদি জোর করিয়া সহসা কোন নৈতিক ধারণা লোকের উপর চাপাইয়া দিতে চায়, তবে সে আইনকে কার্যকর করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত মদ্যপানকে নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া অধিকাংশ লোকে মনে না করে, ততক্ষণ আইন করিয়া মদ্যপান বন্ধ করা অসম্ভব। এই কারণে ভারতের অনেক রাজ্যে মাদকদ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে আইন বিশেষ কার্যকর হয় নাই। অপরদিকে, ভারতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নৈতিক চেতনা যখন কতকটা জাগ্রত হইয়াছিল তখনই তাহাকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সময়মত কার্যকর করা হইয়াছে। সতীদাহকে পূর্বে ধর্মের বা নীতির অংগ বলিয়া মনে করা হইত। আইন করিয়া সতীদাহ বন্ধ করা হইল। জনমত এই আইনকে সমর্থন করিয়াছিল বলিয়াই ইহা কার্যকর হইতে পারিয়াছিল। সুতরাং আইনের কার্যকারিতা মানুষের নৈতিক বিশ্বাসের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আবার যে নৈতিক বিশ্বাস বর্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়িয়াছে আইন দ্বারা তাহার পরিবর্তনসাধন করা হয়; এবং ইহা করা উচিত। বলা যায়, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির নৈতিক ব্যক্তিত্বের উপলব্ধিতে সহায়তা করা। সুতরাং রাষ্ট্র সর্বদাই নৈতিক আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পথ চলিবে। ফলে আইন—যাহার মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা রূপগ্রহণ করে, তাহা কখনই নৈতিক ধারণা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না।

আইন ও নৈতিক সূত্র পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে

আইন সর্বদাই নৈতিক সূত্র দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইবে—ইহার আদর্শ

* ২৩ পৃষ্ঠা।

আইন মান্য করা হয় কেন ? **(Why is Law Obeyed ?) ঃ** আইনের স্বরূপ উৎস এবং ইহার পশ্চাতে সমর্থন সম্বন্ধে আলোচনা করার পর সংক্ষেপে আইন মান্য করা হয় কেন সে-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে। প্রধানত আইনের প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে দুই প্রকার মতবাদ আছে। প্রথম মতবাদ অনুসারে লোকে শাস্তির ভয়েই আইন মান্য করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে মানুষ আইনের উপযোগিতা উপলব্ধি করে বলিয়াই ইহাকে মান্য করে। প্রথম মতবাদের সমর্থকগণের মধ্যে হবস্, বেন্থাম ও অষ্টিনের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয় এবং দ্বিতীয় মতবাদের সমর্থক হিসাবে রুশো এবং কতিপয় আদর্শবাদী দার্শনিকের (Idealistic Philosophers) নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। অবশ্য, স্যর হেনরী মেইনের মত ঐতিহাসিক আইনানুগগণের মতে, মানুষ দণ্ডের ভয় এবং উপযোগিতার উপলব্ধি উভয় কারণেই আইন মান্য করিয়া থাকে। লর্ড ব্রাইস্ প্রভৃতি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, আইনের প্রতি আনুগত্যের কারণ আরও জটিল। ব্রাইস্ বলেন, আইনের প্রতি আনুগত্যের কারণ বিবিধ। এগুলিকে একরূপ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, (১) নির্লিপ্ততা (Indolence), (২) শ্রদ্ধাভক্তি (Deference), (৩) সহানুভূতি (Sympathy), (৪) দণ্ডভয় (Fear) এবং (৫) উপযোগিতার উপলব্ধি (Reason)। নির্লিপ্ততা বলিতে বুঝায় যে, সাধারণে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে চাহে না। সুতরাং কোন আইন প্রণীত ও বলবৎ করা হইলে তাহার সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়াই তাহাকে মান্য করিয়া চলে। শ্রদ্ধাভক্তি বলিতে বুঝায় যে, রাষ্ট্রনায়ক বা জননেতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিবশত লোকে আইন মান্য করিয়া থাকে। রাষ্ট্রনায়ক হইলেন জননেতা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রণীত আইনকে লোকে সাধারণত মান্য করিয়াই চলে। সহানুভূতি হইল সাধারণ লোকের আচরণের প্রতি সহানুভূতিবশত কোন কার্য করা। অধিকাংশে যখন কোন বিশেষ আইনকে মান্য করে, তখন তাহাদের অনুবর্তী হইয়া ইহাকে মান্য করাই উচিত—এইরূপ মনোভাবকে সহানুভূতি বলে। নির্লিপ্ততা, শ্রদ্ধাভক্তি ও সহানুভূতিকে একযোগে অনুকরণ (Imitation) আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, মানুষ অনুকরণপ্রিয় বলিয়া আইন মান্য করিয়া থাকে। ব্রাইসের মতে, অনুকরণপ্রিয়তার জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন মান্য করা হইয়া থাকে।

আইনের প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে দুইটি প্রধান মতবাদ

ব্রাইস্ প্রভৃতির মতে, আইনের প্রতি আনুগত্যের কারণ পঞ্চবিধ

অনুকরণপ্রিয়তা ও আইন মান্যকরণ

সকলে না হউক, অনেকে যে দণ্ডের ভয়ে আইন মান্য করিয়া থাকে ইহাও সত্য। সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি থাকে যাহারা সর্বদাই সামাজিক বিধিনিয়মের বিরুদ্ধে কার্য করিতে চায়। এরূপ ব্যক্তিসমূহের জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন। তবে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে সর্বশেষে। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুধু বলপ্রয়োগ দ্বারা আইন বলবৎ করা যায় না। এই

দণ্ডভয়

প্রসংগে গ্রীণের বিখ্যাত উক্তি "জনগণের সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি, পাশবিক বল নহে—" (will, not force is the basis of the state) স্মরণ করা যাইতে পারে। উপযোগিতার উপলব্ধি হইতে যে আইন মান্য করা হয় ইহাও বর্তমানে মাত্র কতকাংশে সত্য। সভ্যতার অগ্রগতি ও বিজ্ঞানের প্রসারের সংগে সংগেই এই উপলব্ধি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুতরাং যে দেশ যত উন্নত, যে দেশের অধিবাসী যত বেশী শিক্ষিত সেই দেশে লোকে উপযোগিতার কারণেই আইনের প্রতি তত বেশী শ্রদ্ধা জানাইয়া থাকে।

উপযোগিতার উপলব্ধি

সংক্ষিপ্তসার

আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। অষ্টিন প্রভৃতি বিশ্লেষণী আইনানুগের ধারণা অনুসারে সার্বভৌম শক্তির আদেশই আইন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন লেখকগণের মতে, প্রথাও আইনের সৃষ্টি করে। অবশ্য প্রথা যতক্ষণ পর্যন্ত সার্বভৌম শক্তি কতৃ ক অনুমোদিত না হয় ততক্ষণ আইনে পরিণত হয় না। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রকতৃ ত্ব দ্বারা অনুমোদিত ও প্রযুক্ত বিধিনিয়মই আইন।

আইনের দ্বারা সাধারণের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইহা অমান্য করিলে বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে।

আইনকে সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করা চলিতে পারে না—কারণ (১) আজিকার দিনের বিরাট রাষ্ট্রে সাধারণের ইচ্ছা প্রকাশের কোন ব্যবস্থা নাই; (২) ইহার দ্বারা স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করা হয়; এবং (৩) আইন সর্বদাই সাধারণের স্বার্থসাধন করে না। তবে সাধারণের ইচ্ছা বলিতে 'জনমত' বুঝিলে আইনকে উহার প্রকাশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

স্বাভাবিক আইন: স্বাভাবিক আইন সম্বন্ধে ধারণা প্রাচীনকাল হইতে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। বর্তমানে ধারণাটি হইল এইরূপ: কতকগুলি স্বাভাবিক ন্যায়ের নীতি আছে যাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে বলবৎ করা উচিত। এই নীতিগুলি অপরিবর্তনীয়, ন্যায্য, যুক্তিসংগত এবং স্বতঃপ্রকাশিত।

স্বাভাবিক আইনের ব্যবহারিক ফল বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম হইয়াছে। ইহাকে বলবৎ করিবার উপায় কোন কালে ছিল না। দ্বিতীয়ত, একমাত্র বিপ্লবের সময় কার্যকর হয় বলিয়া এই আইন আইনের মর্যাদা পাইতে পারে না। তৃতীয়ত, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় নীতি বলিয়া কিছু নাই। আইন সর্বদাই স্থান, কাল ও সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক।

উপসংহারে বলা যায়, স্বাভাবিক আইন আদর্শবাদীর কল্পনা মাত্র। কিন্তু এই আদর্শ সফল হয় নাই।

আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা: আইন সম্বন্ধে ধারণাকে প্রধানত পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) বিশেষণমূলক ধারণা, (২) ঐতিহাসিক ধারণা, (৩) দার্শনিক ধারণা, (৪) তুলনামূলক ধারণা, এবং (৫) সমাজবিজ্ঞানমূলক ধারণা।

আইনের উৎস ঃ আইনের উৎস সংখ্যায় ছয়টি—যথা, (১) প্রথা, (২) ধর্ম, (৩) বিচারের রায়, (৪) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, (৫) ন্যায়বিচার, এবং (৬) আনুষ্ঠানিকভাবে আইন প্রণয়ন। ইহাদের মধ্যে প্রথাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস। ধর্ম অবশ্য প্রায় সমসাময়িক। পরবর্তী উৎস হইল বিচারের রায় এবং ন্যায়বিচার। আনুষ্ঠানিকভাবে আইন প্রণয়ন ও আইনের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হইল আধুনিক সূত্র।

আইনের শ্রেণীবিভাগ ঃ আইন প্রধানত দুই প্রকারের—আন্তর্জাতিক আইন ও জাতীয় আইন। জাতীয় আইনকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—যথা, শাসনতান্ত্রিক ও সাধারণ আইন, সরকারী ও ব্যক্তিগত আইন, শাসনসংক্রান্ত ও অবিবেচক আইন, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক আইন ও শাসনসংক্রান্ত আইনের মধ্যে পার্থক্য স্মরণ রাখিতে হইবে। শাসনতান্ত্রিক আইন রাষ্ট্রের সংগঠন এবং সরকারের ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করে। শাসনসংক্রান্ত আইন শাসন-কর্তৃপক্ষ বা সরকারের সংগঠন, অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে।

আন্তর্জতিক আইন ঃ যে-সমস্ত নীতির দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারিত হয় সমগ্রভাবে তাহাদিগকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। ইহার উপর কতকগুলি আন্তর্জাতিক সৌজন্যবিধিও আছে। আন্তর্জাতিক আইন ব্যক্তিগত ও সরকারী—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃত আইন কিনা? কতিপয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মত হইল যে আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না—কারণ ইহার উৎস নির্দিষ্ট নহে, ইহাকে বলবৎ করিবারও কোন ব্যবস্থা নাই। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, জাতীয় আইনের মতই সাধারণত আন্তর্জাতিক আইনকে মান্য করা হয় এবং আন্তর্জাতিক আদালত প্রভৃতির মাধ্যমে ইহাদিগকে বলবৎও করা হইতেছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনও আইন। আধুনিক মত হইল আন্তর্জাতিক আইন আইনের পর্যায়ভুক্ত হইতে চলিয়াছে।

আইন ও নৈতিক বিধি ঃ উভয়ের মধ্যে বিষয়বস্তু, সমর্থন ও নির্দিষ্টতা লইয়া পার্থক্য আছে। উভয়ের মধ্যে কিন্তু সম্পর্কও গভীর। আইন ও নৈতিক সূত্র পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। আইন নৈতিক সূত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে—ইহাই আদর্শ।

আইন মান্য করিবার কারণ ঃ বিভিন্ন কারণে লোকে আইন মান্য করিয়া থাকে। তন্মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তা, দণ্ডভয় এবং উপযোগিতার উপলব্ধিই প্রধান।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the nature and sanction of Law. How far is it correct to use such expressions as the 'Natural Laws', 'Laws of Morality' and 'International Laws ?' [C. U. 1950, '58]

[ইংগিত ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের বিধি বা আইন লইয়াই আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। অষ্টিনের ন্যায় বিশ্লেষণী আইনানুগগণ আইনকে 'নিম্নতনের প্রতি উধ্বতন রাষ্ট্রনৈতিক কতৃত্বের আদেশ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সংজ্ঞার সমালোচনা করিয়া স্যর হেনরী মেইনের মত ঐতিহাসিক লেখকগণ বলেন যে, প্রথাগত আইন সার্বভৌম শক্তি কতৃক প্রণীত হয় নাই। বলা হয় যে, প্রথা ও জনমতের চাপ রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের সহিত আইন সৃজনে সমভাবে কার্যকর। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে কোন প্রথা বা

নৈতিক বিধি যতক্ষণ না রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হয় ততক্ষণ ইহা আইনে পরিণত হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা অনুমোদিত ও প্রযুক্ত বিধিনিয়মই আইন। আইনের প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে প্রেসিডেন্ট উইলসন এবং অধ্যাপক হল্যাণ্ড প্রদত্ত সংজ্ঞার মধ্যে। উইলসনের মতে, "আইন হইল মানুষের প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে।" হল্যাণ্ড বলেন, "আইন হইল মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত সাধারণ নিয়ম।"

অনেক সময় 'নৈতিক আইন' বা 'স্বাভাবিক আইনে'র কথা উল্লেখ করা হয়। স্বাভাবিক আইনের ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয় যে, ঐশ্বরিক অনুজ্ঞা কিংবা মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত ন্যায়ের মৌলিক নীতিগুলি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়াই আইনরূপে প্রচলিত থাকে। ইহা রাষ্ট্রের পূর্বতন ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ঊর্ধ্বতন। এই অর্থে স্বাভাবিক আইনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যাহাকে আইন বলা হয় সেই পর্যায়ে ফেলা যায় না—কারণ উহা বলবৎ করিবার উপায় নাই। শুধু যখনই স্বাভাবিক আইনের অন্তর্ভুক্ত ন্যায়বোধের নীতিগুলি রাষ্ট্রের বিধি হিসাবে গৃহীত ও প্রযুক্ত হয় তখনই উহা আইনে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। নৈতিক বিধান সম্পর্কেও একই প্রকার মন্তব্য প্রযোজ্য।

আন্তর্জাতিক আইন আইন কিনা ? এই প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা আজ পর্যন্ত হয় নাই। অষ্টিন প্রমুখ বিশ্লেষণকারী আইনানুগগণ আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলিয়া অভিহিত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ আইন হইল সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের নির্দিষ্ট আদেশ এবং ইহাকে অমান্য করিলে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলপ্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন কোন সার্বভৌম শক্তির আদেশ হিসাবে প্রচারিত হয় না, এবং উহাকে বলবৎ করিবারও কোন নির্দিষ্ট শক্তি নাই। অপরদিকে ঐতিহাসিক আইনানুগগণ বলেন যে, আইনের ভিত্তি হইল সম্মতি, বলপ্রয়োগের কল্পনা করা অনাবশ্যক। আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মকানুন জনগণ দ্বারা সমর্থিত এবং রাষ্ট্রসমূহ নানা কারণে তাহাদের মান্য করিয়া চলে। সুতরাং তাহাদিগকেও আইন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে, আইনের দৃষ্টিতে দেখিলে আন্তর্জাতিক আইন আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; কারণ বিশ্বজনীন সার্বভৌমিকতার কোন অস্তিত্ব নাই। তবে অষ্টিনের মত আন্তর্জাতিক আইনকে শুধু নৈতিক বিধির সমষ্টি বলিয়াও অভিহিত করা যায় না। সুসংগঠিত না হইলেও ইহা ক্রমশ আইনসংগত রূপ ও পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক আইন আইনভংগকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন করে। ইহা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়।...এবং ১৩৭-১৩৯, ১৪১-১৪৩ এবং ১৫২-১৫৪, ১৫৫-১৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

2. Distinguish between the spheres of law and morality and show the relation that exists between them. (১৫৫-১৫৭ পৃষ্ঠা)

3. How far do you agree with the view that Law is an expression of the General Will of the Community ! [C. U. 1955] (১৩৯-১৪১ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the nature of Law with special reference to its relation to Morality. [C. U. 1959] (১৫৫-১৫৭ পৃষ্ঠা)

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিকতা

(CITIZENSHIP)

রাষ্ট্রকে নাগরিকগণের সংগঠন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক নাগরিকই কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক। নাগরিকগণকে লইয়াই রাষ্ট্র; নাগরিকগণের জন্যই রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নাগরিক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির আলোচনা প্রসংগে নাগরিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে আরও কিছু আলোচনা করা হইবে।

শব্দগত অর্থে 'নাগরিক' হইল নগরবাসী—অর্থাৎ নগরে বাস করিলেই নাগরিক বলিয়া অভিহিত করা যায়। বর্তমানে কিন্তু 'নাগরিক' শব্দটি এই শব্দগত অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে নাগরিক বলিতে নগরবাসীকে না বুঝাইয়া রাষ্ট্রের সভ্যকে বুঝায়। নাগরিক সম্বন্ধে এই ধারণা উদ্ভূত হয় প্রাচীন গ্রীসে। প্রাচীন গ্রীকরা নাগরিক বলিতে শুধু নগরবাসী না বুঝিয়া নগরের সভ্যও বুঝিতেন। প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্র ও নগর অভিন্ন থাকায় নগরের প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রেরও সভ্য ছিল। নগর বা রাষ্ট্রের সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত তাহারাই যাহারা নগর-রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনায় কতকটা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিত। এ্যারিষ্টটলের মতে, শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা নাগরিকের পক্ষে অপরিহার্য; অবশ্য সে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ নাও করিতে পারে। বর্তমানে সাধারণত নাগরিক বলিতে বুঝায় সেই সকল ব্যক্তিকে যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার ফলে আইনের দৃষ্টিতে সভ্য বা আপন জন বলিয়া পরিগণিত হয়। রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন জন রূপে পরিগণিত হইবার ফলে তাহারা কতকগুলি অধিকার ভোগ করে যাহা বিদেশীরা পায় না। এগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলা হয়। অবশ্য সকল নাগরিকের সকল সময় পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার নাও থাকিতে পারে। যাহা হউক বলা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্র কর্তৃক সভ্য বলিয়া স্বীকার ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারভোগ নাগরিকের লক্ষণ।

'নাগরিক' শব্দের প্রাচীন ও আধুনিক অর্থ

নাগরিকের এই লক্ষণ বিচার করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মিলার (Mr. Justice Miller) নাগরিকের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন: "নাগরিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সভ্য। তাহারা হইল সেই জনসমষ্টি যাহার দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা করে বা সরকারের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে।"

নাগরিক সংজ্ঞা

অধিকার দায়িত্ব বা কর্তব্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাগরিকের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার আছে যাহা বিদেশীর নাই। ইহার ফলে, নাগরিকের কতকগুলি কর্তব্যও আছে যাহা বিদেশীকে পালন করিতে হয় না। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য হইলেও অন্যান্য কর্তব্যপালনের দ্বারা রাষ্ট্রের সেবা করা নাগরিকতার সংজ্ঞার মধ্যে নিহিত। এই সকল কর্তব্যপালন করিতে হইলে কর্তব্যপালনের উপযুক্ত হইতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে উপযুক্ত বা জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া রাষ্ট্রের মংগল-সাধনের সহজাত প্রচেষ্টাকেই নাগরিকতা বলা হয়। এই দিক দিয়া ল্যাস্কির ভাষায় বলিতে পারা যায়, "নাগরিকতা হইল সমাজের মংগলের জন্য নিজের জ্ঞানসম্পন্ন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ।"* সুতরাং নাগরিককে সমাজের মংগলে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাহাকে তাহার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং তাহার বিচারবুদ্ধি যেন জ্ঞানপ্রসূত তাহাও দেখিতে হইবে।

ল্যাস্কি-প্রদত্ত নাগরিকতার সংজ্ঞা

নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি (Modes of Acquisition of Citizenship) ঃ প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন করা যায়ঃ (১) স্বাভাবিকভাবে বা জন্ম দ্বারা, এবং (২) কৃত্রিম উপায়ে বা অনুমোদন দ্বারা। যাহারা স্বাভাবিকভাবে নাগরিকতা অর্জন করে তাহাদের জন্মসূত্রে (Natural Born) নাগরিক এবং যাহারা অনুমোদন দ্বারা নাগরিক হিসাবে গৃহীত হয় তাহাদিগকে অনুমোদনসিদ্ধ (Naturalised) নাগরিক বলা হয়।

জন্ম পদ্ধতি ও অনুমোদন পদ্ধতি

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি ঃ জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনেরও আবার দুইটি মূলনীতি আছে—জন্ম নীতি (*Jus Sangunis*) এবং জন্মস্থান নীতি (*Jus Soli or Jus Loci*)। জন্ম নীতি অনুসারে শিশু যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে তাহার পিতার নাগরিকতা পাইবে। একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের পুত্র ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলেও সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। অপর-দিকে, জন্মস্থান নীতি হিসাবে শিশু যে-রাষ্ট্রাভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিবে সেই রাষ্ট্রেরই নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে—তা তাহার পিতা যে-রাষ্ট্রেরই নাগরিক হউন না কেন। এই নীতি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন নাগরিকের পুত্র ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলে সে ব্রিটিশ নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। এই উদ্দেশ্যে ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণের সময় পতাকাসমন্বিত জাহাজকেও রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অংশ বলিয়া গণ্য করা হয়। জন্মস্থান নীতি অবশ্য পররাষ্ট্র দূতগণের সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে কখনও প্রযুক্ত হয় না।

[জন্ম] নীতি ও জন্মস্থান নীতি

* "Citizenship....means contribution of our instructed judgement to public good."

জন্ম নীতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রাধান্য (personal supremacy) এবং জন্মস্থান নীতিতে ভূমিগত প্রাধান্যের (territorial supremacy) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রাধান্য বলিতে বুঝায় যে, ব্যক্তি হিসাবে নাগরিকের উপর রাষ্ট্রের প্রাধান্য সর্বদাই বজায় রহিয়াছে। নাগরিক অস্থায়ীভাবে পররাষ্ট্রে বাস করিলেও এই প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয় না। এই অবস্থায় তাহার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সেই সন্তানের উপর নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রাধান্যই বলবৎ হয়। ভূমিগত প্রাধান্য বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে স্থায়ী-অস্থায়ী সকল বাসিন্দার উপর রাষ্ট্রের প্রাধান্য সর্বদাই বজায় রহিয়াছে। রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে কোন বিদেশীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহার উপরও এই প্রাধান্য প্রযুক্ত হইবে।

জন্ম নীতি ও জন্মস্থান নীতির তত্ত্ব ও গুণাগুণ

জন্ম নীতি ও জন্মস্থান নীতির কোনটিই সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত নহে। জন্ম নীতির প্রধান ত্রুটি হইল যে সকল ক্ষেত্রে পিতার জাতীয়তা প্রমাণ করা সহজ নয়। জন্মস্থান নীতি অনুসারে এইরূপ প্রমাণ প্রয়োজন না হইলেও ইহা আরও অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। জন্মস্থানই নাগরিকতার নির্ধারক হইবে—ইহা যুক্তির সহিত সম্পর্কবিহীন। একজন ভ্রাম্যমাণ ব্রিটিশ নাগরিকের তিন পুত্র তিনটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিতে পারে। জন্মস্থান নীতি অনুসারে তাহারা তিনটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। এইরূপ অবস্থা যুক্তিসংগত বা বাস্তব নহে।

পূর্বে সাধারণত জন্ম নীতিই অনুসৃত হইত। কিন্তু রাষ্ট্রের ভূমিগত সার্বভৌমিকতা বা প্রাধান্য সম্বন্ধে মতবাদের পরিস্ফুটনের পর অনেক রাষ্ট্র জন্মস্থান নীতিও অনুসরণ করিতে থাকে। বর্তমানে কোন নীতিই পৃথিবীর সর্বত্র অনুসৃত হয় না। কতকগুলি রাষ্ট্র জন্ম নীতি অনুসরণ করে, আবার ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্র উভয় নীতিই অনুসরণ করে। এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করায় অনেক সময় দ্বিজাতি সমস্যার উদ্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্রিটিশ নাগরিকের পুত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভূমিষ্ঠ হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মস্থান নীতি অনুসারে এবং ইংল্যাণ্ড জন্ম নীতি অনুসারে তাহাকে নাগরিক বলিয়া দাবি করিতে পারে, কারণ ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় নীতিই অনুসরণ করে।

বর্তমানে জন্ম নীতি বা জন্মস্থান নীতি কোনটি সর্বত্র অনুসৃত হয় না

এইরূপ জটিলতা থাকিলে সাধারণত নাগরিক বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহার নাগরিকতা নির্ধারণ করা হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাকে যে-কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা বাছিয়া লওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার পদ্ধতি (Acquisition of Citizenship by Naturalisation) : অনুমোদনের দ্বারা পররাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করা হয়। অনুমোদন শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে অনুমোদন বলিতে বুঝায় বৈধতা (legitimisation), বিবাহ, সৈন্য বাহিনীতে

যোগদান, স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করা, সরকারী চাকরি প্রভৃতি উপায়ের যে-কোনটিকে অবলম্বন করিয়া পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া। সংকীর্ণ অর্থে অনুমোদন বলিতে বুঝায় রাষ্ট্র-নির্দিষ্ট কতকগুলি সর্ত পালন করিয়া শাসন বিভাগ বা আদালতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া। ইংল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে অনুমোদন শব্দটি সাধারণত এই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা হইয়াছে যে, অনুমোদন দ্বারা যে-ব্যক্তি নাগরিকতা অর্জন করে, তাহাকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক বলে।

ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থে অনুমোদন

ব্যাপক অর্থে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার জন্য আবেদন করিবার প্রয়োজন হয় না। নির্দিষ্ট সর্তের যে-কোন একটি পালন করিলেই আইনের চক্ষে সে নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি কোন বিদেশী ব্যক্তি জাপানী রমণীকে বিবাহ করে তবে সে জাপানের নাগরিক বলিয়া গণ্য হয়। ইহার জন্য তাহাকে কোন অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যাইতে হয় না। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার জন্য আবেদন করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট কয়েকটি সর্ত পালন করিয়া তবেই আবেদন করিবার অধিকারী হওয়া যায়। এই সকল সর্তের মধ্যে 'স্থায়ী বাসিন্দার সর্ত' (condition of domicile) অধিকাংশ রাষ্ট্রেই প্রচলিত স্থায়ী বাসিন্দার সর্ত বলিতে বুঝায় নাগরিককে রাষ্ট্রের অধীনে নির্দিষ্ট সময় একযোগে বাস করিতে হইবে এবং সারাজীবন বসবাস করিবার ইচ্ছা প্রমাণ করিতে হইবে। এমনও দেখা গিয়াছে যে আজীবন বসবাস করিয়াও বিদেশী ব্যক্তি স্থায়ী বাসিন্দারূপে পরিগণিত হইতে পারে নাই। কত বৎসর একযোগে বাস করিতে হইবে সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত আছে। মেয়াদ অনুযায়ী বসবাস করার পর সারাজীবন বসবাস করার ইচ্ছা প্রমাণ করিতে পারিলে বিদেশী স্থায়ী বাসিন্দারূপে পরিগণিত হয়। অধিকাংশ রাষ্ট্র একমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাকেই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করে।

সংকীর্ণ অর্থে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি

স্থায়ী বাসিন্দার সর্ত

স্থায়ী বাসিন্দার সর্ত ব্যতীত আবেদনকারীকে অন্যান্য সর্ত পূরণ করিতে হইতে পারে। যেমন, ভারত ও ইংল্যাণ্ডে নিয়ম আছে যে আবেদনকারী বিদেশীকে প্রমাণ করিতে হইবে—প্রথমত, সে সচ্চরিত্র ; দ্বিতীয়ত, ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা ও ভারতের ক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত ১৪টি ভাষার যে-কোন একটিতে সে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন।

অনুমোদনের মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জন পূর্ণ (grand or perfect) বা আংশিক (partial or imperfect) হইতে পারে। পূর্ণ নাগরিকতা বলিতে বুঝায় পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারপ্রাপ্তি। নাগরিকতা অর্জন আংশিক হইলে কয়েকটি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে গৃহীত নাগরিককে বঞ্চিত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন গৃহীত নাগরিক কখনও রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির পদে আসীন হইতে পারে না। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক গ্রহণ আংশিক মাত্র।

পূর্ণ বা আংশিক নাগরিকতা অর্জন

উপরি-উক্ত পদ্ধতিসমূহের দ্বারা নাগরিক গ্রহণ ছাড়াও ভারত ইংল্যাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে নিয়ম আছে যে, অন্য কোন দেশ বা ভূখণ্ড ঐ সকল রাষ্ট্রের কোনটির অন্তর্ভুক্ত হইলে ঐ দেশ বা ভূখণ্ডের অধিবাসীদের নাগরিকতা প্রদান করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতি দ্বারা নাগরিকতা প্রদানকে অনেক সময় সমষ্টিগত অনুমোদনকরণ (**group nationalisation**) বলা হয়।

সমষ্টিগত অনুমোদন

এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনুমোদন দ্বারা নাগরিকতা প্রাপ্তির পথে সাধারণত বহু বাধার সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই বিদেশীকে নাগরিক হিসাবে গ্রহণে অনিচ্ছুক। অনেক ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যের কারণে বিদেশীকে নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। এইভাবে নাগরিকতাপ্রাপ্তি নিয়ন্ত্রণ করায় জাতি-বিদ্বেষ ও আন্তর্জাতিক বিরোধ বৃদ্ধি পায়। ফলে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বজনীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার কল্পনা স্বপ্নের জগতেই রহিয়া যায়—মাটির পৃথিবীতে নামিয়া আসে না।

***নাগরিকতার বিলোপ* (Loss of Citizenship) ঃ** যাহাকে সাধারণত নাগরিকতার বিলোপ বলিয়া ধরা হয় তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাগরিকতার পরিবর্তন মাত্র। কোন ব্যক্তি একই সময় দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের নাগরিক থাকিতে পারে না ; সুতরাং সে যদি পররাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করে তবে সে তাহার নিজ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। বিদেশীর সহিত বিবাহের ফলে স্ত্রীলোক স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করে, কিন্তু নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হয়।

সাধারণ ক্ষেত্রে নাগরিকতার বিলোপ বলিতে পরিবর্তন বুঝায় মাত্র

অনেক সময় অবশ্য অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন না করিয়াও কোন ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। সৈন্যদল হইতে পলায়ন, বিদেশী রাষ্ট্র-প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ, দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকা প্রভৃতি কারণে নাগরিকতার বিলোপ হইতে পারে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কোন ভারতীয় নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্র-প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করিতে পারে না।

নাগরিকতার প্রকৃত বিলোপ ঘটিতে পারে

পূর্বে নাগরিকতার পরিবর্তন একরূপ অসম্ভব ছিল কারণ তখন ধারণা ছিল যে, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য অপরিবর্তনীয়। বর্তমানের ধারণা হইল, নাগরিকের আনুগত্য পরিবর্তনীয়। রাষ্ট্রনৈতিক আনুগত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণার এই পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিক গ্রহণের নীতি প্রচলিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্র কর্তৃক সভ্য বলিয়া স্বীকার এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ বর্তমানে নাগরিকের লক্ষণ।

নাগরিকতা বলিতে বুঝায় সমাজের মংগলের জন্য নিজের জ্ঞানসম্পন্ন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ।

নাগরিকতা দুইভাবে লাভ করা যায়—(১) জন্মসূত্রে, (২) অনুমোদন দ্বারা। জন্মসূত্রে

নাগরিকতা লাভ আবার দুই প্রকারের—(১) পিতার নাগরিকতা অনুসারে, (২) জন্মস্থান অনুসারে। 'অনুমোদন' শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে অনুমোদন বলিতে বুঝায় যে-কোন উপায়ে পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া ; এবং সংকীর্ণ অর্থে অনুমোদন বলিতে বুঝায় বিশেষ পদ্ধতির ভিতর দিয়া নাগরিকতা অর্জন করা। অনুমোদন দ্বারা নাগরিকতা অর্জন পূর্ণ বা আংশিক হইতে পারে। কোন কোন রাষ্ট্রে আবার সমষ্টিগত অনুমোদনের ব্যবস্থাও আছে।

নাগরিকতার বিলোপ বলিতে সাধারণত উহার পরিবর্তন বুঝায় মাত্র। তবে কতিপয় কারণে নাগরিকতার প্রকৃত বিলোপ ঘটিয়া ব্যক্তিকে রাষ্ট্রহীনও (Stateless) করিতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. Define 'Citizenship'. Discuss the different methods of acquiring citizenship. (১৬২-১৬৬ পৃষ্ঠা)

2. Describe the different methods of acquiring citizenship. Discuss in this connection the 'condition of domicile'. (১৬৩-১৬৬ পৃষ্ঠা)

নবম অধ্যায়

সুনাগরিকতা

(GOOD CITIZENSHIP)

বর্তমান পৃথিবীর আদর্শ গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া মানবসমাজ সুন্দর ও সম্পূর্ণ জীবন গড়িয়া তুলিতে আকাংক্ষিত। কিন্তু গণতন্ত্রের আদর্শকে সার্থক করিতে হইলে নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ কতকগুলি গুণ বর্তমান থাকা প্রয়োজন—কারণ গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব নাগরিকদের উপর ন্যস্ত থাকে। সুতরাং তাহাদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের গুণাগুণ ও সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণ। যে-সকল গুণ গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয় তাহা যে-নাগরিকের মধ্যে আছে তাহাকেই 'সুনাগরিক' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার জন্য প্রয়োজন সুনাগরিকের

সুনাগরিক কাহাকে বলে

এখন প্রশ্ন হইল, সুনাগরিকতার এই অপরিহার্য লক্ষণগুলি কি কি ? লর্ড ব্রাইস্ সুযোগ্য নাগরিকের তিনটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সুনাগরিককে (১) বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, (২) সংযমী ও (৩) বিবেকসম্পন্ন হইতে হইবে। বর্তমান সমাজ সমস্যাবহুল ; এই সকল সমস্যা আবার জটিল। সুতরাং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন না হইলে নাগরিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির প্রকৃতি বুঝিতে পারিবে না এবং উহাদের সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে পারিবে না। ফলে সে মন্দ লোক কর্তৃক ভুল পথে চালিত হইতে পারে। এইজন্যই শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সুনাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে উক্তি করিয়াছেন যে, প্রত্যেক নাগরিককে

সুনাগরিকতার তিনটি লক্ষণ :

১। বিচারবুদ্ধি

ভালমন্দ, সত্যাসত্যের উপলব্ধি করিবার মত যোগ্য বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে।* এই জ্ঞান ব্যতীত সে নিজের কল্যাণ এবং সমাজের কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইবে না। সুনাগরিকতার জ্ঞানগত দিক ছাড়া নৈতিক দিকও আছে। নৈতিক দিক হইতে সুনাগরিকতার জন্য আত্মসংযম এবং সমাজচেতনা বা বিবেকের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই গুণাবলীর কথা চিন্তা করিয়াই বার্ণস (C. D. Burns) বলিয়াছেন যে গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিককে সমাজদরদী ও স্বাধীনচিত্ত হইতে হইবে।** আত্মসংযম ব্যতীত সুষ্ঠু ও সবল সামাজিক জীবন গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না। আত্মসংযমী ব্যক্তিই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, সাময়িক উত্তেজনাকে দমন করিতে পারে এবং সহিষ্ণুতার সহিত অপরের মতামতের বিচার করিতে পারে। আবার বিবেকসম্পন্ন ও স্বাধীনচিত্ত নাগরিকই সমাজের কল্যাণে নিজেকে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে নিয়োগ করে, নাগরিক-দায়িত্ব পালন করে এবং প্রয়োজন হইলে সামাজিক স্বার্থের জন্য নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত থাকে। সে নির্ভীক হইলেও উদ্ধত নহে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইলেও বলপূর্বক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না। মোটকথা, আত্মসংযমী ও বিবেকসম্পন্ন নাগরিক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সমাজবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রাণবন্ত। গণতন্ত্রের বনিয়াদ এইরূপ নাগরিক ভিন্ন গড়িয়া তোলা যায় না।

২। আত্মসংযম, এবং
৩। বিবেক

সুনাগরিক সমাজ-কল্যাণে অনুপ্রাণিত

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক (Hindrances to Good Citizenship) : সুনাগরিকতার পথে নানা প্রকারের বাধাবিঘ্ন আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিনটি—যথা, (ক) নির্লিপ্ততা, (খ) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, এবং (গ) দলীয় মনোভাব।

সুনাগরিকতার পথে তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধক :

(ক) নির্লিপ্ততা (Indolence) : নির্লিপ্ততাকেই সুনাগরিকতার প্রধান অন্তরায় হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। নির্লিপ্ততার জন্যই নাগরিক সাধারণের কার্যে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উদাসীন ও উৎসাহহীন হইয়া পড়ে এবং নাগরিক-কর্তব্যকে অবহেলা করিয়া চলে। সর্বসাধারণের কাজ বিশেষভাবে কাহারই কাজ নয়—এই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া নাগরিক সমাজের প্রতি নিজের কর্তব্যটুকু ভুলিয়া যায়। সে মনে করে আরও দশজন ত আছে; সুতরাং তাহাকে না হইলেও চলিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া সাধারণের কার্যে ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা খুব কম থাকে বলিয়া নাগরিক উৎসাহহীন হইয়া এই সকল ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতে চেষ্টা করে।

ক। নির্লিপ্ততা

কিভাবে নির্লিপ্ততার সৃষ্টি হয়

* "....there is an intellectual side....the sound practical judgement which enables one to know the true from the false and the good from the bad and, more difficult still, the true from the plausible and the good from the attractive."
Kamala Lectures

** "..in a democratic society there should be at least two characteristics in the conduct and outlook of all men ; first, a sturdy independence, and secondly, an imaginative sympathy."
Democracy : Its Defects and Advantages

এইরূপ মনোভাবের জন্যই সে নির্বাচনের সময় ভোটদান হইতে বিরত থাকে, নিজের মতামতকে সত্য জানিয়াও তাহার জন্য সংগ্রাম করিতে চায় না, শত্রুর আক্রমণে দেশ বিপন্ন হইলেও দেশরক্ষাকার্যে অগ্রণী হয় না এবং অবিলম্বে খ্যাতিলাভের সম্ভাবনা না থাকিলে সাধারণের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয় না। নির্লিপ্ততার জন্যই আবার সে পৌর-কর্তব্যকে এড়াইয়া চলে। অথচ সমাজবন্ধনের গোড়ার কথা হইল সহযোগিতা; সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়াই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। সামাজিক কল্যাণ ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ সম্ভব হয় না, আর একমাত্র প্রত্যেকটি ব্যক্তির শুভবুদ্ধিপ্রসূত কর্মপ্রচেষ্টাই সমাজ-কল্যাণকে সর্বাধিক এবং সমাজজীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। সমাজজীবনকে দুর্বল রাখিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সমাজ পংগু ও শৃংখলিত হইয়া পড়িলে সমাজভুক্ত মানুষও পংগু ও শৃংখলিত হইতে বাধ্য। তাই কর্মজড়তা, মানসিক অবসাদ ও ব্যক্তিগত লোভ মানুষের পরম শত্রু।

নির্লিপ্ততা কিভাবে প্রকাশ পায়

নির্লিপ্ততার ফলে ব্যক্তি ও সমাজজীবন উভয়ই ব্যাহত হয়

কিন্তু বর্তমান সময়ে নানাবিধ কারণে নাগরিকদের মধ্যে নির্লিপ্ততা প্রসারের সম্ভাবনা বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথমত, গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের মত প্রাচীন যুগের রাষ্ট্র আকারে ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং স্বল্প জনসংখ্যাসমন্বিত। সুতরাং নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু বর্তমান যুগের জাতীয় রাষ্ট্র আয়তন এবং জনসংখ্যায় বৃহৎ। এই বিশাল আয়তন ও জনসমুদ্রের মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলিয়া মনে করে। যেমন, নির্বাচনের সময় সে মনে করে অগণিত ভোটের মধ্যে তাহার একটি ভোটের মূল্য অতি সামান্যই। এই মনোভাবের দরুন সে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিরুৎসাহ ও কর্মবিমুখ হইয়া পড়ে।

নির্লিপ্ততার কারণ

১। বৃহদাকার রাষ্ট্র

দ্বিতীয়ত, বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক দিক ছাড়া অন্যান্য দিকের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং স্বাভাবিকভাবেই মানুষের দৃষ্টি অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় আকৃষ্ট হইতেছে। যেমন, খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ, শিল্প, সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে মানুষ অধিক মত্ত হইয়া পড়ায় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ঔদাসীন্যের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে এবং নাগরিক-কর্তব্যে অবহেলার মনোভাব অধিকাংশের মধ্যে সংক্রামিত হইতেছে।

২। নানা দিকে নাগরিকের আকর্ষণ বৃদ্ধি

তৃতীয়ত, বর্তমান পৃথিবীতে বিশেষ করিয়া ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশগুলিতে জীবন-সংগ্রাম তীব্রতর হইয়া পড়িতেছে। জীবনধারণের জন্য উপার্জন করিতেই মানুষের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়; অবসর তাহার হাতে সামান্যই থাকে। এই অবস্থায় ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে চিন্তা বা কার্য করিবার সুযোগ অতি সামান্যই পায়।

৩। জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা

চতুর্থত, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা উভয়ই মানসিক অসাড়তা টানিয়া আনে। ভারতের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেই বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে। এতদিন পর্যন্ত ভারতের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাতে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তুলিবার কোন চেষ্টাই ছিল না। পুঁথিগত বিদ্যাকে কোন রকমে মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই ছিল উহার একমাত্র সার্থকতা। ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার বা জানিবার কোন আকাংক্ষাই থাকিত না বলিলে চলে। শুধু ইহাই নয়, অধিকাংশের ভাগ্যে এ-শিক্ষাও জুটিত না। সম্প্রতি অবশ্য আমাদের দেশে শিক্ষাকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

৪। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা

(খ) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (Private Interest): নির্লিপ্ততার পরেই সুনাগরিকতার প্রধান প্রতিবন্ধক হইল ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ। ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে মানুষ অনেক সময়ই নাগরিক-কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং সমাজবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্য করিতে প্রয়াস পায়। নানাভাবে এই স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়—যথা, উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদান। অনেক সময়ই উৎকোচের বিনিময়ে ভোট ক্রয়বিক্রয় চলে। উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোটপ্রদান না করিয়া অযোগ্য প্রার্থীকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লোভে নির্বাচিত করা হয়। সরকারী দল অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনে জয়লাভের আশায় গুণাগুণ বিচার না করিয়া প্রভাবশীল ব্যক্তিদের খেতাব ও সম্মান বিতরণ করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার হাতে বিভিন্ন কাজের 'কণ্ট্রাক্ট' প্রদানের ক্ষমতাও যথেষ্ট রহিয়াছে। ব্যবসায়ীশ্রেণী, ঠিকাদার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। একদিক দিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নির্লিপ্ততা অপেক্ষাও সমাজের অধিক অহিতসাধন করে। স্বার্থের হানাহানি সমাজবন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় এবং সমাজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অনবরত চলিতেই থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম সমাজধর্ম, লোভ রিপু তাহার প্রধান হন্তারক।"

খ। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা

কিভাবে স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়

ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নির্লিপ্ততা অপেক্ষাও ক্ষতিকর হইতে পারে

(গ) দলীয় মনোবৃত্তি (Party Spirit): দলীয় মনোবৃত্তিকে সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক বলিয়া অভিহিত করা হয়। আবার ইহাও বলা হয় যে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হইল দলপ্রথা। দলপ্রথার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা প্রসারলাভ করে; জনমত সংগঠিত ও মূর্ত হয়, নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচন ও নীতি-নির্ধারণ এবং স্বৈরাচারিতার পথকে অবরোধ করিতে পারে। তাহা হইলে সুনাগরিকতা ও দল-প্রথার মধ্যে বিরোধ কোথায়? ইহার উত্তরে বলা হয় যে, প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক দল নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে চায়। এই আদর্শ

গ। দলীয় মনোবৃত্তি

হইতে যখন কোন দল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, যখন ইহা সাধারণের বৃহত্তর মংগলের পরিবর্তে দলভুক্ত মুষ্টিমেয়ের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার যন্ত্রে পরিণত হয় তখনই ইহা সমাজবিরোধী হইয়া সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে। দলীয় সদস্যগণ দলীয় আনুগত্যের ফলে নাগরিকতার আদর্শ ভুলিয়া যায় এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ অপেক্ষা দলগত স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে থাকে। ভারতের কথা উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, এখনও এমন দল আছে যাহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াইয়া আপন সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে।

আদর্শভ্রষ্ট দলই সুনাগরিকতার অন্তরায়

উপরি-উক্ত প্রতিবন্ধক ছাড়া সংবাদপত্র, নির্বাচন-পদ্ধতি প্রভৃতি সুনাগরিকতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায়, সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিত অভিমতপ্রদানই সুনাগরিকতার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত দিতে হইলে উহাদের বিভিন্ন দিকের মতামত জানিতে হইবে। এ-ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সাধারণ নাগরিকদের উপর ইহাদের প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং ইহারা যে-ধরনের সংবাদাদি সরবরাহ করে তাহার দ্বারাই অনেক পরিমাণে নাগরিকদের মতামত গঠিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় অনেক সময়ই সংবাদপত্রগুলি বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করিয়া সাধারণ নাগরিককে ভুলপথে পরিচালিত করে। এইজন্যই লর্ড ব্রাইস উক্তি করিয়াছেন যে সংবাদপত্রগুলি দিনের পর দিন বিভিন্ন ঘটনাকে বিকৃত করিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিয়া চলে।

ঘ। অন্যান্য প্রতিবন্ধক —সংবাদপত্র প্রভৃতি

কিভাবে সংবাদপত্র প্রতিবন্ধকের কার্য করিতে পারে

নির্বাচন-পদ্ধতির ত্রুটির জন্যও নাগরিকগণ অনেক সময় রাষ্ট্রনৈতিক কার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ না পাইয়া নির্লিপ্ত হইয়া পড়ে। সংখ্যালঘু দলভুক্ত নাগরিকগণ যদি দেখে যে কোনমতেই তাহারা আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে না তবে নির্বাচন প্রভৃতিতে তাহাদের কোন উৎসাহ থাকে না; রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণের দ্বারা তাহারা নাগরিকের কর্তব্যও পালন করিতে পারে না।

নির্বাচন-পদ্ধতির ত্রুটি-জনিত প্রতিবন্ধকতা

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক দূরিকরণের পন্থা (Measures to remove the Hindrances to Good Citizenship):

সুনাগরিকতার অন্তরায়সমূহের আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা করিতে হয় যে কিভাবে এই সকল প্রতিবন্ধককে দূর করা যায়। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন প্রতিবিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই সকল প্রতিবিধানকে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি—(১) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান, এবং (২) নৈতিক প্রতিবিধান।

দুই প্রকার প্রতিবিধান: (১) শাসনতান্ত্রিক, (২) নৈতিক

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান: নানাবিধ শাসনতান্ত্রিক নিয়মকানুন প্রবর্তনের দ্বারা সুনাগরিকতার পথ সুগম করাই এইপ্রকার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্য। দেখা যায়,

অনেক নাগরিকই নির্বাচন ব্যাপারে নির্লিপ্ত এবং ভোটপ্রদানে বিরত থাকে। এই নির্লিপ্ততা গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হয়—কারণ নাগরিকগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করিলে নির্বাচনের ফলাফলকে 'জনমতের প্রকাশ' (expression of public opinion) বলিয়া ধরা ভুল হইবে।

১। বাধ্যতামূলক ভোটদান

এইজন্য অনেকের মতে, ভোটপ্রদান বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। বেলজিয়াম সুইজারল্যাণ্ড অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশে এই পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এই সকল দেশের আইন অনুসারে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত ভোটদানে বিরতি থাকা দণ্ডনীয়। কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রকৃত নাগরিক গড়িয়া তোলা যায় না—নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে অনুভূতি ও উৎসাহের উদ্রেক না করিতে পারিলে কোন সুফলই ফলিবে না। শিক্ষা বিস্তার ও প্রচারের মাধ্যমেই নাগরিকদের মধ্যে কর্তব্য সম্পর্কে উপলব্ধি ও চেতনা জাগ্রত করা সম্ভবপর হয়।

ইহা প্রকৃত প্রতিকার নহে

আবার বলা হয় যে গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাগরিকগণের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকিলে চলিবে না, অন্যান্য সময়েও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন। ইহার দ্বারা একদিকে যেমন সরকার জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে অপরদিকে নাগরিকগণও তেমনি সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত হয়। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহের মধ্যে গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative) এবং পদচ্যুতির (Recall) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ল্যাস্কি প্রমুখ বহু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান রাষ্ট্রের নির্বাচকগণের সংখ্যা এত বেশী ও সমস্যাসমূহ এত জটিল যে গণভোট বা গণ-উদ্যোগের দ্বারা আইন নির্ধারণ করা সম্ভব বা কাম্য নয়।

২। প্রত্যক্ষ গণ-তান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

অনেকে ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধেও সন্দিহান

৩। সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের আর একটি প্রধান সমস্যা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার বিচার-বিবেচনায় সংখ্যালঘিষ্ঠগণের মতামত প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহা না করিলে স্বভাবতই সংখ্যালঘিষ্ঠগণ মনে করিবে তাহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই এবং তাহাদের স্বার্থ অসংরক্ষিত। কিন্তু সাধারণ নির্বাচন-পদ্ধতির সাহায্যে তাহারা ভোটসংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় আসনলাভ করিতে পারে না; এমনও হইতে পারে যে তাহারা মোট নির্বাচকদের শতকরা ২৫ ভাগের সমর্থন পাইয়াও আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য অনেক দেশে আইনসভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক

সংস্থার নির্বাচনের জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Representation) ব্যবস্থা আছে। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক দল ভোটসংখ্যার অনুপাতে আসন অধিকার করিতে সমর্থ হয়। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই এই পদ্ধতিকে সুনজরে দেখেন না—কারণ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ফলে কোন দলই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; ফলে একাধিক দল লইয়া 'সম্মিলিত সরকার' (coalition government) গঠিত হয়। এই ধরনের সরকার দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী হয়। ইঁহাদের মতে, জনমত গঠন ও অন্যান্যভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ন্ত্রণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ সংখ্যালঘিষ্ঠদের হাতে রহিয়াছে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা—সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

বর্তমানে এই পদ্ধতিকে সমর্থন করা হয় না

উপরি-উক্ত পদ্ধতি ছাড়া সকল রাষ্ট্রেই দুর্নীতি এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ও নির্বাচনে অসাধু উপায় অবলম্বনের জন্য শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা আছে। যেমন, ভারতে উৎকোচ প্রদান, ভোটদাতাদের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার, ভোটদানকেন্দ্র হইতে ব্যালট কাগজ সরান ইত্যাদি কার্য বেআইনী ও অসাধু আচরণের অন্তর্গত।

৪। দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নৈতিক প্রতিবিধান : সুনাগরিকতার পথে অন্তরায়কে দূর করিবার জন্য শাসনযন্ত্রের উন্নতিসাধনই যথেষ্ট নয়। মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে সমস্ত ব্যবস্থাই বিফল হইতে বাধ্য। সুতরাং আসল সমস্যা হইল মানুষের নৈতিক বা মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষসাধন। তাহা হইলেই নাগরিকদের মধ্যে সমাজবোধ, উদ্যম ও শুভবুদ্ধি প্রকাশ পাইবে। ইহার জন্য চাই জনসাধারণের জন্য সুশিক্ষা—এ-শিক্ষা কেবল জীবিকার্জনেই সাহায্য করিবে না; অপরের প্রতি দরদী এবং সমাজহিতের প্রতি অনুগত করিয়াও তুলিবে।

নৈতিক প্রতিবিধানের গুরুত্ব

সংক্ষিপ্তসার

গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার জন্য প্রয়োজন সুনাগরিকের। সুনাগরিক বিচারবুদ্ধি, আত্মসংযম, বিবেক প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইয়া সমাজ-কল্যাণে অনুপ্রাণিত হয়।

সুনাগরিকতার পথে নানা প্রতিবন্ধক আছে—যথা, (১) নির্লিপ্ততা, (২) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, এবং (৩) দলীয় মনোভাব। তন্মধ্যে, নির্লিপ্ততাই প্রধান। নির্লিপ্ততার কারণ হইল বর্তমানের বৃহদাকার রাষ্ট্র; নানাদিকে নাগরিকের আকর্ষণবৃদ্ধি, জীবন-সংগ্রামে তীব্রতা এবং অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। ইহাদের জন্য নাগরিক সামাজিক কর্তব্য এড়াইয়া চলে।

ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের ফলে নাগরিক সমাজের ক্ষতি করে।

দলীয় মনোবৃত্তির ফলে নাগরিক জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে।

ইহা ছাড়াও সংবাদপত্র, নির্বাচন-পদ্ধতি প্রভৃতি সুনাগরিকতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে।

প্রতিবিধান : প্রতিবিধান প্রধানত দুই প্রকারের—১। শাসনতান্ত্রিক, এবং ২। নৈতিক।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের মধ্যে (ক) বাধ্যতামূলক ভোটপ্রদান; (খ) গণভোট, গণ-উদ্যোগ প্রভৃতির ন্যায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ; (গ) সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা;

(ঘ) সমাজবিরোধী এবং দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম দমন প্রভৃতি প্রধান।

নৈতিক প্রতিবিধান হইল নাগরিককে প্রকৃত শিক্ষিত করিয়া তোলা।

প্রশ্নোত্তর

1. How would you define 'Good Citizenship'? Describe the factors that hinder it. (১৬৭-১৭১ পৃষ্ঠা)

2. Describe the hindrances to Good Citizenship. Show how they can be removed. (১৬৮-১৭৩ পৃষ্ঠা)

দশম অধ্যায়

অধিকার

(RIGHTS)

রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের জগতে অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়া আছে। বর্তমানে এই তিনটি ধারণা পরস্পরের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত—ওতপ্রোতভাবে জড়িতও বলা চলে। বর্তমান ও পরবর্তী অধ্যায়ে এই গভীর সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই ধারণা তিনটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

অধিকারের আলোচনা প্রসংগে কর্তব্যের আলোচনাও আসিয়া পড়ে, কারণ অধিকার বলিতেই কর্তব্য বুঝায়। গান্ধীজির ভাষায়, "অধিকার সম্বন্ধে সম্যক ধারণালাভ করিতে হইলে অধিকার ও দায়িত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করা প্রয়োজন।" সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে অধিকারের সহিত কর্তব্যের আলোচনাও করা হইবে।

অধিকারের স্বরূপ (Nature of Rights)**:** মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই অধিকারের প্রশ্ন উঠে। সমাজ-বহির্ভূত মানুষের অধিকার বলিতে কিছুই নাই। আইনানুগের নিকট অধিকার হইল রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত দাবি। সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তি কাহার উপর দাবি করিবে, আর কে-ই বা তাহার দাবি স্বীকার করিয়া লইয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে? অসংরক্ষিত অধিকার অলীক। সুতরাং অধিকার সম্বন্ধে ধারণা সামাজিক। এই কারণেই গ্রীণ বলিয়াছেন যে, একমাত্র সমাজের সভ্য হিসাবেই মানুষ তাহার অধিকার লাভ করে এবং সমাজ-বিবর্তনের সংগে সংগে অধিকারও বিস্তৃতিলাভ করে। বর্তমানে সমাজের পক্ষে রাষ্ট্রই আইনের মাধ্যমে অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া উহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। সুতরাং আইনানুগের দৃষ্টিতে অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরূপ দাবি স্বীকার ও সংরক্ষণের মাধ্যমে রাষ্ট্রাধীন বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে এবং একদিকে রাষ্ট্র ও অপরদিকে বিভিন্ন ব্যক্তি বা নাগরিকদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণ

অধিকার সম্বন্ধে ধারণা সামাজিক

আইনানুগের দৃষ্টিতে অধিকার

করা হয়। সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে অধিকারের এই আইনগত ধারণাই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু শুধু আইনগত ধারণা রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের (Political Philosophy) পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না, কারণ রাষ্ট্রদর্শনে ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্নও উঠে। আবার, রাষ্ট্রদর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অধিকার সম্বন্ধে শুধু আইনগত ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষেও পর্যাপ্ত হইতে পারে না। আইনগত ধারণানুসারে বলা যায় যে, কোন বিশেষ রাষ্ট্রে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকার কি কি—কিন্তু বলা যায় না যে, রাষ্ট্রে কি কি অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রদর্শনের দৃষ্টিতে অধিকার

রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ হইতে অধিকার সকল সময় সুন্দর জীবন-গঠনের সহায়ক হইবে। বলা যায়, সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখী হইতে চায়—তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করিতে চায়। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন কতকগুলি সামাজিক অবস্থার (conditions)। রাষ্ট্রদর্শনে এই প্রয়োজনীয় সামাজিক অবস্থাগুলিকে অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকের দৃষ্টিভংগি হইতেই অধ্যাপক ল্যাস্কি অধিকারের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন: "অধিকার হইল সমাজ-জীবনের সেই সকল অবস্থা যাহা ব্যতিরেকে সাধারণভাবে মানুষ তাহার সম্পূর্ণ উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হইতে পারে না।"*

ল্যাস্কি-প্রদত্ত সংজ্ঞা

রাষ্ট্রদর্শনে যাহাদিগকে 'সামাজিক অবস্থা' বলা হয় ব্যক্তিগত দিক হইতে তাহাদিগকে 'সুযোগ-সুবিধা'—ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির সুযোগ-সুবিধা বলা যাইতে পারে। এই সকল সুযোগ-সুবিধা সকলেরই ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির উপযোগী হইবে—কোন শ্রেণী বা ব্যক্তি বিশেষের নয়। সুতরাং অধিকার হইবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত—উভয় প্রকার কল্যাণের সহায়ক। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক না হইলে কোন অবস্থা বা সুযোগ-সুবিধা আইনের চক্ষে অধিকার বলিয়া গণ্য হইলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'অধিকার' পদবাচ্য হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন রাষ্ট্রে দাসত্বপ্রথা আইনানুমোদিত হইলে আইনের দৃষ্টিতে ক্রীতদাস পোষণের অধিকার বর্তমান থাকে; কিন্তু ক্রীতদাস প্রথা সমষ্টিগত কল্যাণের পরিপন্থী হওয়ায় ইহা রাষ্ট্রদর্শনে এবং, ইহার ফলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয় না। পূর্ণ অর্থে অধিকার সকল সময়েই সুষ্ঠু সমাজজীবনের সহায়ক হইবে। এই কারণেই গ্রীণ বলিয়াছেন যে, সমষ্টিগত নৈতিক কল্যাণ সম্বন্ধে চেতনা ব্যতীত অধিকারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।** অপরদিকে আবার, আইনানুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তির এবং সমষ্টিগত কল্যাণের

পূর্ণ অর্থে অধিকার সুষ্ঠু সমাজজীবনের সহায়ক হইবে

* "Rights. . . . are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best."

** "Without a society conscious of common moral interests, there can be no rights."

জন্য প্রয়োজনীয় কোন অবস্থাকে পূর্ণ অর্থে অধিকার বলিয়া গণ্য করা চলিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ক্রীতদাসগণের মুক্তি তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য কিন্তু রাষ্ট্রের আইন ইহা সমর্থন না করা পর্যন্ত ইহা ক্রীতদাসগণের 'অধিকারে' পরিণত হয় না। দেখা যাইতেছে, প্রকৃত পূর্ণ অর্থে অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য কোন দাবি বা সুযোগ-সুবিধা দুই প্রকার গুণসম্পন্ন হইবে—ইহাকে দুইটি সর্ত পূরণ করিতে হইবেঃ (১) ইহা প্রত্যেকের (সুতরাং সমষ্টির) ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির সহায়ক হইবে; এবং (২) ইহা আইনানুমোদিত হইবে। বার্কারের মতে, এই দুইটি সর্তের একটি পূরণ করিলে সেই সুযোগ-সুবিধাকে 'কতক পরিমাণে অধিকার' (Quasi Right) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

পূর্ণ অর্থে অধিকারের সংজ্ঞা

উপরি-উক্ত পূর্ণ অর্থে অধিকারের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়ঃ অধিকার হইল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তির (সুতরাং সমষ্টির) অন্তর্নিহিত শক্তিবিকাশের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা। আনুষ্ঠানিকভাবে, পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে অধিকারকে এইভাবেই দেখিতে হয়।

কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সকল সময় অধিকারকে এই দৃষ্টিতে দেখা হয় না। ফলে দেখা যায় যে, অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের উপযোগী সকল প্রকার সুযোগকে রাষ্ট্র স্বীকার করে নাই—অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সকল অধিকার সমষ্টিগত কল্যাণের উপযোগী নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বলিতে হইবে যে, ব্যবহারিক জীবনের রাষ্ট্র আদর্শ রাষ্ট্র নয়।

অধিকার ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা নহে, অধিকার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের সুযোগ

আদর্শ রাষ্ট্র পূর্ণ অর্থে সকল অধিকারকেই স্বীকার করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে এবং সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক নয় এরূপ কোন দাবিকেই আইনানুসারে অধিকারের মর্যাদা দিবে না। হবসের মত যে অধিকার ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা, তাহা ভুল। অধিকার ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা নহে—অধিকার অন্তর্নিহিত শক্তিবিকাশের সুযোগ। কোন বিশেষ রাষ্ট্র অধিকারকে স্বীকার ও সংরক্ষণের দ্বারা কতটা পরিমাণে এই অন্তর্নিহিত শক্তিবিকাশে সহায়তা করে তাহাই তাহার উৎকর্ষের মানদণ্ড।

***অধিকার ও স্বাধীনতা* (Rights and Liberty) ঃ** স্বাধীনতার সহিত অধিকারের সম্পর্ক আলোচনা ব্যতীত অধিকারের স্বরূপ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় না। পরবর্তী অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইলেও এখানে বলা প্রয়োজন যে, বর্তমানে অধিকার ও স্বাধীনতা প্রায় সমার্থবোধকভাবে ব্যবহৃত হয়। অধিকার হইল অন্তর্শক্তির বিকাশ বা ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির সুযোগ এবং স্বাধীনতা হইল ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির অনুকূল পরিবেশ। স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্ট হয় অধিকারের দ্বারা। সুতরাং অধিকার ব্যতীত স্বাধীনতার অলীক কল্পনা মাত্র।

অধিকার ও স্বাধীনতা সমার্থবোধকভাবে ব্যবহৃত হয়

স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে মতবাদ (Theory of Natural Rights) ঃ এক শ্রেণীর লেখকের মতে, মানুষের অধিকার নৈসর্গিক, সহজাত, চিরন্তন ও অবাধ। ইহারা স্থান, কাল বা সামাজিক অবস্থার অপেক্ষা রাখে না। ইহাদের সংগে লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। মানুষের চলৎশক্তি বা দেহের বর্ণ যেরূপ মানুষের প্রকৃতির অংশ, এই অধিকারগুলিও সেইরূপ মানুষের অংগীভূত। এই স্বাভাবিক ও অপরিত্যাজ্য অধিকারের মধ্যে প্রধান তিনটি হইল জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সুখের অনুসরণের অধিকার।

চুক্তিবাদিগণের হস্তেই স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে মতবাদ বর্তমান রূপ ধারণ করে

স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে ধারণা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিলেও ইহা চুক্তিবাদী হবস্, লক ও রুশোর হস্তেই বর্তমান রূপ ধারণ করে। ইঁহাদের মধ্যে আবার লক ও রুশোর রচনাতেই এই ধারণা বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। লকের মতে, চুক্তি সম্পাদন করিয়া আদিম মনুষ্যসকল স্বাভাবিক অধিকারের কিয়দংশ সমর্পণ করিয়াছিল অবশিষ্টাংশকে সংরক্ষিত করিবার জন্য। সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরও স্বাভাবিক অধিকারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। রুশোর মতবাদে, স্বাভাবিক অধিকার সাধারণের ইচ্ছার (General Will) অংগীভূত হইল এবং সাধারণের ইচ্ছাই ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির সংরক্ষক হইয়া দাঁড়াইল ; এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা সাধারণের ইচ্ছার অংগীভূত বলিয়া ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার বা স্বাভাবিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণই রহিল। কার্যক্ষেত্রে স্বাভাবিক অধিকারের এই ধারণার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় আমেরিকা ও ফ্রান্সের স্বাধীনতা ঘোষণায়। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে, মানুষ কতিপয় অপরিত্যাজ্য অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ফ্রান্সের স্বাধীনতা ঘোষণায় বলা হইয়াছিল, মানুষের সমান স্বাভাবিক অধিকারের সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কর্তব্য।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে ধারণার প্রয়োগ

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর এই ঘোষণার পিছনে বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্দেশ্য ছিল সামন্তপ্রথার অযৌক্তিক বাধানিষেধ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে মানুষের সাধারণ ও স্বাভাবিক অধিকারের নামে উদ্বুদ্ধ করা এবং অভিজাতশ্রেণীর ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকারের দাবির (Divine Rights) বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।* তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা ও প্রচার সমাজের প্রভূত উপকারসাধন করে, কারণ সামন্তপ্রথার অবসান করিতে সাহায্য করিয়া স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা সমাজের অগ্রগতিকে সম্ভব করে। অবশ্য একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন

ফ্রান্সের স্বাধীনতা ঘোষণা

* "In the eighteenth century the demands of the rising bourgeoisie were reinforced by appealing to the authority of 'Nature', to a certain 'natural right' inherent in man, which could be opposed to the 'divine right' of kings and similar buttresses of privilege". John Lewis, '*On Human Rights*', *Human Rights, A symposium edited by UNESCO*

যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা প্রগতিমূলক হইয়া থাকিলেও পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় ঐ ধারণার ত্রুটি প্রকট হইয়া পড়ে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের তুলনায় সামাজিক বা অর্থ নৈতিক অধিকারের (Social or Economic Rights) উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।*

আধুনিক গতি

সাম্প্রতিক যুগে সমাজবিজ্ঞানীরা স্বাভাবিক অধিকারের এক নূতন অর্থ করিয়াছেন। এই অর্থে স্বাভাবিক অধিকার সহজাত, চিরন্তন বা অপরিত্যাজ্য নহে। ইহা হইল সমাজের নীতির সম্পূর্ণ সহায়ক, ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা মাত্র। একমাত্র সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই এই প্রকার অধিকারের কল্পনা করা যাইতে পারে। ইহা প্রযুক্ত হয় স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র দ্বারা (natural selection) গিডিংসের ভাষায় বলা যায়, "সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র দ্বারা প্রযুক্ত সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অধিকারই" স্বাভাবিক অধিকার।† অন্য সকল প্রকার অধিকার অস্বাভাবিক।

সমাজবিজ্ঞানিগণ-প্রদত্ত স্বাভাবিক অধিকারের সাম্প্রতিক অর্থ

সমালোচনাঃ স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে মতবাদের তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, 'স্বাভাবিক' শব্দটির বিভিন্ন অর্থের জন্য স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে ধারণা কোনক্রমেই সর্বজন গ্রাহ্য হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, চুক্তি মতবাদী দার্শনিকগণ-কল্পিত সহজাত, চিরন্তন ও অবাধ অধিকার বলিয়া কিছুই নাই। মানুষের অধিকার সমাজ হইতে উদ্ভূত। আদিম যুগ হইতে মানুষ সংগঠিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই সে নিজেকে বিকশিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সমাজ আবার প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে এবং সমাজসঞ্জাত অধিকারও অনুরূপভাবে রূপান্তরিত হইতেছে। সুতরাং শাশ্বত ও সহজাত অধিকার বলিয়া কিছুই নাই। অধিকার সমাজের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সহিত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এক সময় ক্রীতদাস পোষণের অধিকার ছিল; কিন্তু আজ তাহা বিলুপ্ত। সুতরাং অধিকার সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক।

'স্বাভাবিক' শব্দটির বিভিন্ন অর্থের জন্য এই মতবাদ সমালোচিত হইয়াছে

অধিকার সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক—সহজাত, চিরন্তন ও অবাধ নহে

উপরি-উক্ত কারণের জন্য স্বাভাবিক অধিকার বলিতে সহজাত, চিরন্তন ও অবাধ অধিকার না বুঝিয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির উপযোগী সামাজিক অবস্থানসমূহকেই বুঝা উচিত। এই অর্থে স্বাভাবিক অধিকার সমালোচনার ঊর্ধ্বে। যে-অধিকার ব্যক্তি ও সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন করে তাহাই ত' স্বাভাবিক। ইহা আইনানুমোদিত না হইলেও আদর্শের মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

---

* Human Rights—UNESCO Symposium ; E. H. Carr—The Rights of Man

† Natural rights are "socially necessary forms of right, enforced by natural selection in the sphere of social relations".

এই দিক দিয়া সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা কতকটা সমর্থনযোগ্য। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ উন্নয়নের সহায়ক ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধাকেই স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, এবং ইহা স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র দ্বারা প্রযুক্ত হয় বলিয়াও প্রচার করিয়াছেন। সমাজ উন্নয়নের সহায়ক সুযোগ-সুবিধাকেই স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি নাই; কিন্তু ইহা স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র দ্বারা প্রযুক্ত হয় মনে করিলে ভুল করা হইবে। স্বাভাবিক অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া বলবৎ করা রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কর্তব্য। কোন বিশেষ রাষ্ট্র এই কর্তব্য কতকটা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে তাহাই তাহার উৎকর্ষের পরিচায়ক।

***নৈতিক ও আইনসংগত অধিকার* (Moral and Legal Rights):** সাধারণত সমাজের ন্যায়বোধ ও বিবেক দ্বারা সমর্থিত পারস্পরিক দাবিকেই 'নৈতিক অধিকার' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহাদের পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন থাকে না। ফলে নৈতিক অধিকার ভংগ করা হইলে আইনসংগতভাবে প্রতিকারবিধানেরও কোন উপায় থাকে না। প্রত্যেকেরই অপরের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাইবার অধিকার আছে কারণ ইহা সমাজের বিবেক দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু এই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে আইনসংগতভাবে প্রতিকারবিধানের কোন উপায় নাই; কারণ ইহা নৈতিক অধিকার মাত্র। রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন দাবি অধিকারে পরিণত হয় না।

এক অর্থে নৈতিক অধিকার হইল স্বাভাবিক অধিকার

এক অর্থে নৈতিক অধিকারকে স্বাভাবিক অধিকার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা সমর্থিত হউক আর না হউক সমাজের ন্যায়বোধ বা বিবেক দ্বারা সমর্থিত পারস্পরিক দাবি ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল ইহাদিগকে স্বীকার করিয়া লওয়া। কিন্তু স্বীকার করিয়া লইলেও সকল সময় ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, স্ত্রীর স্বামীর নিকট হইতে সদ্ব্যবহারের দাবির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রের আইন স্ত্রীর উপর স্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিতে পারে, কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে জোর করিয়া সদ্ব্যবহার আদায় করিয়া দিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, নৈতিক অধিকার সকল সময় আইনসংগত অধিকারের পর্যায়ভুক্ত হইয়া পূর্ণ অর্থে অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে, আদর্শ রাষ্ট্র নৈতিক অধিকারকে প্রকৃত অধিকারের মর্যাদা দান করিতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকিবে—ইহাই তাহার আদর্শের পরিচায়ক।

নৈতিক অধিকার সকল সময় আইন-সংগত অধিকারে পরিণত হইতে পারে না

আইনসংগত অধিকারের স্বরূপ

আইনসংগত অধিকার হইল অনুমোদিত পারস্পরিক দাবি। আইনানুমোদিত বলিয়া রাষ্ট্র ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। আইনানুগের দৃষ্টিতে ইহাই একমাত্র অধিকার। আইনানুমোদিত অধিকার নীতি বা সমাজের কল্যাণ দ্বারা সমর্থিত নাও হইতে পারে। না হইলে

ইহাদের পূর্ণ অর্থে অধিকার বলিয়া অভিহিত করা যায় না। সুতরাং রাষ্ট্রের একদিক দিয়া যেমন কর্তব্য হইল নৈতিক অধিকারকে স্বীকার করিয়া লওয়া, অপরদিকে তেমনি কর্তব্য হইল সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণের পরিপন্থী আইনানুমোদিত অধিকারের বিলোপসাধন করা। আদর্শ রাষ্ট্র ইহাই করে।

সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার (Civil, Political and Economic Rights): আদর্শ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত অধিকারগুলিকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে: সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক। যে-সকল সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত ব্যক্তির সামাজিক জীবন নিরর্থক হইয়া পড়ে তাহাদিগকেই সামাজিক অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়—যথা, জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, গতিবিধির স্বাধীনতা, প্রভৃতি। আবার যে-সকল সুযোগ-সুবিধা না থাকিলে মানুষ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া সমাজের কল্যাণসাধনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারে না, তাহাও সামাজিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে—যথা, চিন্তা, বিশ্বাস ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার, ইত্যাদি। সামাজিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া সুসভ্য রাষ্ট্র ব্যক্তির এই সকল অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত না হইলে কোন দাবি অধিকারে পরিণত হয় না। সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের দ্বারা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির জন্য যে-পরিবেশ সৃষ্ট হয় তাহাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা (**civil liberty**) বলা হয়।

সামাজিক অধিকারের স্বরূপ

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইল রাষ্ট্রীয় কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা। ইহা প্রধানত নাগরিকের অধিকার। বিদেশীদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। সুতরাং বলা যায়, নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে ব্যক্তি যে-সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাহাই রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। পূর্বে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিতে সরকারকে দমিত রাখিবার ক্ষমতা বুঝাইত; বর্তমানে ইহার দ্বারা সরকার গঠন ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিবার সুযোগ-সুবিধা বুঝায়। সুতরাং নির্বাচন করিবার অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠনের অধিকার, সরকারী কার্যের সমালোচনার অধিকার, প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের স্বরূপ

অনেকে অর্থনৈতিক অধিকারকে সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতী। ইঁহাদের যুক্তি হইল, অর্থনৈতিক অধিকার সমাজজীবনে ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহাদিগকে সামাজিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত করা যায়; 'অর্থনৈতিক অধিকার' বলিয়া নূতন এক পর্যায়ের সৃষ্টির কোন সার্থকতা নাই। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে, বর্তমান যুগের অর্থ-ব্যবস্থায়

কতকগুলি অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা স্বাধীন জীবনযাপনের পক্ষে এরূপ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ইহাদিগকে এক বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করিয়া ইহাদের উপর সম্যক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। বিরুদ্ধবাদীদের এই যুক্তি মানিয়া লইয়া আমরা অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে এক বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করিয়া পৃথকভাবে আলোচনা করিব।

অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে এক বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করা উচিত

এককথায় অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় দৈনন্দিন অন্নসংস্থান ব্যাপারে যুক্তিসংগত অর্থ খুঁজিয়া পাইবার সুযোগ।* অন্নসংস্থান ব্যাপারে যুক্তিসংগত অর্থ খুঁজিয়া পাইবার জন্য শ্রমিকের বেকারত্ব হইতে মুক্তির অধিকার থাকিবে, উপযুক্ত মজুরির অধিকার থাকিবে ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক অধিকারের স্বরূপ

আইনসংগত অধিকারসমূহকে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অতি অস্পষ্ট। এমন অনেক অধিকার আছে যাহা সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক উভয় শ্রেণীর অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সামাজিক অধিকার; কিন্তু সরকারের নীতি ও কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। এইরূপ পার্থক্য সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক—কারণ মতামত প্রকাশ ও সরকার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দেশ করা সকল সময় সম্ভব নয়।

উপরি-উক্ত তিন শ্রেণীর অধিকারের মধ্যে শুধু যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দেশ করা সকল সময় সম্ভব হয় না তাহাই নহে, উহারা পরস্পরের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীলও। গতিবিধির স্বাধীনতা সামাজিক অধিকার। ইহা ক্ষুণ্ন হইলে আইন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অধিকার না থাকিলে, গতিবিধির স্বাধীনতা মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। আবার গতিবিধির স্বাধীনতা না থাকিলে অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার—ঠিকমত ভোগ করা যায় না। অর্থনৈতিক অধিকারের দিক দিয়াও বলা যায় যে, শ্রমিক যদি দৈনন্দিন অন্নসংস্থান ব্যাপারে সর্বদা ব্যাপৃত ও ভীত থাকে তবে তাহার নিকট নির্বাচনাধিকার সম্পূর্ণ অর্থহীন। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার পরস্পরের পরিপূরক এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

আইনসংগত বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল

বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অধিকার (Different Kinds of Civil Rights): দেশ ও কাল ভেদে সামাজিক অধিকারের পার্থক্য ঘটিয়া থাকিলেও, ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে মৌলিক বলিয়া গণ্য করা হয়। নিম্নে এই মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

* ...the opportunity to find reasonable significance in the earning of one's daily bread". Laski

(ক) জীবনের অধিকার (Right to Life): জীবনের অধিকার বলিতে বাঁচিয়া থাকার অধিকার বুঝায়। ইহা মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। এই অধিকার না থাকিলে অন্য সকল অধিকার মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আমাকে যদি কেহ যখন ইচ্ছা হত্যা করিতে পারে এবং তাহার যদি কোন প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না থাকে তবে আমার পক্ষে সমাজে বাস করা অর্থহীন। এরূপ ঘটিলে রাষ্ট্রীয় সংগঠনেরও অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের নিকটও ব্যক্তির জীবন মূল্যবান। হবসের মতবাদ অনুসারে, জীবনরক্ষার জন্যই আদিম মানুষ সামাজিক চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের পত্তন করিয়াছিল।

জীবনের অধিকার বলিতে কি বুঝায়

বাঁচিয়া থাকার অধিকার বলিতে রাষ্ট্রের দ্বারা জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা বুঝায়। আত্মরক্ষার অধিকারও ইহার অন্তর্গত। চরম রাজতন্ত্রের সমর্থক হবসের মতে, মানুষ চুক্তি দ্বারা সকল অধিকার সমর্পণ করিলেও আত্মরক্ষার অধিকার সমর্পণ করে নাই, কারণ ইহা হস্তান্তরযোগ্য নহে। ব্যক্তির জীবনের অধিকার বলবৎ করিবার জন্য আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা হইল রাষ্ট্রের পক্ষে প্রাথমিক কর্তব্য।

আত্মহত্যার অধিকার আছে কিনা ?

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণের মতে, ইহা হইল রাষ্ট্রের পক্ষে একমাত্র কর্তব্য। প্রত্যেকের যখন জীবনরক্ষার অধিকার আছে তখন কাহারও নিজের জীবন নষ্ট করিবার অধিকার নাই। এই কারণেই আত্মহত্যা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। আত্মহত্যা দ্বারা সমাজ হইতে এমন এক ব্যক্তি বিনষ্ট হয় যাহার সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য আছে। সুতরাং আত্মহত্যা সমাজদ্রোহিতারই সামিল।

(খ) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty): জীবন বলিতে এ্যারিষ্টটল বুঝিয়াছিলেন সুন্দর জীবন—শুধু বাঁচিয়া থাকা নহে। এ্যারিষ্টটলের এই ধারণা প্রতিফলিত হইয়াছে একজন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর উক্তিতে যে, "জীবনধারণই কাম্য নহে, ধারণোপযোগী জীবনই কাম্য।" ধারণোপযোগী জীবনের জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতার অধিকারের। স্বাধীনতার অধিকার বলিতে প্রধানত বুঝায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার বা গতিবিধির স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের সুযোগ। এই অধিকার না থাকিলে মানুষ পশুরই সামিল হইয়া পড়ে। বর্তমানে দাসত্বপ্রথাকে কেহই সমর্থন করে না, কারণ ইহা মানুষের স্বাধীনতার বিরোধী। স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া ইহা কাম্য জীবনেরও পরিপন্থী।

স্বাধীনতার অধিকার বলিতে কি বুঝায়

স্বাধীনতার অধিকার অব্যাহত নহে। রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য—শান্তিশৃংখলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে ইহাকে খর্ব করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে খর্ব করা কখনই উচিত নহে।

(গ) মতপ্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of Opinion): গতিবিধির স্বাধীনতা ও জীবিকার্জনের অধিকারের মতই সমান মূল্যবান অধিকার হইল মত-

প্রকাশের স্বাধীনতা। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—বাক্-স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। মনের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের অধিকারকে কাম্য জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। গণতন্ত্রকে জনমতের শাসন বলা হয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকিলে জনমত গঠিত হইতে পারে না এবং ফলে জনমতের শাসনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। উপরন্তু, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকিলে তবেই রাষ্ট্রনৈতিক সত্য ও ন্যায়ের প্রচার এবং প্রতিকার করা সম্ভব হয়। সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনৈতিক জীবনই হইল আদর্শ জীবন।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দুই প্রকারের

অনেকের মতে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনই অব্যাহত হইতে পারে না। ইহা সকল সময়ই সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার আছে বলিয়া মানহানিকর, দুর্নীতিমূলক বা রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কোন কিছু বলিবার বা লিখিয়া প্রকাশ করিবার অধিকার থাকিতে পারে না। এই মতের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, অনেক সময় নানা অজুহাতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে অযৌক্তিকভাবে খর্ব করা হয়। এইজন্যই ল্যাস্কি প্রমুখ লেখকগণের মতে, যুদ্ধের সময়ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অনিয়ন্ত্রিত থাকা উচিত।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অব্যাহত হওয়া উচিত কিনা ?

ধনতান্ত্রিক সমাজে সকল শ্রেণীর পক্ষে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা উপলব্ধি করা একরূপ দুষ্কর। সেখানে মানহানির অজুহাতে, দুর্নীতির অজুহাতে শ্রমিককে সহজেই আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে; কিন্তু শ্রমিকের পক্ষে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্বে বারবার ব্যয়ের কথা চিন্তা করিতে হয়। আবার এইরূপ সমাজে রাষ্ট্রযন্ত্র ধনিক শ্রেণীর করায়ত্ত বলিয়া সকল আইনই ধনিক শ্রেণীর অনুকূলে প্রণীত হয়। পরিশেষে, সংবাদপত্রগুলির মালিকানাও থাকে ধনিক শ্রেণীর হস্তে। ফলে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন মতামত লিখিতভাবে বিশেষ প্রকাশিত হয় না; হইলেও বিকৃতভাবে হয়। সুতরাং স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লওয়াই যথেষ্ট নয়, ইহাকে বলবৎ করিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন এমন এক সমাজ-ব্যবস্থার যেখানে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হইল সহযোগিতার, শোষণের নয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

(ঘ) পরিবার গঠনের অধিকার (Right to Family): গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এক সমভোগী সমাজের (communistic society) পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যেখানে পরিবার বলিয়া কিছুই থাকিবে না—যেখানে রাষ্ট্রীয় সমাজের সকলে একই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

এ্যারিষ্টটলের মতে, এক পরিকল্পনা একটি মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। পারিবারিক জীবন সমাজ-বন্ধনের মূলগ্রন্থী। ইহাকে ছিন্ন করিলে সমগ্র

সমাজজীবনই বিনষ্ট হইবে। বস্তুত, আদিম কাল হইতে আজ পর্যন্ত পারিবারিক জীবন সমাজজীবনের কেন্দ্র হিসাবে কার্য করিতেছে। সমাজকে এই কেন্দ্রচ্যুত করিলে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। চিরকালই সকল দেশ এই মৌলিক সত্য উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়া পারিবারিক জীবনের অবসান ঘটাইবার প্রচেষ্টা কোন রাষ্ট্রেই করা হয় নাই। বরং এই অধিকারকে সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

পরিবার গঠনের অধিকার মৌলিক অধিকার

(ঙ) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property): পূর্ণ অর্থে সম্পত্তির অধিকার বলিতে সম্পত্তি অর্জনের, ব্যবহারের এবং দান-বিক্রয়ের অব্যাহত অধিকার বুঝায়। এ্যারিষ্টটলের মতে, এই পূর্ণ অর্থে সম্পত্তির অধিকার সমাজ-বন্ধনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ; ইহাকেও ছিন্ন করা অযৌক্তিক। এ্যারিষ্টটলের এই ধারণা বহুকাল ধরিয়া অধিকাংশের দ্বারা সমর্থিত হইলেও বর্তমানে ইহা সমর্থন একপ্রকার হারাইয়া ফেলিয়াছে বলা যায়। বর্তমানে সম্পত্তির অব্যাহত অধিকার কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করেন না। সমভোগবাদী সমাজ ইহার একরূপ বিলোপসাধনেরই পক্ষপাতী এবং সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র ইহাকে সমাজের কল্যাণে সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়োজিত করিতে চায়।

সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে মতবিরোধ

(চ) চুক্তির অধিকার (Right to Contract): চুক্তির অধিকার স্বাধীন জীবিকার্জনের অধিকারের সহিত জড়িত। মানুষের যদি জীবিকার্জনের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকে তবে তাহার পক্ষে চুক্তি করিবার অধিকারও প্রয়োজনীয়। উপরন্তু, যে-সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যক্তির নির্দেশে পরিচালিত হয়, সে-সমাজে চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার অধিকারও প্রয়োজনীয়। এইজন্য চুক্তির অধিকারকে অধিকাংশ রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু চুক্তির অধিকার কখনও অসীম হইতে পারে না ; হইলে জন-কল্যাণের আদর্শ ব্যাহত হয়। যে চুক্তি বেআইনী বা দুর্নীতি-মূলক, যাহা রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিপন্থী তাহাকে কখনই সমর্থন করা যায় না। চুক্তির অধিকার সর্বদাই সামাজিক ধ্যানধারণা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের আপেক্ষিক। জনকল্যাণকর সমাজে চুক্তির অধিকার রক্ষণশীল ধনতান্ত্রিক সমাজ (conservative capitalistic society) অপেক্ষা সংকীর্ণতর। তবে বর্তমানে সকল দেশেই সম্পত্তি ও অর্থ-ব্যবস্থার উত্তরোত্তর নিয়ন্ত্রণের ফলে চুক্তির অধিকারও ক্রমশ সংকুচিত হইয়া আসিতেছে।

চুক্তির অধিকার জনকল্যাণের আপেক্ষিক

বর্তমানে চুক্তির অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হইয়া আসিতেছে

(ছ) স্বাধীন বিবেক ও ধর্মাচরণের অধিকার (Right to Freedom of Conscience and Religion): পূর্বে ধর্মীয় রাষ্ট্রের যুগে কোন বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের (State Religion) মর্যাদা দিয়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকে নিপীড়ন করা হইত। ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যের জন্য বৃহৎ জনসমষ্টিকে বিনাশ করিবার দৃষ্টান্তও ইতিহাসে পাওয়া যায়। বর্তমানে কিন্তু ধর্মীয় রাষ্ট্রের দিন শেষ না হইলেও মানুষ

ধর্ম-নিরপেক্ষতার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। বিবেক ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহাদের বশবর্তী হইয়া রাষ্ট্রের আইন অমান্য করিবার অধিকার কোন রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। বিবেক ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করিতে অক্ষম হইলেও রাষ্ট্র এই বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। নিজ স্বার্থে প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহাই করে।

ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা আইন অমান্যের স্বাধীনতা দেয় না

(জ) সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার (Right to Association): মানুষের প্রকৃতির একটি দিক হইল সংঘবদ্ধতা। স্বভাবগত কারণেই সে সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে চায়। বলা যায় যে, একরূপ এই প্রকৃতিগত কারণের জন্যই রাষ্ট্রনৈতিক সংঘ বা রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাংক্ষা ছাড়াও মানুষের জীবনের অন্যান্য দিক আছে। বর্তমানের বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রে এই সকল দিকের যথাযোগ্য পরিস্ফুটন এবং এই সকল আদর্শের পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব হয় না। সুতরাং মানুষ নানাপ্রকার সংঘ গঠন করে। এই কারণেই বর্তমানে আমরা সমাজজীবনে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রভৃতি নানাপ্রকার সংঘ দেখিতে পাই। আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ব্যক্তি উত্তরোত্তর ইহাদের সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতেছে। বাস্তব জীবনের এই চিত্র এবং মানুষের সামাজিক প্রকৃতি সম্বন্ধে উপরি-উক্ত তত্ত্ব হইতে অনেকে এই অভিমত পোষণ করেন যে, সংঘসমূহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌম এবং রাষ্ট্র সংঘসমূহের অন্যতম মাত্র।* ব্যবহারিক জগতে অবশ্য দেখা যায় যে, সংঘসমূহ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন। সংঘসমূহের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও ব্যাপক ক্ষমতা থাকিলেও রাষ্ট্র যে-কোন সময় এই স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সুতরাং সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার নিয়ন্ত্রিত অধিকার মাত্র। সাধারণত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সহিত সংগতিরক্ষার জন্যই এই নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার নিয়ন্ত্রিত অধিকার

(ঝ) আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার (Right to Equality before Law): অধিকার সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে অলীক প্রতিপন্ন হয়। অধিকার বলিতে বুঝায় আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ-সুবিধা। এই সুযোগ-সুবিধার প্রধান উপাদান হইল আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বা সমানাধিকার। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য থাকিলে তবেই সকল সামাজিক (এবং রাষ্ট্রনৈতিকও) অধিকার ভোগ সম্ভব হয়। এই প্রসংগে স্মরণযোগ্য বিষয় হইল যে, আইনের দৃষ্টিতে সাম্যই যথেষ্ট নয়। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ধনবৈষম্য-মূলক সমাজে অধিকার ব্যাহত হইতে পারে। সুতরাং প্রয়োজন অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার।

আইনের দৃষ্টিতে সাম্যই যথেষ্ট নয়

*১২৯-১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

(ঞ) ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার (Right to Preserve Distinct Language and Culture): এই অধিকার প্রধানত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধানের প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে স্বীকার করিয়া লওয়া সকল সময় সম্ভব নয়; সকল ক্ষেত্রে ইহা যুক্তিসংগতও নয়। এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য উপায়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইল অন্যতম উপায়।

ইহা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার

উপরি-উক্ত রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন ছাড়াও তত্ত্বের দিক দিয়া ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকারকে মানিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যেই ব্যক্তি আত্মোপলব্ধির সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারে। এই দিক দিয়াও এই অধিকারকে স্বীকার এবং ইহার সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

রাষ্ট্রনৈতিক ও তত্ত্বগত কারণে ইহাকে স্বীকার করা উচিত

(ট) শিক্ষার অধিকার (Right to Education): উন্নত সমাজে শিক্ষার অধিকারকে অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার বলিয়া গণ্য করা হয়। পূর্ণ অর্থে শিক্ষার অধিকার বলিতে বুঝায় এক বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত হওয়া সকলেরই আইনসংগত অধিকার ও দায়িত্ব এবং উচ্চশিক্ষার জন্য সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা। এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রই করিয়া থাকে। রাষ্ট্র যদি যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে না পারে তবে সেখানে পূর্ণ অর্থে অধিকার নাই বলিতে হইবে।

শিক্ষার অধিকার নাগরিকতার সংজ্ঞার সহিত বিশেষভাবে জড়িত। বর্তমানে নাগরিকতা বলিতে বুঝায় "সাধারণের কল্যাণে নিজের জ্ঞানপ্রসূত বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ।"* ইহার জন্য নাগরিককে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইবে এবং এই শিক্ষার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রের।

শিক্ষার অধিকার নাগরিকতার সংজ্ঞার সহিত জড়িত

বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Different Kinds of Political Rights): রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি মৌলিক বলিয়া পরিগণিত হয়:

(ক) বসবাস করিবার অধিকার (Right of Residence): রাষ্ট্রের যে-কোন অংশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার অধিকারকে প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রশ্ন উঠিতে পারে: ইহাকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন? রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইল সেই সকল সুযোগ-সুবিধা যাহা একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্যদেরই দেওয়া হয়—বিদেশীদের দেওয়া হয় না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারভোগই নাগরিককে বিদেশী হইতে পৃথক করে। বিদেশীর স্থায়ী বসবাসের অধিকার নাই; রাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া সে

বসবাস করিবার অধিকারকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত করা হয় কেন

* ১৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতে পারে মাত্র। সুতরাং, বিদেশীর যে-অধিকার নাই, যে-অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্যগণই ভোগ করিতে পারে তাহা রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার।

(খ) বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তার অধিকার (**Right to Protection while staying Abroad**) : নাগরিকের বিদেশে অবস্থানকালীন নিজ রাষ্ট্র দ্বারা নিরাপত্তা রক্ষার অধিকার আছে। যদি নাগরিক বিদেশে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন প্রতিকার না পায়, তবে নাগরিকের রাষ্ট্র তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া অন্যায়ের প্রতিকারবিধান করিতে চেষ্টা করিবে। এই অধিকার বলবৎ করার জন্য প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ ঘোষণাও করিবে। বলা যায় যে, অষ্ট্রিয়া কর্তৃক সার্বিয়ার উপর এই অধিকার বলবতের প্রচেষ্টায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

(গ) ভোটাধিকার (**Right to Vote**) : আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রে (National State) এই রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ণ অর্থে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইল শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা। বর্তমানে আর প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা নাই। তাই ভোটাধিকারের মাধ্যমে নাগরিক পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ভোটাধিকারের প্রসার বিশেষ কাম্য ; এবং জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। এই আদর্শের উপলব্ধি হইলে তবেই শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বা জনপ্রতিনিধিমূলক হইয়া উঠিতে পারে।

বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় ভোটাধিকারই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার

(ঘ) নির্বাচিত হইবার অধিকার (**Right to be Elected**) : ভোটাধিকার বা নির্বাচন করিবার অধিকারই যথেষ্ট নয়, রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণ করিবার বা নির্বাচিত হইবার অধিকারও প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যোগ্যতা থাকিলে প্রত্যেককেই নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রদান করা হয়। ইহা না করিলে গণতান্ত্রিক আদর্শ ব্যাহত হয়।

(ঙ) সরকারী চাকরিতে নিয়োগের অধিকার (**Right to hold Public Office**) : সরকারী চাকরি করিয়াও নাগরিক রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণ করে। সুতরাং এই অধিকারও গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ অব্যাহত রাখিতে হইলে সরকারী চাকরিতে নিয়োগ ব্যাপারে যোগ্যতা ভিন্ন অন্য কোন কারণে নাগরিকগণের মধ্যে প্রভেদ করা উচিত নয়।

অনেক সময় বিদেশীকেও সরকারী চাকরিতে লওয়া হয়। কিন্তু বিদেশীর কোন অধিকার নাই। রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই তাহাকে লওয়া হয়।

(চ) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার (**Right against the State**) : এই অধিকারটি লইয়া বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। অনেকের মতে, নাগরিকের সমাজ

ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অধিকার নাই। অধিকার সম্পূর্ণভাবে সমাজ-সঞ্জাত; ইহা বলবৎ করে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার প্রয়োগে রাষ্ট্রের সাহায্য প্রত্যাশা করা যায় না। এই মতবিরোধের জন্যই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকারকে অসম্ভব ও অলীক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অপরদিকে বলা যায় যে, রাষ্ট্র একটি তত্ত্বগত ধারণা মাত্র; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় শাসকগোষ্ঠী। সুতরাং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার কার্যত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অধিকার। বিভিন্ন অধিকারের স্বীকার ও সংরক্ষণের দ্বারা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির পথ প্রস্তুত করাই শাসকগোষ্ঠীর কর্তব্য—শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইহাই নাগরিকের অধিকার। ইহা সর্বপ্রধান মৌলিক অধিকার, কারণ ইহা অন্য সকল প্রকার অধিকারের ভিত্তি। সুতরাং ইহাকে অস্বীকার করার অর্থ সকল অধিকারকে অস্বীকার করা।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার লইয়া বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার বলিতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার বা বিদ্রোহের অধিকারও বুঝায়। তত্ত্বের দিক দিয়া বিদ্রোহের অধিকার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হইলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই অধিকার—কারণ শাসকগোষ্ঠীই রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করে। সক্রেটীস বিদ্রোহের অধিকারকে সমর্থন করেন নাই। তাঁহার মত ছিল যে, বিদ্রোহের অধিকার দ্বারা অরাজকতা সমর্থন করিলে সংঘবদ্ধ জীবন ব্যাহত হইবে। পরবর্তী যুগে সক্রেটীসের এই মতের বহু সমর্থক মিলিলেও অনেক আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মত হইল যে, বিদ্রোহের অধিকার দান না করিলেই সংঘবদ্ধ জীবন ব্যাহত হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকে। ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেলকে (Bertrand Russell) অনুসরণ করিয়া বলা যায়, অনেকক্ষেত্রে আইনানুমোদিত সরকার এতই নিকৃষ্ট হয় যে অরাজকতার সম্ভাবনা থাকিলেও উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রয়োজন হয়।* সংঘবদ্ধ বা সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্য হইল সুন্দর জীবন। ব্যক্তির অধিকারের স্বীকার ও সংরক্ষণ দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। বিদ্রোহের অধিকার না থাকিলে শাসনকর্তা স্বৈরাচারী হইয়া উঠিয়া ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে। ফলে সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্যই ক্ষুণ্ণ হইবে। সুতরাং তত্ত্বগত কারণেই বিদ্রোহের অধিকার থাকা উচিত। এই প্রসংগে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অধিকার আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রে আইনানুমোদিত হইয়া প্রকৃত অধিকারের মর্যাদা পায় নাই।

বিদ্রোহের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা

বিদ্রোহের অধিকার আইনানুমোদিত হয় নাই

বিভিন্ন অর্থনৈতিক অধিকার (Different Kinds of Economic Rights): কতিপয় অর্থনৈতিক অধিকারকেও মৌলিক অধিকার বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহারা এই অর্থে মৌলিক যে, ইহাদের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে বহু সামাজিক ও

* "There are cases where the legal government is so bad that it is worth while to overthrow it by force in spite of the risk of anarchy that is involved."

—*The Reith Lectures, 1948-49*

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই দিক দিয়া অর্থনৈতিক অধিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার অপেক্ষা অধিকতর মৌলিক। সকল রাষ্ট্র ইহাদিগকে স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিলেও ইহাদের মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং সেই সকল রাষ্ট্রের আদর্শ ব্যাহত হয়। আদর্শ রাষ্ট্রে নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক অধিকারগুলি স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হইয়া প্রকৃত অর্থে অধিকারের মর্যাদা পাইবেই ঃ

অর্থনৈতিক অধিকারের গুরুত্ব

(ক) কর্মে অধিকার (Right to Work) ঃ এই অধিকার জীবনের অধিকারের মধ্যে নিহিত। সমাজে মানুষ পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকার্জন করিবে—ইহা সভ্যতার পরিচায়ক। ইহা হইতে স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হইল যে, সমাজ ব্যক্তির জীবিকার্জনের জন্য যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করিবে। ল্যাস্কি বলেন, কর্মের দ্বারাই মানুষ জীবিকার্জন করে; সুতরাং সমাজের কর্তব্য রহিয়াছে তাহাকে কর্মসংস্থান করিয়া দিবার। কর্মে অধিকার বলিতে যে-কোন কর্মে অধিকার বুঝায় না, যথাযোগ্য কর্মে অধিকার বুঝায় মাত্র।

কর্মে অধিকার বলিতে যথাযোগ্য কর্মে অধিকার বুঝায়

(খ) পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের অধিকার (Right to Adequate Wages) ঃ কর্মে অধিকারই যথেষ্ট নয়, নাগরিককে তাহার পরিশ্রমের জন্য যোগ্য ও পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকও দিতে হইবে। দেখিতে হইবে যে, নাগরিক যেন তাহার পরিশ্রমের বিনিময়ে তাহার জীবনযাত্রার মানের উপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে। কাহারও বিলাসের সামগ্রী যোগাইবার পূর্বে সমাজকে দেখিতে হইবে যে, সকলের যেন প্রয়োজনীয় অভাব মোচন হয়।*

(গ) অবকাশের অধিকার (Right to Leisure) ঃ শ্রমিকের পরিশ্রমের সময়ও যথোচিত হইবে। দেখিতে হইবে যে, বিশ্রাম ও সত্তার বিকাশের জন্য শ্রমিকের যেন যথেষ্ট অবকাশ থাকে। মানুষের কর্মশক্তির একটা সীমা আছে। অন্নসংস্থান ব্যাপারে শ্রমিককে যদি এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছিতে হয় তবে সে অন্য কোন ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতে পারিবে না।** ফলে তাহার সত্তার পূর্ণ বিকাশ হইবে না; সাধারণের মংগলে নিজের জ্ঞানপ্রসূত বিচারবুদ্ধির নিয়োগ করিয়াও সে তাহার নাগরিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

কর্তব্য (Duties) ঃ অধিকারের আলোচনার পর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। কর্তব্য হইল দায়িত্ব—কিছু করার বা না-করার দায়িত্ব—যথা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা এবং রাষ্ট্রের আইন অমান্য না করা, ইত্যাদি। আধুনিক কালে নাগরিকের দায়িত্ব বা কর্তব্যের উপর অধিকারের মতই সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কর্তব্য কাহাকে বলে

* "..There must be sufficiency for all before there is a superfluity for some." Laski

** "Leisure is essential to happiness." Aristotle, Nicoamchean Ethics

অধিকারের ন্যায় কর্তব্যকেও নৈতিক ও আইনসংগত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। নৈতিক কর্তব্য সমর্থিত হয় মাত্র সমাজের বিবেক দ্বারা—ইহার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় আইনের অনুমোদন থাকে না। দরিদ্রকে সাহায্য দান করা অন্যতম নৈতিক কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন না করিলে রাষ্ট্রীয় শক্তি কোনরূপ শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে পারে না। কিন্তু আইনসংগত কর্তব্য এড়াইয়া গেলে আইনানুমোদিতভাবেই শাস্তিদানের ব্যবস্থা থাকে। রাষ্ট্রকে নিয়মিতভাবে ন্যায্য কর প্রদান অন্যতম আইনসংগত কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন না করিলে আইনানুমোদিত শাস্তিভোগ করিতে হইতে পারে।

কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ

নৈতিক ও আইনসংগত কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ সকল দেশে এক নহে। কোন দেশে যাহা নৈতিক কর্তব্য, অপর দেশে তাহা আইনসংগত কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ রাষ্ট্রে ভোটদান নৈতিক কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু মেক্সিকো, আর্জেণ্টাইন, প্রভৃতি দেশে ইহা আইনসংগত কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত।

***অধিকার ও কর্তব্য* (Rights and Duties) :** অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে। বস্তুত, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের সমাজবোধ হইতে অধিকার ও কর্তব্য—উভয়েরই জন্ম। সমাজবদ্ধ মানুষ পরস্পরের উপর কতকগুলি দাবি করিতে থাকে। এই দাবিগুলি স্বীকৃত হইলে তবেই তাহারা অধিকারে পরিণত হয়। দাবিগুলি স্বীকারের অর্থ হইল কতকগুলি দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। এই দায়িত্বগুলিই কর্তব্য। আনুষ্ঠানিকভাবে আইনানুমোদিত হইলে ইহারা আইনসংগত কর্তব্যে পরিণত হয়। সুতরাং কর্তব্য ব্যতীত অধিকারের কল্পনাও করা যাইতে পারে না। আমার অধিকার ভোগ অপরের কর্তব্য পালনের উপর নির্ভর করে এবং অপরের অধিকার ভোগ আমার কর্তব্য পালনের উপর নির্ভর করে। আমি যদি অধিকার ভোগ করিতে চাই তবে আমাকে কর্তব্য পালন করিতে হইবে; নচেৎ অপরে তাহাদের কর্তব্য পালন হইতে বিরত থাকিয়া আমার অধিকার ভোগ অসম্ভব করিয়া তুলিবে।

মানুষের সমাজবোধ হইতে অধিকার ও কর্তব্য উভয়ের জন্ম

অধ্যাপক হবহাউস (Hobhouse) একটি উদাহরণের সাহায্যে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে এই অংগাংগি সম্বন্ধ সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন: ধাক্কা না খাইয়া পথ চলিবার অধিকার যদি আমার থাকে তবে অপরের কর্তব্য হইল আমাকে প্রয়োজনমত পথ ছাড়িয়া দেওয়া।* আমার এই অধিকার ভোগের জন্য আমারও কর্তব্য অপরের চলার পথ ছাড়িয়া দেওয়া। ল্যাস্কি বলেন, আমার নিরাপত্তার

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে অংগাংগি সম্বন্ধ নির্দেশে উদাহরণ

* "If I have the right to walk along the street without being pushed off the pavement, it is your duty to give me reasonable room."

অধিকারের মধ্যে অপরকে অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করিবার কর্তব্য নিহিত আছে।

অধিকার আত্মোপলব্ধির সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু এই সুযোগ-সুবিধা সমাজ-বহির্ভূত নয়; সমাজের মধ্যেই ইহা নিহিত। এমনভাবে এই সকল সামাজিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধি ও সামাজিক কল্যাণের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হয়। অসামাজিকভাবে ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকারের উৎপত্তি হয় নাই। এজন্য প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণসাধন করার পূর্ণ দায়িত্ব সংযুক্ত আছে। নাগরিকের যদি সম্পত্তির অধিকার থাকে, তবে তাহার কর্তব্য হইল এমনভাবে সম্পত্তির ব্যবহার করা যাহাতে সর্বাধিক ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। যদি সে এই কর্তব্য পালন না করে তবে তাহার সম্পত্তির অধিকার কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। অধিকাংশ সময় সম্পত্তির অধিকার এইভাবে ব্যবহৃত হয় না বলিয়াই বর্তমানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের বিরুদ্ধে বিশেষ বিদ্বেষ দেখা গিয়াছে।

প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত দায়িত্ব সংযুক্ত আছে

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনসংগত অধিকার ও কর্তব্য লইয়াই আলোচনা করা হয়। এক অর্থে রাষ্ট্রই সকল অধিকারের উৎস কারণ রাষ্ট্রীয় সংগঠন দ্বারা স্বীকৃত না হইলে কোন দাবিই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয় না। আবার রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত না হইলে কোন অধিকারই অধিকাররূপে বলবৎ থাকিতে পারে না। আমাদের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে বলিয়া রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, কর প্রদান, প্রভৃতি নানাবিধ কর্তব্য আমাদের রহিয়াছে। এই কর্তব্যসমূহ পালন না করিলে রাষ্ট্রযন্ত্র অচল হইয়া পড়িবে; আমাদের অধিকারও ব্যাহত হইবে। সুতরাং অধিকার ভোগের জন্য আমাদিগকে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে হইবে। অপরদিক দিয়াও আবার বলা যায় যে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল নাগরিকের আত্মোপলব্ধির উপযোগী অধিকারসমূহকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র এই কর্তব্য পালনে পরাংমুখ হইলে নাগরিকগণ স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনে অস্বীকার করিতে পারে। কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনে অস্বীকৃতি বলিতে বুঝায় শাসকগোষ্ঠীর প্রতি কর্তব্য পালনে অস্বীকৃতি। এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করিবার পূর্বে অবশ্য আইনানুমোদিতভাবে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তনসাধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রচেষ্টা ফলবতী না হইলে দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করিয়া সার্বভৌমশক্তির ব্যবহারকারীর বিরোধিতা করিতে হইবে। ইহা নাগরিকের বিদ্রোহের অধিকার ও কর্তব্য। নাগরিকগণের এই কর্তব্যপালনের ক্ষমতাই শাসকবর্গকে তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন রাখে; এবং শাসকবর্গের দায়িত্ব সম্বন্ধে চেতনাই সুন্দর জীবনের অন্যতম অপরিহার্য সর্ত।

রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের কারণ

বিদ্রোহের অধিকার ও কর্তব্য

নাগরিকের বিভিন্ন কর্তব্য (Different Kinds of Duty of the Citizen) : নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনত পালনীয় হইলেও কতকগুলি সমাজের নৈতিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। নাগরিকের কর্তব্যসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ঃ

(ক) আনুগত্য (Allegiance) ঃ আনুগত্য নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হওয়ার অর্থ রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি অনুগত হওয়া। রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি অনুগত নাগরিক সর্বতোভাবে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিয়া, সর্বতোভাবে রাষ্ট্রকে সেবা করিয়া ইহার আদর্শ উপলব্ধিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে। প্রয়োজন হইলে তাহাকে যথাসর্বস্ব রাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়া জীবন বিসর্জন দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, ইত্যাদি। এইভাবেই আনুগত্য প্রকাশ করা হয়।

আনুগত্যের অর্থ

(খ) আইন মান্য করিয়া চলা (Obedience to Laws) ঃ সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক সোবিয়েত নাগরিক বিশ্বস্ততার সহিত শাসনতন্ত্র ও আইন মান্য করিয়া চলিবে।* অন্যান্য শাসনতন্ত্রে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলা না হইলেও সকল দেশেই আইন মান্য করা নাগরিকের আনুগত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হিসাবে গণ্য করা হয়। আইনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের আদর্শের রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং আইনকে অমান্য করার অর্থ হইল রাষ্ট্রের আদর্শের বিরোধী কার্য করা। এরূপ কার্য কোন রাষ্ট্রই সমর্থন করে না। অতএব নাগরিককে আইন মান্য করিয়া চলিতে হইবে।

সকল দেশেই আইন মান্য করা নাগরিকের আনুগত্যের লক্ষণ হিসাবে ধরা হয়

নাগরিককে আইন মান্য করিয়া রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে হইবে বলিয়া যে সকল আইন মান্য করিয়া চলিতে হইবে এরূপ মতবাদ সমর্থন করা যায় না। এরূপ ধারণা প্রচলিত থাকিলে তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা মূল্যহীন। আইন যদি ব্যক্তির অধিকার হরণ করে, ইহা যদি সুষ্ঠু সমাজজীবনের পরিপন্থী হয়, তবে ইহাকে মান্য করা নয়—ইহার বিরোধিতা করা কর্তব্য।

সকল ক্ষেত্রে আইন মান্য করা চলিতে পারে না

(গ) কর প্রদান (Payment of Taxes) : নিয়মিতভাবে ন্যায্য কর প্রদান নাগরিকের আর একটি কর্তব্য। রাষ্ট্র নাগরিকগণের সংগঠন ; রাষ্ট্রই সকল অধিকারের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। কোন সংগঠনের কার্যই অর্থ ব্যতিরেকে চলিতে পারে না। রাষ্ট্রের কার্য যাহাতে সুপরিচালিত হয়, যাহাতে ইহা সকল অধিকার সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিতে পারে তাহার জন্য নাগরিকের কর্তব্য হইল নিয়মিতভাবে ন্যায্য কর প্রদান করা। ন্যায্য কর প্রদান সকল রাষ্ট্রেই নাগরিকের আইনসংগত কর্তব্য।

কর প্রদান নাগরিকের আইন-সংগত কর্তব্য

* এই গ্রন্থের ২য় খণ্ডে সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থার তৃতীয় অধ্যায় দেখ।

অপরাপর কর্তব্য (Miscellaneous Duties): উপরি-উক্ত তিনটি মুখ্য কর্তব্য ছাড়াও নাগরিকের কয়েকটি গৌণ কর্তব্য আছে। এগুলি প্রধানত সমাজের নৈতিক চেতনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রয়োজন হইলে ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাষ্ট্রের অধীনে কর্মগ্রহণ, নিষ্ঠার সহিত রাষ্ট্র কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন, দলগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত প্রভাবের উর্ধ্বে উঠিয়া সদ্ভাবে ভোট দেওয়া, প্রভৃতি নাগরিক কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত। সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া, জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নের চেষ্টা করা, সমাজের কল্যাণে সর্বদা সচেষ্ট থাকা, প্রভৃতিও উন্নত সমাজে নাগরিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হয়।

সমাজের বিবেক দ্বারা প্রণোদিত কর্তব্যসমূহ

সংক্ষিপ্তসার

অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। আইনানুগের নিকট অধিকার হইল রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত দাবি। রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকের দৃষ্টিতে অধিকার হইল সেই সকল সামাজিক সুযোগ-সুবিধা যাহা সুন্দর জীবন গঠনের সহায়ক। এই দুইটি দিক মিলাইয়া বলা যায় যে, পূর্ণ অর্থে অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য কোন দাবি বা সুযোগ-সুবিধাকে দুইটি সর্ত পূরণ করিতে হইবে —(১) ইহা সুন্দর জীবনের সহায়ক হইবে, (২) ইহা আইনানুমোদিত হইবে।

অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ দ্বারা সুন্দর জীবন গড়িয়া তোলাই রাষ্ট্রের কর্তব্য।

অধিকার ও স্বাধীনতা সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়। স্বাধীনতা সৃষ্ট হয় অধিকারের দ্বারা।

স্বাভাবিক অধিকার: এক শ্রেণীর লোকের মতে, মানুষের অধিকার নৈসর্গিক, সহজাত, চিরন্তন এবং অবাধ। ইহারা স্থান, কাল বা সামাজিক অবস্থার অপেক্ষা রাখে না। ইহাদের সংগে লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে।

সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানীরা স্বাভাবিক অধিকারের এক নূতন অর্থ প্রদান করিয়াছেন। ইহাদের মতে স্বাভাবিক অধিকার ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের কল্যাণেরই সহায়ক সুযোগ-সুবিধা মাত্র। ইহা প্রযুক্ত হয় স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র দ্বারা।

সমালোচনা: 'স্বাভাবিক' শব্দটির দ্বারা কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে মতৈক্য নাই। দ্বিতীয়ত, অধিকার সকল সময়ই সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক—সহজাত, চিরন্তন এবং অবাধ নহে।

সমাজবিজ্ঞানীরা স্বাভাবিক অধিকারকে সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও উহা স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র দ্বারা প্রযুক্ত হয় মনে করিয়া ভুল করেন। সমাজের অনুপন্থী সকল অধিকারকেই বলবৎ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

নৈতিক ও আইনসংগত অধিকার: সমাজের নীতিবোধ দ্বারা সমর্থিত পারস্পরিক দাবিই নৈতিক অধিকার। ইহারা আইনানুমোদিত হইলে তবেই আইনসংগত অধিকারে পরিণত হয়। অবশ্য সকল আইনসংগত অধিকারই নীতির দিক দিয়া সমর্থনীয় নহে।

সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার: সুষ্ঠু সমাজজীবনের সহায়ক সুযোগ-সুবিধাকে সামাজিক অধিকার বলা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইল শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ-সুবিধা। অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে বেকারত্ব হইতে মুক্তি, যোগ্য মজুরির অধিকার, ইত্যাদি বুঝায়। এই তিন শ্রেণীর অধিকার পরস্পরের পরিপূরক এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

বিভিন্ন সামাজিক অধিকার: জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, পরিবার গঠনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তির অধিকার, স্বাধীন বিবেক ও ধর্মাচরণের অধিকার, সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, আইনের চক্ষে সমানাধিকার প্রভৃতিকে বর্তমানে মৌলিক সামাজিক অধিকার বলিয়া গণ্য করা হয়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার: বসবাস করিবার অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তার অধিকার, ভোটাধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকারকে মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হিসাবে ধরা হয়। অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার—বিদ্রোহের অধিকার এখনও আইনানুমোদিত হয় নাই।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক অধিকার: কর্মে অধিকার, পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের অধিকার এবং অবকাশের অধিকার হইল মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার।

অধিকার ও কর্তব্য: কর্তব্য হইল কিছু করা বা না-করার দায়িত্ব। প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত কোন-না-কোন দায়িত্ব সংযুক্ত আছে।

বিভিন্ন কর্তব্য: নাগরিকের বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে আনুগত্য, আইন মান্য করা, কর প্রদান, প্রভৃতিই প্রধান।

প্রশ্নোত্তর

1. What are Rights ? Distinguish between Civil and Political Rights. How are Civil Rights guaranteed in (*a*) the U. S. A., (*b*) England, and (*c*) India ?

[C. U. 1945]

[ইংগিত: অধিকার হইল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তির (সুতরাং সমষ্টির) অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা। সুতরাং কোন সুযোগ-সুবিধা অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে ইহাকে দুইটি সর্ত পূরণ করিতে হয়—(ক) ইহা প্রত্যেকের (অর্থাৎ সমষ্টির) ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির সহায়ক হইবে, এবং (খ) ইহা আইনানুমোদিত হইবে। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের পার্থক্য হইল এইরূপ: যে-সকল সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত ব্যক্তির সামাজিক জীবন নিরর্থক হইয়া পড়ে তাহাদিগকে সামাজিক অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়। আর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইল রাষ্ট্রীয় কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা। জীবনের অধিকার, গতিবিধির স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি সামাজিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের দৃষ্টান্ত হিসাবে নির্বাচন করিবার ও নির্বাচিত হইবার অধিকার, সরকারী কার্যের সমালোচনার অধিকার প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকার সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত রক্ষাকবচের কথা উল্লিখিত হয়—(১) শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ করা; (২) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা; (৩) আইনের অনুশাসন; (৪) দায়িত্বমূলক শাসন-ব্যবস্থা; (৫) নাগরিকগণের সতর্ক দৃষ্টি ও সাহসিকতা।

ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং উহাকে সার্বভৌম পার্লামেন্ট সাধারণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করিতে পারে। সুতরাং শাসনতন্ত্রে অধিকার বিধিবদ্ধ হইবার কোন প্রশ্নই উঠে না। ইংল্যাণ্ডে অধিকার ভোগের নীতি হইল যে, নাগরিকগণ আইন (বিধিবদ্ধ ও প্রথাগত) ভংগ না করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে বা বলিতে পারে। এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে, ইংল্যাণ্ডের শাসন-

ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল পার্লামেন্টের প্রাধান্য এবং ইহা যে কোন প্রকারের আইন প্রণয়ন করিয়া অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা, নাগরিকগণের সাহসিকতা, আইনের অনুশাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দ্বারা নাগরিকগণের অধিকার সুসংরক্ষিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে কিন্তু কতকগুলি মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া আছে। এইগুলিকে বলবৎ করিবার ভার আদালতের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। শাসন বিভাগ বা ব্যবস্থা বিভাগ এই সংরক্ষিত অধিকারকে ক্ষুন্ন করিয়া কার্য বা আইন পাস করিলে আদালত উহাকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে। একমাত্র শাসনতন্ত্রকে এত বিশেষ পদ্ধতিতে সংশোধিত করিয়া মৌলিক অধিকারের পরিবর্তন করা যাইতে পারে। অবশ্য ভারতের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের ক্ষমতা অধিক। উভয় দেশেই আবার যাহাকে বলা হয় আইনের অনুশাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তাহা স্বীকৃত। উপরন্তু, ভারতে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত। নাগরিকগণের সতর্কতা সম্পর্কে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের তুলনায় ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ও চেতনা এখনও ততটা প্রসারলাভ করে নাই।...প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ১৭৪-১৭৬ এবং ১৮০-১৮১ পৃষ্ঠা দেখ।]

2. Write a note on Natural Rights. (১৭৭-১৭৯ পৃষ্ঠা)

3. Enumerate the more important fundamental rights whiich a Citizen in a modern State enjoys. (১৮১-১৮৯ পৃষ্ঠা) [C. U. 1951]

4. "Rights imply duties." Elucidate. (১৯০-১৯১ পৃষ্ঠা)

একাদশ অধ্যায়

স্বাধীনতা ও সাম্য

(LIBERTY AND EQUALITY)

***স্বাধীনতার স্বরূপ* (Nature of Liberty):** স্বাধীনতা* সম্বন্ধে ধারণা উদ্ভূত হয় প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরীতে। এই স্বাধীনতাকে এথেনীয় স্বাধীনতা (Athenian Liberty) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এথেনীয় স্বাধীনতা

স্বাধীনতা বলিতে এথেন্সবাসীরা সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উভয়ই বুঝিতেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আবার দুইটি দিক ছিল—স্ব-শাসন (Self-rule) ও দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ হইতে মুক্তি বা স্বাধীনতা। এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে স্ব-শাসন নীতির প্রয়োগের ফলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল এবং ক্রীতদাস সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রমের কার্যে নিযুক্ত থাকায় নাগরিকগণের পক্ষে দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে এথেনীয় ধারণা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হইয়া ইহার এইরূপ অর্থ দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত

---

* স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচনা প্রসংগে শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতারই (Individual Liberty) পর্যালোচনা করা হইবে। সম্প্রদায়গত বা জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty or Independence) স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের আলোচনা প্রসংগে আলোচিত হইবে।

সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনুসন্ধান ও অনুসরণের জন্য ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা। রাষ্ট্রের ভূমিগত সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে মতবাদ পরিস্ফুটিত হওয়ার পর সার্বভৌমিকতার ধারণা ও স্বাধীনতার এই ধারণার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। কারণ, সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা আর স্বাধীনতা হইল সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। ব্যক্তির যদি স্বাধীনতা থাকে তবে তাহার উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ, কোনরূপ বাধানিষেধ থাকিবে না। কিন্তু সার্বভৌমিকতার অর্থই যে নিয়ন্ত্রণ, বাধানিষেধ। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা ও ব্যক্তির স্বাধীনতার মধ্যে স্পষ্টতই অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই অসামঞ্জস্য দূরিকরণের জন্য রাষ্ট্রনৈতিক ধারণার ক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক জগতে নানাভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে স্বাধীনতার অর্থও পরিবর্তিত হইয়াছে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলই এই পরিবর্তনের সূচনা করেন। তিনি তাঁহার স্বাধীনতা সংক্রান্ত গ্রন্থে (Essay on Liberty) স্বাধীনতাকে বাহ্যিক আচরণের স্বাধীনতা বা নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বলিয়া কল্পনা না করিয়া এই ধারণা প্রচার করেন যে, স্বাধীনতা হইল মানুষের মৌলিক সামাজিক শক্তির বলিষ্ঠ, বিভিন্নমুখী ও অব্যাহত প্রকাশ। ব্যক্তিকে যখন তাহার মানসিক বৃত্তির প্রকাশে এইরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে তখনই সুন্দর, সুস্থ, সবল সমাজজীবন গড়িয়া উঠিবে। এইভাবে মিল বাহ্যিক আচরণের স্বাধীনতা হইতে মানসিক বৃত্তির অব্যাহত প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেও তিনি স্বাধীনতার স্বরূপ সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বার্কার বলেন, "মিল ছিলেন শূন্যগর্ভ স্বাধীনতার প্রচারক—তাঁহার অধিকার সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না একমাত্র যে-ধারণার মাধ্যমেই স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থসমন্বিত হয়।"* সুতরাং বর্তমান অর্থে স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থসমন্বিত হয় অধিকারের মাধ্যমে। অধিকার ব্যতীত স্বাধীনতা অবাস্তব—শূন্যগর্ভ। স্বাধীনতার ভিত্তিই অধিকার, স্বাধীনতা অধিকার হইতেই উদ্ভূত।

বিবর্তিত হইয়া এখেনীয় স্বাধীনতা বাহ্যিক আচরণের স্বাধীনতা হইয়াদাঁড়ায়

মিল-প্রদত্ত স্বাধীনতার অর্থ

বর্তমান অর্থ—স্বাধীনতার ভিত্তি অধিকার

এক দিক দিয়া অবশ্য স্বাধীনতাকে 'নিয়ন্ত্রণবিহীনতা' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণবিহীনতা দ্বারা ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝায় না, বুঝায় কতকগুলি মৌলিক বিষয় বা অবস্থার উপর বাধানিষেধ অপসারিত থাকা। এই বিষয় বা অবস্থাগুলিকেই বর্তমানে অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়। ল্যাস্কি বলেন, "স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সেই সকল সামাজিক অবস্থার উপর হইতে বাধানিষেধের অপসারণ, যাহা বর্তমান সভ্যজগতে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের পক্ষে অপরিহার্য।" ল্যাস্কি যাহাদিগকে 'সামাজিক অবস্থা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাদিগকেই অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়। মানুষের

স্বাধীনতা কি অর্থে নিয়ন্ত্রণবিহীনতা

ল্যাস্কি-প্রদত্ত সংজ্ঞা

* "Mill was the prophet of an empty liberty and an abstract individual. He had no clear philosophy of rights through which alone the conception of liberty attains a concrete meaning."

সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের পক্ষে কতকগুলি অধিকার অপরিহার্য। এইগুলির উপর কোনরূপ বাধানিষেধ থাকিবে না; এইগুলি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণবিহীন হইবে। এই প্রকার বাধানিষেধের অপসারণ; এই প্রকার নিয়ন্ত্রণবিহীনতাই স্বাধীনতা।

স্বাধীনতাকে একটি পরিবেশ (atmosphere) বলিয়া বর্ণনা করা যায়—যে-পরিবেশে মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারে। এই পরিবেশের সৃষ্টি হয় অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ দ্বারা। এই প্রসংগে ল্যাস্কি-প্রদত্ত আর একটি সংজ্ঞার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ল্যাস্কি বলেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সযত্নে সেই পরিবেশের সংরক্ষণ যেখানে মানুষ তাহার সত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায়।"* রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকার ভোগ করিয়াই নাগরিক স্বাধীনভাবে তাহার সত্তাকে বিকশিত করিতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকের মতে, এইভাবে অধিকারের স্বীকার ও সংরক্ষণ দ্বারা নাগরিকের সত্তার পূর্ণ বিকাশের পথ প্রস্তুত করাই রাষ্ট্রের আদর্শ। বার্কার বলেন, ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিই যখন রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্দেশ্য, তখন রাষ্ট্র গঠিত হইবে মাত্র স্বাধীন মনুষ্য-সম্প্রদায়কে লইয়া, কোন ক্ষেত্রেই ক্রীতদাস সম্প্রদায়কে লইয়া নহে।

ল্যাস্কি-প্রদত্ত আর একটি সংজ্ঞা

স্বাধীনতা বা অধিকার সাম্যের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ দ্বারাই স্বাধীনতার পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই অধিকার সকলকে সমভাবে দিতে হইবে; অধিকার ভোগ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা একই নিয়ম দ্বারা করিতে হইবে। এককথায়, সাম্যের ভিত্তিতে স্বাধীনতা বা অধিকারের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ল্যাস্কি প্রভৃতির মতে, (১) সমাজজীবনে যদি বিশেষ সুবিধার (special privileges) অস্তিত্ব থাকে, অথবা (২) যদি একজনের স্বাধীনতা অপরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, অথবা (৩) যদি রাষ্ট্র-কার্যের ফল পক্ষপাতশূন্য না হয় তবে প্রকৃত স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই তিনটি অবস্থা হইল বৈষম্যের অবস্থা। বৈষম্য বর্তমান থাকিলে সকলের আত্মোপ-লব্ধির পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা থাকে না। ফলে স্বাধীনতার পরিবেশেরও সৃষ্টি হয় না।

স্বাধীনতা ও সাম্য

ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লওয়া ও সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে ইহা পন্থা মাত্র—পরিণতি বা উদ্দেশ্য নহে। ম্যাথু আরনল্ড (Mathew Arnold) বলিয়াছেন, "যদি আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার না করিতে পারি তবে স্বাধীনতা পাই বা না পাই তাহাতে কিছু যায় আসে না।" ব্যক্তি যদি স্বাধীনতা বা আত্মবিকাশের সুযোগের প্রকৃত ব্যবহার করিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, নিজেকে বিকশিত করিতে সমর্থ হয়—তবেই স্বাধীনতা হইয়া উঠে সার্থক।

ব্যক্তির আত্মোপ-লব্ধিতেই স্বাধীনতার সার্থকতা

* "By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves."

স্বাধীনতা, কর্তৃত্ব ও আইন (Liberty, Authority and Law)ঃ স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্ট ও রক্ষিত হয় যথাক্রমে রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের দ্বারা। আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র এই অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। সুতরাং স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট ও সংরক্ষিত স্বাধীনতা আইনের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল বলিয়া ইহাকে আইনসংগত বা আইনানুমোদিত স্বাধীনতা (Legal Liberty) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা সৃষ্ট হয় আইনের দ্বারা। আইনানুমোদিত স্বাধীনতা আইনানুমোদিত বলিয়াই ইহা কখনও অব্যাহত বা নিয়ন্ত্রণবিহীন হইতে পারে না। আইনের অর্থই নিয়ন্ত্রণ—সকলের জন্য ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ। সকলের স্বাধীনতা স্বীকার ও সকলের স্বাধীনতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই আইন (রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব) ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হয়। বার্কার বলিয়াছেন, "প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত।"* শিল্পপতির পক্ষে শ্রমিকের কার্যের সর্ত নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা থাকা যেমন প্রয়োজন তেমনি শ্রমিকের পক্ষেও সে যে-কার্যে নিযুক্ত হয় তাহার সর্তাবলী নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা প্রয়োজন। শ্রমিকের স্বাধীনতা না থাকিলে শ্রমিক ক্রীতদাসে পরিণত হইবে, সে তাহার আত্মশক্তিকে বিকশিত করিবার সুযোগ পাইবে না। সুতরাং শিল্পপতির স্বাধীনতা ও শ্রমিকের স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে; শ্রমিকের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পেই শিল্পপতির স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকের আইনসংগত স্বাধীনতা সর্বদা অপর সকলের আইনসংগত স্বাধীনতার আপেক্ষিক এবং ইহার সহিত অপর সকলের স্বাধীনতার সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে। এই কারণে স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না। নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বাধীনতার অস্তিত্বই বজায় থাকিবে না। আইন (রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব) এই নিয়ন্ত্রণকার্য করিয়া, এই সামঞ্জস্যবিধান করিয়া স্বাধীনতার স্বরূপকে বজায় রাখে—স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে না।

স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল

আইনসংগত স্বাধীনতা

প্রত্যেকের স্বাধীনতা অপর সকলের স্বাধীনতার আপেক্ষিক

যাঁহারা আইনকে (রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব) স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহারা স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতার উগ্র উপাসকগণের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় নাই যে, অনিয়ন্ত্রিত হইলে একজনের স্বাধীনতা অপরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে। বর্তমান শিল্প-ব্যবস্থায় শিল্পপতির অবাধ স্বাধীনতা থাকিলে শ্রমিকের স্বাধীনতা নির্ভর করিত শিল্পপতির

আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বাধীনতার স্বরূপ বজায় থাকে না

---

* "The need of liberty for each is necessarily qualified and conditioned by the need of liberty for all...."

ইচ্ছার উপর। শিল্পপতি নিজ স্বার্থে যখন-তখন শ্রমিকের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন। সুতরাং শ্রমিকের স্বাধীনতা অলীক কল্পনাই রহিয়া যাইত।

ল্যাস্কি বলেন, স্বাধীনতার প্রকৃতিতেই রহিয়াছে নিয়ন্ত্রণ

স্বাধীনতা সম্ভব হয় সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে, দার্শনিকগণ কল্পিত প্রাকৃতিক পরিবেশের (State of Nature) মধ্যে নহে। প্রাকৃতিক অবস্থায় যে-স্বাধীনতার কল্পনা করা যাইতে পারে তাহা বলহীনের দাসত্ব ও বলবানের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ মাত্র। সমাজজীবনে স্বাধীন আচরণ এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে অপরের স্বাধীন আচরণ ব্যাহত না হয়। এইজন্যই অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন, "স্বাধীনতার প্রকৃতিতেই রহিয়াছে নিয়ন্ত্রণ।"*

আইনসংগত স্বাধীনতা আইনানুমোদিত বলিয়াই ইহা নির্দিষ্ট। ব্যক্তির সত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য যতটুকু পরিমাণ স্বাধীনতার প্রয়োজন ততটুকু স্বাধীনতাই ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। সংগে সংগে আবার ইহাও দেখা হয় যে, একজনের আত্মোপলব্ধি যেন অপরের আত্মোপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি না করে। স্বাধীনতাকে নির্দিষ্ট ও আপেক্ষিক করিয়া দিলেই তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে পারে। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তাহাই করে।

প্রয়োজন হইলে সামাজিক স্বাধীনতাকে আইনানুমোদিত করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা হয়

আইনসংগত স্বাধীনতাই একমাত্র স্বাধীনতা নহে। আইনানুসারে সংগঠিত রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বাহিরে বৃহত্তর সমাজজীবন সামাজিক বিবেক দ্বারা সৃষ্ট ও সামাজিক বিধি দ্বারা সংরক্ষিত সামাজিক স্বাধীনতাও (Social Liberty) থাকে। তবে সামাজিক বিধি অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট বলিয়া সামাজিক স্বাধীনতাও অনির্দিষ্ট। উপরন্তু, সামাজিক বিধির পশ্চাতে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের সমর্থন না থাকায় ইহা পদে পদে ব্যাহত হইয়া অলীক প্রতিপন্ন হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সামাজিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয় অংশকে আইনের সমর্থন দ্বারা আইনসংগত স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহাকে প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর্মাচরণের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। ধর্মাচরণের স্বাধীনতা অন্যতম সামাজিক স্বাধীনতা (Social Freedom)। ব্যক্তির এই স্বাধীনতা অপরের উগ্রতার ফলে বিপন্ন হইলে রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ইহাকে আইনসংগত স্বাধীনতায় (Legal Freedom) পরিণত করিতে পারে। আইনসংগত হইলে উগ্রতা নিয়ন্ত্রিত হইয়া ধর্মাচরণের স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত হয়।

বার্কার বলেন, স্বাধীনতা আইন

উপরি-উক্ত আলোচনার পর আইনই যে স্বাধীনতার ভিত্তি সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উক্তি না করিলেও চলে। বার্কার বলেন, স্বাধীনতার নীতি অনুসারেই প্রয়োজনীয় অধিকার সকলের মধ্যে ন্যায্যভাবে বন্টিত হয়। সুতরাং "স্বাধীনতাও আইন, অন্তত আইনের এক অংশ।"

* "Liberty...involves in its nature restraints...."

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Forms of Liberty) **:** স্বাধীনতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা হয়। ফলে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপেরও সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রেণীবিভাগ করিয়া এই সকল রূপের মধ্যে পার্থক্য দেখান হইতেছে।

ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা (Individual and National Liberty) :

জাতীয় স্বাধীনতা অন্যান্য সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি

ব্যাপক অর্থে স্বাধীনতা শব্দটি দ্বারা ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত উভয়প্রকার স্বাধীনতাই বুঝায়। প্রাচীন গ্রীকরা স্বাধীনতা বলিতে ইহাই বুঝিতেন। সম্প্রদায়গত স্বাধীনতাকে (liberty of the group) বর্তমানে জাতীয় স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। জাতীয় স্বাধীনতা অন্যান্য সর্বপ্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি। বার্ণসের (Delisle Burns) ভাষায় বলিতে গেলে, "সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা দেশ বা জাতির সর্বপ্রকার স্বাভাবিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে।"* দেশ পরাধীন থাকিলে ব্যক্তির পক্ষে তাহার আত্মোপলব্ধির পথে সহায়ক আইনসংগত অধিকারসমূহ ভোগ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইল জাতীয় স্বাধীনতার—বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত অবস্থার।

স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচনা প্রসংগে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকারের দ্বারা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির উপযোগী যে-পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাহাকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলা হয়।

স্বাভাবিক ও আইনসংগত স্বাধীনতা (Natural and Legal Liberty) : অধিকাংশ সময় স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) বলিতে বুঝায় সেই স্বাধীনতাকে যাহা মানুষ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে কাল্পনিক প্রাকৃতিক পরিবেশে ভোগ করিত। ঐ অবস্থায় মানুষের যথেচ্ছাচরণের ক্ষমতাকে 'স্বাভাবিক' বলিয়া ধরা হইয়াছে। রুশো হইলেন এই স্বাধীনতার মন্ত্রের প্রধান প্রচারক।

স্বাভাবিক স্বাধীনতার প্রচলিত অর্থ

তাঁহার মতে, "মানুষ স্বাধীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু চতুর্দিকে সে আজ শৃংখলাবদ্ধ।"† রুশোর উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় দর্শনমূলক নৈরাজ্যবাদে (Philosophical Anarchism)। নৈরাজ্যবাদিগণের মতে, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিধিসমূহ মানুষের চতুর্দিকে শৃংখলা রচনা করিয়া আছে। মানুষের সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের পথে আজ অসংখ্য বাধা। সুতরাং রাষ্ট্র ও সমাজের বিলোপসাধন করিয়া স্বাভাবিক স্বাধীনতার পুনঃপ্রবর্তন করিতে হইবে, স্বাভাবিক অবস্থাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

কিন্তু রুশো প্রমুখ দার্শনিকগণ ও নৈরাজ্যবাদীরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, আইন ব্যতিরেকে যে স্বাধীনতার কল্পনা করা যাইতে পারা যায় তাহা স্বেচ্ছাচারিতা মাত্র। একজনের অবাধ স্বাধীনতা যে অপরের স্বাধীনতা বিপন্ন করিতে পারে ইহা

* "Liberty of the group is regarded as the basis for all natural development of the country or the race."

† ' Man was born free but everywhere he is in chains."

তাঁহাদের নিকট প্রতীয়মান হয় নাই। এই প্রসংগে ল্যাস্কি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরস্পরবিরোধী আকাংক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য পরস্পরবিরোধী আচরণ করিবে ততক্ষণ স্বাভাবিক স্বাধীনতার কল্পনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। ইহা যদি সমাজের কল্যাণকৃৎরূপে পরিগণিত হয়, তবে ইহাই স্বাভাবিক।

প্রকৃত অর্থে 'স্বাভাবিক স্বাধীনতা' কাহাকে বলা যাইতে পারে

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা স্বীকৃত, সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত পরস্পরের আপেক্ষিক, নির্দিষ্ট স্বাধীনতাই আইনসংগত স্বাধীনতা। হার্বার্ট স্পেনসারের ভাষায়, ইহা হইল "অপর কাহারও অনুরূপ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির যথেচ্ছাচরণের স্বাধীনতা।"

সামাজিক ও আইনসংগত স্বাধীনতা (Social and Legal Liberty)
সমাজ ও রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নহে। সুতরাং মানুষের সমাজজীবন এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনও অভিন্ন নহে। রাষ্ট্রনৈতিক গণ্ডির বাহিরে বৃহত্তর সমাজজীবনে মানুষ যে-স্বাধীনতা ভোগ করে তাহাকেই সামাজিক স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। সামাজিক স্বাধীনতা সমাজের বিবেক বা ন্যায়বোধ দ্বারা স্বীকৃত এবং সামাজিক বিধি দ্বারা সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক বিধিসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট বলিয়া সামাজিক স্বাধীনতাও অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। উপরন্তু, এই কারণেই ইহা ব্যাহত হইতে পারে অথবা বিকৃত রূপ ধারণ করিতে পারে। দেখা গিয়াছে যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্বাধীন ধর্মাচরণের নামে অনেক ক্ষেত্রে দাসত্বপ্রথা গড়িয়া তুলিয়াছে।

সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে যদি এইরূপ স্বাধীনতাকে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করিয়া তুলিয়া ইহার স্বরূপ বজায় রাখিবার প্রয়োজন হয় তবে রাষ্ট্র সামাজিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আইনের মাধ্যমে সামাজিক স্বাধীনতার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করিয়া ইহাকে আইনসংগত স্বাধীনতায় রূপান্তরিত করে। রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের পরিধিবৃদ্ধির সংগে সংগে সামাজিক স্বাধীনতার এইরূপ রূপান্তর ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রের সামাজিক স্বাধীনতার গণ্ডি হইতে মুক্ত হইয়া আইনসংগত স্বাধীনতার পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র সামাজিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারে

***আইনসংগত স্বাধীনতার বিভিন্ন দিক* (Different Aspects of Legal Liberty) ঃ** আইনসংগত অধিকারের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ নৈতিক—এই তিনটি দিক আছে। সুতরাং আইনসংগত স্বাধীনতাও তিনপ্রকার রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা হইল এই তিন রূপ। এখন ইহাদের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা (Civil Liberty) ঃ ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যে আইনসংগত স্বাধীনতা ভোগ করে তাহাকেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলা হয়। ইহাকে অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও (personal liberty) বলে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিতে

বুঝায় সংঘবদ্ধ জীবনে সেই সমস্ত আচরণের স্বাধীনতা যাহার ফলে লোকে বিশেষ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তিগত সুনাম রক্ষার স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত সুনাম রক্ষায় সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিই অধিকতর আগ্রহশীল কারণ দুর্নামের ফল বিশেষ করিয়া ব্যক্তিকেই ভোগ করিতে হয়। ব্ল্যাকষ্টোন (Blackstone) ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, গতিবিধির স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার—প্রধানত এই তিনটি বিষয়কেই বুঝিয়াছিলেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে আজিকার দিনে এই তিনটি অধিকার ছাড়াও চিন্তা, বিশ্বাস ও মতামতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা, অপরের সংগে চুক্তিগত সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা, প্রভৃতিও বুঝায়।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বরূপ

রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) : ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরেই আছে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা। ব্ল্যাকষ্টোন রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝিয়াছিলেন প্রধানত সরকারকে দমিত রাখার ক্ষমতা। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সরকারী ক্ষমতার ব্যবহারের ফলে জনসাধারণের স্বাধীনতা ব্যাহত হইলে যে-প্রতিবিধানসমূহের ব্যবস্থা ছিল তাহাদিগকে ব্ল্যাকষ্টোন রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার উপাদান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই অর্থে আবেদনের অধিকার, বিচারালয়ে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা, সরকারের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিলোপসাধন প্রভৃতিই ছিল রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা। বর্তমানে কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতাকে এইরূপ পরোক্ষভাবে না দেখিয়া প্রত্যক্ষভাবে দেখা হয়। এখন রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে সরকারকে দমিত রাখার ক্ষমতা না বুঝিয়া সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাই বুঝায়। ল্যাস্কির ভাষায় বলিতে পারা যায়, "রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রকার্যে কর্মশীল হইবার ক্ষমতা।"* নির্বাচন করিবার অধিকার, নির্বাচিত হইয়া জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার পরিচালনার অধিকার, রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠনের অধিকার, সরকারী কার্যের সমালোচনার অধিকার প্রভৃতিকেই বর্তমানে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার উপাদান বলিয়া গণ্য করা হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার স্বরূপ

রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার উপাদান

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) ঃ ব্যক্তিগতভাবে এবং নাগরিক হিসাবে স্বাধীনতার ভোগ করা ছাড়া অন্নসংস্থান ব্যাপারেও ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজন। আইনসংগত স্বাধীনতার এই তৃতীয় রূপকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। ল্যাস্কির মতে, ইহা হইল "দৈনন্দিন অন্নসংস্থানে যুক্তিসংগত অর্থ খুঁজিয়া পাইবার সুযোগ ও নিরাপত্তা।"† ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ল্যাস্কি বলিয়াছেন, ব্যক্তি যদি দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ, বেকারত্ব, ভবিষ্যতের অভাব-অনটনের ভয়ে সর্বদাই

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা

* "Political liberty means the power to be active in affairs of State."

† "....security and the opportunities to find reasonable significance in the earning of one's daily bread."

ভীত থাকে তবে সে কোনমতেই তাহার সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। বার্কারের ভাষায় বলা যায়, "অর্থ-ব্যবস্থায় পরাধীন শ্রমিক রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে কখনও স্বাধীন হইতে পারে না।" সুতরাং তাহাকে উপযুক্ত মজুরি দিতে হইবে, যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত করিতে হইবে, বেকারত্বের ভাবনা হইতে মুক্ত করিতে হইবে—তাহার কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে সমর্থ হয়। এইজন্য বর্তমান শিল্প-ব্যবস্থায় প্রয়োজন হইল শ্রমিককে শিল্প-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা দিবার। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমেই এই ক্ষমতা দেওয়া হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বার্কার বলিয়াছেন, স্বাধীনতা ও আইনের মধ্যে কোন বিরোধ নাই সত্য, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ পরস্পরের সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে

প্রথমত, ব্যক্তি-স্বাধীনতার সহিত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার বিবাদ বাধিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অন্যতম ব্যক্তি-স্বাধীনতা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ব্যবহারের নামে খর্ব করিতে পারে। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, নির্বাচিত হইয়া জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র পরিচালনা করা অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা; এই স্বাধীনতার ব্যবহারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে খর্বই হয়। অনুরূপভাবে, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ব্যবহারের নামে সরকার শ্রমের অবস্থা ও মজুরি নির্ধারণ ব্যাপারে অধিকার বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করিতে পারে। অপরদিকে, আবার শ্রমিককে শ্রমের অবস্থা ও মজুরি নির্ধারণ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে অন্যতম ব্যক্তি-স্বাধীনতা চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়। এই কারণেই বার্কার বলিয়াছেন, "প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা একটি জটিল ধারণা। ইহা মানুষকে ইহার প্রতি আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধও করে, আবার বিভিন্ন রূপের প্রতি আনুগত্যের জন্য পরস্পর হইতে পৃথকও করে।"* পৃথক করে বলিয়াই পরস্পরবিরোধী এমন বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাহারা সকলেই স্বাধীনতার সমর্থনকারী বলিয়া দাবি করে।

স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধন

এক শ্রেণীর দার্শনিকগণের মতে, আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতার এই বিভিন্ন রূপের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কর্তব্য।

***স্বাধীনতার রক্ষাকবচ* (Safeguards of Liberty) :** স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয় প্রত্যক্ষভাবে আইন ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা। কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কার্যকর হয় সরকারের দ্বারা। সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের মতই

* "Liberty is indeed a complex notion, which at once unites men in its allegiance and divides them by its divisions."

সাধারণ সকলকে লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা আদর্শভ্রষ্ট হইতে পারে। এই প্রসংগে লর্ড এ্যাক্টনের সুপ্রচলিত উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ক্ষমতা লোককে আদর্শভ্রষ্ট করে এবং অবাধ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবেই আদর্শভ্রষ্ট করে।* শাসনকার্য পরিচালকগণ নির্বাচিত হইলেও ক্ষমতার আসনে বসিয়া অনেক সময় জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের পরিবর্তে ইহার বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারেন। উপরন্তু, যে-শ্রেণী সমাজে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব করায়ত্ত করে তাহারা সার্বভৌম শক্তিকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। ফলে, সমাজে বিশেষ সুযোগের সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্রকার্য পক্ষপাতমূলক হয় এবং একজনের স্বাধীনতা অপরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই সকল কারণে প্রয়োজন হয় স্বাধীনতার রক্ষাকবচের। এই প্রসংগে ল্যাস্কি বলেন, সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অধিকাংশ লোক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না।

সংরক্ষণের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অধিকাংশ লোকে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না

স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হইল শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি বিধিবদ্ধভাবে গৃহীত হওয়া। বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকার কোনরূপ খর্ব করা হইলে আদালতে প্রতিকারবিধানের ব্যবস্থা থাকে। বিধিবদ্ধ হইলে মৌলিক অধিকারগুলির একটি বিশেষ মর্যাদাও থাকে। জনসাধারণ জানিতে পারে তাহাদের অধিকার কি কি। নির্দিষ্ট অধিকারভংগের বিরুদ্ধে প্রতিকারবিধানের চেষ্টা অনির্দিষ্ট স্বাধীনতার ব্যাঘাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকর। এই কারণেই বর্তমানে লিখিত শাসনতন্ত্রসমূহে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করিবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা গিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের আইনের অনুশাসনের নীতিতে বিশ্বাসী ডাইসির মত যে, মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করা নিরর্থক তাহাতে আর বর্তমানে অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তি সায় দেন না।

১। মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করা অন্যতম রক্ষাকবচ

মণ্টেস্কু, ম্যাসিডন প্রভৃতির প্রচারের ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকে স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচরূপে গণ্য করা হইয়া আসিতেছে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, একই ব্যক্তি বা একই বিভাগের হস্তে বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতা থাকিলে স্বাধীনতা ব্যাহত হইবে—জনসাধারণ অত্যাচারিত হইবে। সুতরাং রাষ্ট্র-ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণ প্রয়োজন। কিন্তু দেখা গিয়াছে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, মেক্সিকো, চিলি প্রভৃতি রাষ্ট্র নীতিগতভাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ইহার পূর্ণ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় নাই। অপরদিকে আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ ব্যতিরেকেও স্বাধীনতার সংরক্ষণ সম্পূর্ণ সম্ভব। ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতি গৃহীত হয় নাই, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ

২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ—ইহা প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে

* "Power corrupts and absolute power corrupts absolutely."

অন্য কোন দেশের নাগরিকগণ অপেক্ষা কোন অংশে কম স্বাধীনতা ভোগ করে না। উপরন্তু, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ না হইয়া স্বাধীনতার পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে। বর্তমানে দলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগ সত্ত্বেও শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা সহজেই স্থাপিত হয়। এই সহযোগিতা যদি স্বাধীনতার সংরক্ষণের পরিবর্তে স্বাধীনতার বিনাশে মনঃসংযোগ করে, তবে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার কিছুই থাকে না। এই সকল কারণে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকে বর্তমানে আর অষ্টাদশ শতাব্দীর মত স্বাধীনতার অপরিহার্য রক্ষাকবচরূপে গণ্য করা হয় না।

অবশ্য বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতার প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ

অবশ্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের এক অংশ স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা হইল বিচার বিভাগকে শাসন ও আইন বিভাগের প্রভাব ও কর্তৃত্ব হইতে মুক্তকরণ—বা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। জনসাধারণের অধিকারকে খর্ব করা হইলে, স্বাধীনতা ব্যাহত করিলে বিচার বিভাগই ইহার প্রতিবিধান করে। কোন্ আইন ক্ষমতাবহির্ভূত, কোন্ আইন অযৌক্তিভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নির্ধারণ করে বিচার বিভাগ। যাহাতে বিচারপতিগণ সকলপ্রকার প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার করিতে পারেন, তাহার জন্য প্রয়োজন বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার।

৩। আইনের অনুশাসন—ইহাও প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে

স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ হইল আইনের অনুশাসন (Rule of Law)। অনেকে মনে করেন, ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ইংল্যাণ্ডে নাগরিক স্বাধীনতা বিশেষভাবে সংরক্ষিত। আইনের অনুশাসন বলিতে প্রধানত দুইটি জিনিস বুঝায়—আইনের পূর্ণ প্রাধান্য ও আইনের দৃষ্টিতে সাম্য। আইনের পূর্ণ প্রাধান্য থাকায় সরকার পূর্ব ঘোষিত আইন অনুসারে সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়।* আইন হইতে প্রাপ্ত নয় এরূপ কোন ক্ষমতা সরকারী কর্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত থাকিতে পারে না। এই কারণে বেআইনীভাবে কাহারও অধিকার খর্ব করা যায় না—স্বাধীনতা হরণ করা যায় না। উপরন্তু, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য—অর্থাৎ, সকলের জন্য একই আইন থাকায়, একই অধিকার থাকে। সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া প্রকৃত রূপ ধারণ করে।

আইনের অনুশাসনের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, আইন হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতারও অপব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য অলীক কল্পনা মাত্র। যে-সমাজ উৎপাদনের উপাদানের ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত, সে-সমাজে আইন প্রধানত আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর অনুকূলেই কার্য করে, কারণ প্রচলিত বৈষম্যমূলক সামাজিক সম্পর্ককে (social relations)

* "Stripped of all legal technicalities Rule of Law means that Government in all its actions is bound by rules fixed and announced beforehand." Hayek, The Road to Serfdom

অটুট রাখাই আইনের উদ্দেশ্য। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য নীতিগতভাবে স্বীকৃত হইলেও আদালতে মামলা দায়ের করিবার ব্যয় দরিদ্রের নিকট ঐ অধিকারকে অলীক করিয়া তুলে।* সুতরাং আইনের অনুশাসন যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে সেখানেও স্বাধীনতা সকল সময় সংরক্ষিত হয় না। একমাত্র উৎপাদন-উপাদানের সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীবিহীন সমাজেই আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রকৃত হইতে পারে।**

৪। দায়িত্বশীল শাসন-পদ্ধতি

অনেকের মতে, দায়িত্বশীল শাসন-পদ্ধতি স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান রক্ষাকবচ। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের সমালোচনা প্রসংগে জেনিংস (Dr. Ivor Jennings) বলিয়াছেন, "শাসন বিভাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের সন্ধান ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের মধ্যে পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় নির্বাচিত কমন্স সভায় যেখানে দলীয় ব্যবস্থা সমালোচনাকে স্পষ্ট ও কার্যকর করিয়া তুলে।" অন্যভাবে বলিতে গেলে, দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অস্তিত্ব সাধারণের স্বাধীনতাকে অব্যাহত রাখে। ইংল্যাণ্ডে বিরোধী দলকে স্বাধীনতার সতর্ক প্রহরীরূপে গণ্য করা হয়। ইহা সরকারী কার্যের পথরোধ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু ইহা সমালোচনা দ্বারা সকল সময় রাষ্ট্র-রথকে জনমত অনুমোদিত পথে চালিত করিতে চেষ্টা করে। স্বাধীনতার রক্ষাকবচরূপে কার্যকর হইবার জন্য বিরোধী দলের পক্ষে সুসংবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

৫। গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য বর্তমানে গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাদিগকেও স্বাধীনতার রক্ষাকবচরূপে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানের জাতীয় রাষ্ট্রসমূহে এই সকল পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসৃত হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য বিশেষ কিছু নাই।

৬। জনগণের সাহসিকতাই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ

স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইল স্বাধীনতাকামী জনগণের সাহসিকতা। স্বাধীনতাকে উপলব্ধি ও রক্ষা করিতে হইলে নাগরিকগণের পক্ষে প্রয়োজন স্বাধীনতার জন্য উগ্র আকাংক্ষা এবং ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্র আবেগ। বিনামূল্যে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায় না—ইহার সংরক্ষণের জন্য মূল্য দিতে হয়। নাগরিকগণের চিরন্তন সতর্কতাই এই মূল্য। গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিসের (Pericles) ভাষায় বলিতে পারা যায়, "চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য।"† স্বাধীনতাকামী নাগরিককে যক্ষের মত সজাগ থাকিতে হইবে এবং স্বাধীনতা কোনরূপে ব্যাহত হইলে অবিলম্বে বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে সংগ্রামে চরম ত্যাগের জন্যও প্রস্তুত

* "All may be equal before the law, but in fact the expenses of filing a law-suit may place justice beyond the reach of the poor." Benham, Economics

** "There cannot..be equality before the law, except in a narrowly formal sense unless there is a classless society." H. J. Laski

† "Eternal vigilance is the price of liberty."

থাকিতে হইবে। এইজন্যই পেরিক্লিস আরও বলিয়াছেন যে, "সাহসিকতাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র।"**

ল্যাস্কি বলেন, সাহসিকতা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হইলেও কতকগুলি পদ্ধতির প্রয়োজন যাহা অবলম্বন করিয়া সাহসিকতা লক্ষ্যাভিমুখে চলিবে। সুতরাং স্বাধীনতাকাংক্ষী সাহসী নাগরিক সম্প্রদায়ের পক্ষে মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে। এককভাবে স্বাধীনতার জন্য আকাংক্ষা এবং ইহাকে রক্ষা করিবার আবেগ প্রধান হইলেও পূর্ণ রক্ষাকবচ নহে।

✓ *সাম্য* (Equality) **ঃ** স্বাধীনতার ন্যায় সাম্যের আদর্শও মানুষকে যুগে যুগে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বর্তমানে উভয়কেই গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। ল্যাস্কির মতে, যে-যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মানুষের সাহসিকতা স্বাধীনতার স্বরূপ বজায় রাখে তাহারা সাম্যের ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। লয়েডের (Lloyd) মতে, "সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক ধারণা।" রুশোর ভাষাতেও বলা যায় যে সাম্য ব্যতিরেকে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে না। সুতরাং সাম্যের আলোচনাকে স্বাধীনতার অধ্যায়ের পরিশিষ্ট হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক ধারণা

পূর্বে কিন্তু স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ককে এইভাবে দেখা হইত না। তখন স্বাধীনতাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এবং সাম্যকে সমাজতন্ত্রবাদের মূলমন্ত্র হিসাবে গণ্য করা হইত। সুতরাং টক্‌ভিল, লর্ড এ্যাকটন প্রভৃতি সাম্য ও স্বাধীনতাকে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এ্যাকটন এক স্থানে বলিয়াছেন, "সাম্যের জন্য আবেগ স্বাধীনতার আশাকে নির্মূল করিয়াছে।" ইঁহারা সাম্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পারিলে স্বাধীনতা ও সাম্যকে পরস্পরবিরোধী মনে না করিয়া পরস্পরের পরিপূরক হিসাবেই গণ্য করিতেন। ল্যাস্কি বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্য বলিতে সর্ববিষয়ে সমান ক্ষমতা বা অভিন্নতা বুঝায় না। সাম্য বলিতে ব্যবহারের অভিন্নতাও বুঝায় না। কার্যক্ষেত্রে যতক্ষণ মানুষের ক্ষমতা ও স্বভাবে পার্থক্য থাকিবে ততক্ষণ সকলে সমাজের নিকট হইতে একই প্রকার ব্যবহার পাইতে পারে না; পাইলে সাম্যের আদর্শ ব্যাহত হয়। প্রকৃত সাম্য প্রত্যেকের আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করে। আমাদের নিকট হইতে সকলে যদি একই প্রকার ব্যবহার পায় তবে সকলের আত্মোপলব্ধির পথ সুগম হইতে পারে না। সমাজ যদি অধ্যাপক আইনষ্টাইন এবং কারখানার সাধারণ শ্রমিকের শ্রমের একই মূল্য দেয়, তবে আইনষ্টাইনের প্রতিভা বিকশিত হইতে পারিবে না। সকল মানুষ একই প্রকার কর্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই; সকলের অভাব-অভিযোগও এক নহে। সুতরাং তাহাদের একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি অভিন্ন ব্যবহার করা

কিন্তু পূর্বে ইহাদিগকে পরস্পরবিরোধী মনে করা হইত

বর্তমানে সাম্য বলিতে ব্যবহারের অভিন্নতা না বুঝাইয়া সুযোগের সমতা বুঝায়

** "The secret of liberty is courage."

সাম্যের উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং বর্তমানে সাম্য বলিতে ব্যবহারের অভিন্নতা বুঝায় না, বুঝায় সুযোগের সমতা।

রিচি (Ritchie) বলেন, সাম্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মগ্রহণ করে অসাম্যের উত্তরাধিকার হিসাবে। প্রাচীন অভিজাততান্ত্রিক দাসপোষণকারী সমাজে অভিজাত-গণ প্রজা ও ক্রীতদাসদের সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের স্বাধীন ও পরস্পরের সহিত সমান মনে করিতে থাকেন। অপরদিকে আবার নীতি ও ধর্ম-শাস্ত্রবেত্তাগণ ইতর জীবগণের সহিত তুলনায় মানুষের আত্মার অপরিমেয় সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া প্রচার করিতে থাকেন যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। পরে ইহা হইতে আরও একপদ অগ্রসর হইয়া প্রচার করা হইতে লাগিল যে, মানুষের দৃষ্টিতে এবং আইনের সমক্ষে সকলেই সমান।

সাম্য সম্বন্ধে ধারণার পরিস্ফুটন

সাম্য সম্বন্ধে ধারণা এইভাবে জন্মগ্রহণ করিলেও ইহা বহুদিন পর্যন্ত সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই। সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী জাতীয় সংসদের (National Assembly) অধিকার ঘোষণায়। এই ঘোষণায় বলা হয় যে অধিকার সম্পর্কে সকল মানুষই পরস্পরের সমান।* অর্থাৎ, প্রত্যেককে আত্মোপলব্ধির জন্য যথোচিত সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে। সমান সুযোগ-সুবিধা বলিতে বুঝায় মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও কর্মদক্ষতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেককে আত্মোপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করা। উপরি-উক্ত উদাহরণ লইয়া বলা যায় যে, কারখানার সাধারণ শ্রমিকের শ্রমের মূল্য আইনষ্টাইনের শ্রমের মূল্যের সমান হইবে না সত্য, কিন্তু কারখানার শ্রমিকের সন্তানকে আইনষ্টাইন হইবার সুযোগ দিতে হইবে।

বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র অনিষ্টকর অথচ অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান নয়; ইহা কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। সকলের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রকে বর্তমানে এক বিরাট জনকল্যাণ সমিতি (a benefit club on a grand scale) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে সাম্যের জন্য দাবি করা হইত যে, সকল প্রকার বিশেষ সুযোগের বিলোপসাধন ও ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্রে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অবসান করা হউক। বর্তমানে দাবি করা হয় যে, সকল প্রকার বিশেষ সুযোগের বিলোপসাধন করা হউক কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা হউক। এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) রিকার্ডো (Ricardo) প্রভৃতি অর্থবিদ্যাবিদগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে বৈষম্যমূলক সমাজে সকলকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায় না। সকলকে যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হইলে প্রয়োজন হইল বৈষম্য অপসারণের। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে

রাষ্ট্রকর্তৃত্বই বৈষম্যের বিলোপসাধন করিয়া সাম্যের প্রতিষ্ঠা করে

* "Men are born free and equal in respect of their rights."

বৈষম্যের অপসারণ করা সম্ভব নহে। সুতরাং সাম্য স্বাধীনতার মতই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল।

উভয়েই আইনের মাধ্যমে রূপ গ্রহণ করে বলিয়া বর্তমানে স্বাধীনতার মত সাম্য সম্বন্ধে ধারণাও আইনগত। আইনসংগত সাম্য কখনও স্বাধীনতার বিরোধী হইতে পারে না। স্বাধীনতা হইল প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির উপযোগী পরিবেশ। ইহা সৃষ্ট হয় রাষ্ট্র কর্তৃক সকলের সমান অধিকারের স্বীকার ও সংরক্ষণ এবং সকল প্রকার বিশেষ সুবিধার বিলোপসাধনের দ্বারা। এই সমানাধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ এবং বিশেষ সুবিধার বিলোপসাধনই প্রকৃত সাম্য। ইহাই স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব করে।

সাম্য বলিতে সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা বুঝায়, সমান পরিণতি বুঝায় না

সাম্যের স্বরূপ আলোচনা প্রসংগে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাম্যের অবস্থা বলিতে সকলের সমান সুযোগ বুঝায় মাত্র, সকলের সমান পরিণতি বুঝায় না। সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা দিলেও পরিণতিতে বিভিন্ন ফল দেখা যাইবে। পরিণতি রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে না, করে ব্যক্তির উপর।* রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট সাম্যের অবস্থাকে ব্যক্তি কিভাবে নিজের আত্মশক্তির বিকাশের কার্যে লাগাইবে তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। সাম্যের ভিত্তিতে আত্মোপলব্ধির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাই রাষ্ট্রের কার্য। আদর্শ রাষ্ট্র তাহাই করে।

সাম্যের বিভিন্ন রূপ **(Forms of Equality)** **ঃ** লর্ড ব্রাইস চারি প্রকার সাম্যের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, স্বাভাবিক সাম্য, সামাজিক সাম্য, ব্যক্তিগত সাম্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য। বর্তমান দিনে ইহার সহিত অর্থনৈতিক সাম্য যোগ করা হয়। ব্যক্তিগত সাম্য, রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য ও অর্থ নৈতিক সাম্যকে একসংগে আইনসংগত সাম্য (Legal Equality) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে—কারণ ইহারা আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব কর্তৃক সৃষ্ট ও সংরক্ষিত হয়।

স্বাভাবিক সাম্য (Natural Equality)ঃ স্বাভাবিক সাম্য বলিতে বুঝায় জন্মকাল হইতে মানুষে মানুষে সমতা। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার একটি অনুচ্ছেদে এই স্বাভাবিক সাম্যের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, "সকল মানুষই সমান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" আক্ষরিক অর্থ ধরিলে এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সকল মানুষ কখন সমান হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিভা ও কর্মশক্তিতে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক বৈষম্য। কোল (G. D. H.

মানুষে মানুষে জন্ম হইতে সমান—এই অর্থে স্বাভাবিক সাম্য ভ্রান্ত ধারণা

* "Equality is. . . .the beginning, not the end ; the end depends on ourselves and on the use which we make of the equal conditions guaranteed to us, *as a beginning*, by the State." Barker

Cole) বলেন, মানুষ শারীরিক বল, মানসিক শক্তি, সৃজন-ক্ষমতা, সমাজ সেবার ইচ্ছা এবং চিন্তাশক্তিতে পরস্পর হইতে বিশেষ পৃথক। সুতরাং 'সকল মানুষ সমান' এই উক্তি 'ভূপৃষ্ঠ সমতল'—এই উক্তির মতই ভ্রান্ত।

ইহা অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বাভাবিক বৈষম্যকে স্বীকার করিলে সাম্যের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং ইহাকে স্বীকার করিলেই প্রকৃত সাম্যের উপলব্ধি সম্ভব হয়। কিন্তু যে-বৈষম্য স্বাভাবিক নহে—যাহা মানুষের সৃষ্ট বৈষম্য, তাহাকে স্বীকার করিলে সাম্যের আদর্শ ব্যাহত হয়। মানুষের সৃষ্ট এই অস্বাভাবিক বৈষম্য দূর করিবার যে প্রয়াস তাহাই একদিকে স্বাভাবিক স্বাধীনতার ঘোষণায় রূপগ্রহণ করিয়াছে।

সামাজিক সাম্য (Social Equality) : সামাজিক সাম্য বলিতে বুঝায় সমাজের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে সমতা। জাতি ধর্ম অর্থ প্রতিপত্তি প্রভৃতি কারণে যে-সমাজে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় না সেখানেই সামাজিক সাম্যের সন্ধান মিলে। অপরদিকে, যে-সমাজে বর্ণগত কারণে, শ্রেণীগত কারণে, জাতিগত কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় সেখানে সামাজিক সাম্যের অস্তিত্ব নাই। ভারতের বর্ণভেদ প্রথা, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের শ্রেণীবৈষম্য প্রভৃতি সামাজিক সাম্যের অন্তরায়। প্রকৃত সামাজিক সাম্যের উপলব্ধি একমাত্র শ্রেণীহীন ও বর্ণহীন সমাজেই সম্ভব। কিন্তু শ্রেণীহীন ও বর্ণহীন সমাজের সৃষ্টি একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। সুতরাং প্রকৃত সামাজিক সাম্য ব্যবহারিক জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন একরূপ আদর্শগত ধারণা।

সামাজিক সাম্য একরূপ আদর্শগত ধারণা

আইনসংগত সাম্য (Legal Equality) : রাষ্ট্রাভ্যন্তরে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সম্পর্কে মানুষে মানুষে যে-সাম্য তাহাকেই আইনসংগত সাম্য বলা হয়। সংক্ষেপে ইহাই হইল আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বা সমানাধিকার। রাষ্ট্রের আইন সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখিবে, সকলের সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

আইনসংগত সাম্য রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ সাম্য। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য স্বীকৃত হইলেও বৃহত্তর সমাজজীবনে বৈষম্য ইহার উপলব্ধিকে অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, সকলের সমানভাবে নির্বাচিত হইবার অধিকার থাকিতে পারে কিন্তু যতক্ষণ না সকলের সমান শিক্ষার সুযোগ থাকে ততক্ষণ অধিকাংশের নিকট এই সমানাধিকার বা সাম্য মূল্যহীন। তেমনি আবার ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইনের দৃষ্টিতে সাম্যও অর্থহীন। রাষ্ট্রের আইন সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারে, কিন্তু ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইনের দ্বারস্থ হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। সমাজে বর্ণবৈষম্য থাকিলেও আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ব্যাহত হইতে পারে। সুতরাং আইনসংগত সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাষ্ট্রকে সমাজের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। এই কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রকে সাধারণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হয়, আইন করিয়া বর্ণবৈষম্য, ধর্মগত বৈষম্য দূর করিতে হয়, ইত্যাদি। ফলে দেখা যাইতেছে, আজ

সমাজজীবনে বৈষম্য আইনসংগত সাম্যের উপলব্ধি অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারে

যাহা সামাজিক বৈষম্য বলিয়া পরিগণিত, কাল তাহা আইনসংগত সাম্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

বলা হইয়াছে যে, আইনসংগত সাম্য—ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক—এই তিন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। এখন ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

আইনসংগত সাম্যের বিভিন্ন রূপ

ব্যক্তিগত সাম্য (Civil Equality): সমস্ত সামাজিক অধিকার সমভাবে ভোগ করিবার সুযোগ থাকিলে ব্যক্তিগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত আছে বলা যায়। ব্যক্তিগত সাম্য থাকিতে হইলে সকল নাগরিকের একই প্রকার মৌলিক অধিকার থাকিবে। অর্থ প্রতিপত্তি ধর্ম বর্ণ বা অন্য কোনও কারণে বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে পার্থক্য করা চলিবে না। আইনের অনুশাসন দ্বারাই হউক আর সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াই হউক, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক অধিকারভোগে সমতা বজায় রাখিতে হইবে।

রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য (Political Equality): রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারভোগ বিষয়ে সমতাকেই রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে দণ্ডিত অপরাধী, বিকৃত মস্তিষ্ক এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যতিরেকে সকলেরই অন্যান্য রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের সংগে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনারও সমান সুযোগ থাকে। বর্তমান দিনের বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রে শাসনকার্য পরিচালনার সুযোগ বলিতে বুঝায় নির্বাচনাধিকার—অর্থাৎ নির্বাচিত হইবার ও নির্বাচন করিবার অধিকার এবং সরকারী চাকরিতে অধিকার। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য উপলব্ধির জন্য জাতিধর্ম, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যোগ্যতার সর্ত পূরণ করিলে সকলকে নির্বাচনাধিকার এবং সরকারী চাকরিতে অধিকার দিতে হইবে। যে-রাষ্ট্রে জন্মগত, ধনগত প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার প্রদানে পার্থক্য করা হয় সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত নাই। ইংল্যাণ্ডে লর্ড সভার অস্তিত্ব রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের বিরোধী; ক্যানাডায় ধনগত কারণে সিনেটের সভ্য মনোনয়ন প্রথাও রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের বিরোধী।*

রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সর্ত

অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality): অর্থনৈতিক সাম্যকে বর্তমানে আইনসংগত সাম্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়—কারণ ইহা ব্যতিরেকে অন্যপ্রকার আইনসংগত সাম্য মূল্যহীন হইয়া পড়িতে পারে। সকলকে আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করিবার জন্যই সাম্যের প্রয়োজন। বলা যায়, এই উদ্দেশ্যে প্রথম প্রয়োজন হইল অর্থনৈতিক সাম্যের। ম্যাথু আরণল্ড বলিয়াছেন, "অর্থনৈতিক সাম্যবিহীন সমাজে সকলেই জরাগ্রস্ত। এরূপ সমাজে, উচ্চশ্রেণী উদরপূর্তির দিকে লক্ষ্য রাখে, মধ্যবিত্তশ্রেণী নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয় এবং নিম্নশ্রেণী পশুতে পরিণত হয়।" সুতরাং কাহারও সত্তার বিকাশ সম্ভব হয় না। এ্যারিষ্টটলের

অর্থনৈতিক সাম্যের গুরুত্ব

* ক্যানাডায় উচ্চতর পরিষদ—সিনেটের সদস্যগণ বিত্তশালীদের মধ্য হইতে সারাজীবনের জন্য মনোনীত হন।

দৃষ্টিতে দেখিলে—অর্থাৎ সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হইতে বিশ্বাস করিলে, এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় বলা চলে। অতএব অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা সর্বাগ্রে করিতে হইবে।

অর্থনৈতিক সাম্যের স্বরূপ

অর্থনৈতিক সাম্যকে অনেকে পূর্ণ সাম্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। লর্ড ব্রাইসের মতে, অর্থনৈতিক সাম্য হইল, "প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষকে পার্থিব সম্পদের সমান অংশ দান এবং সকল ধনগত বৈষম্য দূরিকরণের প্রচেষ্টা।" এই অর্থে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব; ইহা কাম্যও নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষে মানুষে অভাব-অভিযোগ ও কর্মশক্তিতে পার্থক্য থাকিবে, ততক্ষণ পূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিলে অন্যায়ই করা হইবে।

অর্থনৈতিক সাম্য বলিতে বুঝায় প্রথমে সকলের বিশেষ প্রয়োজনীয় অভাবের পরিতৃপ্তি। সকলের বিশেষ অভাব পরিতৃপ্ত হইবার পর সামাজিক কল্যাণের অনুপন্থী বৈষম্য বর্তমান থাকিতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সামাজিক কল্যাণের অনুপন্থী বৈষম্যই বর্তমান থাকিতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণের মানদণ্ডে বৈষম্যের পরিমাপ করিয়া প্রত্যেক অপ্রয়োজনীয় অসংগত বৈষম্যের বিলোপসাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ল্যাস্কির ভাষায় ইহা হইল, "অনুপাত নির্ধারণের সমস্যা।"* প্রত্যেক বৈষম্য যে-অনুপাতে সামাজিক কল্যাণ সাধিত করে সেই অনুপাতেই তাহাকে বর্তমান রাখা যাইতে পারে—কোন ক্ষেত্রেই অনুপাতাতিরিক্তভাবে নহে।

স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সাম্য

স্বাধীনতা হইল আত্মোপলব্ধির উপযুক্ত পরিবেশ। এই পরিবেশ রক্ষার জন্য মানুষকে নিয়ত সংগ্রাম করিতে হয়। সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য প্রয়োজন আত্ম-শক্তির। শৃংখলাবদ্ধ থাকিয়া কেহ সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না। অর্থনৈতিক সাম্যই আত্মশক্তিকে মুক্ত করে। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকিলে মুক্ত আত্মশক্তি সমাজে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের স্বরূপ বজায় রাখিয়া স্বাধীনতার সেই পরিবেশ রক্ষা করে একমাত্র যেখানে মানুষে তাহার পূর্ণ আত্মোপলব্ধির সুযোগ পায়।

সংক্ষিপ্তসার

স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা উদ্ভূত হয় প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরীতে। ধীরে ধীরে বিবর্তিত হইয়া এথেনীয় ধারণা বাহ্যিক আচরণের স্বাধীনতা—এই রূপ ধারণ করে। ইহার পর মিল স্বাধীনতাকে মৌলিক সামাজিক শক্তির বলিষ্ঠ, বিভিন্নমুখী এবং অব্যাহত প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু মিল অধিকারের কল্পনা করেন নাই বলিয়া তাঁহার এই স্বাধীনতার ধারণা শূন্যগর্ভ

* "...Equality is most largely a problem in proportions."

বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে। বর্তমান অর্থে স্বাধীনতার ভিত্তি হইল অধিকার—স্বাধীনতা অধিকার হইতে উদ্ভূত।

স্বাধীনতাকে একটি পরিবেশ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে প্রারে। এই পরিবেশ মানুষের আত্মোপলব্ধির সহায়ক এবং ইহা সৃষ্ট হয় রাষ্ট্র কতৃ ক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকার দ্বারা।

অধিকার আত্মোপলব্ধির পন্থা মাত্র, পরিণতি নহে।

স্বাধীনতা, কর্তৃত্ব ও আইন: স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র-কতৃত্বের উপর নির্ভরশীল।

স্বাধীনতার আইনানুমোদিত বলিয়া নিয়ন্ত্রণবিহীন হইতে পারে না। প্রত্যেকের স্বাধীনতা অপর সকলের স্বাধীনতার আপেক্ষিক। আইন দ্বারা রাষ্ট্র এই আপেক্ষিকতার সৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতাকে প্রকৃত করিয়া তুলে।

স্বাধীনতা বিভিন্ন রূপ: স্বাধীনতাকে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়—উভয় দিক হইতেই দেখা যাইতে পারে। স্বাধীনতাকে আবার স্বাভাবিক বলিয়া কল্পনা করিয়া ইহাকে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্র এক অভিন্ন নহে বলিয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যেও পার্থক্য নির্দেশ করা চলে। আইনসংগত স্বাধীনতার তিনটি প্রধান দিক আছে—সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। সমাজজীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগই সামাজিক স্বাধীনতা। রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যথাক্রমে রাষ্ট্রকার্যে কর্মশীল হইবার ক্ষমতা এবং দৈনন্দিন অন্নসংস্থানে যুক্তিসংগত অর্থ খুঁজিয়া পাইবার সুযোগ ও নিরাপত্তা।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কার্য হইল এই সংঘর্ষ রোধ করিয়া স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ: স্বাধীনতার রক্ষাকবচের মধ্যে (১) সংবিধানে মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধকরণ, (২) ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ, (৩) আইনের অনুশাসন, (৪) দায়িত্বশীল শাসনপদ্ধতি, (৫) প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং (৬) জনগণের সাহসিকতা এবং সতর্ক দৃষ্টিই প্রধান।

সাম্য: সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক ধারণা। পূর্বে কিন্তু ইহাদিগকে পরস্পর-বিরোধী মনে করা হইত। ইহার কারণ হইল প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সাম্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বর্তমানে সাম্য বলিতে ব্যবহারের অভিন্নতা বুঝায় না, বুঝায় সুযোগের সমতা।

সাম্য বলিতে সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা বুঝায়, সমান পরিণতি বুঝায় না।

সাম্যের বিভিন্ন রূপ: লর্ড ব্রাইস চারি প্রকার সাম্যের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, স্বাভাবিক সাম্য, সামাজিক সাম্য, ব্যক্তিগত সাম্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য।

সাম্য স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করে।

প্রশ্নোত্তর

1. "The Liberty of an individual is not always in inverse ratio to the amount of State legislation." Examine the statement. (১৯৮-১৯৯ পৃষ্ঠা)

2. Explain the concept of Liberty ? "Sovereignty and Liberty are not contradictory terms." Examine this proposition. [C. U. 1957]

[ইংগিত : সার্বভৌমিকতা ব্যক্ত হয় আইনের মাধ্যমে। এই আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি। আইন স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহার প্রকৃত রূপদান করে।...১৯৫-১৯৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

3. Explain the concept of liberty. What are the methods for safeguarding individual liberty ? (C. U. 1961) (১৯৫-১৯৭, ২০৩-২০৭ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the relation between liberty and equality. (২০৭-২০৯ পৃষ্ঠা)

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন রূপ
(FORMS OF GOVERNMENT)

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ **(Classification of States) :** সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়া ইহার বিভিন্ন রূপের আলোচনা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংগীভূত। পূর্বে কিন্তু সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপের আলোচনার প্রচেষ্টা করা হইত। রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের জন্য কোন বিজ্ঞানসম্মত নীতির সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের এইরূপ প্রচেষ্টার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই।

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত নহে

একদিক দিয়া দেখিলে প্রকৃতিগত বিচারে সকল রাষ্ট্রই এক পর্যায়ভুক্ত। সকল রাষ্ট্র একই উপাদান—জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, শাসনযন্ত্র ও সার্বভৌমিকতা—দ্বারা গঠিত; সকল রাষ্ট্রই আইনানুসারে সংগঠিত; এবং সকল রাষ্ট্রই সুশৃংখল সমাজজীবন সম্ভব করিবার কার্যে নিযুক্ত থাকে। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

অবশ্য এক দল চিন্তাশীল লেখকের মতে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। ইঁহারা বলেন, রাষ্ট্রের প্রকৃতি সমাজের প্রকৃতির সহিত সম্পর্কিত। সমাজের প্রকৃতির পরিবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্রেরও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। এই দিক দিয়া দাস-রাষ্ট্র, সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। সুতরাং সকল রাষ্ট্রের প্রকৃতি এক নহে। এই শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, ইহা প্রধানত ইতিহাসের দিক দিয়া রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের নির্দেশ করে। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইলেও ইহা রাষ্ট্রের আধুনিক রূপের আলোচনার দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে।

বিজ্ঞানসম্মত না হইলেও অনেক সময় বাহ্য বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, ধনৈশ্বর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতির তারতম্যকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। ফলে আমরা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, শক্তিশালী ও দুর্বল রাষ্ট্র, ধনশালী ও দরিদ্র রাষ্ট্র, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ রাষ্ট্র প্রভৃতি পর্যায়ের সহিত পরিচিত হইয়াছি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নিকট এইরূপ বর্ণনাগত বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগের বিশেষ গুরুত্ব নাই। কারণ, ইহারা পরস্পরের সহিত এরূপভাবে মিশিয়া আছে যে, ইহাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপের পর্যালোচনা সন্তোষজনকভাবে করা যায় না।

বাহ্য বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা

অনেক সময় বিজ্ঞানানুমোদিতভাবেও—অর্থাৎ প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্যকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত সক্রেটিস করিলেও এবং প্লেটো সক্রেটিসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগকে উন্নততর করিলেও ইহা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে এ্যারিষ্টটলের হস্তে। এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগই পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাই এই শ্রেণীবিভাগের পর্যালোচনা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানানুমোদিতভাবে শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা

এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগ (Aristotle's Classification) ঃ

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগে এ্যারিষ্টটল দুইটি নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন ঃ (১) সংখ্যা নীতি, এবং (২) উদ্দেশ্য নীতি। সংখ্যা নীতি বলিতে বুঝায় নির্ণয় করা যে, কি সংখ্যক ব্যক্তি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা ব্যবহার করে—অর্থাৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমিকতার অবস্থান-নির্ণয় করা। উদ্দেশ্য নীতি বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা কাহার বা কাহাদের মংগলসাধনে ব্যবহৃত হয় তাহা নির্ণয় করা।

শ্রেণীবিভাগে এ্যারিষ্টটল-অনুসৃত নীতি

প্রথমে এ্যারিষ্টটল সংখ্যা নীতি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রসমূহকে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। রাজতন্ত্রে চরম ক্ষমতার ব্যবহার করেন একজন, অভিজাততন্ত্রে কয়েকজন এবং গণতন্ত্রে বহুজন।

সংখ্যা নীতি অনুসরণের পর উদ্দেশ্য নীতি (teleology) প্রয়োগ করিয়া এ্যারিষ্টটল রাষ্ট্রের স্বাভাবিক (normal) ও বিকৃত (perverted) রূপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র হইল রাষ্ট্রের স্বাভাবিক রূপ। ইহারা বিকৃত হইলে যথাক্রমে স্বৈরাচারতন্ত্র, মুখ্যতন্ত্র ও জনতাতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়। বিকৃত হওয়া বলিতে এ্যারিষ্টটল বুঝিয়াছেন উদ্দেশ্যভ্রষ্ট বা আদর্শভ্রষ্ট হওয়া। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্দেশ্য হইল সুন্দর জীবন সম্ভব করা। সুন্দর

উদ্দেশ্য নীতি এবং স্বাভাবিক ও বিকৃত রূপ

জীবন সম্ভব করার জন্য রাষ্ট্রকে সকলের কল্যাণে সর্বদা নিয়োজিত থাকিতে হইবে। সকলের কল্যাণে নিয়োজিত না থাকিয়া মাত্র শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হইলে রাষ্ট্র আদর্শভ্রষ্ট হইয়া বিকৃত রূপ ধারণ করে।

এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগকে নিম্নলিখিতভাবে দেখান যাইতে পারে ঃ

সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থান অনুসারে শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি	স্বাভাবিক রূপ	বিকৃত রূপ
একজনের শাসন (Government of One)	রাজতন্ত্র (Monarchy or Royalty)	স্বৈরাচারতন্ত্র (Tyranny or Despotism)
কয়েকজনের শাসন (Government of the Few)	অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)	মুখ্যতন্ত্র (Oligarchy)
বহুজনের শাসন (Government of the Many)	গণতন্ত্র (Polity)	জনতাতন্ত্র (Democracy)

সমালোচনা ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এ্যারিষ্টটল-প্রদত্ত রাষ্ট্রের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগের নানাভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রধান বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল যে, ইহা বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ অচল। সিলি বলেন, এ্যারিষ্টটল শুধু নগর-রাষ্ট্রের সহিতই পরিচিত ছিলেন এবং এই সকল নগর-রাষ্ট্র বর্তমানের বিশাল রাষ্ট্রসমূহ হইতে এত পৃথক যে উভয়কে এক পর্যায়ভুক্ত করিয়া শ্রেণীবিভক্ত-করণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। উদাহরণ দিতে গিয়া ষ্ট্রং (C. F. Strong) বলিয়াছেন, বর্তমানে কোন রাষ্ট্রের স্বরূপ বর্ণনা করিবার সময় 'রাজতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অর্থহীন, কারণ ইহা বর্তমানে সরকারের কোন সুস্পষ্ট রূপ নির্দেশ করে না। বর্তমানে রাজতন্ত্র বলিতে সসীম বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রও বুঝাইতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র গণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের সংমিশ্রণে গঠিত। সরকার যে মিশ্রভাবে সংগঠিত হইতে পারে—ইহার ইংগিত এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগে পাওয়া যায় না। কিন্তু আধুনিক যুগে অধিকাংশ সরকারই মিশ্রভাবে গঠিত।

১। এই শ্রেণীবিভাগ বর্তমান যুগের সহিত সংগতিবিহীন

অনুরূপভাবে গণতন্ত্র বলিতেও বর্তমানে কোন বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র বুঝায় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইংল্যাণ্ডের মত পার্লামেণ্টীয় ধরনের বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহার ইংগিতও এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগে নাই। পরিশেষে, আধুনিক বিশাল রাষ্ট্রসমূহে শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টনের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে যে-পার্থক্য বর্তমানে করা হয়, তাহাও নগর-রাষ্ট্রের পটভূমিকায় রচিত এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে নাই।

এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগের দ্বিতীয় বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল যে ইহা প্রধানত সংখ্যা নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নহে। স্থতরাং ইহা বিজ্ঞানসম্মত নহে। উদ্দেশ্য নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের প্রকৃতির উপর যে আলোকসম্পাত করা হয় তাহাও যথেষ্ট নহে। এই আলোকসম্পাত বর্তমান দিক দিয়া মূল্যহীন বলা চলে, কারণ বর্তমানে রাষ্ট্রের বিকৃত রূপের সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্তত তত্ত্বগতভাবে সকল রাষ্ট্রই সর্বসাধারণের মংগলসাধনে নিযুক্ত থাকে।

২। ইহা বিজ্ঞান-সম্মত নহে

তৃতীয়ত বলা হয় যে, এ্যারিষ্টটল রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার শ্রেণীবিভাগ স্থস্পষ্ট রূপ ধারণ করিতে পারে নাই।

৩। এই শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ এবং ইহা রাষ্ট্রের নহে—সরকারেরই শ্রেণী-বিভাগ

উপসংহার হিসাবে গেটেল বলেন, রাষ্ট্রের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্য এবং অস্পষ্ট বর্ণনা ব্যতিরেকে এই শ্রেণীবিভাগ প্রকৃতপক্ষে সরকারেরই বিভিন্ন রূপের শ্রেণীবিভাগ।

রাষ্ট্রের অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ (Other Classifications of States): এ্যারিষ্টটলকে অনুসরণ করিয়া যাঁহারা রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্লুণ্টস্‌লি, জেলিনেক ও বার্জেসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই এ্যারিষ্টটলের সংখ্যা নীতিকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন; এবং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা হয় বিশেষভাবে না-হয় একেবারেই উপলব্ধি করেন নাই। ফলে ইঁহাদের কাহারও শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত হয় নাই; কেহই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্দেশ করিতে পারেন নাই।

ব্লুণ্টস্‌লি, জেলিনেক ও বার্জেসের শ্রেণী-বিভাগ

বস্তুত, রাষ্ট্রের বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নহে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায় সরকারের সংগঠনের মধ্যে। উইলোবির (Willoughby) ভাষায় বলিতে পারা যায়, "একমাত্র সরকারের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়।" গেটেল বলেন, "রাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য—ইহার রাষ্ট্রনৈতিক ও আইনমূলক প্রকৃতি প্রকাশিত হয় সরকারের মাধ্যমে। স্থতরাং সরকারের বিভিন্ন রূপের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে যে শ্রেণীবিভাগ তাহাই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক।"* কিন্তু ইহা হইল সরকারের শ্রেণীবিভাগ, রাষ্ট্রের নহে। এখন সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

রাষ্ট্রের নহে, সরকারেরই সন্তোষজনক শ্রেণীবিভাগ সম্ভব

* "The essential characteristic of the State is its political and legal nature. This is manifested in its governmental organization ; hence the most satisfactory classification is based on the similarities and differences of governmental forms."

সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Governments) : দেখা গেল, সরকারেরই সন্তোষজনক শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। কিন্তু সরকারেরও সন্তোষজনক শ্রেণীবিভাগ করা বিশেষ কঠিন। যে বিভিন্ন নীতি অনুসারে সরকারের বিভিন্ন রূপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় তাহাদের কোনটিই এককভাবে পর্যাপ্ত নয়। কোন বিশেষ নীতি অনুসরণ করিয়া সরকারের দুই রূপের মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখান গেলেও অন্য এক নীতি অনুসারে উভয়ের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে যে, শ্রেণীবিভক্তিকরণ অপেক্ষা উভয়কে সমপর্যায়ভুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একদিক দিয়া ফ্রান্সের সরকারকে প্রজাতন্ত্র ও ইংল্যাণ্ডের সরকারকে রাজতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করিতে হয়; কিন্তু পার্লামেণ্টীয় সরকার উভয় রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য অপেক্ষা বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্যই অধিকতর মৌলিক। দ্বিতীয়ত, সরকারের রূপ চিরপরিবর্তনশীল বলিয়া কোন শ্রেণীবিভাগই চিরকালের জন্য গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কোন নীতি অনুসরণ করিয়া আজিকার দিনের শ্রেণীবিভাগ কাল অচল হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং সরকারের শ্রেণীবিভাগকে কালের আপেক্ষিক করিতে হইবে; এবং একই সংগে বিভিন্ন নীতির অনুসরণ করিতে হইবে।

কিন্তু সরকারেরও সন্তোষজনক শ্রেণীবিভাগ করা বিশেষ কঠিন

সরকারের শ্রেণী-বিভাগে বিভিন্ন নীতির অনুসরণ করিতে হয়

সরকারের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীবিভাগ (Two Important Classifications of Governments) : সরকারের যে আধুনিক শ্রেণীবিভাগ তাহাকে বিশেষভাবে রূপদান করিয়াছেন ম্যারিয়ট (J. A. R. Marriot) এবং লীকক (Dr. Stephen Leacock)। ম্যারিয়ট এ্যারিষ্টটলের শ্রেণীবিভাগকে মৌলিক বলিয়া মানিয়া লইলেও আধুনিক যুগের পক্ষে ইহাকে পর্যাপ্ত বলিয়া গণ্য করেন নাই। সুতরাং তিনি তাঁহার শ্রেণীবিভাগে কয়েকটি নূতন নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রধান হইল শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন (territorial distribution) নীতি। এই নীতি অনুসারে সরকার—যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক এই দুই শ্রেণীর হয়। ম্যারিয়ট অনুসৃত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি হইল শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক। এই নীতি অনুসারে সরকার প্রধানত পার্লামেণ্টীয় বা দায়িত্বশীল এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত—এই দুই শ্রেণীর হয়।

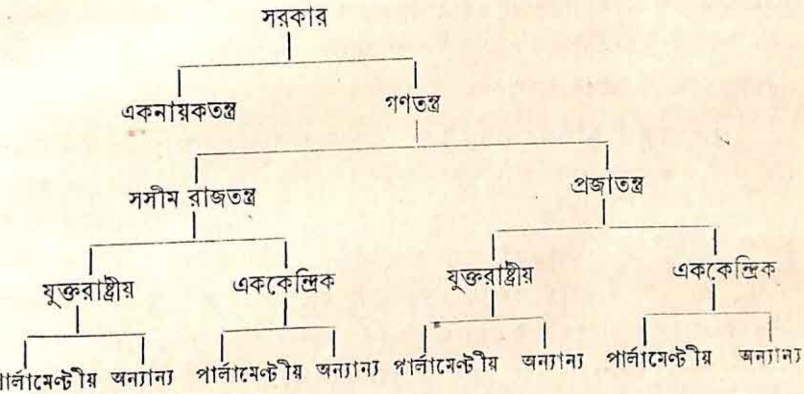
শ্রেণীবিভাগে ম্যারিয়ট অনুসৃত দুইটি নূতন নীতি

লীকক তাঁহার শ্রেণীবিভাগে প্রধানত ম্যারিয়টকেই অনুসরণ করিয়াছেন। লীককের শ্রেণীবিভাগে বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ স্থান পায় নাই। তিনি সম্পূর্ণভাবে সরকারের সাম্প্রতিক রূপসমূহেরই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি একনায়কতন্ত্র (Despotism) এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। পরে

গণতন্ত্রকে সসীম রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র—এই দুই পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। আঞ্চলিক শাসনক্ষমতার বণ্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার যুক্তরাষ্ট্র বা এককেন্দ্রিক—এই দুই-এর যে-কোন রূপ গ্রহণ করিবে। সুতরাং ইহাও লীককের শ্রেণীবিভাগভুক্ত হইয়াছে।

লীককে অনুসরণ করিয়া সরকারের শ্রেণীবিভাগ

পরিশেষে, গণতান্ত্রিক সরকারের সংগঠন – অর্থাৎ এরূপ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধের নির্দেশ করিতে হয়। এই দিক দিয়াও গণতান্ত্রিক সরকারকে দুইটি প্রধান শ্রেণীভুক্ত করা চলে—পার্লামেন্টীয় ও অন্যান্য। লীকক তাহাই করিয়াছেন। লীককে অনুসরণ করিলে সরকারের বিভিন্ন রূপ নিম্নলিখিতভাবে সাজান যায়ঃ



লীককের শ্রেণীবিভাগে দু'একটি সামান্য ত্রুটি আছে। ইহা হইল যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু অনেক সময় প্রচলিত অর্থে যাহাকে একনায়কতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হইতে পারে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ আছে। দ্বিতীয়ত, এই শ্রেণীবিভাগে অভিজাততন্ত্র বা কয়েকজনের শাসনের কোন উল্লেখ নাই। অভিজাততন্ত্র সরকারের একপ্রকার ঐতিহাসিক রূপ হইলেও আধুনিক কালে অনেক সময় দেখা যায় যে, সামরিক চক্রীদল (Clique বা Junta) ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছে। এই প্রকার শাসকবর্গ সর্ব-সাধারণের মংগলে শাসনকার্য পরিচালনা করেন বলিয়া শাসন-ব্যবস্থাকে তত্ত্বের দিক দিয়া অভিজাততন্ত্র বলিয়া গণ্য করিতে হয়—অন্তত ইহাকে মুখ্যতন্ত্র (Oligarchy) বলিয়াও অভিহিত করা চলে। ইহাও লীককের শ্রেণীবিভাগে স্থান পায় নাই। যাহা হউক, লীককের শ্রেণীবিভাগই চূড়ান্ত বলিয়া অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

লীককের শ্রেণী-বিভাগে ত্রুটি

আধুনিক শ্রেণীবিভাগের নীতি (Principles of Modern Classifications): বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী-প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগের নীতিসমূহের মধ্যে যেগুলি সাধারণ সেগুলিকে বাছিয়া লইয়া কয়েকটি সর্বজনগ্রাহ্য আধুনিক নীতির নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। গেটেলের মতে, এরূপ নীতি হইল তিনটি—(১) সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহারকারীর সংখ্যা নির্ণয় করা, (২) ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বা প্রধানত শাসন এবং আইন বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়, এবং (৩) শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন নীতি। প্রথম নীতি অনুসারে সরকারকে রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র (Rule of One), অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রে বিভক্ত করা হয়। দ্বিতীয় নীতি অনুসারে মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত—সরকারের এই দুই রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তৃতীয় নীতি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখান হয়। এখন পর্যায়ক্রমে সরকারের বিভিন্ন রূপের আলোচনা করা হইবে।

আধুনিক শ্রেণীবিভাগে অনুসৃত তিনটি নীতি

***রাজতন্ত্র* (Monarchy):** এক অর্থে যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানের ইচ্ছাই চরম এবং সর্বদা কার্যকর সেখানে রাজতন্ত্র প্রবর্তিত আছে বলা যায়। এই অর্থ মানিয়া লইলে রাজতন্ত্রকে একনায়কতন্ত্র (Despotism or Dictatorship) হইতে পৃথক করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই এই ব্যাপক অর্থে 'রাজতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। রাজতন্ত্র বলিতে সাধারণত সেই সরকারকেই বুঝায় যাহার চরম কর্তৃত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত। পূর্বে, বিশেষ করিয়া মধ্যযুগে, রাজা নির্বাচিত হইতেন; কিন্তু বর্তমানে উত্তরাধিকার প্রথাই রাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ব্যাপক ও বিশেষ অর্থে রাজতন্ত্র

রাজতন্ত্র অসীম অথবা সসীম—উভয়ই হইতে পারে। চরম বা অসীম রাজতন্ত্রই প্রকৃত অর্থে রাজতন্ত্র; এবং সসীম রাজতন্ত্র গণতন্ত্রেরই নামান্তর। সসীম রাজতন্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) বলা হয়।

অসীম বা চরম রাজতন্ত্র সরকারের সর্বপ্রাচীন রূপ হইলেও ইহা একরূপ ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে কোন সুসভ্য দেশেই চরম রাজতন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা সত্ত্বেও এইপ্রকার শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ আলোচনা করা প্রয়োজন; কারণ একসময় ইহা সরকারের আদর্শ রূপ বলিয়া পরিগণিত হইত।

চরম রাজতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Defects of Absolute Monarchy): রাষ্ট্র-বিবর্তনের প্রথম অধ্যায়ে চরম রাজতন্ত্র যে সরকারের শ্রেষ্ঠ রূপ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে সেই বর্বরসুলভ স্বেচ্ছাচারিতার যুগে রাজতন্ত্র গোষ্ঠীকে আনুগত্য ও শৃংখলা-পরায়ণতার শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া সুসংবদ্ধ সমাজজীবন গঠনে অনন্যসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে পন্থা ও পরিণতি দ্বারা সমর্থন করা গেলে বর্বরদের জন্য

স্বপক্ষে যুক্তি:
১। ঐতিহাসিক সমর্থন

রাজতন্ত্রকেই উপযুক্ত শাসন-ব্যবস্থা রূপে গণ্য করিতে হইবে।* প্রকৃতপক্ষে, অর্ধসভ্য, বর্বরসুলভ ব্যক্তিদের জন্য শাসননীতি ও শাসন পরিচালনায় যে ঐক্য, দৃঢ়তা, দ্রুত কার্যসম্পাদন করিবার ক্ষমতা প্রয়োজন তাহা অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয় না। উপরন্তু, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হওয়ায় আনুগত্যের পথও প্রস্তুত হইয়াছিল।

জাতীয়তাবাদের জাগরণে রাজতন্ত্রের অবদান

জাতীয় ভাবের পরিস্ফুটন ও জাতীয়তাবাদের জাগরণেও রাজতন্ত্রের অবদান রহিয়াছে। বলা যায়, প্রধানত জাতীয় রাজতন্ত্রের (National Monarchy) সমর্থনেই জাতীয় ভাবের প্রথম বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। লর্ড ব্রাইস বলেন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রের অধীনে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে-সকল সংস্কার সাধিত হইয়াছিল তাহা চরম রাজতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন প্রকার শাসন-ব্যবস্থার অধীনে সম্ভব ছিল না।

২। আধুনিক যুগে উপযোগিতার জন্য সমর্থন

আধুনিক কালেও রাজতন্ত্র বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়াছে। এই শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের সংগঠনের সরলতা, শাসননীতি ও শাসনকার্য পরিচালনায় ঐক্য, রাজার পক্ষে দল ও স্বার্থ নিরপেক্ষতা প্রভৃতির জন্য অনেক আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইহাকে সরকারের অন্যান্য রূপ অপেক্ষা কাম্য বলিয়া গণ্য করিয়াছে। ট্রিটস্কের মতে, এই সকল কারণের জন্য রাজতন্ত্রকে বর্তমানেও শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা রূপে গণ্য করিতে হইবে।

বিরুদ্ধে যুক্তি :
১। সুশাসক নৃপতি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা

উপরি-উক্ত গুণ সত্ত্বেও বর্তমানে চরম রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে অভিমত প্রচার করা যায় না। ইহার বিরুদ্ধে প্রথম যুক্তি হইল যে, উত্তরাধিকার সূত্রে রাজপদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকায় সুশাসন সম্পূর্ণভাবে দৈবের উপর নির্ভর করে। একমাত্র সুশাসনের যুক্তিতেই আধুনিক কালে ইহাকে সমর্থন করিতে পারা যায়। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনপ্রাপ্ত নৃপতি যে সুযোগ্য হইবেন তাহার নিশ্চয়তা কি? লীকক বলেন, "উত্তরাধিকার সূত্রে নৃপতি, উত্তরাধিকার সূত্রে রাজকবি বা উত্তরাধিকার সূত্রে গণিতজ্ঞের মতই অকল্পনীয়।"

২। ইহা বিপজ্জনক

দ্বিতীয়ত, রাজার স্বেচ্ছাচারিতার পথে কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিতে পারে। ফলে বিপ্লবও সংঘটিত হইতে পারে। ইতিহাসে এরূপ বিপ্লবের উদাহরণ বিরল নহে।

তৃতীয়ত, সুশাসক ও প্রজারঞ্জক রাজার কল্পনা করিলেও আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের দিক হইতে রাজতন্ত্রকে সমর্থন করা যায় না। সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য

* "Despotism is a legitimate mode of government for dealing with the barbarians, provided the end be their improvement and the means be justified by actually effecting that end."

হইল জনসাধারণকে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া সু-নাগরিকের সৃষ্টি করা। সু-নাগরিক সৃষ্ট না হইলে সু-রাষ্ট্রের কল্পনা করা যাইতে পারে না। কিন্তু রাজতন্ত্রে জনসাধারণ রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত হইতে পারে না। ফলে এরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সু-নাগরিকের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই দিক দিয়া স্যর হেনরী ক্যামবেল ব্যানারম্যানের (Sir Henry Campbell Bannerman) সুপ্রচলিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যায় যে, "সুশাসন স্বশাসনের কোন পরিবর্ত নহে।"*

৩। আদর্শ দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না

অভিজাততন্ত্র **(Aristocracy) :** অভিজাততন্ত্র বলিতে বুঝায় অভিজনদের শাসন। 'অভিজন' (Aristos) বলিতে প্রাচীন গ্রীকরা বুঝিতেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সুতরাং অভিজাততন্ত্র তাঁহাদের নিকট ছিল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শাসন। এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্বসাধারণের জন্যই শাসন করিতেন—নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে নহে। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে শাসনযন্ত্র ব্যবহৃত হইলে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া মুখ্যতন্ত্রে (Oligarchy) পরিণত হইত।

বর্তমানে অভিজাততন্ত্র বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার এক অপেক্ষাকৃত স্বল্প অংশ দ্বারা শাসন পরিচালনা—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শাসন নহে। জেলিনেকের মতে, শাসন পরিচালনাকারী জনসংখ্যার এই স্বল্প অংশকে 'শ্রেণী' (class) বলিয়া অভিহিত করা যায়। তিনি আরও বলেন যে, রাষ্ট্রের মধ্যে জন্মগত, ধনগত, ভূ-সম্পত্তিগত বা অন্য কোন কারণে কোন-না-কোন সামাজিক শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যাইবে যাহা অবশিষ্টাংশ হইতে অধিকতর শক্তিশালী ; এবং এই শ্রেণীই ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই দিক দিয়া দেখিলে বলা যায় সকল সরকারই অল্পবিস্তর অভিজাততান্ত্রিক – কারণ সকল শাসন-ব্যবস্থাতেই শাসনক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হয় মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা। সাধারণ লোক চূড়ান্তভাবে শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী হইলেও তাহারা মাত্র কয়েকজনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। সুতরাং অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যের সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা কঠিন। সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ না করা যাইলেও বলা যাইতে পারে যে, অভিজাততন্ত্রে সোজাসুজি জনগণের শাসনক্ষমতাকে, শাসনকর্তৃত্বকে অস্বীকার করিয়া মাত্র কয়েকজনের কর্তৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। এই অস্বীকার ও বিশ্বাসই অভিজাততন্ত্রের সূচক, শাসনক্ষমতা কার্যত কতজনের হস্তে রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা নহে।

বর্তমানে অভিজাততন্ত্রের অর্থ

এক অর্থে সকল সরকারই অল্পবিস্তর অভিজাততান্ত্রিক

অভিজাততন্ত্রের সূচক

অভিজাততন্ত্রের গুণাগুণ : অভিজাততন্ত্রের সপক্ষে বলা হয় যে, ইহা সংখ্যা অপেক্ষা গুণের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলিয়া ইহা গণতন্ত্র অপেক্ষা কাম্য

* "Good government is no substitute for self-government."

শাসন-ব্যবস্থা। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, এরূপ শাসন-ব্যবস্থায় স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির হস্তে শাসনভার ন্যস্ত থাকে বলিয়া তাহারা শাসনকার্যে সুদক্ষ হইতে পারে; তাহাদের দায়িত্বশীলতা বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে। ইহাতে গণতন্ত্রের আবেগ নাই বলিয়া ইহা সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সর্বদা বিপজ্জনক পরীক্ষা পরিহার করিয়া চলে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, স্থায়িত্ব ও দক্ষতা অভিজাততন্ত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন "শাসনকার্যে স্থায়ী উদ্যমশীলতা ও দক্ষতার দিক দিয়া ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য শাসন-ব্যবস্থাসমূহের অধিকাংশই হইল অভিজাততন্ত্র।"*

গুণ: স্থায়িত্ব ও দক্ষতা ইহার সপক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি

অভিজাততন্ত্রের ত্রুটিগুলিও কোনমতে উপেক্ষণীয় নহে। এই শাসন-ব্যবস্থার মূলতত্ত্বের সন্ধান কারলাইলের (Carlyle) বিখ্যাত উক্তির মধ্যে পাওয়া যাইবে যে, "জ্ঞানী ব্যক্তিগণ দ্বারা শাসিত হওয়াই মূর্খের চিরন্তন সম্মান।"** কিন্তু বর্তমানে জনসাধারণ নিজেদের মূর্খ বলিয়া স্বীকার করে না, জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হওয়াও সম্মান বলিয়া গণ্য করে না। সুতরাং অভিজাততন্ত্র সাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না বলিয়া ইহা কাম্য শাসন-ব্যবস্থা নহে।

ত্রুটি: ১। ইহা সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া কাম্য নহে

ইহাকে কাম্য শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইলেও সুশাসক নির্বাচনের সমস্যা রহিয়া যায়। তত্ত্বের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শাসন শ্রেষ্ঠ হইলেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নির্বাচন করা যাইবে কিরূপে? সাধারণকে এই নির্বাচনের ভার দিলে তখন কি আর তাহাদিগকে 'মূর্খ' পর্যায়ভুক্ত করা যাইবে? তাহারা শাসক নির্বাচনে পারদর্শী হইতে পারিলে শাসনকার্যে দক্ষ হইতে পারিবে না কেন?

২। ইহা অযৌক্তিক

উপরন্তু, অভিজাততন্ত্রের বিকৃত রূপগ্রহণের সম্ভাবনা সর্বদাই বর্তমান থাকে। দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'অভিজনগণ' শাসনযন্ত্রকে সর্বসাধারণের কল্যাণে পরিচালিত না করিয়া নিজেদের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে এরূপ শ্রেণীসম্মানবোধ জাগ্রত হয় যে তাঁহারা সাধারণকে ঘৃণা করিতে থাকেন। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের পক্ষে ইহা বিপজ্জনক শাসন-ব্যবস্থা।

৩। ইহা বিকৃত হইতে পারে

পরিশেষে, ব্লুণ্টস্‌লির মতে, অভিজাততন্ত্র রক্ষণশীল হইতে বাধ্য; কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা প্রয়োজনীয় হইলেও অধিকাংশ সময় ইহা প্রগতির অন্তরায় হইয়া বিপ্লবকে আহ্বান করিয়া আনে। সুতরাং ইহার স্থায়িত্বও অনিশ্চিত।

৪। ইহা প্রগতির অন্তরায়

*"..the Governments which have been remarkable in history for sustained ability and vigour..have generally been aristocracies".

**"It is the everlasting privilege of the foolish to be governed by the wise."

গণতন্ত্র—অর্থ ও বিভিন্ন রূপ (Meaning and Forms of Democracy) **:** সাধারণত সরকারের বিভিন্ন রূপের আলোচনা প্রসংগেই গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ইহা হইতে এই অনুমান করা কোনমতেই ঠিক হইবে না যে, গণতন্ত্র বলিতে শুধু সরকারের রূপ বা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই বুঝায়। গণতন্ত্র বলিতে সমাজের রূপ এবং রাষ্ট্রের রূপও বুঝাইতে পারে। অধ্যাপক গিড়িংস এবং হারন্স (Hearnshaw) দেখাইয়াছেন যে, 'গণতন্ত্র' শব্দটি দ্বারা বিশেষ এক সমাজ-ব্যবস্থা, এক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অথবা এক শাসন-ব্যবস্থা বুঝাইতে পারে। ইহার উপর বর্তমানে আমরা ইহার দ্বারা বিশেষ এক অর্থ-ব্যবস্থাও (economic system) বুঝাইয়া থাকি।

গণতন্ত্রের বিভিন্ন অর্থের ফলে গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণায় অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে

এইরূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম ধারণা হিসাবে গণতন্ত্রও সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। উপরন্তু, যে-কোন রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক মতবাদে বিশেষ কোন যুগের ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়। 'গণতন্ত্র' সম্বন্ধে ধারণা প্রাচীন গ্রাস হইতে চলিয়া আসায় ইহাতে বিভিন্ন যুগের সামাজিক অবস্থার ছাপ পড়িয়াছে। এই কারণেও 'গণতন্ত্র' সম্বন্ধে ধারণায় অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। উইলি (Malcolm M. Willey) বলেন, দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত এই অস্পষ্টতা দূর করিবার ও ধারণার বিভিন্নতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করিবার সার্থক প্রচেষ্টা করা সম্ভব হয় নাই।

সাম্য গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি

ধারণায় অস্পষ্টতা থাকায় 'গণতন্ত্রের' বিভিন্ন রূপ বা শব্দটির বিভিন্ন অর্থ লইয়া সামান্য আলোচনা করিতে হয়। প্রথমে গণতান্ত্রিক সমাজ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা সেইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা যাহা সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্য গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। সামাজিক গণতন্ত্রই হউক, রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রই হউক আর অর্থনৈতিক গণতন্ত্রই হউক—সকলই সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্য গণতন্ত্রের ভিত্তি বলিয়া সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে সাম্যের সন্ধান পাওয়া গেলে ইহাকে গণতান্ত্রিক সমাজ (Democratic Society) আখ্যা দেওয়া হয়। বার্ণসের (Delisle Burns) মতে, এইরূপ সমাজে সাধারণ জীবনযাত্রায় সকলেরই অবদান রহিয়াছে—সকলেই দায়িত্বশীলতার সহিত সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়া সাধারণ জীবনকে ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলে।

গণতন্ত্রের তিনটি রূপ : ১। গণতান্ত্রিক সমাজ

এইরূপ সমাজ বলপ্রয়োগকে সমর্থন করে না বা জন্মগত ও ধনগত বৈষম্যকে কোনরূপ মর্যাদা দেয় না। সাধারণ জীবনযাত্রায় প্রত্যেকের অবদানকে সমান মূল্যবান উৎস হিসাবে গণ্য করিয়া এইরূপ সমাজ একমাত্র সাম্যকেই মর্যাদা দেয়; এবং ফলে সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ 'গণতান্ত্রিক' রূপ ধারণ করে।

সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রের পরিবর্তে যদি শুধু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবে ইহাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। সংক্ষেপে গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় সকলের সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও মর্যাদা, এবং ইহার ফলে, সাধারণের চূড়ান্ত রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব। রুশো 'গণতন্ত্র' শব্দটিকে এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, শাসন-ব্যবস্থার রূপ যাহাই হউক না কেন সার্বভৌম সাধারণের ইচ্ছায় (General Will) প্রণীত আইন দ্বারা শাসিত হইলে যে-কোন রাষ্ট্রকে 'গণতান্ত্রিক' বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। সুতরাং রুশোর মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে-কোন প্রকার শাসন-ব্যবস্থা বা সরকারের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। রুশোর মত সমর্থন করিয়া অধ্যাপক হারন্‌স বলেন যে, 'গণতন্ত্র' বলিতে রাষ্ট্রেরই রূপ বুঝায় এবং 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' সরকারের যে-কোন প্রকার রূপের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।*

২। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষণ হইল সাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতা ও চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ। সাধারণে সার্বভৌম বলিয়া ইহা যে-কোন প্রকার সরকার সংগঠিত করিতে পারে। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও রাজতান্ত্রিক বা অভিজাততান্ত্রিক সরকারের সাক্ষাৎ মিলিতে পারে। রাষ্ট্রের রূপই সরকারের রূপের পরিচায়ক নহে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী বলিয়া ইহাকে 'জনগণের শাসন' (Rule of the People) বলা যায়। কিন্তু ইহা যে 'জনগণের দ্বারা শাসন' হইবে সে-বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই। জনগণের দ্বারা শাসন (Rule by the People) বলিতে বুঝায় যে, জনগণ প্রত্যক্ষভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। যদি জনগণ দ্বারা এইরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন প্রবর্তিত থাকে তবে ইহাকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক সরকার বলা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন, কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তিত না-ও হইতে পারে।

৩। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা (Democratic Government) : সরকারের বিভিন্ন রূপ বা শাসন-ব্যবস্থার আলোচনা প্রসংগে যে 'গণতন্ত্রের' আলোচনা করা হয় প্রধানত তাহা হইল গণতান্ত্রিক সবকার। এখন এই গণতান্ত্রিক সরকার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইবে। আলোচনার বিভিন্ন স্থানে 'গণতন্ত্র' শব্দটি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা সরকারের অর্থে ব্যবহার করা হইবে।

গণতান্ত্রিক সরকারকে জনগণের দ্বারা শাসন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শাসন জনগণের দ্বারা (by the people) এবং জনগণের (of the people) হওয়ায় ইহা জনগণের জন্যই (for the people) শাসন। এই তিনটিকে মিলাইয়া রাষ্ট্রপতি এ্যাব্রাহাম লিংকন গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই সর্বজনগ্রাহ্য ও প্রচলিত হইয়াছে। লিংকনের ভাষায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা হইল, "জনগণের জন্য (কল্যাণার্থে), জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন।"

লিংকন-প্রদত্ত সুপ্রচলিত সংজ্ঞা

* "...democracy as a form of State is consistent with any type of Government."

এখন প্রশ্ন উঠে যে, 'জনগণ' বলিতে কি বুঝায়? প্রাচীন গ্রীকগণ 'জনগণ' বলিতে রাষ্ট্রের সমগ্র অধিবাসিগণকে না বুঝিয়া মাত্র বহুজনকে বুঝিতেন। সুতরাং তাহাদের নিকট ইহা ছিল বহুজন-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা (multitude's rule)। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে সিলীর মতে, গণতন্ত্র হইল এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা যাহাতে সকলেরই একটি অংশ আছে। কিন্তু দেখা যায়, কোন শাসন-ব্যবস্থাতেই সকলে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। নাবালক উন্মাদ সমাজদ্রোহী প্রভৃতিকে সকল শাসন-ব্যবস্থাতেই রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের বা শাসনকার্যের বহির্ভূত করিয়া রাখা হয়। এই কারণে অধ্যাপক ডাইসি ও লর্ড ব্রাইস গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন ও স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই সাধারণত গ্রহণীয়। ডাইসির মতে, গণতন্ত্র এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা যেখানে তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ শাসন পরিচালনা করে। ব্রাইস বলেন, এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা সম্প্রদায়ের সকলের হস্তে থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়—কারণ সম্প্রদায়ের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় ভোটাধিকারের মাধ্যমে এবং সকলে একমতাবলম্বী নহে বলিয়া কোন বিশেষ মতাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই শাসনভার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'জনগণ' বলিতে বুঝায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়; এবং স্বভাবতই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা শাসন—সকলের দ্বারা নহে। অন্য এক স্থানে ব্রাইস স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্র হইল ভোটাধিকারী নাগরিকগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা শাসন—অবশ্য ভোটাধিকারী নাগরিকগণকেও সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে হইবে; না হইলে ইহা সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের শাসনে পরিণত হইবে। তখন আর ইহাকে 'গণতন্ত্র' বা 'জনগণের দ্বারা শাসন' বলিয়া অভিহিত করা যাইবে না।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ:

১। বাস্তব জীবনে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মাত্র, সকলের নহে

সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলিয়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় আইন জনমতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই প্রণীত হয়। এইজন্য গণতন্ত্রকে জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থাও (government resting on public opinion) বলা হয়। রুশো অবশ্য ইহাকে সাধারণ জনমতের (public opinion) পরিবর্তে পূর্ণ অর্থে জনমত বা সাধারণের ইচ্ছার (General Will) উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

২। ইহা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত

গণতান্ত্রিক সরকারকে অনেক সময় 'সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার' (rule based on consent) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। সম্মতি বলিতে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি বুঝায় না, সংখ্যালঘিষ্ঠের সম্মতিও বুঝায়। গণতান্ত্রিক সরকার সর্বসাধারণের মংগলার্থে পরিচালিত হয় বলিয়া এবং এরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সকলেরই সমালোচনা দ্বারা, জনমত গঠন দ্বারা শাসনকার্য নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা থাকে বলিয়া সকলে একরূপ সম্মতি

ইহা সকলের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত

প্রদান করিয়া থাকে। সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সরকারও সর্বদা সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতকে শ্রদ্ধা করিয়া চলে। সিজউইক বলেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সর্বদা বলপ্রয়োগ করিলে সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের স্বরূপ বজায় থাকে না। সংখ্যালঘিষ্ঠের গুরুত্বপূর্ণ মতামতকে শ্রদ্ধা করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিলে তবেই ইহা জনপ্রিয় হইয়া প্রকৃত অর্থে 'জনগণের দ্বারা সরকারের' রূপ গ্রহণ করে। বার্কার গণতন্ত্রকে 'আলাপ-আলোচনার পদ্ধতিতে সরকার'* বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, রাষ্ট্রজীবনে বিভিন্ন মতপোষণকারীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন মতের সমন্বয়ের দ্বারাই গণতান্ত্রিক সরকারের কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয়সাধন ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনে সকলেরই ভূমিকা রহিয়াছে। গণতন্ত্র সকলের সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী বলিয়া ইহা কাহাকেও উপেক্ষা করিতে পারে না; এবং এই অর্থে গণতান্ত্রিক শাসনকে সর্বসাধারণের দ্বারা (by the people) শাসন বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

গণতান্ত্রিক শাসনে সকলেরই ভূমিকা রহিয়াছে

গণতান্ত্রিক সরকারের বিভিন্ন রূপ (Forms of Democratic Government)ঃ ব্রাইস যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিয়াছেন —যে শাসন-ব্যবস্থাকে জনমত ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র। ইহা ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধও হইতে পারে।

দুই প্রকারের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Pure or Direct Democracy)ঃ প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই শাসন-ব্যবস্থাকে যাহাতে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রসমূহে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে সমগ্র নাগরিক কোন বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিত। সময় সময় তাহারা আবার বিচারের ব্যবস্থাও করিত। এইভাবে নাগরিক সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালিত হইত। নির্বাচন বা প্রতিনিধি প্রেরণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রেই এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র, জনসংখ্যা স্বল্প এবং সমস্যা সরল হইলে এখনও এইরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে। কিন্তু আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ ক্ষুদ্র নহে, ইহাদের সমস্যাও সরল নহে। সুতরাং বর্তমান যুগে এই শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। ফলে মাত্র সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি

আধুনিক বিশাল রাষ্ট্রসমূহে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অচল

* "Democracy..is a system of 'government' by discussion."

ক্যান্টন (Cantons) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্থানীয় সরকারে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy) ঃ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের শাসন-ব্যবস্থা প্রতিনিধিমূলক। সুতরাং এই সকল গণতন্ত্র পরোক্ষ গণতন্ত্র। পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা সুন্দরভাবে দিয়াছেন জন ষ্টুয়ার্ট মিল। মিল বলেন, ইহা হইল সেইরূপ শাসন-ব্যবস্থা যেখানে "সমগ্র জনসংখ্যা বা জনসংখ্যার অধিকাংশ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনক্ষমতার ব্যবহার করে।"* নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইনসভায় জনমতের অনুকূলে আইন প্রণয়ন করেন এবং শাসন বিভাগকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ করেন।

মিল-প্রদত্ত সংজ্ঞা

শাসন বিভাগের কর্মকর্তৃগণও হয় প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকগণ দ্বারা নির্বাচিত হন, না-হয় আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে মনোনীত হন। সুতরাং তাঁহারাও জনমতের অনুকূলে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে সচেষ্ট থাকেন।

প্রতিনিধিগণ সকল ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। যদি তাঁহারা আইন প্রণয়ন বা শাসনকার্য পরিচালনায় জনমতবিরোধী কার্য করেন তবে তাঁহাদের পুনর্নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রতিনিধি জনমতের অনুকূলেই কার্য করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু প্রতিনিধি যে সকল সময় জনমতের অনুকূলেই কার্য করিবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। একবার নির্বাচিত হইয়া তিনি জনমতবিরোধী কার্যও করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিয়া জনমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নির্বাচকগণের পক্ষে পুনর্নির্বাচন অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এইজন্য প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উপাসক রুশো বলিয়াছিলেন যে নির্বাচনের সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে ইংরাজরা স্বাধীন নহে। অর্থাৎ, একবার নির্বাচন হইয়া গেলে পুনর্নির্বাচন অবধি তাহারা প্রতিনিধিবর্গের শাসন মানিয়া লইতে বাধ্য।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের ত্রুটির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য বর্তমানে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Democratic Checks) বলা হয়।

***প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ* (Direct Democratic Checks) ঃ** প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বলিতে এমন সকল ব্যবস্থাকে বুঝায় যাহাদের দ্বারা প্রতিনিধিদের উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা হয়। এই সকল ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ

* It is a form of Government where "..the whole people or some numerous portion of them, exercise the governing power through deputies periodically elected by themselves."

গণতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষও (Relics of Direct Democracy) বলে। এইরূপ ব্যবস্থা প্রধানত তিনটি—গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative) ও পদচ্যুতি (Recall)।

গণভোটের পদ্ধতি ও বিভিন্ন রূপ

গণভোট হইল এমন এক পদ্ধতি যাহার দ্বারা নির্বাচকগণ আইনসভাসমূহের কার্যাকার্যের বিচার-বিবেচনা করিতে পারে। শাসনতন্ত্রে এইরূপ নির্দেশ থাকিতে পারে যে, সকল আইনের খসড়া জনসমীপে, অর্থাৎ নির্বাচকগণের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে এবং নির্বাচকদের দ্বারা পাস করাইয়া লইতে হইবে। শাসনতন্ত্রে এইরূপ নির্দেশ থাকিলে ইহাকে বাধ্যতামূলক গণভোট (Obligatory Referendum) বলা হয়। গণভোট বাধ্যতামূলক নাও হইতে পারে। শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক খসড়া গণভোট দ্বারা পাস করাইয়া লইতে হইবে এরূপ নির্দেশ থাকিতে পারে যে, কিছুসংখ্যক ভোটদাতা আবেদন করিলেই আইনের খসড়াটি নির্বাচকগণের নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাদের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ গণভোটকে ইচ্ছাধীন গণভোট (Facultative or Optional Referendum) বলা হয়। আবার এরূপ ব্যবস্থাও থাকিতে পারে যে, কোন কোন বিষয় জনসমীপে উপস্থাপিত করিতে হইবেই এবং বাকী বিষয়গুলি নির্বাচকগণের এক নির্দিষ্ট অংশ দাবি করিলে তবে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

গণ-উদ্যোগ

গণ-উদ্যোগ বলিতে বুঝায় নির্বাচকগণের উদ্যোগে আইন প্রণয়ন করা। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসারে নির্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচক কোন আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভাকে নির্দেশ দান করিতে পারে অথবা আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া আইনসভার নিকট প্রেরণ করিতে পারে অথবা শুধু অনুরোধ করিতে পারে। এরূপ নির্দেশ, খসড়া বা অনুরোধপ্রাপ্তির পর আইনসভা ইহাকে সাধারণত জনসমীপে উপস্থিত করিয়া গণভোট গ্রহণ করে।

পদচ্যুতি

পদচ্যুতি পদ্ধতির প্রয়োগে প্রতিনিধিকে জনমতের চাপে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই পদত্যাগ করিতে হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে নির্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচকের পক্ষে তাহাদের প্রতিনিধির পদত্যাগ দাবি করিয়া এই দাবি সকল নির্বাচকের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকগণ ইহা সমর্থন করিলে প্রতিনিধির পক্ষে সরাসরি পদত্যাগ করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না।

সপক্ষে যুক্তি

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের গুণাগুণ : প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণসমূহের সপক্ষে বলিবার প্রধান বিষয় হইল যে, বর্তমানে একমাত্র ইহাদের মাধ্যমেই জনগণের শাসন জনগণের দ্বারা শাসন হইয়া উঠিতে পারে। বিশেষ বিশেষ নিয়ন্ত্রণ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গণভোট দ্বারা আইনসভার অসাধুতা দূর করা হয়, প্রতিনিধি ও নির্বাচকগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বজায় রাখা হয় এবং জনমতবিরোধী আইন প্রণয়নের আশংকার অবসান করা

হয়। এই গুণগুলির সন্ধান গণ-উদ্যোগ ও পদচ্যুতিতে মিলে। উপরন্তু, গণ-উদ্যোগ হইল জনপ্রিয় প্রস্তাবকে আইনে রূপান্তরিত করিবার প্রত্যক্ষ পন্থা। বিপক্ষে বলিবার বিষয় হইল যে, এই সকল পদ্ধতি মন্থর গতি গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রকে আরও মন্থর গতি করিয়া তুলে। প্রত্যেক বিষয়ই যদি গণভোট দ্বারা পাস করাইয়া লইতে হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইবে যে, আইনের উপযোগিতা ও উদ্দেশ্য আর বর্তমান নাই। দ্বিতীয়ত, বর্তমানের বিশাল রাষ্ট্রসমূহে ধারণা ও মতের এরূপ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় যে, সকল ক্ষেত্রে নির্বাচকগণের মত গ্রহণ করিয়া কার্য করিলে বহু পরস্পরবিরোধী আইনের সৃষ্টি হইবে এবং ইহার ফলে প্রকৃত প্রগতিশীল আইনের কার্যকারিতা নষ্ট হইবে। তৃতীয়ত, বর্তমানে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহ বিশেষ ভাবে জটিল, এবং শাসনকার্য পরিচালনা বর্তমানে বিশেষভাবে বিশেষজ্ঞের কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষেত্রে 'জনগণ' দ্বারা আইন প্রণয়ন, সরকারী কার্যনীতির বিচার প্রভৃতির ফল কার্যক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে না। পরিশেষে, এই সকল পদ্ধতির ফলে অনেক সময় সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী 'নেতৃবর্গ' দায়িত্বহীন জনসাধারণকে নিজেদের ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে পরিচালিত করে—ইহাও দেখা যায়। ফলে বৃহত্তর স্বার্থ ব্যাহত হয়।

বিপক্ষে যুক্তি

গুণাগুণ বিচারে ত্রুটির সংখ্যা ও গুরুত্ব অধিক হওয়ায় আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আর বিশেষ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সপক্ষে প্রচার করিয়া বেড়ান না। বরং তাঁহারা বিপরীত কার্যই করেন। ল্যাস্কি বলেন, প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা শাসন এত স্থূল বিষয় যে ইহা সূক্ষ্ম শাসন-পদ্ধতিতে—যাহা বর্তমানে একরূপ চারুকলায় পরিণত হইয়াছে—স্থান পাইতে পারে না।

বর্তমান যুগে ইহা একরূপ অচল

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Defects of Democratic Government): 'গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ' বলিতে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের গুণাগুণই বুঝায় কারণ বর্তমানে ইহাই গণতন্ত্রের প্রধান রূপ। পরোক্ষ গণতন্ত্রের সমর্থক ও বিরুদ্ধ সমালোচকের অভাব কখনও হয় নাই। উইলির (Malcolm M. Willey) মতে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপর লেখকগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে: অন্ধ সমর্থকগণ, ঘোরতর বিদ্বেষিগণ এবং মধ্য পন্থানুসরণকারিগণ। এই তিন শ্রেণীর লেখকগণের মতামতের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া গণতন্ত্রের গুণাগুণ বর্ণনা করা এবং গণতন্ত্রের সফলতার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে ইংগিত দেওয়া যাইতে পারে।

গুণ: বার্কার গণতন্ত্রের দুইটি প্রধান গুণের নির্দেশ করিয়া ইহাকে শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রথমে তিনি এ্যারিষ্টটলের যুক্তি অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে একমাত্র গণতন্ত্রেই সকল বিষয়ের উপর সম্যক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়। সংস্কৃতি ও চারুকলা বিচারের ক্ষেত্রে এ্যারিষ্টটল বলিয়াছিলেন, "কতক লোকে একটি

বার্কার নির্দেশিত গণতন্ত্রের দুইটি প্রধান গুণ

বিশেষ দিক দেখিতে পায়, কতক লোক আর একটি দেখিতে পায়, কিন্তু সকলে মিলিয়া বিষয়টিকে সমগ্রভাবেই দেখিতে পায়।" বার্কার বলেন, এই উক্তি মাত্র সংস্কৃতির বেলাতেই নহে, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বস্তুত, এ্যারিষ্টটলই ইহা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ করিয়াছিলেন। শাসন বহুজনের হইলে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় দ্বারা এমন সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় যাহা সাধারণভাবে গ্রাহ্য। উপরন্তু, রাষ্ট্রনৈতিক সত্যের আবিষ্কার ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হয় বহুজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময়। ফলে একমাত্র গণতন্ত্রেই স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের উপলব্ধি সম্ভব হয়। এই কারণেও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

১। সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্রেই সম্ভব

বার্কার গণতন্ত্রের দ্বিতীয় গুণ নির্দেশ করিয়াছেন জন ষ্টুয়ার্ট মিলকে অনুসরণ করিয়া। মিল তাঁহার প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত গ্রন্থে* বলিয়াছেন যে, সুশাসনই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, জনসাধারণের মানসিক উন্নতিও অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিলে তবেই সুশাসনে শিক্ষিত হইতে পারে। একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ইহা সম্ভব হয় বলিয়া গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

২। একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনেই জনসাধারণের মানসিক উন্নতি সম্ভব

বার্কার গণতন্ত্রের যে প্রথম গুণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা গণতন্ত্রের সপক্ষে প্রদর্শিত বিভিন্ন যুক্তির সমন্বয় মাত্র। এই বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে প্রথম হইল বেন্থাম, জেমস মিল প্রভৃতি হিতবাদিগণ (Utilitarians) প্রদর্শিত যুক্তি। হিতবাদী বেন্থামের মতে, সুশাসনের সমস্যা হইল শাসক ও শাসিতের স্বার্থকে এক ও অভিন্ন করিয়া তুলিয়া সর্বাধিক সংখ্যার সর্বাধিক মংগল-সাধনের সমস্যা। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হইল শাসিতকে শাসক করিয়া তোলা। একমাত্র গণতন্ত্রেই ইহা সম্ভব হয় বলিয়া ইহাই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা। হিতবাদী জেমস মিল ঐ একই কারণে গণতন্ত্রকে 'বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"**

৩। হিতবাদীদের মতে, গণতন্ত্রে শাসিতই শাসক বলিয়া ইহাই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা

হিতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নহে, বাস্তব জীবনে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান-গুলির গঠন ও কার্যাবলী পরীক্ষা করিয়া টকভিল ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, "গণতন্ত্রের ন্যায় সমাজের সকল শ্রেণীর কল্যাণসাধনের উপযোগী আর কোন শাসন-ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হন নাই।"† হার্বার্ট স্পেনসারও এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন।

৪। ইহা সকলের কল্যাণসাধন করে

* Considerations on Representative Government

** "Grand discovery of modern times."

† "No political form has hitherto been discovered which is equally favourable to the prosperity and development of all the classes."

ইহা অন্যতম ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সত্য যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে-শ্রেণীর হস্তে থাকে সেই শ্রেণীর স্বার্থেই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হয়। সুতরাং ল্যাস্কির ভাষায় বলিতে পারা যায়, "সাধারণের কল্যাণ যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয় তবে সাধারণের নিয়ন্ত্রণ এই উদ্দেশ্যসাধনের অপরিহার্য সর্ত।"

৫। গণতন্ত্র দেশপ্রীতি ও দায়িত্ববোধ গভীর করে

৬। ইহা বিপ্লবের আক্রমণ হইতে অনেকাংশে মুক্ত

বার্কারের নির্দেশিত গণতন্ত্রের দ্বিতীয় গুণটি বিশ্লেষণ করিলেও গণতন্ত্রের সপক্ষে আরও যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। বলা হয় যে, গণতন্ত্র সকলকে সমান মর্যাদা দান করিয়া সাধারণ মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে। সকলে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে বলিয়া তাহারা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তাহাদের দেশপ্রীতি গভীর হয়, তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। "অনুভূতির প্রেরণা হইল কার্য।" শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারায় জনগণ সরকার সম্বন্ধে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে, জাতীয় জীবন সম্বন্ধে অনুভূতি লাভ করিতে থাকে। ফলে তাঁহারা বৈপ্লবিক পন্থা হইতে দূরে থাকিয়া আইনসংগত শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুন্দর রাষ্ট্র ও সমাজজীবন গঠনে সচেষ্ট হয়।

দুই প্রকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা

ত্রুটি ঃ প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে অসংখ্য অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অসংগতি দৃষ্ট হইলেও তাহাদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব বলিয়াই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করেন। উইলির (M. M. Willey) মতে, এইরূপ অভিযোগগুলিকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—যথা, (ক) অপরিহার্যরূপে গণতন্ত্র হইল অজ্ঞ ও অক্ষমের শাসন; এবং (খ) ক্ষণভংগুরতা হইল গণতন্ত্রের প্রকৃতি। ইহার উপর কোকাব প্রভৃতিকে অনুসরণ করিয়া গণতন্ত্রকে অবৈজ্ঞানিক ধারণা (unscientific dogma) বলিয়াও সমালোচনা করা হয়।

(ক) ১। গণতন্ত্র অক্ষম ও অশিক্ষিতের শাসন

গণতন্ত্র যে অক্ষম ও অশিক্ষিত জনসাধারণের শাসন এই অভিযোগ প্লেটোর সময় হইতে করিয়া আসা হইতেছে। সমালোচকগণের মতে, যে-কোন শাসন-ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে শাসকবর্গের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সমস্যা বিশেষ জটিল হওয়ায় বর্তমান যুগ সম্বন্ধে এই ধারণা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু গণতন্ত্র শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না। এইজন্য সমালোচকগণ গণতন্ত্রের মধ্যে অকর্মণ্যতার বীজ লক্ষ্য করিয়াছেন এবং ইহা 'অকর্মণ্যতার মন্ত্র' বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে।* লেকীর (Lecky) মতে, সরকার অজ্ঞতা না বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত হইবে—ইহাই মূল প্রশ্ন। ইহার মধ্যে অজ্ঞতা দ্বারা শাসনই যদি কাম্য হয় তবে অবশ্য গণতন্ত্রকে সমর্থন করা যাইতে পারে। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে,

* Cult of Incompetence, Emile Faguet

গণতন্ত্র হইল "সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য ব্যক্তির শাসন-ব্যবস্থা, কারণ এই শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় সর্বাধিক।"*

২। ইহা রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা

গণতন্ত্র এই দিক দিয়াও অভিযুক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞ ও অকর্মণ্য লোকের শাসন বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা বিশেষভাবে রক্ষণশীল। নূতন নূতন আবিষ্কার, নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে বিশেষ সাড়া জাগাইতে পারে না। ফলে কাম্য সংস্কার সাধিত হইতে না পারায় প্রগতি পদে পদে ব্যাহত হয়।

৩। গণতান্ত্রিক নেতৃবর্গ নিম্নস্তরের

নায়কতার দিক দিয়াও গণতন্ত্রের ত্রুটি প্রদর্শন করা হইয়াছে। র‍্যালফ্ এ্যাডামস্ ক্র্যাম (Ralph Adams Cram) ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন যে গণতান্ত্রিক নেতারা অন্য যে-কোন ব্যবস্থার নেতৃবর্গ হইতে নিম্নস্তরের। তাঁহার মতে, সাধারণে সকল সময়েই নেতার সন্ধান করিয়া বেড়ায়, কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহারা নিম্নস্তরের নেতৃবর্গকেই নির্বাচিত করে।

৪। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক

গণতন্ত্রে যে-স্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহাও, সমালোচকগণের মতে, ভুল। বলা হয় যে সাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকিতে পারে না। স্বাধীনতার সম্বন্ধে ধারণার জন্য প্রয়োজন হইল চিন্তাশক্তি ও উপলব্ধির ক্ষমতা। ইহা সাধারণ লোকের নাই। তাহারা গতানুগতিকভাবে কোন নির্দিষ্ট মান অনুসরণ করিয়া চলে এবং নির্দিষ্ট গণ্ডিবহির্ভূত সকলপ্রকার কার্য ও মতামত প্রকাশকে সন্দেহের চক্ষে দেখে বলিয়া ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট হয়। এই নিয়ন্ত্রণাধিক্যের জন্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা অলীক প্রতিপন্ন হয়।

৫। দলপ্রথার জন্য ত্রুটি

দলপ্রথা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অংগীভূত হওয়ার জন্যই দলগত স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুফল দৃষ্ট হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কাহারও জাতীয় মিতব্যয়িতার দিকে দৃষ্টি থাকে না। রাষ্ট্রনায়কগণ সাধারণের অর্থ অসংগতভাবে ব্যয় করিয়াও জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করেন। সাধারণেও জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখে। ফলে, জাতীয় সমৃদ্ধির স্থানাধিকার করে দলগত বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতা।

অজ্ঞ ও অকর্মণ্যের শাসন বলিয়া গণতন্ত্রের উপরি-উক্ত যে-সমালোচনা কোকার তাহার সংক্ষিপ্তসার এইভাবে প্রদান করিয়াছেন: "......সরকারের সকল প্রকার রূপের মধ্যে গণতন্ত্র হইল সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য ও অপচয়পূর্ণ, সর্বাপেক্ষা দলগত ও অসহিষ্ণু, প্রকৃত প্রগতির সর্বাপেক্ষা বিরোধী।" †

* It is a Government by "the poorest, the most ignorant, the most incapable, who are necessarily the most numerous."

† "..of all forms of government, democracy is the most inefficient and extravagant, the most factional and intolerant, the most hostile or indifferent to true progress."

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত সমালোচকগণের মধ্যে সর্বপ্রধান হইলেন স্যর হেনরী মেইন। তিনি গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিয়া ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা বিশেষভাবে ক্ষণভংগুর। এই আলোচনার উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, "অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই দেখা যায় যে, ক্ষণভংগুরতা জনপ্রিয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইহার আবির্ভাবের ফলে সকলপ্রকার শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্বই অধিকতর অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।" কারণ হিসাবে মেইন বলেন যে, গণতন্ত্রে বহু পরস্পরবিরোধী ধারণা পরস্পরের সহিত জড়িত থাকায় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের পক্ষে শাসন-ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। ফলে সরকারের ঘন ঘন উত্থানপতন দেখিতে পাওয়া যায়।

(খ) ৬। গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ফলেই সভ্যতা 'বন্ধ্য, সাধারণ ও স্থূল' (banal, mediocre and dull) হইয়া দাঁড়াইয়াছে— বিজ্ঞানের দিক হইতে এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে। জীববিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে বলিয়াই সভ্যতার পশ্চাদ্গতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। মনস্তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বলেন, গণতন্ত্র সকলকে সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া বুদ্ধিমত্তার যে সমভূমির সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে উন্নত সভ্যতা জন্মিতে পারে না। এই দিক দিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে প্রতিভার অপমৃত্যুই গণতন্ত্রের একমাত্র কুফল নহে ; প্রতিভাকে স্থূল ও সাধারণ পর্যায়ে পরিণত করাও গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

৭। গণতান্ত্রিক সভ্যতাকে নিম্নস্তরের বলা হইয়াছে

আবার বলা হয় যে, সাধারণ মানুষ অজ্ঞানতাহেতু নিজের ভালমন্দ বিচার করিতে অপারগ। এই অজ্ঞানতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে চলে স্বৈরাচারিতার কুশাসন। এই কারণে প্রস্তাব করা হয় যে, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠের হাতে (conscious minority) শাসন পরিচালনা ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন। ইহারাই জনসাধারণের কল্যাণ উপলব্ধি করিয়া শান্তি ও সমৃদ্ধি আনিয়া দিবে। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই যুক্তির পিছনে উদ্দেশ্য হইল ফ্যাসিবাদী শাসন-ব্যবস্থা বা নায়কতন্ত্রের প্রবর্তন করা।

গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ করা হয় যে, ইহাতে 'সামাজিক চেতনা' (sense of the community) প্রসারলাভ করিতে পারে না কারণ গণতান্ত্রিক সমাজ কতকগুলি স্বার্থান্বেষী বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিমাত্র। অপরপক্ষে নায়কতন্ত্রে সাধারণের আনুগত্য সহজেই পাওয়া যায় এবং সমাজের সংহতি নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু এ-যুক্তির সারবত্তা বিশেষ নাই, কারণ প্রকৃত গণতন্ত্র সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে না—বরঞ্চ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য পরস্পর নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইহা ব্যতীত নায়কতন্ত্রে যে ঐক্য সৃষ্টি হয় তাহা

জনসাধারণের অন্ধ অনুসরণের ফল। কিন্তু গণতন্ত্রে সমাজ-চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণ সাম্যের ভিত্তিতে সামগ্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়।*

(গ) ৮। ইহা পুঁজিবাদের প্রশ্রয় দেয়

উপরি-উক্ত শ্রেণীর সমালোচনা ছাড়াও গণতন্ত্র পুঁজিবাদের প্রশ্রয় দেয়; ইহা বিপদকালীন অবস্থা অবলম্বনে বিশেষ কার্যক্ষম নয়—বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছে।

উপসংহার: গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে-সকল সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিবার ফল। কোন কোন লেখক গণতন্ত্রকে একরূপ সমাজ-ব্যবস্থা মনে করিয়া ইহার সমালোচনা করিয়াছেন, কোন লেখক বা ইহাকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিয়া ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, আবার কেহ বা ইহাকে শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে দেখিয়াই ইহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। যেখানে গণতন্ত্রকে শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে দেখিয়া ইহার সমালোচনা করা হইয়াছে সেখানে অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক হইয়াছে। লর্ড ব্রাইস দেখাইয়াছেন যে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছয়টি সাধারণ অভিযোগের তিনটি—যথা, (১) আর্থিক স্বার্থসমূহের শাসন ও আইন প্রণয়নকে বিকৃত করিবার ক্ষমতা; (২) রাষ্ট্রনীতিকে ব্যবসা হিসাবে গণ্য করা—সেবা হিসাবে নহে; এবং (৩) অপচয়-যে-কোন শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য এবং অপর ত্রুটিগুলিরও প্রতিবিধান করা সম্ভব। প্রতিবিধানের প্রশ্নে গণতন্ত্র সফল করিবার উপায় সংক্রান্ত প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। এখন এ-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক হইয়াছে

গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে (Conditions of Success of Democracy): জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে, প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য তিনটি অবস্থার অস্তিত্ব বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়—(১) জনগণের পক্ষে ইহাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন; (২) ইহাকে রক্ষা করিববার জন্য তাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে; এবং (৩) তাহাদের পক্ষে কর্তব্যপালনে এবং অধিকার ব্যাহত হইলে অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রামে ইচ্ছুক ও সমর্থ হইতে হইবে।

মিল-প্রদত্ত সর্ত

মিলের এই তিনটি সর্ত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের গুণ বা লক্ষণের নির্দেশক মাত্র। উচ্চ রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনগণই এরূপ গুণসমন্বিত হইতে পারে; এবং এরূপ গুণসমন্বিত জনগণকে বার্ণসের ভাষায়, 'গণতান্ত্রিক জনগণ' (democratic people) বলিয়া অভিহিত করা যায়। সুতরাং মিল-প্রদত্ত তিনটি সর্ত মিলাইয়া বলা যায় যে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক জনগণের।

১। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক জনগণের

নাগরিকগণের যদি অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় তবেই জনগণ গণতান্ত্রিক হইয়া উঠিতে পারে। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন নাগরিকের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

*C. Delisle Burns, Democracy—its defects and advantages

পরিলক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে অন্যতম হইল তাহা গিডিংস যাহাকে 'শ্রেণী সম্বন্ধে সচেতনা' (consciousness of kind) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গণতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, কারণ ইহা সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গণতন্ত্র প্রসংগে শ্রেণী সম্বন্ধে সচেতনা বলিতে বুঝায় সকলের সম্বন্ধে সচেতনা, সমাজ সম্বন্ধে সচেতনা, সৌভ্রাত্রের অনুভূতি (a feeling of fraternity)।

গণতন্ত্র নাগরিকগণের নিকট হইতে সহিষ্ণুতাও দাবি করে। কার্যক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন বলিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানিয়া লইতে হইবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত ও স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে।

২। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা

দেখা গেল, জনগণ গণতান্ত্রিক হইলে তবেই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সফল হইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইল, জনগণকে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন করিয়া তোলা যায় কিরূপে? ইহার জন্য প্রয়োজন এমন এক পরিবেশের যেখানে ব্যক্তি তাহার পূর্ণ সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই পরিবেশ সৃষ্ট হয় সকল প্রয়োজনীয় সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকার ও সংরক্ষণ এবং সাম্যের ভিত্তিতে এই সকল অধিকারের প্রতিষ্ঠার দ্বারা। প্রয়োজনীয় অধিকার ভোগ করিয়া ব্যক্তি যদি সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন হইতে পারে তবেই সে গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে। জনসাধারণের শাসনের বিরুদ্ধে বর্তমানে যে অভিযোগ তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশের অসম্পূর্ণতার জন্যই। বর্তমান পরিবেশে সাধারণের পূর্ণ অধিকার—বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয় না। বস্তুত, রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের সহিত সাম্প্রতিক যুগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে 'অর্থনৈতিক মুখ্যতন্ত্র' (economic oligarchy) বা পুঁজিবাদ। ফলে স্বাধীনতা ও সাম্য একরূপ অলীক প্রতিপন্ন হইয়াছে; এবং দেখা দিয়াছে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ হতাশা। তাই প্রথম প্রয়োজন হইল গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদানসমূহের (instruments of production) মালিকানা সমাজের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে এবং মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র বাঁচিতে পারিবে না।

৩। গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার অপরিহার্যতা

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (Future of Democracy): বর্তমানে রাষ্ট্রনৈতিক বা উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Political or Liberal Democracy) সংকটের সম্মুখীন। কিছুদিন পূর্বেও ধারণা ছিল যে গণতন্ত্র সমাজবিকাশের চরম রূপ। কিন্তু সম্প্রতি গণতন্ত্রকে সফলকাম

গণতন্ত্রের সংকটের কারণ

করার পথে নানা প্রকার অসুবিধা দেখা দিয়াছে। গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম সর্ত হইল যে নাগরিকগণকে তাহাদের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিকগণের এই সচেতনতা বা সতর্কতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।* গণতন্ত্রের আর একটি বিপদ হইল যে সমাজের সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞানের অভাব। ইহার প্রধান কারণ জনসাধারণের অশিক্ষা ও সমস্যাসমূহের জটিলতা। সাধারণ লোক এই সকল জটিল সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে না বা বুঝিতে চেষ্টা করে না। সংবাদপত্র, রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি জনসাধারণের এই অজ্ঞানতা ও নির্লিপ্ততার সুযোগ লইয়া তাহাদের বিপথে পরিচালনা করে। পরিশেষে, গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা হইল অর্থনৈতিক মুখ্যতন্ত্র (economic oligarchy) এবং রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ। গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে আশ্রয় না করিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও সফলতার এই সর্তে একরূপ স্বীকার করিলেও কার্যক্ষেত্রে এখনও ইহাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ফলে তথাকথিত গণতন্ত্রের সহিত সর্বক্ষেত্রে এখনও জড়িত আছে পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা।† পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা যতদিন সম্প্রসারণশীল ছিল ততদিন গণতন্ত্রের সম্মুখে অস্তিত্বের কোন সমস্যা উপস্থিত হয় নাই, কারণ অধিকতর মুনাফা হইতে জনসাধারণের উত্তরোত্তর দাবি সহজেই মিটানো যাইত। কিন্তু আজ পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা সংকোচনশীল হইয়াছে এবং ফলে জনসাধারণের দাবিপূরণ করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং গণতন্ত্রে দেখা দিয়াছে সংকট। এই সংকট হইতে পরিত্রাণের পথ কি?—এই প্রশ্নেই আজ সমগ্র গণতান্ত্রিক জগৎ মুখরিত। পথের সন্ধান যাঁহারা দিতে চান তাঁহাদের অনেকে একনায়কতন্ত্রের দিকে নির্দেশ করেন কারণ ইঁহাদের মতে, গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি সম্ভব নয়। অনেকে আবার সমভোগী সমাজ (communistic society) প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রেরই বিলোপসাধন করিতে চান। অবশ্য ইঁহারাও পুঁজিবাদের বিলোপ ও সমভোগী সমাজ প্রবর্তনের অন্তর্বর্তীকালে একরূপ নায়কতন্ত্রের কল্পনা করেন। সর্বশেষে আছেন শাসনতান্ত্রিক ও বিবর্তনমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই নূতন সমাজ সৃষ্টির সম্ভাবনায় বিশ্বাসী চিন্তাশীলগণ।

অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব

সমাজের সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞানতা

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অনস্তিত্ব

গণতন্ত্রের সংকট এবং ইহা হইতে পরিত্রাণের পথ

এমত অবস্থায় মতবাদ-নিরপেক্ষ কাহারও পক্ষে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী না করাই বাঞ্ছনীয়। তবে এটুকু বলা যাইতে পারে যে, পুঁজিবাদের

* 'Democracy is in danger of growing stale through the laziness of its members'. Lloyd, Democracy and Its Rivals.

† পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় গণতন্ত্রের সফলতা সংক্রান্ত আলোচনা দেখ।

কাঠামোর মধ্যে গণতান্ত্রিক সরকারের বর্তমান রূপ কখনই চূড়ান্ত শাসন-ব্যবস্থা হিসাবে টিকিয়া থাকিতে পারে না।

***একনায়কতন্ত্র* (Dictatorship) ঃ** তত্ত্বগতভাবে দেখিলে রাজতন্ত্রও একনায়কতন্ত্র। কিন্তু বর্তমানে 'একনায়কতন্ত্র' শব্দটি সামান্য ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূক্ষ্ম অর্থে একনায়কতন্ত্র বলিতে সেই শাসন-ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে চরম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন কোন বিশেষ দলীয় একমাত্র নায়ক, উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন-প্রাপ্ত বা নির্বাচিত রাজা নহেন। এইরূপ দলীয় নায়ক সাধারণত শাসনতন্ত্রবিরোধী পদ্ধতিতেই শাসনক্ষমতা অধিকার করেন; শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রনৈতিক দলের বিলোপসাধন করিয়া নিজ দলের অপ্রতিহত নেতৃত্ব করেন। সুতরাং রাজতন্ত্রের সহিত একনায়কতন্ত্রের দ্বিতীয় পার্থক্য হইল যে, একনায়কগণের দল আছে কিন্তু রাজা সকল সময়ই দল ও রাষ্ট্রনীতির উর্ধ্বে। এইজন্য একনায়কতন্ত্রের মধ্যে গণতন্ত্রের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

একনায়কতন্ত্রের অর্থ

অনেকের মতে, একনায়কতন্ত্র একনায়কের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব অথবা তাঁহার দলের দলগত কর্তৃত্ব—উভয় ভিত্তিতেই সংগঠিত হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে দেখিলে এরূপ ধারণা পোষণ করা ভুল। একনায়কতন্ত্র কখনই ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে না—ইহা সকল সময়ই দলগত কর্তৃত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয় যদিও দলের উপর একনায়কের প্রভাব-প্রতিপত্তির তারতম্য থাকিতে পারে। ম্যাক্আইভার বলিয়াছেন, "....কোন শাসন-ব্যবস্থাতেই সর্বময় কর্তৃত্ব একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকে না....যদি আপাতদৃষ্টিতে কোথাও একমাত্র চূড়ান্ত শাসকের সন্ধান পাওয়া যায় তবে অপরিহার্যভাবে দেখা যাইবে যে, তাঁহার ক্ষমতার ভিত্তি হইল এক সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর প্রত্যক্ষ সংযোগ; তিনি এই শ্রেণীর স্বার্থেই এবং ইহার সহযোগিতাই শাসন করিয়া থাকেন।" প্রকৃতপক্ষে হিটলার ও মুসোলিনীও দলীয় নায়ক ছিলেন, তাঁহাদের কর্তৃত্বও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ছিল না।

একনায়কতন্ত্র দলীয় কর্তৃত্বের ভিত্তিতেই গঠিত হয়

তত্ত্বের দিক দিয়া একনায়কতন্ত্রকে গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা বলা যায়। একনায়কতন্ত্রে মানুষে মানুষে সাম্য, আইন-সভার প্রাধান্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের অস্তিত্ব, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহাদের পরিবর্তে দেখা যায় সুনিয়ন্ত্রিত সংখ্যালঘিষ্ঠের দ্বারা গঠিত একদলীয় শাসন, দলের উপর একনায়কের একরূপ আধিপত্য, সুকল্পিত পন্থায় জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ত ও তরবারির নীতি অনুসরণ। একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক ও সর্বশক্তিরূপে গণ্য করা হয় এবং রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ব্যক্তিজীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়। ফলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়, এবং রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায় সামগ্রিক (totalitarian) রাষ্ট্র। সামগ্রিক রাষ্ট্র হেগেলীয় রাষ্ট্র—ইহা বিশ্বে ঈশ্বরের পদক্ষেপ।* হেগেলীয় রাষ্ট্র যুদ্ধবাদী।

সামগ্রিক রাষ্ট্র ও যুদ্ধবাদ

* ১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

সুতরাং একনায়কতন্ত্রের অধীনে সামগ্রিক রাষ্ট্র যুদ্ধের পথে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই কারণেই সংঘটিত হইয়াছিল।

একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ (Reasons for the Rise of Dictatorship) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষ হইতে প্রচার করা হইয়াছিল যে এই যুদ্ধ হইল গণতন্ত্রের জন্য, পৃথিবীকে নিরাপদ করিবার জন্য যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই দেখা গেল, গণতন্ত্রের জন্য নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্ট হয় নাই, বরং গণতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে। মধ্য ইয়োরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র এবং জার্মেনী ও ইতালী সরাসরি এই আন্দোলনে সাড়া দিয়া একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল।

এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও ধারণার জগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হইল। প্রশ্ন উঠিল, সামগ্রিক রাষ্ট্রের নীতির প্রতি মানুষের বিশ্বাসের কারণ কি? গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই যে প্রতিক্রিয়া ইহার মূল সূত্র কি? ইহার উৎস কোথায়? এবং গণতন্ত্রেরই বা ভবিষ্যৎ কি? বিভিন্ন উত্তর পাওয়া গেল বিভিন্ন মহল হইতে। তন্মধ্যে একটি উত্তর বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সংক্ষেপে ইহা হইল গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা।

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় যে গণতন্ত্র প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা হইল রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র। ইহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে 'অর্থনৈতিক মুখ্যতন্ত্র' (economic oligarchy)। সুতরাং ইহা স্থিতিশীল। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্বাসের সহিত ইহা সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছে না। ফলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য, আইনের অনুশাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে দেখা দিয়াছে অপরিমেয় হতাশা, তীব্র অসন্তোষ এবং গণতন্ত্রের উৎকর্ষে প্রায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। ফলে তাহারা আজ সমাজ-ব্যবস্থাকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে চায়। ডাঃ গুচের (Gooch) মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে যখন এইরূপ মনোভাব প্রবল হইয়া উঠে তখন উদ্ভব হয় একনায়কতন্ত্রের।

গুচের এই ধারণার সমর্থন মিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের বর্তমান পরিস্থিতিতে। ফ্যাসীবাদী ইতালী, নাৎসীবাদী জার্মেনী ও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের ধ্বংসের পর আজও সামগ্রিক রাষ্ট্রের নীতি ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় নাই। অনেক দেশে আজও প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে একনায়কতন্ত্র রহিয়াছে; স্পেনের ন্যায় অনেক রাষ্ট্র এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের সামগ্রিক রাষ্ট্রের নীতিকে গ্রহণ করিয়াছে এবং এসিয়ার অনেক দেশে সামরিক একনায়কতন্ত্র (Military Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং বলা যায় যে, গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা বা নূতন সমাজ-ব্যবস্থা আনয়নে অক্ষমতাই একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ।

গণতন্ত্রের অক্ষমতা ও স্থিতিশীলতা একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ

নবপ্রবর্তনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের এই অক্ষমতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন হইল গণতান্ত্রিক পরিবেশের এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে যে-সকল দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয় সেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বা ঐতিহ্য কোনটাই ছিল না। ফলে ঐ সকল দেশের জনগণ নূতন ব্যবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। তাহারা 'নূতন কিছু' চাহিয়াছিল কিন্তু নূতন কিছু পায় নাই। এইরূপ অসন্তোষ ও আশাভংগের অবস্থায় কোন ব্যক্তি বা দল যদি নির্দিষ্ট কার্যক্রম লইয়া উপস্থিত হয় তবে তাহার বা তাহাদের পক্ষে সহজেই একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে জার্মেনীতে এইরূপই ঘটিয়াছিল; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে এসিয়ার বিভিন্ন দেশে এইরূপই ঘটিয়াছে।

গুণাগুণ: একনায়কতন্ত্রের গুণাগুণের বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নাই। একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণতন্ত্রের যাহা ত্রুটি একনায়কতন্ত্রের তাহা গুণ এবং গণতন্ত্রের যাহা গুণ একনায়কতন্ত্রের তাহা ত্রুটি। সংক্ষেপে বলা যায়, একনায়কতন্ত্রে উচ্ছৃংখল জনতার শাসনের পরিবর্তে সুযোগ্য একনায়কের সুশাসনের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে; ইহাতে দলীয় বিরোধ নাই। শাসনযন্ত্রও মন্থর গতি নহে; এবং স্থায়িত্ব ইহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে আবার এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয় বলিয়া রাষ্ট্রের আদর্শ ব্যাহত হয়; সমাজের সংহতি সাধিত হইতে পারে না; সাম্য ও স্বাধীনতা অস্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির পথ রুদ্ধ থাকে; যুদ্ধবাদের ফলে জীবন হইয়া উঠে যন্ত্রবৎ; এবং বিপ্লবের সম্ভাবনা পুঞ্জীভূত থাকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে।

একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা

উপসংহার: চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডক্টর বেনেস (Dr. Benes) বলিয়াছিলেন যে, একনায়কতন্ত্র জাতির রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের একটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থা (a passing phase) মাত্র। গুচের মতেও ইহা একরূপ অন্তর্বর্তীকালীন শাসন-ব্যবস্থা। "যে সময় পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে অথচ সম্পূর্ণভাবে নূতনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, একনায়কতন্ত্র ঠিক সেই সময়কারই শাসন-ব্যবস্থা।" সাম্প্রতিক ইতিহাস হইতে ইহাই মনে হয় যে, এইরূপ ধারণা পোষণ করা ভুল। নূতন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হইলেও একনায়কতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নূতন সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্যই একনায়কতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রয়োজন হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে, একনায়কতন্ত্র তত্ত্বগতভাবে একজনের শাসন হইলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা কোন বিশেষ দলীয় শাসন-ব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রনৈতিকদল যদি জনসাধারণকে কোন নূতন পথের সন্ধান দিতে পারে তবে ইহার পক্ষে ক্ষণস্থায়ী হইবার কোন কারণ নাই।

একনায়কত্ব ক্ষণস্থায়ী নাও হইতে পারে

একনায়কতন্ত্রের দুইটি সাম্প্রতিক রূপ (Two Modern Forms of Dictatorship): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর একনায়কতন্ত্র তিনটি প্রধান রূপে প্রকাশিত হয়—ইতালীতে ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র, জার্মেনীতে নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র এবং

রাশিয়ায় সমভোগবাদী বা সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র। ইহার মধ্যে সমভোগবাদী একনায়কতন্ত্রকে প্রচলিত অর্থে একনায়কতন্ত্র বলা যায় কিনা? এই একনায়কতন্ত্রের প্রকৃতি কিরূপ?—প্রভৃতির আলোচনা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সোবিয়েত ইউনিয়নের আলোচনা প্রসংগে করা হইয়াছে।* বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে।

ফ্যাসীবাদ (Fascism): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীতে ফ্যাসীবাদের প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা এক যুগান্তকারী ঘটনা হইলেও রাষ্ট্রের তত্ত্ব হিসাবে ফ্যাসীবাদ কোন সুশৃংখলিত দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট দল দেশে তৎকালীন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য বিভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন ধারণার সংমিশ্রণ করিয়া ফ্যাসীবাদ নামে মতবাদ প্রচার করে। সংমিশ্রিত করিলেও ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারে নাই। ফলে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে ফ্যাসীবাদ মোটেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। এখন ফ্যাসীবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ফ্যাসীবাদে রাষ্ট্রের কোন সম্পূর্ণ তত্ত্ব নাই

ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্যাসীবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল প্রকৃত সার্বভৌম এমন এক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা যে-রাষ্ট্র রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও সংঘের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে কিন্তু সর্বদাই জনসাধারণের সহিত সম্পর্কিত থাকিয়া তাহাদের ধ্যানধারণাকে প্রভাবান্বিত করিবে, তাহাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিবে এবং সর্বতোভাবে তাহাদের স্বার্থসাধন করিবে।

ফ্যাসীবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ও বৈশিষ্ট্য:

যে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র ইহা করে তাহা, মুসোলিনীর মতে, চারিটি বিষয়কে অস্বীকার করে। ইহা শান্তিবাদকে (Pacifism) অস্বীকার করে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করে, গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে এবং সমাজতন্ত্রবাদকে অস্বীকার করে।

ফ্যাসীবাদ শান্তিবাদকে অস্বীকার করে কারণ শান্তিবাদ যুদ্ধধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। মুসোলিনীর ভাষায় বলা যায়, "স্ত্রীলোকের নিকট মাতৃত্ব যেরূপ অপরিহার্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও সেইরূপ অপরিহার্য।" সুতরাং মুসোলিনীর মতে আন্তর্জাতিক শান্তি হইল "ভীরুর স্বপ্ন" এবং সাম্রাজ্যবাদ হইল "জীবনের চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম।"

১। ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র শান্তিবাদকে অস্বীকার করে

ফ্যাসীবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করে কারণ রাষ্ট্রের কর্তব্যই হইল শাসন করা, মাত্র ব্যক্তিকে সংরক্ষণ করা নয়। ব্যক্তির জীবনযাত্রার ভার ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এই ভার গ্রহণ করিবে সর্বাত্মক, সর্বশক্তিসম্পন্ন, সামগ্রিক রাষ্ট্র। এই সামগ্রিক সংস্থা বা রাষ্ট্রের বাহিরে কাহারও স্থান নাই। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সকল ব্যক্তির স্বাধীনতা ও কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়-সাধন করিবে। যদি দেখা যায়, ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয়

২। ইহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করে

* অরুণকুমার সেন প্রণীত শাসন-ব্যবস্থা দেখ।

আদর্শের বিরোধী তবে উহাদের খর্ব করিতে হইবে ; প্রয়োজন হইলে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসও করা যাইতে পারে।

৩। ইহা সমাজতন্ত্রবাদকে অস্বীকার করে

সমাজতন্ত্রবাদকে অস্বীকার করিবার কারণ হইল, ফ্যাসীবাদ এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণই সাধারণের স্বার্থের অধিকতর উপযোগী, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন নয়।

৪। ইহা গণতন্ত্রের উৎকর্ষে বিশ্বাস করে না

ফ্যাসীবাদ গণতন্ত্রের উৎকর্ষে বিশ্বাস করে না। গণতন্ত্র হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা কখনও 'সাধারণের ইচ্ছা' (General Will) নয়। অনেক সময় সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসনও অধিকতর কাম্য হইতে পারে, কারণ সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি থাকিতে পারেন একমাত্র যাঁহারাই রাষ্ট্র-কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রযন্ত্র সুপরিচালিত হয়। সুতরাং শাসনভার এরূপ ব্যক্তিসমূহের হস্তেই দিতে হইবে। কার্লাইল বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক রাষ্ট্রে শাসনকার্যের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তির সন্ধান কর ; তাঁহাকে কর্তৃত্ব ও শ্রদ্ধার উচ্চতম বেদীতে প্রতিষ্ঠিত কর ; তাঁহার পূজা কর।—তাহা হইলে সেই দেশে কাম্য ও সার্থক সরকারের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ব্যালট বাক্সের প্রয়োজন নাই, পার্লামেণ্টীয় বাগ্মিতাও নিরর্থক। ভোট প্রদান, সংবিধান প্রণয়ন প্রভৃতি সবই অপ্রয়োজনীয়। এইরূপ রাষ্ট্রই কাম্য ও আদর্শ রাষ্ট্র।" ফ্যাসীবাদী কার্লাইলের এই উক্তির পূর্ণ প্রতিধ্বনি মাত্র। গণতন্ত্রের অস্বীকার এবং নেতৃপূজা (hero worship) ফ্যাসীবাদের (নাৎসীবাদেরও) অংগীভূত।

নেতৃপূজা ফ্যাসীবাদের বৈশিষ্ট্য

ফ্যাসীবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইতালী মুসোলিনীকে পূজা করিতে থাকে এবং অতীত রোমক সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হয়। একদিন মুসোলিনী-পূজার সমাপ্তি ঘটিল কিন্তু রোমের অতীত গৌরব ফিরিয়া আসিল না।

নাৎসীবাদ (Nazism) : ফ্যাসীবাদে যদিও কিছু রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব থাকিয়া থাকে তবে নাৎসীবাদে কিছুই নাই বলা চলে। নাৎসীবাদ অন্যতম আন্দোলন মাত্র। ইহা ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মান জাতির ঐতিহ্যগত জাতীয়তাবাদের প্রকাশ। কিন্তু ইহাকে ফ্যাসীবাদের পরিবর্তিত রূপ বা ফ্যাসীবাদের জার্মান সংস্করণ বলিয়াও বর্ণনা করা চলিতে পারে। ফ্যাসীবাদের সহিত ইহার প্রধান পার্থক্য হইল যে, ইহা জাতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে, ফ্যাসীবাদ করে রাষ্ট্রের উপর। জার্মেনীতে ইহারও প্রয়োগ এবং প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে লিখিত থাকিবে।

নাৎসীবাদে কোন রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব নাই ; ইহা ফ্যাসীবাদের জার্মান সংস্করণ

জার্মান ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া নাৎসীবাদ জাতিকে স্তবস্তুতি করে এবং ইহাকে এক অতিমানবীয় সংস্থা হিসাবে গণ্য করিতে থাকে। জাতি বা সম্প্রদায় (Volk) হইল কাঁচামাল যাহা হইতে জার্মান-রাষ্ট্র উদ্ভূত হইয়াছে। যাহাতে এই জাতি শক্তিশালী

হইতে পারে তাহার জন্য সকল ব্যক্তি ও সংঘ রাষ্ট্রপাদমূলে তাহার সকল স্বার্থ ও সত্তা বিসর্জন দিবে। সুতরাং রাষ্ট্র হইবে সর্বতোভাবে হেগেলীয় রাষ্ট্র।* হেগেলীয় রাষ্ট্র সর্বাত্মক ও সর্বশক্তিসম্পন্ন। ইহার অধীনে ব্যক্তির সত্তা একরূপ বিনষ্টই হয়। ব্যক্তি জীবনের পূর্ণ সামরিকিকরণ (regimentation) এবং চিন্তাহীন ও যুক্তিহীন ভাবে নেতৃপূজা চলিতে থাকে। নাৎসী জার্মেনীতে ইহাই সংঘটিত হইয়াছিল। জার্মান জাতিকে শক্তিশালী করিবার সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা, ব্যক্তিজীবনের সম্পূর্ণ সামরিকিকরণ, ফ্যাসীবাদের অনুসরণে গণতন্ত্রের ধ্বংস এবং নেতৃপূজাই ছিল নাৎসী জার্মেনীর বৈশিষ্ট্য। হিটলারের অধীনে নাৎসী দল সোজাসুজি যুদ্ধের মহিমা প্রচার করিয়া বলিত, "বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য।" বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যুদ্ধের সহায়ক বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করিবার। জার্মান জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা, জার্মান ভাষা এবং সাহিত্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যও ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনেও জাতিকে শক্তিশালী করিবার জন্য অর্থ নৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। গণতন্ত্রকে 'নির্বোধ, বিকৃত এবং ধীরগতিসম্পন্ন' বলিয়া অভিহিত করিয়া আড়ম্বরহীনভাবে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল।

হিটলারের অধীনে জার্মান জাতির বিশ্বব্যাপী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সফল না হইলেও পশ্চিম জার্মেনীতে নাৎসীবাদ এখনও জীবিত আছে। অনেকে আশংকা করেন যে, এখান হইতেই আবার বিশ্বশান্তি-বিনাশক নাৎসী আন্দোলন গড়িয়া উঠিবে।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে। তবুও এ্যারিষ্টটল বিজ্ঞানানুমোদিতভাবেই রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেণীবিভাগ বর্তমান যুগের সহিত সংগতিবিহীন এবং অসম্পূর্ণ। উপরন্তু, ইহা রাষ্ট্রের নহে, সরকারেরই শ্রেণীবিভাগ।

সরকারেরও সন্তোষজনক শেণীবিভাগ করা কঠিন। যাহা হউক বর্তমানে তিনটি পৃথক নীতির অনুসরণ করিয়া সরকারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। নীতি তিনটি হইল: (১) সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারকারীর সংখ্যা নির্ণয়, (২) শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়, এবং (৩) শাসন-ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন। প্রথম নীতি অনুসারে সরকারকে রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র এবং গণতন্ত্রে বিভক্ত করা হয়। দ্বিতীয় নীতি অনুসারে মন্ত্রি-পরিষদ শাসিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত—সরকারের এই দুই রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তৃতীয় নীতি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখান হয়।

রাজতন্ত্র: রাজতন্ত্র চরম বা সসীম—উভয়ই হইতে পারে। সসীম রাজতন্ত্র গণতন্ত্রেরই নামান্তর। অপরদিকে চরম রাজতন্ত্র একরূপ ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হইলেও উপযোগিতার জন্য আধুনিক যুগেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু আদর্শের দিক হইতে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থাকে কখনই সমর্থন করা যাইতে পারে না।

* ১০০ এবং ২৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

অভিজাততন্ত্র : পূর্বে অভিজাততন্ত্র বলিতে বুঝাইত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের শাসন, বর্তমানে বুঝায় জনসাধারণের অপেক্ষাকৃত স্বল্প অংশের দ্বারা শাসন। স্থায়িত্ব ও দক্ষতা এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার সর্বপ্রধান গুণ হইলেও ইহা সাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া, অযৌক্তিক বলিয়া, বিকৃত হইতে পারে বলিয়া এবং রক্ষণশীল বলিয়া কাম্য গণ্য হইতে পারে না।

গণতন্ত্র : গণতন্ত্র বলিতে সরকারের রূপ বা শাসন-ব্যবস্থা ছাড়াও এক বিশেষ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং সমাজ-ব্যবস্থা বুঝাইতে পারে। যাহা হউক, সরকারের রূপের আলোচনা প্রসংগে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়। তত্ত্বের দিক দিয়া গণতন্ত্র জনসাধারণের শাসন হইলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মাত্র। তবুও ইহা সকলের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জনমত দ্বারা পরিচালিত। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা দুই প্রকারের হইতে পারে—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আজিকার বৃহৎ রাষ্ট্রে অচল। তাই বর্তমানে সকল গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। এই প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে প্রতিনিধিদের সহিত জনমতের সংযোগ বজায় রাখিবার জন্য অনেক সময় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ইহাদের মধ্যে গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative) এবং পদচ্যুতিই (Recall) প্রধান।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ : বার্কারের মতে, দুইটি প্রধান গুণের জন্য গণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা। গুণ দুইটি হইল—(১) সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভব, (২) একমাত্র এই শাসন-ব্যবস্থাতেই জনসাধারণের মানসিক উন্নতি সম্ভব। ইহার উপর বলা যায় যে, (৩) একমাত্র গণতন্ত্রেই শাসক ও শাসিতের স্বার্থে এক এবং অভিন্ন করিয়া তোলা সম্ভব ; (৪) ইহা সকলের কল্যাণসাধন করে ; (৫) ইহা দেশপ্রীতি এবং দায়িত্ববোধ গভীর করে ; এবং (৬) ইহা বিপ্লবের আশংকা হইতে অনেকাংশে মুক্ত।

অপরদিকে কিন্তু গণতন্ত্র (ক) অজ্ঞ ও অক্ষমের শাসন, (খ) ক্ষণভংগুর এবং (গ) অবৈজ্ঞানিক ধারণা বলিয়া অভিযুক্তও হইয়াছে। অভিযোগগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে গণতন্ত্রের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির নির্দেশ করা যায় : (১) গণতন্ত্র অক্ষম ও অশিক্ষিতের শাসন ; (২) গণতান্ত্রিক নেতৃবর্গ নিম্নস্তরের ; (৩) ইহা রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা ; (৪) গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক ; (৫) দলপ্রথার জন্য ইহা ত্রুটিপূর্ণ ; (৬) ইহা ক্ষণভংগুর ; (৭) গণতান্ত্রিক সভ্যতা নিম্নস্তরের ; (৮) গণতন্ত্র পুঁজিবাদের প্রশ্রয় দেয়।

গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে : গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন (১) গণতান্ত্রিক জনসাধারণের ; (২) গণতান্ত্রিক পরিবেশ স্থষ্টির ; এবং (৩) গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ : গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করা কঠিন। তবে ইহা বলা যায় যে, বর্তমানের পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যে ইহা টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

একনায়কতন্ত্র : একনায়কতন্ত্র বলিতে একজনের শাসন বুঝাইলেও ইহা দলীয় কর্তৃত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রের অক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতাই একনায়কতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ। একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণতন্ত্রের ন্যায় ইহাতে দলীয় বিরোধ নাই। শাসনযন্ত্রও মন্থরগতি নহে। কিন্তু ইহা সাম্য ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে এবং রক্ত ও তরবারির নীতি অনুসরণ করিয়া মানুষের জীবনকে যন্ত্রবৎ করিয়া তুলে। ফলে বিপ্লবের সম্ভাবনাও থাকে পুঞ্জীভূত।

একনায়কতন্ত্রের সাম্প্রতিক দুইটি রূপ হইল (১) ফ্যাসীবাদ, এবং (২) নাৎসীবাদ।

প্রশ্নোত্তর

1. How would you classify forms of government. (C. U. 1951)

(২১৮-২২০ পৃষ্ঠা)

2. Estimate strength and weakness of modern Democracy as a form of government. Do you think that Democracy will survive ? [C. U. 1943, '48, '49]

[ইংগিত : গুণ :—গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার নিম্নলিখিত গুণের উল্লেখ করা হয় : (১) সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্রেই সম্ভব ; (২) একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনেই জনসাধারণের মানসিক উন্নতি সম্ভব ; (৩) অনেকের মতে, গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা কারণ ইহা শাসিতকে শাসক করিয়া সর্বাংগীণ মংগলসাধন করে ; (৪) গণতন্ত্র দেশপ্রীতি ও দায়িত্ববোধ গভীর করে ; (৫) ইহা অনেকাংশে বিপ্লবের আক্রমণ হইতে মুক্ত। ত্রুটি :— গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে-সমস্ত অভিযোগ আনয়ন করা হয় তাহা হইল এই : (১) গণতন্ত্র অক্ষম, অশিক্ষিতের শাসন কারণ ঐ শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় বেশী ; (২) ইহা রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা কারণ অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে নূতন নূতন আবিষ্কার বা ধ্যানধারণা বিশেষ সাড়া জাগাইতে পারে না ; (৩) গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ নিম্নস্তরের ; (৪) গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক ; (৫) দলপ্রথার জন্য দলগত স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুফল দৃষ্ট হয় ; (৬) গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান, (৭) গণতান্ত্রিক সভ্যতাকে নিম্নস্তরের বলা হয়, (৮) পশ্চিমী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদের প্রশ্রয় দেয়।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে আশ্রয় না করিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। বর্তমানে পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও সফলতার প্রধান সর্তকে তত্ত্বগততভাবে স্বীকার করিলেও বাস্তবক্ষেত্রে উহাকে বিশেষভাবে কার্যকর করিতে সমর্থ হয় নাই।···এবং ২৩০-২৩৫ এবং ২৩৬-২৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

3. What conditions are required for the successful operation of Democracy ? Indicate the merits and defects of such a form of government. (C. U. 1955)

(২৩৫-২৩৬ এবং ২৩০-২৩৫ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the aims and ideals of Totalitarian States. How far do these ideals differ from those of Democratic States ? (C. U. 1944)

(২৩৮-২৩৯, ২৪০ পৃষ্ঠা)

5. Distinguish between Democracy and Dictatorship. (C. U. 1960)

(২২৪-২২৭ এবং ২৩৮-২৩৯ পৃষ্ঠা)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদ এবং সরকারের রূপ

(SEPARATION OF POWERS AND FORMS OF GOVERNMENT)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির ভিত্তিতেই মন্ত্রি-পরিষদ শাসিত বা পার্লামেণ্টীয় এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের এই দুই রূপের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি (Principle of Separation of Powers): এ্যারিষ্টটলের সময় হইতে এ-বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে একরূপ মতৈক্য পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে যে, সরকারের কার্যাবলী প্রধানত তিন শ্রেণীর—যথা, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য, শাসন বা আইন প্রবর্তন সংক্রান্ত কার্য এবং বিচার সংক্রান্ত কার্য।

সরকারের ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ

এই তিন প্রকার কার্য পরিচালনার জন্য সরকারী ক্ষমতাকেও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা। সাধারণত এই তিন প্রকার ক্ষমতা ব্যবহার বা কর্ম পরিচালনার জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ আছে—আইন বিভাগ (Legislature), শাসন বিভাগ (Executive) এবং বিচার বিভাগ (Judiciary)। আইন বিভাগের কার্য আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশ করা; শাসন বিভাগের কার্য এই আইনগুলিকে বলবৎ করা; এবং বিচার বিভাগের কার্য আইনের ব্যাখ্যা করা ও প্রচলিত আইনকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা—অর্থাৎ আইনভংগকারীর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

সংক্ষেপে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি কাহাকে বলে

সংক্ষেপে যে-নীতি অনুসারে সরকারের তিন শ্রেণীর কার্য বা ক্ষমতা এই তিন বিভাগ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত বা ব্যবহৃত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় তাহাকেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বলে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আইন প্রণয়ন ব্যাপারে ব্যবস্থা বিভাগ, আইন প্রবর্তন ব্যাপারে শাসন বিভাগ এবং বিচার সম্পর্কিত ব্যাপারে বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রদানের নীতিই হইল ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি। অন্য এক দিক দিয়া দেখিলে ইহা হইল কোন বিভাগের পক্ষে নিজস্ব গণ্ডি ছাড়াইয়া অপর বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সহিত আর একটি মতবাদ বিশেষভাবে জড়িত আছে। ইহাকে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের মতবাদ (Theory of Checks and Balances) বলা হয়। সংক্ষেপে মতবাদটিকে এইভাবে বিবৃত করা যায়ঃ প্রত্যেক বিভাগ নিজস্ব ক্ষমতা এরূপভাবে ব্যবহার করিবে যে, যেন ইহা অপর দুইটি বিভাগকে

নিয়ন্ত্রণ করিয়া শাসনযন্ত্রে ভারসাম্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের মতবাদ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতির একরূপ বিরোধী। কারণ, এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিলে প্রত্যেক বিভাগেরই স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হয় কিন্তু প্রকৃত অর্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বলিতে বুঝায় যে, এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা অন্য বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি

ক্ষমতা বা কর্ম স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকে অনেক সময় কর্মকর্তাদের স্বতন্ত্রিকরণের (separation of personnel) অর্থেও ব্যবহার করা হয়। বলা হয় যে, একই ব্যক্তি ব্যবস্থা বিভাগ বা আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ—একটির অধিকের সহিত জড়িত থাকিবে না। এই প্রসংগে অবশ্য ল্যাস্কি বলেন, যদিও ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বলিতে কর্মকর্তাদের স্বতন্ত্রিকরণ বুঝায় বলিয়া একরূপ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে তবুও এইরূপ মনে করিবার কোন সংগত কারণ নাই। যাহা হউক উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের তিন প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে: (১) সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবে না; (২) একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে না; এবং (৩) সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা উহার কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। এখন দেখা প্রয়োজন এই তিন অর্থের কোন্‌টিতে কি পর্যন্ত ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ইহা কতদূর প্রযুক্ত হওয়া কাম্য। কিন্তু তাহার পূর্বে দেখা প্রয়োজন ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্যের আলোচনায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের আলোচনা করিতে হয়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের তিন প্রকার অর্থ

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে এ্যারিষ্টটল হইতে স্বরু করিতে হয়। কারণ, ইহা বলা হইয়াছে যে, এ্যারিষ্টটলের রচনাতেই সরকারের কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে প্রথম ইংগিত পাওয়া যায়।

এ্যারিষ্টটল সরকারী কার্যাবলীকে নীতি-নির্ধারণমূলক (deliberative), শাসনমূলক (magisterial) এবং বিচারমূলক (judicial)—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এইভাবে কর্মবিভাগ করিলেও তিনি কর্মকর্তাদিগকে স্বতন্ত্র করেন নাই। কর্মকর্তাদিগকে স্বতন্ত্র করার উদ্দেশ্যও তাঁহার ছিল না; তিনি দৃষ্টি দিয়াছিলেন মাত্র শাসনকার্যের স্থপরিচালনার প্রতি। শাসনকার্য স্থপরিচালনার জন্য তিনি রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষেত্রে অন্যতম অর্থ নৈতিক স্থত্র কর্মবিভাগ বা শ্রমবিভাগের (division of labour) প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করিয়াছিলেন মাত্র।

এ্যারিষ্টটল কর্তৃক সরকারের কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ

এ্যারিষ্টটলের পর প্রাচীন রোমে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। রোমান দার্শনিক পলিবিয়াস (Polybius) এবং সিসেরো (Cicero) ইহা আলোচনা করিয়া নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির পরিস্ফুটন করেন। মধ্যযুগে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ

এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি—উভয়ই একরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ইহার নূতন রূপদানের সূচনা করেন ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক বোদাঁ (Bodin)। এ্যারিষ্টটলের ধারণা অনুসারে সরকারী কার্য তিন শ্রেণীভুক্ত হইলেও একই ব্যক্তি একাধিক শ্রেণীভুক্ত কার্য পরিচালনা করিতে পারিত। বোদাঁ ইহার তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, অন্তত শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইবে; না হইলে ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পূর্ণ মূল্যহীন হইয়া পড়িবে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ধারণাকে মতবাদে পরিণত করেন মন্টেস্কু

বোদাঁর পর হ্যারিংটন (James Harrington) এবং লক ইহার আলোচনা করেন। কিন্তু বোদাঁর আরব্ধ কার্য সমাপ্ত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর আর একজন ফরাসী দার্শনিক—মন্টেস্কুর দ্বারা। মন্টেস্কু (Montesquieu) স্বাধীনতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করিয়া ইহাকে মতবাদে পরিণত করেন। বস্তুত, মতবাদ হিসাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ একরূপ মন্টেস্কুর নামের সহিত জড়িত।

মন্টেস্কু ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সমসাময়িক। চতুর্দশ লুই-এর চরম স্বেচ্ছাচারিতার ফলে ফ্রান্সে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল বলা চলে। একবার ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে আসিয়া মন্টেস্কু ঐ দেশের স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ে একরূপ অভিভূত হইয়া পড়েন। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণই হইল ইংল্যাণ্ডে স্বাধীনতার অস্তিত্বের হেতু। এই সিদ্ধান্ত হইতে পরে তিনি স্বাধীনতার সর্বপ্রধান রক্ষাকবচ হিসাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদের সৃষ্টি করিয়া ইহার প্রচার করেন।

মন্টেস্কু ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির কল্পনা করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। কোন কালেই ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের পদ্ধতিতে সংগঠিত হয় নাই। তবুও ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ সম্বন্ধে মন্টেস্কুর মতবাদ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং বহু বিপ্লবী জনসাধারণের নিকট ইহা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মন্টেস্কুর নামের সহিত বিশেষভাবে জড়িত হইলেও ইহার পরিস্ফুটন প্রসংগে অন্তত আর একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নামোল্লেখ করিতে হয়। ইনি হইলেন ইংরাজ আইনানুগ ব্ল্যাকষ্টোন (Blackstone)। একরূপ সম্পূর্ণভাবে মন্টেস্কুকে অনুসরণ করিলেও ব্ল্যাকষ্টোন স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকে আরও পরিস্ফুট করেন।

ব্ল্যাকষ্টোনের আলোচনা

ম্যাডিসনের সুপ্রচলিত উক্তি

কিন্তু স্বাধীনতার স্বার্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষিপ্ত অথচ বিশেষ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে ম্যাডিসনের (Madison) একটি উক্তিতে। উক্তিটি হইল: "একই হস্তে সর্ব ক্ষমতার সমন্বয়কে......স্বেচ্ছাচারিতার সংজ্ঞা বলিয়াই অভিহিত করা যাইতে পারে।"*

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগ: বলা হইয়াছে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বহু বিপ্লবী জনসাধারণ কর্তৃক স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসাবে গৃহীত হয়। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের গণপরিষদ ঘোষণা করে যে, যে-দেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি গৃহীত হয় নাই সে-দেশে শাসনতন্ত্রই নাই। আমেরিকান বিপ্লবীরাও এই নীতিকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং ইহা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অনুকরণে প্রণীত মেক্সিকো আর্জেন্টিনা ব্রেজিল চিলি প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রেও ইহা গৃহীত হয়। কিন্তু ইয়োরোপে ফ্রান্স ছাড়া অন্য দেশে এই মতবাদ বিশেষ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই।

সমালোচনা: অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহার পর হইতেই ইহার প্রভাব কমিয়া আসিতে থাকে এবং ইহা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সমালোচিত হইতে থাকে। বর্তমানে অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সরকারের কার্যাবলীকে ঠিক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় না। ঠিক কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় সে-সম্বন্ধে এই শ্রেণীর সমালোচকেরা একমত নহেন। গুডনাউ (F. J. Goodnow), জেংকস্ (Jenks) প্রভৃতির মতে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে ব্যবস্থা ও শাসন—সরকারের এই দুইটি বিভাগ আছে কারণ সরকারের কার্য মূলত দুই প্রকারের—যথা, আইন প্রণয়ন ও আইনানুসারে শাসন করা। এই শ্রেণীবিভাগে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের অংশ বলিয়াই গণ্য করা হয়। অপর একদল লেখকের মতে, সরকারের কার্যাবলীকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। সুতরাং সরকারের বিভাগও হইল সংখ্যায় পাঁচটি—তিনটি বা দুইটি নহে। এই পঞ্চ বিভাগের সমর্থকগণ নির্বাচকমণ্ডলীকে সরকারের অন্যতম বিভাগ বলিয়া এবং 'শাসন বিভাগ'কে একটির পরিবর্তে দুইটি বিভাগ বলিয়া গণ্য করেন। ইঁহাদের মতে, শাসন বিভাগের কর্মকর্তৃগণকে শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারিগণের সহিত একই শ্রেণীভুক্ত করা উচিত নয়—কারণ কর্মকর্তাদের কার্য নীতি-নির্ধারণ এবং সাধারণ কর্মচারীদের কার্য নীতির প্রয়োগ।

ক। ভিত্তির দিক হইতে সমালোচনা

মূল ভিত্তির দিক দিয়া এই সমালোচনা ছাড়াও ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি প্রয়োগ এবং উপযোগিতার দিক দিয়াও সমালোচিত হইয়াছে। প্রয়োগক্ষেত্রে দেখা যায় কোন সরকারই ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের

* "The accumulation of all powers...in the same hands...may justly be pronounced the very definition of tyranny..."

ভিত্তিতে সংগঠিত হয় নাই। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে এই বিভাগগুলি পরস্পরের সহিত অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেকটি এমন সকল কার্য সম্পাদন করে যাহা ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের সূক্ষ্ম নীতি অনুসারে অপর বিভাগের কর্তব্য। ইংল্যাণ্ডের ন্যায় পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার কথা ছাড়িয়া দিয়া (কারণ এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকে একরূপ অস্বীকার করে বলিয়া ইহাতে বিভিন্ন বিভাগের স্বতন্ত্র কর্ম নাই) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের—যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ একরূপ পবিত্র নীতি বলিয়া স্বীকৃত—শাসন-ব্যবস্থা অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, এক বিভাগ অপর বিভাগের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চতন পরিষদ সিনেটের রাষ্ট্রপতি প্রভৃতিকে বিচার করিবার ক্ষমতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা একরূপ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিলে অসম্মতি প্রদানের ক্ষমতা ছাড়াও বর্তমানে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের নিকট বাণী (message) প্রেরণ করিয়া আইন প্রণয়ন কার্যে অংশগ্রহণ করেন। এবং অপরদিকে কংগ্রেস, বিশেষ করিয়া সিনেট সভা, সন্ধি নিয়োগ প্রভৃতি অনুমোদন করিয়া শাসন বিভাগের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যবস্থা বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিবার প্রচেষ্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সফল হয় নাই।*

খ। প্রয়োগের দিক হইতে সমালোচনা:

উপরন্তু, বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থাতেই হউক আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারেই হউক সরকারের এক বিভাগ অপর বিভাগের কার্য সম্পাদন না করিয়া পারে না। সুতরাং এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য সম্পাদন করিবে না এই অর্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কখনও সূক্ষ্মভাবে প্রযুক্ত হয় নাই; বর্তমানে তা হইতেই পারে না।

১। সকল শাসন-ব্যবস্থাতেই এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য করিয়া থাকে

সরকারের এক বিভাগ অপর বিভাগের কার্য সম্পাদন করে বলিয়া একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত হইতে হয়। সুতরাং দ্বিতীয় অর্থেও—অর্থাৎ এক ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত হইবে না এই অর্থে—ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের সূক্ষ্ম প্রয়োগ সম্ভব নয়।

২। এক ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িতও থাকে

সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগকে কোনরূপে নিয়ন্ত্রণ করিবে না—এই অর্থেও কোন রাষ্ট্রেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের পূর্ণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। তত্ত্বের দিক দিয়া সরকারের তিনটি বিভাগ সমক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া মানিয়া লইলেও ব্যবস্থা বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। ব্যবস্থা বিভাগ বর্তমানে সকল দেশেই শাসন

৩। এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণও করে

* এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 'শাসন-ব্যবস্থা'য় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা দেখ।

বিভাগকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এই প্রকার নিয়ন্ত্রণই পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার মূলসূত্র। অপরদিকে আবার শাসন বিভাগ (মন্ত্রি-পরিষদ বা ক্যাবিনেট) আইনসভা ভাঙিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া ব্যবস্থা বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা রাষ্ট্রপতির নিয়োগ, সন্ধি প্রভৃতি অনুমোদন করিতে এবং তাঁহার অনুমোদিত কার্য করিতে অস্বীকার করিয়া শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রপতিও আইনসভা বা কংগ্রেস কর্তৃক প্রেরিত বিলে সম্মতি প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। আবার বিচার বিভাগের হস্তে আইনের বৈধতা-অবৈধতা ঘোষণা করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে বলিয়া ইহাও ব্যবস্থা বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই যে, কোন অর্থেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কোন অর্থেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের পুর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহাকে কাম্য বলিয়া গণ্য করা চলিতে পারে না। সরকার শাসনযন্ত্র বলিয়া বর্ণিত হইলেও ইহা যন্ত্র নহে—ইহা মানুষ লইয়া গঠিত। ইহার কার্যক্ষমতা নির্ভর করে বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতার উপর। বিভিন্ন বিভাগকে যদি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয় তবে সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতার পথই প্রশস্ত করা হয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল ইহা উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তিত থাকিলে প্রত্যেক বিভাগ নিজস্ব ক্ষমতা সংরক্ষণেই ব্যস্ত থাকিবে এবং কখনই অপর বিভাগগুলিকে সাহায্য করিবে না। ইহার ফলে শাসনকার্যে দক্ষতার যে-অভাব ঘটিবে তাহা এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের সুফল কখনই পূরণ করিতে পারিবে না। ব্ল্যাকষ্টোনও ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রিকরণ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পুঞ্জীভূত হওয়ার মতই অশুভ ফল প্রসব করিতে পারে। ম্যাক্‌আইভার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, দেখিতে হইবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ফলে দায়িত্বশীলতা হইতে দক্ষতা যেন বিদায় গ্রহণ না করে।

গ। উপযোগিতার দিক হইতে সমালোচনা :
১। ইহা কাম্য নহে

উপরন্তু, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসাবে দেখা ভুল। ইতিহাসের দিক দিয়া মণ্টেস্কু ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছেন। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের জন্য নহে—ইহার অভাবেই তৎকালীন ইংল্যাণ্ডে স্বাধীনতা বিরাজমান ছিল। স্বাধীনতা নির্ভর করে সমাজ-ব্যবস্থার উপর। সরকার জাতীয় সমাজ বা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার যন্ত্রমাত্র। যদি জাতীয় সমাজের উদ্দেশ্য হয় সকলকে স্বাধীনতা প্রদান করা, তবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই কার্য করিবে। কিন্তু ইহা যদি সাধারণের স্বাধীনতা হরণ করিয়া কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি করিতে চায় তবে সরকারের পক্ষে এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ স্বাধীনতার মূলমন্ত্র নহে

রাষ্ট্রীয় সমাজ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা বা আত্মোপলব্ধির সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিলেই ইহা সংরক্ষিত হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু সংরক্ষণের উপায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নহে। স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ হইল জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ ও ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্র আবেগ।* সুতরাং স্বাধীনতা সমাজ-ব্যবস্থার স্বরূপ ও জনগণের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল—ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উপর নহে। এই সত্য উপলব্ধি করার ফলে বর্তমানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের মাত্র আংশিক প্রয়োগ সমর্থন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই আংশিক প্রয়োগ বলিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাই বুঝায়।

বর্তমানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের মাত্র আংশিক প্রয়োগ সমর্থিত হয়

উপসংহার: ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ অতীতের ধারণা। গণতন্ত্র কর্তৃক ইহা অতীত হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। স্বৈরাচারিতার বিনাশসাধন করিয়া জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় যে-সকল রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা সৃষ্ট হয় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ তন্মধ্যে অন্যতম। কিন্তু জনগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর মতবাদ হিসাবে ইহা আর সমর্থন করা যায় না। বিভিন্ন বিভাগের স্বাতন্ত্র্য জনকল্যাণের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। সুতরাং বিশেষ করিয়া ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের মোহ ক্রমশ অন্তর্হিত হইতেছে। বার্কার বলেন, "ইহা অবশ্যম্ভাবীরূপে অন্তর্হিত হইবে।"

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের মোহ ক্রমশ দূর হইতেছে

সংক্ষিপ্তসার

ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণ নীতির ভিত্তিতেই মন্ত্রি-পরিষদ শাসিত এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি: যে নীতি অনুসারে সরকারের তিন প্রকার কার্য—আইন প্রণয়ন, শাসন-পরিচালনা এবং বিচার ব্যবস্থা—তিনটি বিভাগ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় তাহাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বলে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতির সহিত নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিও বিশেষভাবে জড়িত।

বর্তমানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের তিন প্রকার অর্থ করা হয়: (১) সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবে না; (২) একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে না; (৩) সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা উহার কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।

ইতিহাসের দিক দিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদের সূত্রপাত করেন এ্যারিষ্টটল। কিন্তু মতবাদটি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক মণ্টেস্কুর নামের সহিতই বিশেষভাবে জড়িত।

সমালোচনা—ভিত্তির দিক দিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, সরকারের কার্যাবলী তিন শ্রেণীর নহে বলিয়া সরকারও তিনটি বিভাগ লইয়া গঠিত নহে।

---

* ২০৬-২০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রয়োগের দিক হইতে দেখান যায় যে, (১) সকল শাসন-ব্যবস্থাতেই এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য করিয়া থাকে, (২) এক ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িতও থাকে, (৩) এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণও করে। সুতরাং কোন অর্থেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বাস্তব ক্ষেত্রে সত্য নহে।

উপযোগিতার দিক হইতে বলা যায় যে, (১) ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ কাম্য নহে, (২) ইহা স্বাধীনতার মূলমন্ত্রও নহে।

এই সকল কারণে বর্তমানে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ছাড়া আর কোন প্রকারে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের দাবি করা হয় না। বস্তুত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের মোহ ক্রমশ দূর হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. "The strict separation of powers is not only impracticable as a working principle of government, but also it is not one to be desired in practice." Discuss.
(C. U. 1941, '48) (২৪৬-২৪৭ এবং ২৪৯-২৫২ পৃষ্ঠা)

2. Explain the theory of separation of powers. How far has this theory been translated into practice in Great Britain, India and the U. S. A. ? (C. U. 1949)

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের ইংগিত : গ্রেটব্রিটেন ও ভারতে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত। পার্লমেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ থাকে। সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ব্রিটেনে আবার বিচার বিভাগও স্বতন্ত্র নহে। লর্ড সভা একাধারে আইনসভার কক্ষ এবং যুক্তরাজ্যের (U. K.) প্রধান আপিল আদালত। অপরদিকে ভারতে শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ হইতে পৃথক নহে যদিও বা ভারতীয় সংবিধানে এই দুই বিভাগকে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত…এবং ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা ও এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই তিনটি রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা দেখ।]

3. How far is it possible and desirable to carry out the principle of Separation of Powers in the Governmental Organisation of a State ?
(C. U. 1958) (২৪৬-২৪৭ এবং ২৪৯-২৫২ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the value and limitation of the Doctrine of Separation of Powers.
(C. U. 1959) (২৪৬-২৪৭ এবং ২৪৯-২৫২ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the Doctrine of Separation of Powers. How far has it been translated into practice in India, the U. S. A. and the U. K. ?
(C. U. 1961) (২৪৬-২৪৭, ২৪৯-২৫২ পৃষ্ঠা এবং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনটি রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা দেখ।)

চতুর্দশ অধ্যায়

পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

(PARLIAMENTARY AND PRESIDENTIAL GOVERNMENTS)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগ অনুসারে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারসমূহকে পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। পার্লামেণ্টীয় সরকারে তত্ত্বগতভাবে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকে এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে তত্ত্বগতভাবে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বিদ্যমান থাকে।

***পার্লামেণ্টীয় বা মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকার* (Parliamentary or Cabinet Government) :** পার্লামেণ্টীয় বা মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার আলোচনা করিতে গিয়া প্রথম যে-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিতে হয় তাহা হইল নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য। অন্যভাবে বলিতে গেলে, এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় আইনত যাঁহার হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে এবং যাঁহার নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয় কার্যক্ষেত্রে তিনি ক্ষমতার ব্যবহার বা শাসনকার্য পরিচালনা করেন না। তিনি নামে মাত্র কর্তৃত্বের অধিকারী। এইজন্য তাঁহাকে নামসর্বস্ব শাসক (Titular Head) বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক (Constitutional Head) বলা হয়। নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রকৃত শাসক বা মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। পরামর্শের বাহিরে যাইবার ক্ষমতা তাঁহার একরূপ নাই বলিলেই চলে। ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণী, ভারত ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি, প্রভৃতি হইলেন এইরূপ নিয়মতান্ত্রিক শাসকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইঁহাদের সকলেই রাষ্ট্রপ্রধান (Head of the State), কিন্তু সরকারের মধ্যে প্রধান নহেন। ইঁহাদের সকলেই "জাতির প্রতীক, কিন্তু জাতিকে শাসন করেন না।"* ইঁহাদের পদের মর্যাদা আছে, কিন্তু কর্তৃত্ব নাই ; সুতরাং দায়িত্বও নাই।

পার্লামেণ্টীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য : ১। নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য

দায়িত্ব রহিয়াছে প্রকৃত শাসকবর্গের বা মন্ত্রিগণের ; এবং এই দায়িত্ব হইল ব্যবস্থা বিভাগের নিকট। বস্তুত, নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য পার্লামেণ্টীয় সরকারের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইলেও ব্যবস্থা বিভাগের নিকট মন্ত্রিবর্গের দায়িত্বশীলতাই এই প্রকার শাসন-

২। মন্ত্রিবর্গের দায়িত্বশীলতা

* They are "the symbols of nations ; but they do not rule the nations."

ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইজন্য ইহাকে দায়িত্বশীল সরকারও (Responsible Government) বলা হয়।

৩। দায়িত্বশীলতার যৌথ প্রকৃতি

ব্যবস্থা বিভাগের নিকট মন্ত্রিবর্গের দায়িত্ব হইল যৌথ দায়িত্ব (collective responsibility)। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে সরকারী নীতি ও কার্যপরিচালনার জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। এইজন্য এই দায়িত্বকে মন্ত্রিবর্গের না বলিয়া 'মন্ত্রি-পরিষদে'র বলিয়া অভিহিত করা উচিত। বর্তমানে ব্যবস্থা বিভাগ বা আইনসভার নিকট মন্ত্রি-পরিষদের দায়িত্বশীলতা বলিতে দ্বি-কক্ষসমন্বিত আইনসভার নিম্নতন বা জনপ্রিয় কক্ষের নিকটই দায়িত্বশীলতা বুঝায়। মন্ত্রিসভার কার্যকাল নির্ভর করে আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষের আস্থার উপর। এই আস্থা হারাইলে নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিবাহিত হইবার পূর্বেই মন্ত্রি-পরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়। আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সরকারী বিলের বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি দ্বারা সর্বদা মন্ত্রি-পরিষদের দায়িত্বকে কার্যকর করিতে সচেষ্ট হয়—অর্থাৎ এই সকল পদ্ধতির সাহায্যে সর্বদা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে।* পার্লামেণ্ট বা আইনসভার প্রাধান্য এইভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া ইহাকে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা বলে।

পার্লামেণ্টীয় সরকার কেন বলা হয়

অপরদিকে আবার প্রকৃত শাসকবর্গ বা মন্ত্রিগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্য হইতেই মনোনীত হন বলিয়া মন্ত্রি-পরিষদও আইনসভাকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ করে। মন্ত্রিগণই সরকারের পক্ষ হইতে বিল, প্রস্তাব প্রভৃতি উত্থাপন করেন, ব্যয়ের জন্য অর্থমঞ্জুর দাবি করেন, ইত্যাদি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধি বলিয়া আইনসভা তাঁহাদের এই সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আইনসভা ও মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে মতের বিশেষ পার্থক্য থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রীর আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষকে ভাঙিয়া দিবার ক্ষমতাও থাকে। প্রধান মন্ত্রীর এই ক্ষমতা শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রি-পরিষদ কর্তৃক ব্যবস্থা বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার অন্যতম প্রধান উপায় হিসাবে গণ্য হয়। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে উপরি-বর্ণিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার মূলভিত্তি। অন্যভাবে বলিতে গেলে, পার্লামেণ্টীয় সরকারে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকে প্রয়োগ করা হয় না।

৪। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

বলা হইয়াছে যে, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রি-পরিষদও আইনসভাকে 'অল্পবিস্তর' নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ নির্ভর করে দলীয় ব্যবস্থার (party system) উপর। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে—যেখানে দ্বি-দল-ব্যবস্থা (bi-party system) প্রবর্তিত আছে সেখানে এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ বিশেষ ব্যাপক।

* এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 'শাসন-ব্যবস্থা'য় ব্রিটেনের ও ভারতের শাসন-ব্যবস্থা দেখ।

ভারতের ন্যায় দেশে যেখানে বিশেষ একটি মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকে সেখানেও এই নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে কার্যকর করা যাইতে পারে। কিন্তু ফ্রান্সের ন্যায় যেখানে বহুদল-ব্যবস্থা (multi-party system) থাকে সেখানে কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে না। ফলে নিয়ন্ত্রণও কার্যকর হয় না বলিলেই চলে। মন্ত্রি-পরিষদের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে ল্যাস্কি পার্লামেণ্টীয় সরকারসমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা, (১) ব্রিটেনের ধরনের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা যেখানে মন্ত্রি-পরিষদ পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, এবং (২) ফ্রান্সের ধরনের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা যেখানে পার্লামেণ্ট মন্ত্রি-পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

পার্লামেণ্টীয় সরকারের ল্যাস্কি-প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ

জেনিংস (Jennings), ম্যারিয়ট (Marriot) প্রভৃতি লেখকগণ পার্লামেণ্টীয় সরকারের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করিয়াছেন। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য হইল প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব ও বিরোধী দলের অস্তিত্ব। মন্ত্রি-পরিষদ প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়া সংঘবদ্ধভাবে কার্য করে এবং যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে। বিরোধী দলের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জেনিংসের ভাষায় বলা যায় যে, ইহা "পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য অংগ।"* এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ না থাকায় বিরোধী দলই সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারিতার পথে প্রতিবন্ধকের কার্য করিয়া গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

৫। প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব

৬। বিরোধী দলের অস্তিত্ব

গুণাগুণ: পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল যে, ইহা ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করে। সরকারের এই দুই বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকিলে তবেই শাসন সুশাসন হইয়া উঠিতে পারে।

গুণ: ১। ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা থাকে

দ্বিতীয়ত, এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসকবর্গ আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন বলিয়া গণতন্ত্র বা সাধারণের শাসনের স্বরূপ বজায় রাখা সম্ভব হয়। আইনসভায় প্রতিনিধিগণ সর্বদা জনমতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করেন। শাসকবর্গকেও জনপ্রতিনিধিদের মতামত অনুসারেই চলিতে হয়। উভয়ের মধ্যে গভীর মতানৈক্য ঘটিলে আইনসভা ভাঙিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণের মতামত গ্রহণ করিতে হয়। এইভাবে জনগণ কর্তৃক শাসন পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ একরূপ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে বলা চলে।

২। সাধারণের শাসনের স্বরূপ বজায় থাকে

সময়ের সহিত সামঞ্জস্যবিধানের ক্ষমতা এইপ্রকার সরকারের আর একটি গুণ। বেজহট (Bagehot) এই গুণের বর্ণনা বিশেষভাবে করিয়াছেন। কোন মন্ত্রি-পরিষদ

* The "Opposition is not just a nuisance to be tolerated, but is a definite and essential part of the constitution."

নির্দিষ্ট কালের জন্য কার্যভার গ্রহণ করিলেও যে-কোন সময় ইহার স্থলে অপর এক মন্ত্রি-পরিষদকে অধিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্তনও যে-কোন সময় করা যাইতে পারে। অনেক সময় এইরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। অনেকের মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চেম্বারলেনের পরিবর্তে চার্চিলকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করা রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের দিক দিয়াই প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহজ ও সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এই পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সরকার রাষ্ট্রপতি-শাসিত হইলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে প্রধান শাসকের এইরূপ পরিবর্তন আইনসংগত পদ্ধতিতে কোনরূপেই করা যাইত না। ফলে জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারিত।

৩। সময়ের সহিত সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার অপেক্ষা পার্লামেণ্টীয় সরকারে অধিকতর রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাবিস্তারের সুযোগ রহিয়াছে। দলীয় ব্যবস্থা ব্যতিরেকে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা চলিতে পারে না। দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকায় এবং যে-কোন সময় নির্বাচনের সম্ভাবনা থাকায় সর্বদাই দলীয় প্রচারকার্য চলিতে থাকে। ইহাতে জনসাধারণ শাসন সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হয় এবং তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে।

৪। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার হয়

পরিশেষে বলা যায় যে, কোন দেশ রাজতন্ত্রকে বজায় রাখিয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে সেই দেশের পক্ষে পার্লামেণ্টীয় সরকারই প্রকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা।

৫। রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সংগতিসাধন সম্ভব

সাধারণভাবে মার্কিন দেশবাসীদের নিকট পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা বিশেষভাবে দায়িত্বহীন বলিয়া মনে হয়। তাহাদের মতে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের অভাবে এক বিভাগের নিকট অন্য এক বিভাগের দায়িত্বশীলতা মূল্যহীন কল্পনা মাত্র।

ত্রুটি : ১। অনেকে ইহাকে দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন

দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে, আইনসভার সদস্যপদ মন্ত্রিগণের শাসনকার্য পরিচালনায় বিঘ্নের সৃষ্টি করে। সিজ্‌উইককে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রী যদি আইনসভায় পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেই ব্যস্ত থাকেন, তবে পররাষ্ট্র দপ্তর পরিচালনা করিবার সময় কখন পাইবেন ?

২। ইহাতে শাসনকার্য পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে

সরকারের পরিবর্তনশীলতাকে এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি হিসাবে নির্দেশ করা হয়। সুশাসনের জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসৃত সরকারী নীতি; এবং ইহার জন্য প্রয়োজন হইল সরকারের স্থায়িত্ব। কিন্তু স্থায়িত্ব পার্লামেণ্টীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য নহে। সুতরাং এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সুশাসনও নিয়ম না হইয়া ব্যতিক্রম হইয়া উঠিতে পারে।

৩। সরকারের পরিবর্তনশীলতা ত্রুটি হিসাবে দেখা দিতে পারে

দক্ষতার দিক দিয়াও পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার সমালোচনা করা হইয়াছে।

৪। দক্ষতার দিক দিয়া সমালোচনা

মন্ত্রি-পরিষদ জননেতাদের লইয়া গঠিত হয়। জননেতৃবৃন্দ জনগণের মনোহরণে পটু হইতে পারেন, কিন্তু শাসনকার্যে যে দক্ষ হইবেন ইহার কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই। বরং নির্বাচকগণকে লইয়া তাঁহাদের সকল সময়েই ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে শাসনকার্যে অপটু হইবার সম্ভাবনাই অধিক রহিয়াছে।

বহুশাসক লইয়া গঠিত মন্ত্রি-পরিষদের শাসন বিপদকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনে বিশেষ উপযোগী নয় বলিয়াই অভিযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ মন্ত্রি-পরিষদ দেশকে এরূপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে এই অভিযোগ বর্তমানে একরূপ গুরুত্বহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

পার্লামেণ্টীয় সরকারের দলীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হওয়ার আশংকা সর্বদা রহিয়াছে বলিয়াও অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিরোধিতা এই শাসন-ব্যবস্থার মূল নীতি। বর্তমানে দলীয় শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা এরূপ কঠোরভাবে অনুসৃত হয় যে, প্রতিনিধিবর্গের পক্ষে দলীয় নীতি ও কার্যকে সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ফলে মন্ত্রি-পরিষদের সম্মুখে

৫। নয়া স্বৈরাচার

স্বৈরাচারিতার প্রশস্ত পথ পড়িয়া থাকে। লর্ড হিউয়ার্ট (Lord Hewart) ইহাকে 'নয়া স্বৈরাচার' (New Despotism) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কয়েক ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে পার্লামেণ্টীয় সরকারের সমালোচনা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমানে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতাই কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তবুও ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের দিক হইতে পার্লামেণ্টীয় সরকারের সমালোচনা করা হইয়াছে। এই শাসন-ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসৃত

অভিযোগের সমালোচনা

কোন নীতির সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া যে-অভিযোগ করা হইয়াছে তাহাও ভিত্তিহীন। সরকারী নীতি হইল সমাজ-ব্যবস্থা ও জনগণের ধ্যানধারণার প্রতিফলন। সমাজ-ব্যবস্থা ও ধ্যানধারণা অপরিবর্তিত থাকিলে যে-দলই শাসনভার গ্রহণ করুন না কেন সরকারী নীতি অপরিবর্তিত থাকিবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ব্রিটেনের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি দীর্ঘকাল অনুসৃত বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির সন্ধান সহজেই করা যাইতে পারে। বিপদকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনে পার্লামেণ্টীয় সরকারের অক্ষমতার অভিযোগ যে মূল্যহীন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

***রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার* (Presidential Form of Government) :** রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের

পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া থাকে। এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের চরম কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রের পতি ও শাসন বিভাগের কর্তা। নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসকের পদ বলিয়া রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে কিছু নাই। রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করিবার জন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ থাকে। কিন্তু মন্ত্রিগণ তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র, তাঁহার সহকর্মী নহেন। মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না; আইনসভার নিকট তাঁহারা দায়িত্বশীলও নহেন। তাঁহাদের দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট। তত্ত্বানুসারে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই শাসনক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য : ১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ

২। রাষ্ট্রপতি একাধারে নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসক ;

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ভিত্তিতে সংগঠিত বলিয়া রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকলাপের জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকা আইনসভার আস্থার উপর নির্ভর করে না। তিনি জনসাধারণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে সংবিধানভংগ (violation of the constitution) অথবা দুর্নীতিমূলক কার্য ছাড়া অন্য কোন কারণে পদচ্যুত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব হইল জনসাধারণের নিকট। কিন্তু পুনর্নির্বাচন অবধি এই দায়িত্ব কার্যকর করিবার কোন উপায় নাই।

৩। তাঁহার দায়িত্ব জনসাধারণের নিকট

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ অন্তত তত্ত্বগতভাবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিতে পারে না; আইন প্রণয়ননির্ভর করে ব্যক্তিগত ও দলগত উদ্যোগের উপর। সুতরাং রাষ্ট্রপতির বিরোধী দল যদি আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তবে শাসন-ব্যবস্থায় বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে—কারণ শাসন বিভাগ যে-আইন প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে আইনসভা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে। শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ব্যতীত কল্যাণকর আইন প্রণীত হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ অল্প থাকে। আইনসভায় রাষ্ট্রপতির বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে এই সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিতই হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলিতেও এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।

গুণাগুণ : রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ও পার্লামেণ্টীয় সরকারকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার দুই বিপরীত রূপ বলিয়া অভিহিত করা চলে। সুতরাং পার্লামেণ্টীয় সরকারে যে দুর্বলতাগুলি পরিলক্ষিত হয় তাহা রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে দেখা যায় না। পরিবর্তনশীলতা পার্লামেণ্টীয় সরকারের অন্যতম দুর্বলতা কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার এই দুর্বলতা হইতে মুক্ত। স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এই শাসন-ব্যবস্থার কয়েকটি গুণের নির্দেশ করা হয়—যথা, অনুসৃত নীতি ও কার্যধারার মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্নতা থাকে; শাসকবর্গ নির্বাচনী প্রচারকার্য

গুণ : ১। স্থায়িত্ব ইহার প্রধান গুণ

চালানো অপেক্ষা শাসনকার্যের প্রতি অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে পারেন; দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসৃত নীতি ও কর্মধারার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বাড়ে; ইত্যাদি।

২। অনেকের মতে, ইহাতে শাসন ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা অতি অল্প

দ্বিতীয়ত, আমেরিকানদের অধিকাংশের মতে, এই ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ কারণ ইহাতে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা একরূপ নাই বলিলেই হয়। স্বতন্ত্র ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে উভয় বিভাগই পরস্পরের দ্বারা কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে পারে।

৩। ইহা জরুরী অবস্থায় বিশেষ কার্যকর

তৃতীয়ত, বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসন বিভাগের চরম কর্তৃত্ব এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া এই ব্যবস্থা জরুরী অবস্থার পক্ষে বিশেষ কার্যকর। রাষ্ট্রপতির কোন সহকর্মী নাই; সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি কাহারও সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য নহেন। সুতরাং তিনি যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য করিতে পারেন পার্লামেণ্টীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

৪। ইহা বহুদলীয় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের সমর্থকগণ আরও বলেন, যে-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বহু দল ও বিভিন্ন স্বার্থ আছে সেই দেশের পক্ষে ইহাই হইল প্রকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা। বহু দল থাকিলে কোন নির্দিষ্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না, ফলে শাসনযন্ত্রও দুর্বল হইয়া পড়ে।

ত্রুটি ঃ

অপরদিকে, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের ত্রুটি বা দুর্বলতাগুলিও বিশেষ প্রকট। পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা যে যে দিক দিয়া সমর্থিত হইতে পারে ঠিক সেই সেই স্থলেই নিহিত রহিয়াছে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের দুর্বলতা। পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এইরূপ সংঘর্ষের উদাহরণ বহু সংখ্যায় রহিয়াছে। সুতরাং মার্কিন দেশবাসীরা যে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে এই দুই বিভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা নাই বলিয়া মনে করে, তাহা ভুল। ইহাতে বিরোধের সম্ভাবনা বিশেষভাবেই রহিয়াছে। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া কুশাসনের আশংকাও রহিয়াছে।

১। ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনার ফলে কুশাসনের আশংকা রহিয়াছে

২। ইহাতে স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনাও বর্তমান

দ্বিতীয়ত, এই শাসন-ব্যবস্থায় স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা অধিক মাত্রায় বর্তমান। রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা বিভাগের নিকট দায়িত্বশীল নহেন; তাঁহার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট। কিন্তু এই দায়িত্ব কার্যকর করার কোন উপায় নাই। সুতরাং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংবিধান বিরোধী বা নীতি-বিগর্হিত কোন কার্য না করিয়াও রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণভাবে স্বৈরাচারিতার পথে চলিতে পারেন। ইহাতে প্রতিবন্ধকতার

সৃষ্টি করিবার কোন উপায় নাই। এইজন্য ইয়োরোপীয়দের নিকট এই শাসন-ব্যবস্থা স্বৈরাচারী, দায়িত্বহীন ও বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয়।

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় একমাত্র মন্ত্রি পরিষদই আইন প্রণয়নকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে এই কার্যের জন্য আইনসভা কমিটিতে সংগঠিত হয়। এক একটি কমিটি এক এক প্রকার আইন প্রণয়নকার্য পরিচালনা করে। সুতরাং আইন প্রণয়নের দায়িত্বও বিভক্ত হইয়া যায়। দায়িত্ব বিভক্ত হওয়ায় দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই কারণে ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে, পার্লামেণ্টীয় সরকারের অন্তত একটি গুণ আছে যে, ইহাতে দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় মোটেই কঠিন হয় না।

৩। ইহাতে দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন

এইরূপ কমিটি-ব্যবস্থার দ্বারা আইন প্রণয়নের আর একটি ত্রুটি হইল যে, ইহাতে জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা আঞ্চলিক এবং বিশেষ বিশেষ স্বার্থের দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়।

৪। ইহাতে জাতীয় স্বার্থের প্রতি সম্যক দৃষ্টি দেওয়া হয় না

পরিশেষে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এইপ্রকার শাসন-ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ আবার দুই বিভাগের উপর সম্পূর্ণ প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে। বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার ব্যাখ্যার ভার বিচার বিভাগের হস্তে ন্যস্ত বলিয়া ইহা সকল ব্যাখ্যা নিজের অনুকূলে করিয়া ধীরে ধীরে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপই ঘটিয়াছে। বিচার বিভাগের এই প্রাধান্য সুশাসনের অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয়।

৫। ইহাতে বিচার বিভাগের প্রাধান্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়

উপসংহার: বর্তমানে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রতি আগ্রহ বিশেষ একটা দেখা যায় না। তাই নবগঠিত রাষ্ট্রসমূহ পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করিতেছে। তবে ইহা বলা যায় যে, এই সকল নয়া রাষ্ট্রের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে কতকটা স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রদান করিবার দিকে ঝোঁক দেখা গিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগ অনুসারে গণতান্ত্রিক সরকারসমূহকে পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। পার্লামেণ্টীয় সরকার: পার্লামেণ্টীয় সরকার মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকার নামেও অভিহিত। ইহাতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়: ১। নামসর্বস্ব এবং প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য ; ২। ব্যবস্থা বিভাগের নিকট প্রকৃত শাসক বা মন্ত্রিবর্গের যৌথ দায়িত্ব ; ৩। ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ; ৪। প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব ; এবং ৫। বিরোধী দলের অস্তিত্ব।

গুণ—এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার গুণ হিসাবে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করিতে পারা যায়: ১। ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার ফলে সুশাসন সম্ভব হয় ; ২। শাসনকার্য জনমত অনুসারে পরিচালিত হয় বলিয়া গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে ; ৩। সময়ের সহিত

সামঞ্জস্যবিধান সম্ভবপর হয় ; ৪। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে ; ৫। রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে সংগতিসাধন সম্ভব হয়।

ত্রুটি—১। অনেকে ইহাকে দায়িত্বশীল নহে, দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থা বলিয়াই মনে করেন ; ২। আইনসভার সদস্যপদ মন্ত্রিগণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটায় ; ৩। এইরূপ সরকার স্থায়ী নহে বলিয়া সুশাসন ব্যাহত হইতে পারে ; ৪। মন্ত্রিগণ জননেতা বলিয়া শাসনকার্যে মনোনিবেশ করিবার বিশেষ সুযোগ পান না ; ৫। দলীয় নিয়মানুবর্তিতার জন্য মন্ত্রিগণ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন।

উপরি-উক্ত সমালোচনার অনেকগুলিই অবশ্য অযৌক্তিক। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমানে ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা কাম্য বলিয়াই বিবেচিত হয় ; তবুও এই দিক দিয়া পার্লামেন্টীয় সরকারের সমালোচনা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার : ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগের মধ্যে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে এই প্রকার সরকার সংগঠিত হইয়া থাকে। ১। বস্তুত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ হইল ইহার প্রথম বৈশিষ্ট্য ; ২। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসক বলিয়া কিছু নাই। রাষ্ট্রপতি একাধারে নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসক ; ৩। রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকলাপের জন্য একমাত্র জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল, আইনসভার নিকট নহে।

গুণ—১। স্থায়িত্ব এই প্রকার সরকারের প্রধান গুণ ; ২। অনেকের মতে, এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় শাসন ও ব্যবস্থা বিভাগ পরস্পরের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে পারে বলিয়া সুশাসন সম্ভব হয় ; ৩। শাসন বিভাগের চরম কর্তৃত্ব একমাত্র রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত বলিয়া এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা জরুরী অবস্থায় বিশেষ কার্যকর ; ৪। ইহা বহুদলীয় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা।

ত্রুটি—১। ব্যবস্থা ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনার ফলে কুশাসনের আশংকা রহিয়াছে ; ২। রাষ্ট্রপতি আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন বলিয়া স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন ; ৩। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নকার্য কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলিয়া আইন প্রণয়নের দায়িত্ব নির্ণয় করা কঠিন ; ৪। ঐ কারণেই আবার আইন প্রণয়নকারিগণকে জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে দেখা যায় ; ৫। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের জন্য বিচার বিভাগ ধীরে ধীরে অপর দুই বিভাগের উপর নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া লয়।

উপসংহার : বর্তমানে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রতি বিশেষ একটা ঝোঁক দেখা যায় না।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the essential features of the Cabinet form of government ? How does the legislature exercise control over the executive in such a form of government ?

(C. U. 1956)

[ইংগিত : নিম্নলিখিতগুলি হইল পার্লামেন্টীয় বা মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য : (১) নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য ; (২) মন্ত্রিবর্গের দায়িত্বশীলতা ; (৩) দায়িত্বশীলতার যৌথ প্রকৃতি ; এবং (৪) ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক। ইহা ছাড়াও (৫) প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব ও (৬) বিরোধী দলের অস্তিত্বকে আরও দুইটি লক্ষণ হিসাবে নির্দেশ করা যায়।

মন্ত্রি-পরিষদ অর্থাৎ শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল বলিয়া নিয়ন্ত্রিত থাকে। অনাস্থা প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সরকারী বিলের বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি দ্বারা আইনসভা শাসন বিভাগকে (মন্ত্রি-পরিষদকে) নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।...এবং ২৫৪-২৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।]

পঞ্চদশ অধ্যায়

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

(UNITARY AND FEDERAL GOVERNMENTS)

আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টন বর্তমান বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাকে ইহাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলিয়াও অভিহিত করা যায়। দেখা যায় যে, অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রত্যেক বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রে একটি জাতীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার এবং কতকগুলি আঞ্চলিক সরকার রহিয়াছে।

আঞ্চলিক ক্ষমতা-বণ্টনের কারণ

রাষ্ট্রের বৃহদায়তনই এইরূপ ক্ষমতা বণ্টনের একমাত্র কারণ নহে। অন্যান্য কারণ হইল বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থের অস্তিত্ব, স্বায়ত্তশাসনের আকাংক্ষা, গণতান্ত্রিক আদর্শ ও রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার, ইত্যাদি। বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া আঞ্চলিক সরকার হইতেই সম্ভব হয়। ইহাতে একাধারে ব্যয় ও সময় সংক্ষেপ হয়। উপরন্তু, এই প্রকার ব্যবস্থার দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনগণের স্বায়ত্তশাসনের আকাংক্ষাও পূর্ণ হয়। এই বিভিন্ন কারণের ফল দাঁড়াইয়াছে সরকারী ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন।

আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের দুইটি পদ্ধতি--
১। বিকেন্দ্রিকরণ
২। ক্ষমতা বণ্টন

প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন ঘটিতে পারে। প্রথম পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র অনুসারে সমগ্র ক্ষমতা জাতীয় সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে, এবং জাতীয় সরকার নিজের সুবিধামত আঞ্চলিক সরকারসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের হস্তে কতকগুলি ক্ষমতা অর্পণ করে। এইরূপ ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রিকরণ (decentralisation) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র দ্বারাই জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহ সৃষ্ট হয় এবং ইহার দ্বারাই উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত (distribution) হয়। প্রথম পদ্ধতি অনুসৃত হইলে শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক (Unitary) এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসৃত হইলে ইহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা **(Unitary Government)ঃ** এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার সমগ্র শাসনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বা জাতীয় সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। নিজের সুবিধামত আঞ্চলিক সরকারসমূহ সৃষ্টি এবং উহাদিগকে ক্ষমতা প্রদান করা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার অন্যভাবে এই প্রাধান্য প্রয়োগ করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে ইহা আঞ্চলিক সরকারসমূহকে পুনর্গঠিত করিতে পারে, উহাদের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে—এমনকি উহাদের অস্তিত্বের বিলোপসাধন করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যের এইরূপ সর্বতোমুখী প্রকাশের জন্য স্ট্রং (C. F. Strong) বলিয়াছেন যে, শাসনতন্ত্র অনুসারে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একটি মাত্র সরকার ও একটি মাত্র আইনসভা আছে। ইহারা হইল কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় আইনসভা।* এই কারণে ডাইসি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে "একই কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা আইনগত সর্বপ্রধান কর্তৃত্বের স্বাভাবিক ব্যবহার"** বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সমগ্র শাসনক্ষেত্রে কেন্দ্রের পূর্ণ প্রাধান্য এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এই দুই এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণ লইয়া এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ বুঝানো যাইতে পারে। ব্রিটেনে যে-সকল আঞ্চলিক সরকার বা স্থানীয় সরকার আছে তাহাদের অনেকগুলি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠিলেও তাহাদের সকলই পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা স্বীকৃত; কতকগুলি আবার এই পদ্ধতিতেই সৃষ্ট। এই সকল আঞ্চলিক সরকার বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিলেও সকলেই কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত। পার্লামেণ্ট চরম কর্তৃত্বের অধিকারী বলিয়া ইহা যে-কোন সময়ে স্থানীয় সরকারগুলির পুনর্গঠন এবং উহাদের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে; উহাদের বিলোপসাধনও করিতে পারে। অগ (F. A. Ogg) বলেন যে, ব্রিটেনে স্থানীয় সরকারসমূহের বিষয় যাহাই বলা হউক না কেন, ইহাদের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ গভীর ও ব্যাপক। ফ্রান্সের সম্পর্কে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণই স্থানীয় সরকারসমূহের পরিচালনার মূল সূত্র। সেখানে সকল স্থানীয় সরকারই আভ্যন্তরীণ মন্ত্রি-দপ্তরের (Ministry of the Interior) সহিত এরূপভাবে সংযুক্ত যে সরকারের কেন্দ্রীভূত রূপ উপলব্ধি করিতে বিশ্লেষণের মোটেই প্রয়োজন হয় না। অগের ভাষায় বলিতে পারা যায়, ফ্রান্সে, "প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র সরকার আছে, এবং ইহা হইল কেন্দ্রীয় সরকার।"

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ

---

* "The essence of a unitary State is that the power of the Central Government is unrestricted, for the constitution...does not admit any other law-making body than the central one."

** "The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power."

গুণাগুণ ঃ সমগ্র দেশব্যাপী নীতি, আইন ও শাসন পরিচালনায় অখণ্ডতা হইল এককেন্দ্রিক সরকারের প্রধান গুণ। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় একই আইন দুই বার প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না; বিভিন্ন সরকার প্রণীত আইনের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনাও নাই। একটি মাত্র সরকার থাকায় শাসনযন্ত্র জটিল ও বিরাট হইয়া উঠে না। ফলে ব্যয়াধিক্যের সম্ভাবনাও কম থাকে।

গুণ :
১। আইন, নীতি ও শাসন পরিচালনায় অখণ্ডতা

নীতি, আইন ও শাসন পরিচালনায় অখণ্ডতা থাকায় এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় দৃঢ়তা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। বৈদেশিক নীতি অনুসরণের পক্ষে এবং সংকটজনক সময়ে এই দৃঢ়তা বিশেষভাবে উপযোগী।

২। শাসন-ব্যবস্থায় দৃঢ়তা

আরও বলা যায় যে, এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা বিশেষভাবে সুপরিবর্তনীয়। ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনমত বিভিন্ন আঞ্চলিক সরকার গঠন করিতে পারে, তাহাদের হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিতে পারে, অর্পিত ক্ষমতা ফিরাইয়া আবার লইতে পারে, আঞ্চলিক সরকারসমূহের অস্তিত্বের অবসানও ঘটাইতে পারে। বর্তমানে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থায় এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনশীলতা উহার উৎকর্ষের নির্দেশক।

৩। ইহার সুপরিবর্তনীয়তা উৎকর্ষের নির্দেশক

কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা তত্ত্বগতভাবে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারসমূহ সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল থাকে। এই তত্ত্বাবধান ও নির্ভরশীলতার জন্য স্থানীয় উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ফলে জাতীয় জীবনও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

ত্রুটি :
১। ইহা স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে

এক দিক দিয়া এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে সুশাসনের অন্তরায় হিসাবেও গণ্য করা যায়। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ অনেক ক্ষেত্রে প্রতি পদে আঞ্চলিক সরকারসমূহের কার্যপরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে সকল আঞ্চলিক সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়া উঠে না। ফলে সমস্যা-গুলির সমাধান আঞ্চলিক স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হইতে পারে।

২। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সুশাসনের অন্তরায়

উপসংহার ঃ কোন শাসন-ব্যবস্থাই সকল অবস্থার উপযোগী নহে, কিন্তু প্রত্যেক শাসন-ব্যবস্থাই কোন-না-কোন বিশেষ অবস্থার উপযোগী। সুতরাং এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা বিশেষ এক ক্ষেত্রের উপযোগী হইতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণের মতে, ইহা ভৌগোলিক ও জাতিগত (ethnic) ঐক্যসমন্বিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা

বিশেষভাবে জাগ্রত হয় নাই ইহা সেখানেও সফল হইতে পারে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, সুশাসনই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার শেষ কথা নহে ; স্বায়ত্ত-শাসনও অন্যতম গণতান্ত্রিক আদর্শ। ইহাকে প্রধানত গণতান্ত্রিক আদর্শ হিসাবেও গণ্য করা চলে। সুতরাং উপযোগিতার কারণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে সমর্থন করা গেলেও গণতান্ত্রিক আদর্শের দৃষ্টিকোণ হইতে সর্বব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রাধান্যকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। এইজন্যই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকেই সকল ক্ষেত্রে কাম্য বলিয়া মনে করেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Federal Government) ঃ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের প্রাধান্যের পরিবর্তে লিখিত সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। এই লিখিত সংবিধানই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক বা আংগিক সরকারসমূহের সৃষ্টি করে এবং উভয়ের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন (distribution) করিয়া দেয়। ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা বণ্টিত হয় বলিয়া কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের কেহ কাহারও অধীন থাকে না। উভয়ে নিজ নিজ এলাকায় সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিয়া পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে।* সুতরাং এই শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রের মত আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতাও মৌলিক ক্ষমতা ; ইহার কোনরূপ পরিবর্তনসাধন বা হ্রাসবৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমে সংবিধানের পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে।

সংক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয় কিরূপে? (How does a Federation come into being?): এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা উভয়ই বর্তমান জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল।

স্ট্রং-এর মতে, ইতিহাসের দিক দিয়া রাষ্ট্রসমূহ দুইটি পদ্ধতিতে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে দেখা যায়। প্রথম পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি (integration by absorption) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এই পদ্ধতিতে হয় যুদ্ধের ফলে বিজিত রাষ্ট্র বিজেতা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল, না-হয় পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় ভাব এইরূপ প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। এই পদ্ধতিতে বর্তমানের সকল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইলেও নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ফলে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে উদ্ভব হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের। এই পদ্ধতিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি (federal method) বলা যায়। স্ট্রং

* "By the federal principle I mean the method of dividing powers so that general and regional are each, within a sphere, coordinate and independent." K. C. Wheare, Federal Government

ইহাকে একীভূত হওয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি (integration by federation) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধ্যাপক ডাইসিকে অনুসরণ করিয়া এই যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির বর্ণনা করা যাইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি

ডাইসির মতে, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য দুইটি অবস্থার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রয়োজন হয়ঃ (ক) পাশাপাশি অবস্থিত এমন কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থাকিবে যাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে সহজেই একটি জাতীয় ভাব পরিলক্ষিত হইবে; (খ) এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিবে কিন্তু মিলিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে চাহিবে না।*

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে ডাইসির মত

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য ডাইসি-প্রদত্ত উপরি-উক্ত সর্ত দুইটির বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রথম প্রয়োজনীয় অবস্থা হইল কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য। ভৌগোলিক সান্নিধ্য ব্যতিরেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য সাধিত হইতে পারে না এবং জাতীয় ঐক্যসাধন না হইলে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবও ঘটে না। দ্বিতীয়ত, এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়গত এরূপ ঐক্য থাকিবে যে, তাহাদের মধ্যে একটা স্পষ্ট জাতীয় ভাব পরিলক্ষিত হইবে। তৃতীয়ত, জাতীয় ভাবের জন্যই তাহারা জাতীয় ঐক্যসাধনে সচেষ্ট হইবে—অর্থাৎ পরস্পারের সহিত মিলিত হইতে বিশেষভাবে আকাংক্ষিত হইবে। চতুর্থত, পরস্পরের সহিত মিলনের আকাংক্ষা করিলেও তাহারা মিলিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে চাহিবে না—অর্থাৎ মিলিত হওয়ার পরও তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চাহিবে।

ডাইসি-প্রদত্ত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ : ১। ভৌগোলিক সান্নিধ্য

২। জাতীয় ভাব

৩। মিলনের স্পৃহা

৪। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার ইচ্ছা

এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নবগঠিত জাতীয় রাষ্ট্রে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখে। এই প্রকার জাতীয় রাষ্ট্রই যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্যের আকাংক্ষা এবং আপন রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার ইচ্ছা—এই দুই মনোভাবের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসংগে তাই ডাইসি (Dicey) উক্তি করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র হইল জাতীয় ঐক্য ও শক্তির সহিত অংগরাজ্যের অধিকারের সমন্বয়সাধনের রাষ্ট্রনৈতিক উপায়।** এই সমন্বয়সাধনের পদ্ধতি হইল দুই প্রকার সরকারের মধ্যে সংবিধানের সাহায্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া। যাহা সাধারণ বা জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হয়; আর যে-সকল বিষয় অংগরাজ্যগুলির স্বার্থের সহিত অধিক জড়িত তাহা অংগরাজ্যগুলির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

* "They must desire union but not unity."

** "A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of 'state rights'."..."It is a union without unity"

বর্তমান লেখকদের মধ্যে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক হোয়ারও (Prof. K. C. Wheare) যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দুইটি সর্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যখন কতকগুলি রাষ্ট্র বা জনসম্প্রদায় কতিপয় বিষয় সম্পর্কে একই সাধারণ সরকারের অধীনে সম্মিলিত হইতে চায় এবং অপরাপর বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র আংগিক সরকার সংগঠিত করিতে চায় তখনই যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়। অর্থাৎ ইহারা মিলন চাহিলেও সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যাইতে চায় না।* এখন প্রশ্ন হইল কি কারণে এই মিলনের জন্য সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রসমূহ আকাংক্ষিত হয় আবার কি কারণেই বা এই মিলনের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে ইচ্ছা করে? মিলনের প্রেরণা বিভিন্ন কারণের জন্য আসিতে পারে। হোয়ারের মতে, বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, মিলনের সাহায্যে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগের আকাংক্ষা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে কোন-না-কোন প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক একই রাষ্ট্রের অধীনে মিলিত হইবার মনোভাব সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। এগুলি সকলই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে কার্য করিয়াছে। হোয়ার বলেন যে এগুলি ব্যতীত ঐক্যের মনোভাব সৃষ্টির আশা করা যায় না। সুতরাং এগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সর্ত হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অধ্যাপক হোয়ার ভাষা, ধর্ম, উদ্ভব, জাতীয় মনোভাব প্রভৃতি বিষয়গত ঐক্যকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিতে রাজী নন। তাঁহার যুক্তির সমর্থনে কানাডা ও সুইজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, ঐ দেশগুলিতে ভাষা ও উদ্ভবগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সর্ত সম্পর্কে অধ্যাপক হোয়ারের অভিমত

মিলিত হইবার আকাংক্ষার কারণ

ইহা গেল এক দিকের চিত্র। এখন দেখা যাউক মিলনের আকাংক্ষার সংগে আবার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা জড়িত থাকে কোন্ কারণে। অধ্যাপক হোয়ারকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, এ-বিষয়ে কোন ধরাবাঁধা কারণের নির্দেশ করা যায় না। বহুবিধ কারণ আছে যাহার মধ্যে যে-কোন একটির জন্য সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রসমূহ মিলন চাহিলেও সংগে সংগে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে চাহিতে পারে। যেমন, আংগিক রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে পৃথক উপনিবেশ বা রাষ্ট্র হিসাবে আপন স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিয়া আসিয়া নূতন অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিতে চায় না। আবার রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত থাকিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ব্যবধান স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে। পৃথক জাতীয় মনোভাবও স্বতন্ত্র থাকিবার প্রেরণা যোগাইতে পারে। ভাষাগত, উদ্ভবগত ও ধর্মগত পার্থক্যের প্রভাবও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। সর্বশেষে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার

স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার মনোভাবের কারণ

* Communities or States must desire to be united, but not to be unitary.

বিভিন্নতার জন্য স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার ইচ্ছা হইতে পারে। এই প্রসংগে অধ্যাপক হোয়ার আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের গঠনের উপযোগী সকল বিষয় থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্ভব না হইতে পারে। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত নেতৃত্বের। সুতরাং সর্বশেষে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে কিনা তাহা নির্ভর করিবে নেতৃত্বের প্রকৃতির উপর।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা

ডাইসি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য যে-শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাকে কেন্দ্রাভিগামী (centripetal) শক্তি বলিয়া অভিহিত করা হয়। জাতীয় ঐক্যসাধন করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিলে কেন্দ্রাভিগামী শক্তি কার্য করে। এই কেন্দ্রাভিগামী শক্তির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় যে, কেন্দ্রাভিগামী শক্তির পরিবর্তে কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) শক্তির কার্যের ফলেও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হইতে পারে। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র সুশাসনের সম্পূর্ণ উপযোগী না হওয়ায় অথবা এইরূপ রাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রবল হওয়ায় এইরূপ রাষ্ট্রকে ভাঙিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়। ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালের শাসনপদ্ধতিতে এই দ্বিতীয় পন্থাতেই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। সংবিধান দ্বারা প্রদেশগুলির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার দ্বারাই কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছিল। ডাইসি এইভাবে কেন্দ্রাতিগ শক্তির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সহিত পরিচিত ছিলেন না। ফলে ইহার উল্লেখ করেন নাই। বরং যুক্তরাষ্ট্রকে 'এককেন্দ্রিকতার পথে অন্যতম পর্যায়' (a stage on the road to unity) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহার মতে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রই হইল পরিণতি; যুক্তরাষ্ট্র ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র। যে-সকল রাষ্ট্র বর্তমানে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে, পরে তাহারা স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিবে—এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। কিন্তু 'যখন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ভাঙিয়া যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করা হইতেছে তখন আর যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রিকতার পথে অন্যতম পর্যায় বলিয়া অভিহিত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রের গতি এককেন্দ্রিকতার দিকে নহে; ইহা ক্ষণস্থায়ী অবস্থাও নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় দুই শতাব্দীতেও এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থাতে পরিণত হয় নাই। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়াতেও এককেন্দ্রিক সরকার গঠিত হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্র ক্ষণস্থায়ী অবস্থা হইতে পারে না, কারণ মানুষ একবার ক্ষমতার আস্বাদ পাইলে সহজে উহা হস্তান্তরিত করিতে চাহে না।*

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব ও পরিণতি সম্বন্ধে ডাইসির ধারণার সমালোচনা

* "..men who have once tasted power will not, without conflict, surrender it." Laski

যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সমবায় (Federation and Confederation) : ইতিহাসের দিক দিয়া ষ্টং রাষ্ট্রসমূহের মিলনের যে দুইটি পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতিতে রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে। এই অন্যান্য পদ্ধতির অন্যতম হইল কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি। চুক্তির ফলে এক রাষ্ট্র-সমবায়ের (Confederation) উদ্ভব হইতে পারে।

রাষ্ট্র-সমবায়ের হল-প্রদত্ত সংজ্ঞা

অধ্যাপক হল (Hall) রাষ্ট্র-সমবায়ের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন : ইহা হইল "বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে কতক পরিমাণে তাহাদের কার্যের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য বিসর্জন দিতে সম্মত হইয়াছে এরূপ কতকগুলি রাষ্ট্রের সমবায়।"* অন্যভাবে বলিতে গেলে, রাষ্ট্র-সমবায় হইল সন্ধির ফলে উদ্ভূত কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমবায় বা সংঘ। এই স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি নূতন এক কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার হস্তে কিছু কিছু ক্ষমতা অর্পণ করে। নব-সংগঠিত কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া। প্রত্যেক প্রতিনিধি তাঁহার নিজের রাষ্ট্রের নির্দেশ মত কেন্দ্রীয় সংগঠনে ভোটদান, ইত্যাদি কার্য করিয়া থাকেন।

সমবায়ী রাষ্ট্রগুলি তাহাদের আইনগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে বলিয়া রাষ্ট্র-সমবায় গঠনের ফলে কোন নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় না। হল বলিয়াছেন, তাহারা তাহাদের

রাষ্ট্র-সমবায়ে নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় না

কার্যের স্বাধীনতা কতক পরিমাণে যে চিরকালের জন্য বিসর্জন দেয় তাহাও সম্পূর্ণ ঠিক নহে। রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্র-সমবায়ে সমবায়ভুক্ত থাকাকালীন কিছু পরিমাণে কার্যের স্বাধীনতা বিসর্জন দেয় মাত্র। যে-কোন রাষ্ট্র যে কোন সময় রাষ্ট্র-সমবায় পরিত্যাগ করিতে পারে। ইহাতে আইনসংগত প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিতে পারা যায় না। সমবায়ের বাহিরে আসিলেই তাহারা কার্যের পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে। সুতরাং তাহারা কার্যের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য বিসর্জন দেয় না, অস্থায়ীভাবে দেয় মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্র-সমবায়ের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে যুক্তরাষ্ট্রের

যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সমবায়ের মধ্যে তুলনা

ফলে নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায়ের গঠনের ফলে কোন নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র-সমবায়ে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয় জাতীয় ঐক্যসাধন বা সুশাসনের জন্য।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র-সমবায় চুক্তির ফলে উদ্ভূত হয়; ইহা কোনরূপ আইনসংগত সংস্থা নহে। চুক্তির মর্যাদা রক্ষা হইবে কিনা তাহা একরূপ সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে বিভিন্ন সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির ইচ্ছার উপর। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত। ইহা আইনসংগত সংস্থা। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মর্যাদা অংগরাজ্যগুলির

* "A confederation is a union of..states which consent to forego *permanently* a part of their liberty for certain specific objects."

ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নহে। সংবিধানই চরম আইন। কেন্দ্রীয় বা অংগরাজ্যগুলির কোন সরকার ইহাকে কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারে না।

চতুর্থত, রাষ্ট্র-সমবায় কোন আইনসংগত সংস্থা নহে বলিয়া যে-কোন সমবায়ী রাষ্ট্রের পক্ষে যে-কোন সময় ইহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা সম্পূর্ণ আইনানুমোদিত। কিন্তু একমাত্র সোবিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে কোন অংগরাজ্যের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা আইনানুমোদিত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। ১৮৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, অংগরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিবার কোন অধিকার নাই।

পরিশেষে, সমবায়ী রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্র-সমবায় পরিত্যাগ করিবার অধিকার থাকায় রাষ্ট্র-সমবায় সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির এই অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় স্থায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও শক্তি-মৈত্রী (Federation and Alliance) **ঃ** চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র-সমবায় গঠনের পরিবর্তে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ সংগঠনকে শক্তি-মৈত্রী (Alliance) বলিয়া অভিহিত করা হয়। শক্তি-মৈত্রী সাধারণত আক্রমণমূলক (offensive) বা প্রতিরক্ষামূলক (defensive) উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার শক্তির সমতা (balance of power) রক্ষার জন্যই শক্তি-মৈত্রী গঠিত হয়। অর্থাৎ, কোন একটি শক্তি-মৈত্রী গঠিত হইলে পার্শ্ববর্তী অপরাপর রাষ্ট্র নিজেদের দুর্বল মনে করিয়া আর একটি শক্তি-মৈত্রী গঠন করিতে পারে।

শক্তি-মৈত্রীর স্বরূপ

শক্তি-মৈত্রীর ইতিহাসে ফ্রান্সের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তি-মৈত্রীর সাহায্যেই ফ্রান্স ইয়োরোপে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ফ্রান্সে একটি ব্যাপক শক্তি-মৈত্রী ব্যবস্থা সংগঠিত করিয়াছিল। ফ্রান্সের এই শক্তি-মৈত্রী গঠন-প্রচেষ্টায় ইয়োরোপের তিনটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র—যথা, চেকোশ্লাভাকিয়া, রুমানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া নিজেদের মধ্যে একটি শক্তি-মৈত্রী গঠন করে। এই শক্তি-মৈত্রীই ক্ষুদ্র আঁতাত (Little Entente) নামে পরিচিত। পরে এই ক্ষুদ্র আঁতাত ফ্রান্সের শক্তি-মৈত্রী-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

শক্তি-মৈত্রী সংগঠনের ফলে নূতন কোন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় না, মৈত্রীতে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমিকতাও ক্ষুণ্ন হয় না। চুক্তিকারী যে-কোন রাষ্ট্র যে-কোন সময় মৈত্রীর বাহিরে আসিতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইতালী, জার্মেনী ও অষ্ট্রিয়া এই তিন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি শক্তি-মৈত্রী চুক্তি ছিল। যুদ্ধ ঘোষণার সংগে সংগে ইতালী এই মৈত্রীর বাহিরে আসে। সুতরাং শক্তি-মৈত্রী যুক্তরাষ্ট্রের মত সংহত ব্যবস্থা নয়; উহাকে প্রকৃত রাজ্যসংঘ (Real Union) বলিয়াও অভিহিত করা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত শক্তি-মৈত্রীর পার্থক্য

ব্যক্তিগত ও প্রকৃত রাজ্যসংঘ (Personal and Real Union)ঃ যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা প্রসংগে ব্যক্তিগত ও প্রকৃত রাজ্যসংঘের আলোচনা আসিয়া পড়ে, কারণ অনেক সময় ইহাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠন বলিয়া মনে করিয়া ভুল করা হয়। একই নৃপতির অধীনে দুই বা ততোধিক রাজ্য একসংগে শাসিত হইলে ইহাকে ব্যক্তিগত রাজ্যসংঘ (Personal Union) বলিয়া অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন কারণে এইরূপ রাজ্যসংঘের উদ্ভব হইতে পারে, যথা—যুদ্ধ ও বিজয়, বিবাহ ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কিছুটা পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে এইরূপ ব্যক্তিগত রাজ্যসংঘ ছিল। পরে ১৭০৭ সালে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্যের (United Kingdom) উদ্ভব হয়।

ব্যক্তিগত রাজ্যসংঘের স্বরূপ

দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজস্ব সার্বভৌমিকতা বজায় রাখিয়া নির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে প্রকৃত রাজ্যসংঘের (Real Union) সৃষ্টি হয়। প্রকৃত রাজ্যসংঘ একরূপ রাজ্য-সমবায়। ইহাতে যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ সার্বভৌমিকতা বজায় রাখিলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহা একটিমাত্র সার্বভৌম শক্তি হিসাবে বা একটিমাত্র রাষ্ট্র হিসাবে কার্য করে। সাধারণত রাজতন্ত্রের অধীনেই প্রকৃত রাজ্যসংঘের উদ্ভব ঘটিতে দেখা যায়। নরওয়ে ও সুইডেন এবং অষ্ট্রিয়া ও হাংগেরী রাজ্যসংঘের ইতিহাসের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ১৮১৫ সালে এক চুক্তি দ্বারা নরওয়ে সুইডেনের নৃপতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার হস্তে বৈদেশিক ব্যাপার পরিচালনা সংক্রান্ত ভার অর্পণ করে। ১৯০৫ সালে আর এক চুক্তি দ্বারা এই রাজ্যসংঘের বিলোপসাধন করা হয়। ১৮৬৭ সালে এক চুক্তি দ্বারা অষ্ট্রিয়া ও হাংগেরী পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য-সংঘের প্রতিষ্ঠা করে। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হাংগেরীরও সম্রাট হিসাবে স্বীকৃত হন এবং তাঁহার মাধ্যমেই এই রাজ্যসংঘের আন্তর্জাতিক ব্যাপার পরিচালিত হইতে থাকে। ইহা ছাড়া অষ্ট্রিয়া-হাংগেরী রাজ্যসংঘ কতিপয় বিষয় পরিচালনার জন্য একটি যুক্ত ব্যবস্থাপক সভারও প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই রাজ্যসংঘ বিনষ্ট হয়।

প্রকৃত রাজ্যসংঘের স্বরূপ

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Features of Federation)ঃ যে-কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হইবেঃ

১। শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতাবণ্টনঃ আঞ্চলিক ক্ষমতাবণ্টনের ভিত্তিতে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র দেশের সরকার বা কেন্দ্র এবং অংগরাজ্য বা দেশের অংশগুলির সরকারের মধ্যে ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারাই বণ্টিত হয়। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব সূচিত করে বলিয়া সংবিধান দ্বারা শাসনক্ষমতার এইরূপ বণ্টনকে মূল বা আদি বণ্টন (original distribution) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যঃ ১। শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন

২। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য : যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভাই সার্বভৌম; ইহারই প্রাধান্য শাসনক্ষেত্রের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত থাকে সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য। কেন্দ্রীয় বা কোন অংগরাজ্যের আইনসভা ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। শাসনতন্ত্র দ্বারাই যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বণ্টন এবং উভয় প্রকার সরকারের কার্যসীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। যদি ক্ষমতাবণ্টন বা কার্যসীমার পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয় তবে শাসনতন্ত্র-নির্দিষ্ট বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসারেই উহা সম্পাদন করা হয়। সাধারণত এই পরিবর্তন-পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যগুলি উভয়েরই আইনসভা অংশগ্রহণ করে। এককভাবে কেন্দ্র কোন পরিবর্তনসাধন করিতে পারে না।

২। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যের তিনটি প্রধান সূত্রের সন্ধান দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র লিখিত হইবে। লিখিত না হইলে উহাতে অনির্দিষ্টতা থাকিয়া যাইবে। অনির্দিষ্ট শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অনুকূল নহে। একরূপ সন্ধির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। শাসনতন্ত্র হইল এই সন্ধিপত্র। ইহা নির্দিষ্ট হইবে; এবং এই কারণেই হইবে লিখিত। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে। সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে আইনসভা ইহার পরিবর্তনসাধন করিতে পারিবে না। সংবিধান পরিবর্তনের অন্য এক বিশেষ জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। উপরন্তু বলা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রকৃতি সন্ধিপত্রের ন্যায় বলিয়া অন্তত সংবিধানের ক্ষমতাবণ্টন সংক্রান্ত অংশের পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলি উভয়েরই সম্মতি থাকা প্রয়োজন। অধ্যাপক হোয়ারের (**Prof. K. C. Wheare**) মতে, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বলিতে এককভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের এই অক্ষমতাই বুঝায়।* তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক আইনসভাই অ-সার্বভৌম আইনসভা (non-sovereign law-making body)—কারণ, প্রাধান্যের সন্ধান পাওয়া যায় একমাত্র সংবিধানে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যের তিনটি মূল সূত্র

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত : যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই চরম এবং প্রত্যেক সরকার সংবিধানকে মানিয়া লইতে বাধ্য। কিন্তু সংবিধানের ব্যাখ্যা লইয়া বিভিন্ন সরকারের মধ্যে বা অন্য প্রকার মতবিরোধের উদ্ভব হইতে পারে। সুতরাং এই ব্যাখ্যার ভার সাধারণত** ন্যস্ত করা হয় একটি নিরপেক্ষ আদালতের উপর। এই আদালতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

* "Supremacy of the constitution implies that central legislature's unilateral power to amend it is either negligible or non-existent."

** 'সাধারণত' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে, কারণ সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় সংবিধানের ব্যাখ্যার চরম ভার আদালতের উপর ন্যস্ত নহে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাই এই কার্য করিয়া

(Federal Court) বলে। ইহার কার্য হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া ইহার স্বরূপ বজায় রাখা। এইজন্য ইহাকে 'শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক' (interpreter and guardian of the constitution) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ব্যাখ্যা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসকল মানিয়া লইয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ (Variations of the Federal Type) ঃ এক দিক দিয়া দেখিলে সকল যুক্তরাষ্ট্রই এক প্রকারের। সংবিধান দ্বারা শাসনক্ষমতার বণ্টন, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য এবং নিরপেক্ষ কর্তৃত্ব দ্বারা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সকল যুক্তরাষ্ট্রের একপ্রকার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়।

তিন কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হইতে পারে

প্রথমত, ক্ষমতাবণ্টনের রীতি বিভিন্ন হইতে পারে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রসমূহও পরস্পর হইতে পৃথক হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখার পদ্ধতি বিভিন্ন হইতে পারে। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রসমূহও বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে। তৃতীয়ত, সংবিধান পরিবর্তনের পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্যও বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করা যাইতে পারে।

শাসনক্ষমতা বণ্টনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ

শাসনক্ষমতার বণ্টন লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানত দুই পদ্ধতিতে শাসনক্ষমতার বণ্টন করা হয়। এক হয় সংবিধান কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টাংশকে * অংগরাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত রাখিতে পারে, না-হয় কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলির হস্তে সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টাংশকে কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পদ্ধতিতে এবং কানাডায় দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শাসনক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় যদি কেন্দ্রের হস্তে নির্দিষ্ট ক্ষমতা সমর্পণ করা হয় তবে অংগরাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়ে। অংগরাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্রীয় দুর্বলতাকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সূচক বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং দুর্বল কেন্দ্রসমন্বিত যুক্তরাষ্ট্রই প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র। অপরদিকে যদি কানাডার ন্যায় অবশিষ্ট ক্ষমতাকে কেন্দ্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় তবে অংগরাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হইয়া উঠে। শক্তিশালী কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতির বিরোধী। সুতরাং এইরূপ যুক্তরাষ্ট্রকে অনেকে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিতে চাহেন না ঃ এই কারণেই একটি বিখ্যাত মামলার রায়প্রদান কালে লর্ড হ্যালডেন (Lord Haldane) বলিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র স্থুল

থাকে। সোবিয়েত ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ঐ একই প্রকারের ব্যতিক্রম দেখা যায়। কেন্দ্রীয় আইনের ব্যাখ্যার ক্ষমতা আদালতের নাই ; উহা ন্যস্ত করা হইয়াছে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়াম নামক সংস্থার হস্তে।

* Reserve of Powers or Residuary Powers or Residue of Powers

অর্থেই কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা চলে। কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, মাত্র অবশিষ্ট ক্ষমতা ভোগই কোন সরকারের শক্তির নির্দেশক নহে। যদি নির্দিষ্ট ক্ষমতার তালিকায় অধিক সংখ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট ক্ষমতার বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট ক্ষমতাভোগকারী সরকার অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী সরকার অপেক্ষা শক্তিশালী হইবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে কোন্ সরকার অধিক শক্তিশালী হইবে তাহা নির্ভর করে তালিকার অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট বিষয়সমূহের সংখ্যা ও গুরুত্বের উপর।

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখার বিভিন্ন পদ্ধতি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখার পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয় তাহার দুইটি বিপরীত প্রান্তিক (extreme) উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতই সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র ও অংশসমূহের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখে। অপরদিকে, সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাই এই কার্য করিয়া থাকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত নহে। সুইজারল্যাণ্ডে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত আছে, শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে তাহার ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রণীত কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারে না। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে অন্য প্রকারের ব্যবস্থা আছে। ৩০,০০০ নির্বাচক অথবা ৮টি ক্যাণ্টন দাবি করিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে জনসাধারণের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হয়। সুতরাং সুইজারল্যাণ্ডে আদালতের পরিবর্তে জনসাধারণের হস্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাতেও কেন্দ্রীয় আইনের ব্যাখ্যার ক্ষমতা আদালতের নাই ; উহা ন্যস্ত করা হইয়াছে সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়ামের হস্তে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখা ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ড এই দুই বিপরীত প্রান্তিক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া আছে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্র। ভারতীয় ইউনিয়নকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করিলে ইহাকেও মধ্যবর্তী দলভুক্ত হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। অষ্ট্রেলিয়ায় কেন্দ্রীয় আইনসভা কোনরূপে অংগরাজ্যগুলির অধিকারের সহিত সম্পর্কিত নহে সংবিধানের এইরূপ কতকগুলি ধারার পরিবর্তন এককভাবে করিতে সমর্থ। জার্মেনীর ভূতপূর্ব ওয়েমার (Weimer) প্রজাতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিতে পারিত। কানাডায় অংশগুলির (Units) ক্ষমতা বিশেষ স্বল্প হওয়ায় কেন্দ্র ও অংশগুলির মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা খুবই অল্প। তবুও যদি দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের ক্ষমতা ও অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিতেছে তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের মধ্যস্থতাতেই সে বিবাদের মীমাংসা হয়।

বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীর শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি সন্ধিপত্রের ন্যায়। যে অংগরাজ্যগুলি পরস্পরের সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তিই হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান। সন্ধিপত্রের প্রকৃতির অনুরূপ বলিয়া ইহা লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হইতে বাধ্য। লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে সাধারণত পরিবর্তনের পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকে। লিখিত না থাকিলেও ধরিয়া লওয়া হয় যে, কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলি—উভয়েরই সম্মতি ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন করা যায় না। এইভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়তা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হইলেও দুষ্পরিবর্তনীয়তার পরিমাণের পার্থক্য থাকে—অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান পরিবর্তনের পদ্ধতিতে বিভিন্নতা থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন-চতুর্থাংশ অংগরাজ্যের আইনসভার* সম্মতি ব্যতীত সংবিধানের কোন পরিবর্তনসাধন করা যায় না। অষ্ট্রেলিয়ায় কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষে শাসনতন্ত্র-সংশোধনকারী কোন আইন পাস হইবার পর উহাকে প্রত্যেক অংগরাজ্যের নিম্ন কক্ষের নির্বাচকদের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। তখন ইহা যদি অধিকাংশ রাজ্যের অধিকসংখ্যক ভোটারদের দ্বারা গৃহীত হয় তবেই ইহা কার্যকর হয়। সুইজারল্যাণ্ডের গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব আসিতে পারে এবং গণভোট দ্বারা গৃহীত হইলে উহা আইনে পরিণত হয়। এইভাবে দুষ্পরিবর্তনীয়তার পরিমাণের তারতম্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা সাম্প্রতিক শাসন-ব্যবস্থা। নিজ নিজ সত্তা বিসর্জন না দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যাহাতে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে—এই উদ্দেশ্যেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। গেটেল বলেন যে, একমাত্র প্রতিনিধিত্ব ছাড়া গণতন্ত্রকে বিস্তীর্ণ ভুখণ্ডের উপর কার্যকর করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ন্যায় আর কোন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই।

গুণ : ১। ইহা স্বায়ত্ত-শাসন ও গণতন্ত্রকে বিস্তীর্ণ ভুখণ্ডের উপর কার্যকর করিয়াছে

মিলনই শক্তির প্রতীক—রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে এই সাধারণ সত্যটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের অস্তিত্ব বিসর্জন না দিয়াও শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহার ফলে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শক্তিসঞ্চয়—এই দুই রাষ্ট্রনৈতিক প্রকৃতি বা আকাংক্ষার মধ্যে সমন্বয়সাধিত হইয়া রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পথ প্রশস্ত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পথ প্রশস্ত হইবার আরও কারণ হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অনেকগুলি

২। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিজ নিজ সত্তা বিসর্জন না দিয়াও শক্তিশালী হইতে পারে

* কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলির সংখ্যা ছিল ৪৮ ; বর্তমানে উহা ৫০-এ পরিণত হইয়াছে। নূতন অংগরাজ্য দুইটি হইল আলাস্কা ও হাওয়াই।

শাসনযন্ত্র থাকায় বহুসংখ্যক লোক শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ পায়; ফলে সাধারণ লোকও রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে উৎসাহিত হইয়া উঠে। কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যগুলির সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হওয়ায় বিশেষিকরণের (specialisation) ফলে শাসন-কার্যের উৎকর্ষও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৩। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা প্রসারিত হয়; শাসন-কার্যেও উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জাতীয় সংহতি সাধন করিবার প্রকৃষ্টতম উপায়। একই জাতীয় জনসমাজের (Nationality) অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একই জাতিতে (Nation) পরিণত হইতে পারে। গিলক্রাইষ্টের মতে, এরূপ ঘটিলে যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী পূর্বতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মর্যাদার লাঘব হয় না; বরং মর্যাদার বৃদ্ধি ঘটিয়াই থাকে। "ভার্জিনিয়া বা টেক্সাসের ন্যায় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া থাকা অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এক বৃহৎ জাতির সভ্যপদভুক্ত হওয়া অনেক বেশী মর্যাদার পরিচায়ক।"

৪। ইহা জাতীয় সংহতিসাধন করিবার প্রকৃষ্টতম উপায়

লর্ড ব্রাইস যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি গুণের নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রাইস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিকভাবে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা লইয়া এরূপভাবে পরীক্ষাকার্য চালানো যায়, যাহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র দেশব্যাপী করা বিশেষ বিপজ্জনক। যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য থাকে বলিয়া আঞ্চলিক অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এরূপ বিশেষভাবে করা যাইতে পারে যাহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সম্ভবপর নহে।

৫। লর্ড ব্রাইস নির্দেশিত গুণ

উপসংহার: ইতিমধ্যেই উল্লিখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যতম গুণের পুনরুল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, বর্তমান যুগের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রই প্রকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দিন শেষ হইয়াছে অথচ আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাংক্ষা সক্রিয় রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি হিসাবে দিন দিন পরিব্যাপ্ত হইতেছে। অনেকের মতে, এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই—কারণ একমাত্র এই ব্যবস্থাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া শক্তিশালী হইবার সুযোগ প্রদান করে!

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতিতেই কতকগুলি এরূপ বিশেষ দুর্বলতা রহিয়াছে যাহার জন্য উপরি-উক্ত উৎকর্ষ সত্ত্বেও সকল ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমর্থন করা যায় না। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার তুলনামূলকভাবে এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা দুর্বল। এককেন্দ্রিক সরকারের সংগঠন সরল ও নির্দিষ্ট; সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকায় শাসনকার্যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু ক্ষমতা বণ্টন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হওয়ায় কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলি উভয়েরই শাসনকার্যে বিশেষ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

ত্রুটি:

১। ইহা এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা দুর্বল

কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় আন্তর্জাতিক সন্ধি, সর্তাদি পালন ব্যাপারে। আন্তর্জাতিক সন্ধি ইত্যাদি পালন সমগ্র দেশের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু অংগরাজ্যগুলি সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতা করিয়া সন্ধি ইত্যাদি পালনে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। ইহাতে জাতির আন্তর্জাতিক মর্যাদার লাঘব ঘটে। অপরদিকে আবার যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে যে, জাতির আভ্যন্তরীণ শক্তি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার হানি না ঘটিয়া পারে না।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যয়বহুল, জটিল ও মন্থরগতি বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যয়বহুল, জটিল ও মন্থরগতি বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে। একটির পরিবর্তে বহু শাসনযন্ত্র থাকায় ব্যয়বাহুল্য দেখা দেয়; এবং ক্ষমতা বণ্টনের জন্য সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা জটিল ও মন্থরগতি হইতে বাধ্য। শাসন ব্যাপারে অংগরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারও কঠিন হইয়া পড়ে। ইচ্ছা করিলে কোন ব্যক্তি এক অংগরাজ্য হইতে অন্য অংগরাজ্যে চলিয়া যাইতে পারে, সম্পত্তি স্থানান্তরিত করিতে পারে, ইত্যাদি। তখন অপর রাজ্যের শাসনযন্ত্রের সহযোগিতা ব্যতীত ন্যায়বিচার পরিচালনা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহযোগিতার পথ প্রস্তুত করিতে বিশেষ বিলম্ব এবং অনর্থক অর্থব্যয় হয়।

৩। ইহাতে দেশের বিভিন্ন অংশে পরস্পর-বিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ আনা হয় যে, ইহাতে দেশের বিভিন্ন অংশে একই বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ বা আংশিক-ভাবে পরস্পরবিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে। এরূপ ঘটিলে বিভিন্ন অংগরাজ্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন বিশেষ কঠিন কার্য হইয়া পড়ে, এবং নানারূপ অশান্তি ও গোলযোগের আশংকা সর্বদা বিদ্যমান থাকে—এমনকি বিদ্রোহের অভ্যুত্থানও ঘটিতে পারে।

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের দুষ্পরি-বর্তনীয়তা বিপজ্জনক

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযোগ হইল দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ। দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য অথচ বর্তমান দিনের গতিশীল সমাজে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান শুধু যে প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে তাহাই নহে, ইহা বিপজ্জনকও বটে। শাসনতন্ত্র-অনুমোদিত পদ্ধতিতে সংবিধানের সংশোধনে অক্ষম হইলে কোন অংগরাজ্য, কোন স্বার্থ বা কোন রাষ্ট্রনৈতিক দল বিদ্রোহের সূচনা করিতে পারে। এই বিদ্রোহ পরিশেষে বিশেষ গুরুতর গৃহযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। এইজন্যই গেটেল বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্রোহের সম্ভাবনা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গতি ও ভবিষ্যৎ (Tendencies and Prospects of Federalism): বর্তমানে পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে

পার্থক্য ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও মর্যাদা অতি দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে। তুলনায় আংগিক সরকারগুলি ক্রমশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়িতেছে। কেন্দ্রিকতার দিকে এই প্রবল ঝোঁকের লক্ষ্য করিয়াই অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমান পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের সরকারের কোন ভবিষ্যৎ নাই। যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আছে কিনা তাহার আলোচনা পরে করা হইতেছে।

বর্তমানে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে

এখন দেখা যাউক কি কি কারণে যুক্তরাষ্ট্রগুলিতে কেন্দ্রপ্রবণতা দেখা দিয়াছে এবং আংগিক সরকারগুলির ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে। বিভিন্ন কারণের মধ্যে যুদ্ধ, আর্থিক সংকট, বৃহৎ শিল্প ও বৃহদায়তনে উৎপাদন, পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি, আর্থিক পরিকল্পনা এবং সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যাদির প্রসার যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করিতে অধিক সাহায্য করিতেছে।* বর্তমান যুগের সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশের সমস্ত অর্থবল, জনবল ও আর্থিক সম্পদকে দ্রুতগতিতে নিয়োজিত করিতে হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রসারিত করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যুদ্ধ ও যুদ্ধের ভীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় অন্যতম শত্রু। লিপসনের (L. Lipson) ভাষায় বলা যায়, "গত যুদ্ধের ফলে ক্ষতবিক্ষত এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভয়ে ভীত-শংকিত পৃথিবীর বর্তমান বিশৃংখলাপূর্ণ রাষ্ট্রনীতির সহিত ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ অসংগতিপূর্ণ।"** আর্থিক সংকটের ফলেও ব্যাপক বেকারাবস্থা, দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি সমস্যার উদ্ভব হয় যাহার সমাধান করা আঞ্চলিক সরকারগুলির শক্তি ও সামর্থ্যের বাহিরে। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রণী হইতে হয় এবং অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়। পরিবহণ-ব্যবস্থার দ্রুতোন্নতি এবং বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিতে সহায়তা করিয়াছে। বহু শিল্পই এখন আঞ্চলিক সীমাকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র দেশব্যাপী শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে এবং বহু অর্থ নৈতিক ও শিল্পসংক্রান্ত সমস্যা জাতীয় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান সময়ে জন-কল্যাণকর রাষ্ট্রের

কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক প্রবল হইবার কারণ :

১। যুদ্ধ

২। আর্থিক সংকট

৩। পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি ও বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব

---

* K. C. Wheare, Federal Government

** '...A dispersion of powers is incompatible with the troubled politics of a world that is scarred by past wars and scared of new ones.' L. Lipson, The Great Issues of Politics

নীতিও কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁককে প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। প্রায় সকল দেশেই এ-মতবাদ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে যে, রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিবে—অন্তত জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। সুতরাং শিক্ষার বিস্তার, চিকিৎসার ব্যবস্থা, পীড়িতাবস্থায়, বার্ধক্যে ও অসহায় অবস্থায় সাহায্য প্রদান প্রভৃতি ধরনের কার্য আজ রাষ্ট্রকে করিতে হয়। এই সকল জন-কল্যাণকর কার্যাদি ব্যয়বহুল এবং আঞ্চলিক সরকারের আর্থিক সংগতির বাহিরে। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্য অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়; এবং ফলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও প্রসারিত হয়।

৪। জন-কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা

বামপন্থী লেখকদের মতে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হইয়াছে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার ক্রমপরিণতির ফলে। ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে মূলধন মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত ও পুঞ্জীভূত হইয়াছে এবং প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বৃহদাকারের একচেটিয়া কারবার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই সব একচেটিয়া ব্যবসায় মাত্র দেশের সর্বত্রই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে নাই, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আধিপত্য বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করিতেছে। দেশের অভ্যন্তরেও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া বিশেষ প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাপক বেকারাবস্থা, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি সমস্যা ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বেরই ফল বলিয়া অধিকাংশের বিশ্বাস। তাই তাহারা চায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান। এই অবস্থায় ধনতন্ত্র এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা কামনা করে। রাষ্ট্র একদিকে যেমন বহির্বাজারে পণ্য বিক্রয় সম্প্রসারিত করিতে চেষ্টা করে, অপরদিকে তেমনি বলপ্রয়োগ এবং সমাজ-কল্যাণমূলক কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া জনসাধারণের আন্দোলনকে দমন করিতে চায়। সুতরাং ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা আকারে বজায় থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে থাকে না—আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য ও অংগরাজ্যের অধিকার (State Rights) কেন্দ্রিকতার প্রবল শক্তির চাপে নিঃশেষ হইয়া যায়।

বামপন্থী লেখকদের মতে, ধনতন্ত্রের ক্রমপরিণতি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় শক্তির বৃদ্ধি ঘটিয়াছে

যাহা হউক, যুক্তরাষ্ট্রগুলিতে একপ্রকার কেন্দ্রীয় শক্তির বৃদ্ধি দেখিয়া অনেকে মন্তব্য করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার কোন প্রকার ভবিষ্যৎ নাই। অপরদিকে অধ্যাপক হোয়ার প্রমুখ লেখকগণ যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটা নৈরাশ্যব্যঞ্জক অভিমত প্রকাশ করেন না। ইঁহারা বলেন, যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি সম্প্রসারিত হইয়াছে তেমনি আবার যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলির গুরুত্ব, আত্মচেতনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাংক্ষাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।* ইহা ব্যতীত বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাগত, উদ্ভব বা বংশগত

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অধ্যাপক হোয়ারের মতামত

* "...there has been a strong increase in the sense of importance, in the self-consciousness and self-assertiveness of the regional governments." K. C. Wheare, Federal Government

ও ধর্মগত বিভিন্নতা এবং স্বতন্ত্র সরকার হিসাবে পৃথক সত্তা সংরক্ষণের আকাংক্ষা এখনও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিতে সহায়তা করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুইবেক প্রদেশ (Quebec), পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে এতই সচেতন যে স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে মিশিয়া যাইতে চাহে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কাম্য কি না

পরিশেষে দেখা প্রয়োজন, যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন-ব্যবস্থা বর্তমানের পরবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় কাম্য কি না? ইহার উত্তরে বলা যায়, বর্তমানে যে-সকল জটিল ও পরস্পর-সম্পর্কিত অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধান শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। অতএব কতকগুলি ক্ষেত্রে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে। কিন্তু আবার বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের (Nationalities) আপনাপন বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির প্রকাশের স্বাধীনতা এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষিত করিতে হইবে। ঐক্যের সহিত বিভিন্নতার সুসমঞ্জস সংঘটন করিতে হইবে। একমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকরণ নীতির উপর ভিত্তিশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমেই ইহা সম্ভব। ইহার জন্য প্রয়োজন হইবে সামাজিক সম্পর্ককে অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।

সংক্ষিপ্তসার

আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের দুইটি পদ্ধতি আছে—বিকেন্দ্রিকরণ ও ক্ষমতা বণ্টন। বিকেন্দ্রিকরণ পদ্ধতি অনুসৃত হইলে শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি অনসৃত হইলে উহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা : এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সমগ্র শাসনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পুর্ণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত এবং আইনগতভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা ছাড়া অন্য কোন আইনসভার অস্তিত্ব থাকে না।

গুণ : এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সমগ্র দেশব্যাপী—নীতি, আইন ও শাসন পরিচালনায় অখণ্ডতা পরিদৃষ্ট হয়। এই অখণ্ডতার জন্য শাসন-ব্যবস্থায় দৃঢ়তাও প্রকাশ পায়। একটিমাত্র সরকার থাকায় শাসনযন্ত্র বিরাট ও জটিল হইয়া উঠে না। ফলে ব্যয়াধিক্যের সম্ভাবনাও কম থাকে। উপরন্তু, এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার সুপরিবর্তনীয়তা উহার উৎকর্ষের নির্দেশক।

ত্রুটি : কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে ; এবং কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা সুশাসনের পরিপন্থী। যাহা হউক, এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা ভৌগোলিক ও জাতিগত ঐক্য-সমন্বিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা : ইহা একরূপ দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা ; ইহাতে দুই প্রকারের সরকার থাকে—(১) একটি সমগ্র দেশের সরকার, এবং (২) কতকগুলি দেশের অংশসমূহের সরকার। লিখিত সংবিধান এই দুই প্রকার সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টিত করিয়া দেয়। ফলে উভয়

শ্রেণীর সরকার নিজ নিজ এলাকার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিয়া পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে লিখিত সংবিধানের প্রাধান্যই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব : ডাইসির মতে, কেন্দ্রাভিগামী শক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। জাতীয় ঐক্যসাধন করিবার নিমিত্ত সন্নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিলেই কেন্দ্রাভিগামী শক্তি কার্য করে। এইরূপ রাষ্ট্রসকল পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চায় সত্য, কিন্তু মিলিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে চায় না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র হইল কতকগুলি রাষ্ট্রের ঐক্যবিহীন মিলন (a union without unity)।

যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রাতিগ শক্তির কার্যের ফলেও গঠিত হইতে পারে—একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে ভাঙিয়াও যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা যাইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সমবায় : যুক্তরাষ্ট্রকে রাষ্ট্র-সমবায় হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। (১) যুক্তরাষ্ট্রের ফলে নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় ; কিন্তু রাষ্ট্র-সমবায় গঠনের ফলে কোন নুতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না। (২) রাষ্ট্র-সমবায় বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সৃষ্টি হয় ; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয় জাতীয় ঐক্যসাধনের জন্য ; (৩) রাষ্ট্র-সমবায় চুক্তির ফলে উদ্ভূত হয় ; সুতরাং উহার কোন আইনগত ভিত্তি নাই ; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ আইনসংগত সংস্থা ; (৪) রাষ্ট্র-সমবায় পরিত্যাগ করা আইনানুমোদিত ; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ আইনানুমোদিত নহে।

ব্যক্তিগত ও প্রকৃত রাজ্যসংঘ : একই নৃপতির অধীনে দুই বা ততোধিক রাজ্য একসংগে শাসিত হইলে উহাকে ব্যক্তিগত রাজ্যসংঘ বলিয়া অভিহিত করা হয়। অপরদিকে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজ নিজ সার্বভৌমিকতা বজায় রাখিয়া চুক্তির মাধ্যমে পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে প্রকৃত রাজ্যসংঘের সৃষ্টি হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য : যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য প্রধানত তিনটি—(১) শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন ; (২) লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য ; এবং (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ : (১) ক্ষমতা বণ্টনের রীতির বিভিন্নতার জন্য, (২) শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখার পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য, এবং (৩) শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রকারভেদ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ। গুণের দিক দিয়া বলা যায় যে, (১) এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর কার্যকর করিয়াছে ; (২) ইহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শক্তিসঞ্চয়—এই দুই রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষার মধ্যে সমন্বয়সাধিত হইয়া রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পথ প্রশস্ত হয় ; (৩) ইহা জাতীয় ঐক্যসাধন করিবার প্রকৃষ্টতম উপায় ; (৪) ইহাতে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা লইয়া নানারূপ পরীক্ষা চালানো এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব। কিন্তু (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা দুর্বল। (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ব্যয়বহুল, জটিল ও মন্থরগতি বলিয়াও অভিযুক্ত হইয়াছে ; (৩) ইহাতে দেশের বিভিন্ন অংশে পরস্পরবিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে ; (৫) সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্রোহের সম্ভাবনা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গতি ও ভবিষ্যৎ : বর্তমানে বিভিন্ন কারণে যুক্তরাষ্ট্রসমূহ কার্যক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই অভিমত প্রকাশ করা চলে না যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার কোন ভবিষ্যৎ নাই।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the conditions necessary for the formation of a Federation ? Explain the necessity of a written constitution for a Federal Union. (C. U. 1949)

[ইংগিত : ডাইসিকে অনুসরণ করিয়া বলা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য দুইটি অবস্থার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রয়োজন আছে। প্রথমত, পাশাপাশি অবস্থিত এমন কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থাকিবে যাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে সহজেই একটি জাতীয় ভাব পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ত, এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিবে কিন্তু মিলিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে চাহিবে না—অর্থাৎ, মিলিত হওয়ার পরও আংগিক রাজ্যগুলি তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চাহিবে। বস্তুত, জাতীয় ঐক্যের সহিত আংগিক রাষ্ট্রসমূহের অধিকারের সামঞ্জস্যবিধানের উপায় হইল যুক্তরাষ্ট্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জাতীয় ঐক্যসাধনের নিমিত্ত পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চাহিলে কেন্দ্রাভিগামী শক্তি কার্য করে। আবার কেন্দ্রাতিগ শক্তির কার্যের ফলে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকে ভাঙিয়াও যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র লিখিত হওয়া আবশ্যক। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আংগিক সরকারগুলির মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় যে, প্রত্যেক সরকার আইনত নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন। লিখিত শাসনতন্ত্রের দ্বারা উভয় প্রকার সরকারের কার্যসীমা নির্ধারিত না করা হইলে ভবিষ্যতে অনির্দিষ্টতা ও বিবাদ দেখা দিবে। ইহা ছাড়া একরূপ সন্ধির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। শাসনতন্ত্র হইল এই সন্ধিপত্র। ইহা হইবে নির্দিষ্ট এবং এই কারণেই হইবে লিখিত।...এবং ২৬৬-২৬৯ এবং ২৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।]

2. "The difference between a Federation and a Confederation arises wholly from the difference in respect of the location of Sovereignty in the grouping." Examine the statement. (২৭০-২৭১ পৃষ্ঠা)

3. State the nature of Federalism and discuss its advantages and disadvantages. (C. U. 1954, '56) (২৬৬, ২৭২-২৭৪ এবং ২৭৬-২৭৮ পৃষ্ঠা)

4. What are the conditions for the success of a Federal Union ? How far do they exist in India ? (C. U. 1958)

[ইংগিত : বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর গণতন্ত্র প্রবর্তন করিতে হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে হইবে। বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য, জাতীয় ভাব, মিলনের স্পৃহা অথচ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার ইচ্ছা—এই কয়টি অবস্থার অস্তিত্ব থাকিলেই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিয়া অধ্যাপক হোয়ার বলিয়াছেন, কতকগুলি রাষ্ট্র বা জনসম্প্রদায় যখন কতিপয় বিষয় সম্পর্কে সাধারণ সরকারের অধীনে সংগঠিত করিতে চায় এবং অপরাপর বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র আংগিক সরকার গঠন করিতে চায় তখনই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলেও সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন হইল উপযুক্ত নেতৃত্বের এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধনের। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের সফলতার সকল সর্তই বিদ্যমান বলা চলে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সার্থসম্পন্ন হইলেও ভারতবাসী একজাতি। উপরন্তু, বর্তমান নেতৃত্বাধীনে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের সমন্বয়সাধনও অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং ভারতে যুক্তরাষ্ট্র সফল হইবে এই আশা করা যায়। বস্তুত ইহা সফল হইয়াছে এই অভিমতও প্রদান করা যায়।..এবং ২৬৭-২৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

5. How would you distinguish a Federal Union (a) from a Confederation, (b) from a Unitary State ? (C. U. 1957)

(২৭০-২৭১ এবং ২৬৩-২৬৪, এবং ২৬৬ পৃষ্ঠা)

ষোড়শ অধ্যায়

শাসনতন্ত্র

(CONSTITUTIONS)

শাসনতন্ত্রের অর্থ **(Meaning of Constitution)ঃ** যে প্রকারের প্রতিষ্ঠানই হউক না কেন, তাহার কাজকর্ম সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে হইলে প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কি হইবে, সদস্যদের কি অধিকার থাকিবে, ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মকানুন থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র হইল মানুষের আচরণকে কোন নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই তাহার গঠন কি হইবে, বিভিন্ন সরকারী বিভাগগুলির মধ্যে ক্ষমতা কিভাবে বন্টিত হইবে, কিভাবে সরকারী কাজকর্ম পরিচালিত হইবে এবং রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তিসমূহের ও সরকারের মধ্যে কি সম্পর্ক হইবে ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি নিয়মকানুন থাকে। এই নিয়মকানুনগুলিকেই শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলিয়া অভিহিত করা হয়। অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে শাসনতন্ত্রের (Constitution) সংজ্ঞা সম্পর্কে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

সাধারণত 'শাসনতন্ত্র' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। প্রথমত, কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত লিখিত ও অলিখিত নিয়মকানুনকে বুঝাইবার জন্য 'শাসনতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।* এই সমস্ত নিয়মকানুনের মধ্যে আদালত-গ্রাহ্য আইন এবং আচার-ব্যবহার রীতিনীতি উভয়ই স্থান পায়। আচার-ব্যবহার রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক আইন বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও উহাদিগকে সংবিধানের অংগীভূত করা হয় এই কারণে যে, ঠিক আইনের মতই

শাসনতন্ত্রের দুই অর্থ

* K. C. Wheare, Modern Constitutions

ঐ শাসন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে, কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করিতে হইলে শুধু আইনের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই যথেষ্ট নয়, আইনের চারিদিক ঘিরিয়া যে-সমস্ত রীতিনীতি গড়িয়া উঠে এবং যাহা অনেক ক্ষেত্রে আইনের অর্থকে কার্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে সেইগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও একান্ত প্রয়োজন। অধিকাংশ দেশে কিন্তু শাসনতন্ত্র শব্দটি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় অর্থে 'শাসনতন্ত্র' বলিতে বুঝায় সেই লিপিবদ্ধ মৌলিক আইনকে যাহার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি মৌলিক নীতিগুলি নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। অনেকে আবার ইহাকেও যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে, বিধিবদ্ধ মৌলিক আইনটি সাধারণ আইন হইতে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন—অর্থাৎ, সাধারণ আইনের মতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সহজসাধ্য হওয়া উচিত নয়। টক্‌ভিলের (**Tocqueville**) মত যে-সমস্ত লেখক শাসনতন্ত্রকে এই সংকীর্ণ অর্থে বুঝেন তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রিটেনের কোন শাসনতন্ত্র নাই, কারণ উহা অলিখিত এবং সাধারণ আইন অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন নয়। পার্লামেণ্ট যখন ইচ্ছা তখন সাধারণ আইনের মত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে সমর্থ।*

টক্‌ভিলের মতে, ব্রিটেনের কোন শাসনতন্ত্র নাই

'শাসনতন্ত্র' শব্দের উপরি-উক্ত দুইটি অর্থের প্রচলন থাকায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা খুবই থাকে। এইজন্য কোন্ প্রসংগে এবং কোন্ অর্থে 'শাসনতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হইতেছে সেই সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা লইয়া চলিতে হইবে। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে, যে-সমস্ত দেশে 'শাসনতন্ত্র' শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয় সে-সমস্ত দেশেরও শাসন-ব্যবস্থা বুঝিতে হইলে শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত রীতিনীতি, সাধারণ আইন, শাসনতন্ত্রের আদালত-প্রদত্ত ব্যাখ্যা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ দেশের সংবিধানের ধারা তন্নতন্ন করিলেও রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট, রাষ্ট্রনৈতিক দল, কংগ্রেসের কমিটি ইত্যাদির কোন সন্ধানই পাওয়া যাইবে না।

'শাসনতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলিকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বিধিবদ্ধ আইনের আকারে সন্নিবিষ্ট করিবার তাৎপর্য বা কারণ কি? সাধারণত বিপ্লব বা স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর বিপ্লবী বা সংগ্রামকারীরা নিজেদের ধ্যানধারণা ও আদর্শ অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থাকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজিতে চায়। আবার একাধিক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মিলিত হইয়া নূতন শাসন-ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রয়াসী হইতে পারে অথবা কোন দেশে যুদ্ধের ফলে পূর্বতন শাসন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ায় তাহা নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গ

* এই গ্রন্থের ২য় খণ্ড 'শাসন-ব্যবস্থা'য় ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থার ২য় অধ্যায় দেখ।

নূতন শাসন-ব্যবস্থার মূল নীতিগুলিকে বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত করেন ; এবং অধিকাংশ সময় আবার সরকারকে নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রকে সাধারণ আইন অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন করা হয়।

শাসনতন্ত্রকে সাধারণ আইন হইতে অধিকতর মর্যাদা দানের কারণ

এইভাবে শাসনতন্ত্রকে অধিকতর মর্যাদা দান করিবার নানা কারণ থাকিতে পারে। সংবিধান প্রণেতৃবর্গ হয়ত' মনে করিতে পারেন যে, শাসনতন্ত্রকে যখন তখন পরিবর্তন করা সমীচীন নয় ; অথবা শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ধরনের সম্পর্ক রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন ; অথবা কতকগুলি নাগরিক-অধিকার শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের হাত হইতে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রাভ্যন্তরে বিভিন্ন ভাষা ও ধর্ম থাকিলে তাহাদের সংরক্ষিত করা অথবা যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে আঞ্চলিক সরকারগুলির নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য এবং দুষ্পরিবর্তনীয়তার প্রয়োজন হইতে পারে।

শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন ধারা (Different ways in which Constitutions may be established) : পাঁচটি প্রধান উপায়ে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রথমত, কোন দেশের রাজশক্তি বিপ্লবের ভয়ে অথবা অন্য কারণে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করিয়া প্রজাদের নিকট নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাসন করিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সে ১৮১৪ সালের অষ্টাদশ লুই-এর শাসনতান্ত্রিক সনদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্বতন শাসন-ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া সম্পূর্ণ নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা যাইতে পারে। এইভাবে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালে প্রথম সোবিয়েত শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। তৃতীয়ত, যখন কোন দেশ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদালাভ করে তখন তাহার জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত প্রভৃতি দেশে এইভাবে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। চতুর্থত, অনেক ক্ষেত্রে অসংলগ্নভাবে রাষ্ট্র-সমবায়ে মিলিত কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনশীল রাষ্ট্রের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করিবার জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণীত হইতে পারে। সুইজারল্যাণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র এইভাবে রচিত হয়। পঞ্চমত, শাসনতন্ত্র কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে রচিত না হইয়া ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সংগে ক্রমবিবর্তিত হইতে পারে। এইরূপ শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র। বিভিন্ন সময়ের সনদ, চুক্তি, বিধিবদ্ধ আইন, বিচারের নজির, প্রথাগত আইন এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্য দিয়া ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র বর্তমান পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাঁচটি প্রধান পদ্ধতি

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classifications of Constitutions) : শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ নানাভাবে করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র এবং সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র—এই দুই শ্রেণীবিভাগই সুপ্রচলিত।

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র (Written and Unwritten Constitutions): যেখানে শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলিকে এক বা কতিপয় দলিলে লিপিবদ্ধ করা থাকে সেখানে শাসনতন্ত্রকে লিখিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়। আর অলিখিত শাসনতন্ত্রের দ্বারা বুঝানো হয় যে, শাসনসংক্রান্ত মৌলিক নীতিগুলিকে লিপিবদ্ধ বা দলিলভুক্ত করা হয় নাই এবং উহা প্রধানত প্রথা, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত। বলা হয় যে, অলিখিত শাসনতন্ত্র প্রথার ভিত্তিতে বিবর্তিত হইয়া থাকে। অলিখিত শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের এবং লিখিত শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়।

ক্ষেত্রবিশেষে এই শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন থাকিলেও লিখিত এবং অলিখিত এই দুই শ্রেণীতে সমস্ত শাসনতন্ত্রকে বিভক্ত করা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া বিবেচিত হয় না—কারণ, এই প্রকার শ্রেণীবিভাগের ফলে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে।

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞান-সম্মত নহে

প্রথমত, এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে যে, তথাকথিত অলিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত নিয়মকানুনের কোন গুরুত্ব নাই এবং লিখিত শাসনতন্ত্রে অলিখিত শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতির কোন ভূমিকা নাই। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রকে অলিখিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়, কিন্তু এই শাসনতন্ত্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যাহা লিখিত ও বিধিবদ্ধ। অধিকারের বিল, উত্তরাধিকার আইন, জনপ্রতিনিধি আইন, পার্লামেণ্ট আইন প্রভৃতি ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের লিখিতাংশ। অপরপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এখানেও অনেক অলিখিত শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতি এরূপভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাতে শুধু লিখিত সংবিধান হইতে ঐ দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে যথোপযুক্ত ধারণা করা সম্ভব নহে। দলীয় ব্যবস্থা, কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-পদ্ধতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ক্ষমতা ইত্যাদি শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে, কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় না যদি-না সমস্ত লিখিত ও অলিখিত শাসনতান্ত্রিক আইনকানুন এবং রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। এই প্রসংগে লর্ড ব্রাইস্ বলেন, লিখিত শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা, রীতিনীতি প্রভৃতি দ্বারা এরূপভাবে সম্প্রসারিত হইয়া থাকে যে, কিছুদিন পরে শুধু লিখিত নিয়মকানুন হইতে উহার স্বরূপ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব।*

* "Written constitutions are developed by interpretations, fringed with decisions and enlarged by customs so that after a time the letter of the text does not convey the full effect."

দ্বিতীয়ত, শাসনতন্ত্রকে লিখিত এবং অলিখিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করার ফলে আবার এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়া থাকে যে, শাসন-ব্যবস্থার কতকগুলি মূল নীতিসম্বলিত সংবিধান নামে পরিচিত বিধিবদ্ধ আইন ছাড়া আর কোন শাসনতান্ত্রিক আইন থাকিতে পারে না। এইজন্যই অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, ব্রিটেনের কোন শাসনতন্ত্রই নাই। কিন্তু এখানে বলা প্রয়োজন, ব্রিটেনে কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রণীত বিধিবদ্ধ মৌলিক আইন না থাকিলেও, বিভিন্ন সময়ে রচিত সংবিধান সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ আইন আছে। ইহা ব্যতীত যে-সমস্ত দেশে শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ আইনের আকারে রচিত হইয়াছে সেখানেও বহু বিষয় সাধারণ আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যেমন, শাসনতন্ত্র হয়ত' আইনসভার গঠন এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মগুলি নির্দিষ্ট করিয়া দিল কিন্তু নির্বাচন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ সাধারণ আইন করিয়া নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

শাসনতন্ত্রগুলিকে লিখিত ও অলিখিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে ধারণা হয় যে, সকল শাসনতান্ত্রিক আইনই বিধিবদ্ধ

তৃতীয়ত, লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্যের মধ্যে আর একটি ইংগিত থাকিতে পারে যে, আইন বিধিবদ্ধ ছাড়া হইতে পারে না; এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা অলিখিত এবং অনির্দিষ্ট। এইরূপ মনে করাও যুক্তিযুক্ত নহে। অনেক আইন আছে যাহা সম্পূর্ণ প্রথাগত এবং অলিখিত। আবার অনেক শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি আছে যাহা লিখিত এবং আইন অপেক্ষা কোন অংশে কম স্পষ্ট নয়—যেমন ১৯৩১ সালের ওয়েষ্টমিনিস্টার আইনের (**Statute of Westminister, 1931**) মুখবন্ধে গ্রেট ব্রিটেনের সহিত ডোমিনিয়নগুলির সম্পর্ক বিষয়ে এরূপ কয়েকটি রীতিনীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যাহা বিধিবদ্ধ আইনের মতই স্পষ্ট।

বিধিবদ্ধ না হইয়াও আইন হইতে পারে

অনেক সময় বলা হয় যে, লিখিত শাসনতন্ত্র অলিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে অধিকতর সমর্থ। এ-যুক্তির অবশ্য খুব সারবত্তা আছে বলিয়া মনে হয় না। জার্মেনীর পূর্বতন শাসনতন্ত্র লিখিত ছিল কিন্তু তাহা জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। আসল কথা হইল, শাসনতন্ত্র লিখিতই হউক আর অলিখিতই হউক সমস্তই নির্ভর করে সমাজের গতি ও প্রকৃতির উপর। বৈষম্যমূলক সমাজে শাসনতন্ত্রের গতি ও প্রকৃতি পক্ষপাতদুষ্ট হইতে বাধ্য।

লিখিত শাসনতন্ত্র অলিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা সাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী নহে

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible and Rigid Constitutions): উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ হইল শাসনতন্ত্রসমূহকে সংশোধন-পদ্ধতির প্রকারভেদে সুপরিবর্তনীয়

(Flexble) এবং দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা। এই শ্রেণীবিভাগের জন্য আমরা লর্ড ব্রাইসের নিকট ঋণী। যে শাসনতন্ত্রকে সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে সাধারণ আইনসভা অতি সহজে পরিবর্তন করিতে সমর্থ তাহাকে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible Constitution) আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের বেলায় সংশোধন ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য নাই।

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র কাহাকে বলে

অপরপক্ষে, যে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে সম্ভব হয় না এবং পরিবর্তনের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় তাহাকে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্পষ্টতই দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের বেলায় শাসনতন্ত্র এবং সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। শাসনতান্ত্রিক আইন সাধারণ আইন হইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হয় এবং উহার পরিবর্তন বিষয়ে সাধারণ আইনসভার উপর বাধানিষেধ বর্তমান থাকে।

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র কাহাকে বলে

সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রেট ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পার্লামেণ্ট যে-প্রণালীতে সাধারণ আইন পাস করে ঠিক সেই প্রণালীতেই আবার শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত আইন পাস করিতে সমর্থ। অপরপক্ষে, দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কথা বলা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা, কংগ্রেস (Congress), যেভাবে সাধারণ আইন পাস করিতে সমর্থ সেইভাবে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে সমর্থ নহে। শাসনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করে কংগ্রেসের প্রত্যেক কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অথবা রাষ্ট্রসমূহের আইনসভার অনধিক দুই-তৃতীয়াংশের অনুরোধে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত এক জাতীয় সভা (National Convention)। এইভাবে প্রস্তাবিত সংশোধন যখন রাষ্ট্রসমূহের তিন-চতুর্থাংশের সমর্থন লাভ করে তখনই উহা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

দৃষ্টান্ত

এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেই উহা দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে এমন কোন কথা নাই। যেমন, নিউজিল্যাণ্ডের সংবিধান লিখিত কিন্তু উহা সুপরিবর্তনীয়—কারণ, সাধারণ আইনসভা উহাকে সহজেই পরিবর্তন করিতে সমর্থ। ইহা ব্যতীত কোন্ শাসনতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে সুপরিবর্তনীয় না দুষ্পরিবর্তনীয় এ-প্রশ্নের উত্তর মাত্র শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করা যায় না, কারণ শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত হইবে কিনা তাহা বিশেষভাবে নির্ভর করে সমাজের প্রতিপত্তিশালীশ্রেণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। শাসনতন্ত্র ইহাদের স্বার্থের অনুকূলে

লিখিত শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় নাও হইতে পারে

কার্য করিলে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের আইনগত পদ্ধতি সহজ ও সরল হইলেও উহা পরিবর্তিত করা সহজসাধ্য নয়। অপরদিকে শাসনতন্ত্র প্রতিপত্তিশালীশ্রেণীর স্বার্থসাধনের উপযোগী না হইলে আইনগত বাধা যাহাই হউক না কেন উহা সহজেই পরিবর্তিত হয়।*

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন দেশে যে-সমস্ত পদ্ধতি অনুসৃত হয় তাহা মোটামুটিভাবে চারি শ্রেণীতে বিভক্তঃ (ক) প্রথমত, সাধারণ আইনসভা সংশোধন করিতে সমর্থ হইলেও তাহাকে কতকগুলি সর্তাদি মানিয়া চলিতে হয়—যেমন, সোবিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে সুপ্রীম সোবিয়েতের প্রত্যেক কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে ঐ উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া আবশ্যক। আমাদের ভারতীয় সংবিধানেও অনেক বিষয় আছে যাহার সংশোধন পার্লামেণ্টের প্রত্যেক কক্ষের উপস্থিত ও ভোটে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হইলে সম্পাদিত হইতে পারে। (খ) দ্বিতীয় পন্থা অনুসারে সংশোধন করিতে হইলে গণভোটের দ্বারা সাধারণের অনুমোদন লওয়া প্রয়োজন। যেমন, সুইজারল্যাণ্ডে সামগ্রিকভাবে অথবা আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে হইলে তাহা গণভোটে অংশগ্রহণকারী অধিকসংখ্যক নাগরিক এবং অধিকসংখ্যক ক্যাণ্টন কর্তৃক গৃহীত হওয়া আবশ্যক। (গ) তৃতীয় পন্থা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধনের বেলায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই পন্থা অনুযায়ী সংশোধনকার্য সম্পাদনে যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক রাজ্যগুলির সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আংগিক রাজ্যগুলির তিন-চতুর্থাংশের এবং সুইজারল্যাণ্ডে অধিকসংখ্যক ক্যাণ্টনের অনুমোদন থাকা আবশ্যক। ভারতীয় সংবিধানে অনেক বিষয় আছে—যেমন, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি, ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টন ইত্যাদি—যাহাদের পরিবর্তনের জন্য রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলের অন্তত অর্ধেকের অনুমোদন প্রয়োজন। (ঘ) চতুর্থ পন্থা অনুসারে সংশোধনকার্য এক বিশেষ সভা (a special convention) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে—যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংশোধনী প্রস্তাব রাষ্ট্রগুলির দুই-তৃতীয়াংশের অনুরোধে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত সভা আনয়ন করিতে পারে। আবার সংশোধনী প্রস্তাব রাষ্ট্রগুলির তিন-চতুর্থাংশের আহূত সভার দ্বারা সমর্থিত হইয়া আইনসিদ্ধ হইতে পারে। অবশ্য এই পদ্ধতি বাধ্যতামূলক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক রাষ্ট্রগুলির কোথাও কোথাও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য বিশেষ সভার ব্যবস্থা আছে।

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের পদ্ধতিসমূহ

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Defects of Flexible and Rigid Constitutions): সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের

* "..the ease or the frequency with which a Constitution is amended depends not only on the legal provisions which prescribe the method of change but also on the predominant political and social groups in the community.." K. C. Wheare

গুণ সম্পর্কে বলা হয় যে, এইরূপ সংবিধান পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সহজে তাল রাখিয়া চলিতে পারে। সময়ের পরিবর্তনের ফলে নূতন ধ্যান-ধারণা ও সমস্যা দেখা দেয় এবং উহার সংগে সংগে শাসনতন্ত্রেরও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হইতে পারে। সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রকে সময়োপযোগী করা খুব সহজসাধ্য।* আরও বলা হয় যে, জনসাধারণের মধ্যে যখন কোন পরিবর্তনের সপক্ষে আন্দোলন বা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তখন শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তিত করিয়া জনসাধারণের আন্দোলনকে সহজেই প্রশমিত করা সম্ভব। দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের সময় এবং সংকটকালীন অবস্থায় এইরূপ শাসনতন্ত্রকে বিশেষভাবে উপযোগী বলিয়া মনে করা হয়।

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ :
১। ইহা পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে
২। ইহা সংকট-কালীন অবস্থায় বিশেষ উপযোগী

অপরদিকে, সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের সমালোচনাও করা হইয়া থাকে। বলা হয় যে, ইহার প্রধান ত্রুটি হইল স্থিতিশীলতার অভাব। পরিবর্তন অতি সহজসাধ্য বলিয়া এইরূপ শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়ে এবং কারণে-অকারণে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সাময়িক উন্মাদনার বশে বহু কল্যাণকর নিয়ম-কানুন ও প্রতিষ্ঠানের অবসান ঘটাইবার আশংকা সব সময়ই বর্তমান থাকে। মৌলিক আইন হিসাবে সাধারণ আইন হইতে এইরূপ শাসনতন্ত্রের পৃথক মর্যাদা না থাকায় উহার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধাও আকর্ষিত হয় না। আবার মৌলিক অধিকার এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংরক্ষণের পক্ষে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র অনুপযোগী বলিয়াও সমালোচিত হইয়াছে।

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের ত্রুটি :
১। স্থিতিশীলতার অভাব ইহার প্রধান দুর্বলতা
২। ইহা সাধারণের শ্রদ্ধা বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না

যে-সমস্ত ক্ষেত্রে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র ত্রুটিবিহীন ; এবং যে-সমস্ত ক্ষেত্রে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র গুণসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রকে ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়। দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের যে-সকল গুণের কথা উল্লিখিত হয় তাহার মধ্যে প্রধান হইল যে, ইহা স্থিতিশীল, সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। সাময়িক উন্মাদনা বা গণ-আন্দোলনের ফলে অথবা সাধারণ আইনসভার খেয়ালখুসী অনুযায়ী ইহা যখন-তখন পরিবর্তিত হয় না। মৌলিক আইন হিসাবেও ইহা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ :
১। দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ স্থিতিশীলতা, নির্দিষ্টতা এবং সুস্পষ্টতা
২। ইহা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন

* "They can be stretched or bent so as to meet emergencies without breaking their framework." Bryce

৩। ইহা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের পক্ষে উপযোগী

এবং ইহা দ্বারা মৌলিক অধিকারসমূহ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়া থাকে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয় সেখানে আংগিক রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে এইরূপ শাসনতন্ত্রকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয়।

৪। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য

ত্রুটি :

১। ইহা সংস্কার-সাধনের বিশেষ পরিপন্থী

অপরপক্ষে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের কয়েকটি ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়া থাকে। বলা হয় যে, কোন কল্যাণকর সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলে শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় বলিয়া তাহা কার্যকর করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সহিত এইরূপ শাসনতন্ত্র সংগতি রাখিয়া চলিতে পারে না। এজন্য সংকটকালীন অবস্থায় শাসনতন্ত্রকে ভংগ করিবার, বিপ্লব আনয়ন করিবার প্রবল প্রবণতা দেখা যায়। মেকলেকে (Macaulay) উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়, বিপ্লবের প্রধান কারণ হইল যে জাতি যখন অগ্রসর হয় সংবিধান তখন স্থিতিশীল থাকে।* অবশ্য এই সমস্ত ত্রুটির মাত্রা নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের সংশোধনকার্য কত বেশী কষ্টকর তাহার উপর। আবার মার্কিন দেশের

২। ইহা বিচার বিভাগের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হইতে পারে

মত যুক্তরাষ্ট্রে আদালত শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকার এবং শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের নিয়ন্ত্রক হিসাবে প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করে; কিন্তু বিচারকরা যে-শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হন এবং যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টিভংগি রক্ষণশীল হইতে বাধ্য। ফলে তাঁহারা সংবিধানের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া এবং আইনসভার কার্যে বাধার সৃষ্টি করিয়া সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেন।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত দোষত্রুটি অপসারণের উদ্দেশ্যে ল্যাস্কির (Laski) মত অনেক লেখক এই দুই প্রকার শাসনতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ল্যাস্কির অভিমত হইল, শাসনতন্ত্র ব্রিটেনের

উভয় প্রকার শাসনতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা

শাসনতন্ত্রের মত অতটা সুপরিবর্তনীয় হওয়াও উচিত নয়, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত অতটা দুষ্পরিবর্তনীয়ও হওয়া কাম্য নয়। তাঁহার মতে, শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের অনুমোদন-সাপেক্ষ হওয়া উচিত।

আমাদের এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, কোন দেশের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজসাধ্য কি কষ্টসাধ্য তাহা কেবলমাত্র নির্ধারিত আইনগত সংশোধন-পদ্ধতির সরলতা বা জটিলতার উপর নির্ভর করে না। উহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে যে-শ্রেণীর লোক সমাজজীবনে এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশীল তাহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর।

* "The great cause of revolutions lies in this that while nations move onward, constitutions stand still."

শাসনতন্ত্রের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ **(Development and Expansion of Constitutions) :** এ-পর্যন্ত পাঠ করিয়া এ-ধারণা সহজেই হইবে যে, কোন শাসনতন্ত্রই চূড়ান্ত ও চিরন্তন নহে। সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে শাসনতন্ত্রেরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিতে বাধ্য। লর্ড ব্রুহামের (**Lord Brougham**) ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, উপযোগী হইতে হইলে শাসনতন্ত্রের পক্ষে সম্প্রসারণশীল হইতে হইবে। এই প্রকারের আর একটি সুপ্রচলিত উক্তি হইল, "সকল জীবন্ত রাষ্ট্র-নৈতিক সংবিধানই বিবর্তনশীল।"* লিখিত শাসনতন্ত্রের বিবর্তন ও সম্প্রসারণ প্রধানত তিনটি উপায়ে ঘটিয়া থাকে—যথা, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা দ্বারা, বিচারালয়ের ব্যাখ্যা দ্বারা এবং আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পরিবর্তনের দ্বারা। এখন এই তিনটি পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

লিখিত শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারণের তিনটি প্রধান পদ্ধতি

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা (Customs, Usages and Conventions) : যে কোন শাসনতন্ত্র বিশ্লেষণ করিলেই ইহাতে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথার গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা যাইবে—এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দুষ্পরিবর্তনীয় ও লিখিত শাসনতন্ত্রেও রীতিনীতি ও প্রথার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্টের ক্যাবিনেট সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে ক্যাবিনেটের যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। এই ক্যাবিনেট, ইহার দায়িত্ব ও কার্যাবলী—সমস্তই গড়িয়া উঠিয়াছে প্রথাগত রীতিনীতির ভিত্তিতে। সেইরূপ আবার প্রথাগত রীতিনীতির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে মার্কিন রাষ্ট্রপতির কার্যত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা, কংগ্রেসের সম্মতিপ্রাপ্তির পূর্বেই যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা, ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় অন্যান্য সুপ্রতিষ্ঠিত সংবিধানের পর্যালোচনা করিলে ঐ একই সত্য প্রকাশিত হইবে যে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা পুরাতন শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংগ। এই অংগহানি ঘটাইলে শাসনতন্ত্র কার্যকর করা একরূপ অসম্ভবই হইয়া পড়িবে।

সকল শাসনতন্ত্রেই রীতিনীতি ও প্রথার গুরুত্ব রহিয়াছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ

বিচারালয়ের ব্যাখ্যা (Judicial Interpretation) : বিচারালয়ের ব্যাখ্যা দ্বারা লিখিত শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারণ বিশেষভাবে ঘটিয়া থাকে। ইহার কারণ বহুবিধ। প্রথমত, যতই সতর্কতার সহিত রচিত হউক না কেন, প্রত্যেক লিখিত শাসনতন্ত্রে কিছু-না-কিছু দ্ব্যর্থবোধক শব্দসমষ্টি থাকিবেই। ফলে এই দ্ব্যর্থবোধকতা দূর করিয়া শাসনতন্ত্রের ধারাগুলির সুস্পষ্ট অর্থদানের ভার বিচারালয়ের উপর পড়ে। দ্বিতীয়ত, শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে। সুতরাং সম্পূর্ণ করিয়া

বিচারালয়ের ব্যাখ্যা দ্বারা শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারণের কারণ বহুবিধ

* "Living political constitutions must be Darwinian in structure and in practice." Woodrow Wilson

তোলার ভার পড়ে বিচারালয়ের উপর। ফলে শাসনতন্ত্রেরও সম্প্রসারণ ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়ত, শাসনতন্ত্রের প্রণেতৃবর্গের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে। এ-ক্ষেত্রেও বিচারালয়ের ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নাই। বিচারপতিগণ যে শুধু মতদ্বৈধতার বিচার করিয়া এক বা অন্য মতের সপক্ষে রায় দেন তাহা নহে; তাঁহারা অনেক সময় সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব নূতন মতও প্রচার করেন। ফলে শাসনতন্ত্র অনেক সময় অভাবিতভাবে সম্প্রসারিত ও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনুসারে "স্থলবাহিনী"র (Land Forces) উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব রহিয়াছে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের মতে, "স্থলবাহিনী" বলিতে শাসনতন্ত্র-প্রণেতৃবর্গ স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী—তিন রক্ষিবাহিনীই বুঝিয়াছিলেন। ফলে মার্কিন দেশে সম্পূর্ণভাবে সামরিক বাহিনীর উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হইতেই আরও অসংখ্য উদাহরণ লইয়া দেখানো যাইতে পারে যে, বিচারালয়ের ব্যাখ্যা কিভাবে শাসনতন্ত্রের সম্প্রসারণ ঘটাইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ

আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন (Constitutional Amendment): প্রত্যেক লিখিত শাসনতন্ত্রে ইহার পরিবর্তনের পদ্ধতিও লিপিবদ্ধ থাকে। এই আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবর্তনের পদ্ধতিই হইল শাসনতন্ত্র সম্প্রসারণের সর্বপ্রধান উৎস। গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু। কোন জাতি, কোন সমাজ যদি বাঁচিয়া থাকে তবে ইহা গতিশীল হইবেই। গতিশীল জাতি, গতিশীল সমাজের পক্ষে স্থিতিশীল শাসনতন্ত্র কোন মতে উপযোগী হইতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজনবোধে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হইবে; ইহার পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে—পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ইহার সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে।

আনুষ্ঠানিক পরিবর্তনই শাসনতন্ত্র সম্প্রসারণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎস

***সুশাসনতন্ত্রের উপাদান* (Requisites of a Good Constitution):** অনেক সময় প্রশ্ন তোলা হয় যে, সুশাসনতন্ত্রের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন? এ-বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য মতামতের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে শাসনতন্ত্রের ভালমন্দ বিচারের মাপকাঠি ভিন্ন ভিন্ন। ইহা সত্ত্বেও সাধারণভাবে সুশাসনতন্ত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমত, শাসনতন্ত্র সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হইবে; শাসনতন্ত্রের ভাষায় কোন প্রকার অস্পষ্টতা থাকিবে না এবং উহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতবিরোধের বিশেষ অবকাশ থাকিবে না। অন্যথায় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য লইয়া অনবরত বিবাদ-বিসংবাদ লাগিয়া থাকিবে। এইজন্যই বলা হয় যে, স্পষ্টভাবে লিখিত শাসনতান্ত্রিক আইনকানুন অলিখিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা (customs and usages) অপেক্ষা শ্রেয়।

শাসনতন্ত্র সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হইবে

দ্বিতীয়ত, শাসনতন্ত্রের একদিকে যেমন ব্যাপকতা বা প্রসারতা (comprehensiveness) থাকা প্রয়োজন অপরদিকে তেমনি আবার ইহার পক্ষে যথাসম্ভব স্বল্পায়তন-বিশিষ্ট বা সংক্ষিপ্ত (short) হওয়া প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকিবে। কিন্তু শাসনতন্ত্র ব্যাপক হইলেও উহা রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির মধ্যে যাইবে না, যাহা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যাহা অপরিহার্য তাহাই মাত্র শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত করা সমীচীন। যে-ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র সর্ববিষয়ে খুঁটিনাটির মধ্যে যায় সে-ক্ষেত্রে সংবিধান মাত্র বৃহদায়তন-বিশিষ্টই হয় না; অকাম্যভাবে জটিলতারও সৃষ্টি করে এবং বিবাদ-বিসংবাদের পথ প্রশস্ত করে। আইনসভার উদ্যোগ ও দায়িত্বও অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়। জটিলতার জন্য জনসাধারণও শাসনতন্ত্রের সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহা ব্যতীত বিস্তৃত শাসনতন্ত্র দ্রুতপরিবর্তনশীল সমাজের সহিত সংগতি হারাইয়া ফেলে। পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য উহাকে অনবরত সংশোধন করিতে হয় অথবা বহুবিধ রীতিনীতি বা প্রথা প্রবর্তিত করিতে হয় অথবা ব্যাখ্যার মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের অর্থের পরিবর্তন করিতে হয়। সুতরাং শাসনতন্ত্র যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হইবে;* এবং উহা রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত বিচারক জন মার্শালও (John Marshall) অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।** অবশ্য এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র যতটা সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ততটা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দিতে হয় এবং শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের উপর বাধা-নিষেধ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়।

শাসনতন্ত্র যেমন একদিকে ব্যাপক হইবে তেমনি আবার সংক্ষিপ্ত হইবে

সুশাসনতন্ত্রের আলোচনা প্রসংগে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি মৌলিক অধিকার লিখিত সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন কি না? এ-সম্পর্কেও যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। এক শ্রেণীর চিন্তাবিদের

* "One essential characteristic of the ideally best form of Constitution is that it should be as short as possible." K. C. Wheare

** "A Constitution to contain an accurate detail of all the subdivisions of which its great powers will admit, and of all the means by which they may be carried into execution, would partake of the prolixity of a legal code, and could scarcely be embraced by the human mind....Its nature, therefore, requires that only its great outlines should be marked, its important objects designated, and the minor ingredients which compose those objects be deduced from the nature of the objects themselves." Marshall [McCulloch *V.* Maryland]

মতে, অধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। ল্যাস্কির মতে, অধিকার শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে শাসন বিভাগ অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইলে জনসাধারণ সহজেই সরকারের বিরুদ্ধে আইনভংগের অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে। ইহা ছাড়া জনসাধারণও তাহাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে। অবশ্য অধিকার সংরক্ষিত হইবে কিনা তাহা নির্ভর করে সমাজের প্রকৃতি এবং জনসাধারণের সাহসিকতার উপর। অপরদিকে অধ্যাপক হোয়ার (Prof. K. C. Wheare) প্রমুখ লেখকগণ অধিকারকে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন অধিকার সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে তাহার সংগে বাধা-নিষেধের উল্লেখ করিতে হয়। ইহার ফলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকারের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না। এ-অবস্থায় অধিকার সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া সাধারণ আইনের দ্বারাই নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত করাই উচিত।* তবে বর্তমান সময়ে প্রায় সকল দেশের শাসনতন্ত্রেই কতকগুলি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কতকগুলি মৌলিক অধিকার সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হইবে

পরিশেষে, শাসনতন্ত্রকে নির্দিষ্ট আইনসংগত পদ্ধতিতে সংশোধন করিবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা না করা হইলে বলপূর্বক বা বিপ্লবের সাহায্যে পরিবর্তন করিবার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। সংশোধন সম্পর্কে বলা হয় যে, উহা অত্যন্ত সহজসাধ্য অথবা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কোনটিই হইবে না। সংশোধন অত্যন্ত সহজসাধ্য হইলে সাময়িক উত্তেজনার বশে আইনসভা অকাম্যভাবে শাসনতন্ত্রের যখন তখন পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পাইবে; অপরপক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইলে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না।

নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র সংশোধনের ব্যবস্থা

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের অর্থ ঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি করিয়া শাসনতন্ত্র বা সংবিধান থাকে। এই 'শাসনতন্ত্র' শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে শাসনতন্ত্র বলিতে শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত লিখিত ও অলিখিত নিয়মকানুনকে বুঝায়। এই সমস্ত নিয়ম-কানুনের মধ্যে আদালতগ্রাহ্য আইন এবং আচারব্যবহার রীতিনীতি উভয়ই স্থান পায়। সংকীর্ণ অর্থে 'শাসনতন্ত্র' বলিতে বুঝায় মাত্র সেই লিপিবদ্ধ মৌলিক আইনকে যাহার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের সম্পর্ক প্রভৃতি মৌলিক নীতিগুলি নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। টক্‌ভিল প্রভৃতি লেখকের মতে, 'শাসনতন্ত্র' শব্দটিকে এই সংকীর্ণ অর্থেই গ্রহণ করা উচিত। বর্তমানে অবশ্য এ-মত বিশেষ মানিয়া লওয়া হয় না—

* 'The ideal Constitution....would contain few or no declaration of rights, though the ideal system of law would define and guarantee many rights.' K. C. Wheare

কারণ একমাত্র মৌলিক আইনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না—শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত রীতিনীতি, সাধারণ আইন, শাসনতন্ত্রের আদালত-প্রদত্ত ব্যাখ্যা প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়।

শাসনতন্ত্র উৎপত্তির বিভিন্ন ধারা : শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রধান পদ্ধতি হইল পাচটি : (ক) কোন কারণে রাজশক্তি নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাসন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারে ; (খ) বিপ্লবের পর নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ; (গ) কোন দেশ স্বাধীনতালাভ করিয়া নূতনভাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে ; (ঘ) রাষ্ট্র সমবায়ের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রণীত হইতে পারে ; এবং (ঙ) ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে শাসনতন্ত্রের উদ্ভব হইতে পারে।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ : শাসনতন্ত্রের সুপ্রচলিত শ্রেণীবিভাগ হইল লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নয়—কারণ, প্রত্যেক শাসনতন্ত্রেরই কিছুটা অংশ লিখিত এবং কিছুটা অংশ অলিখিত। সুতরাং লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে যে-পার্থক্য তাহা পরিমাণমত, প্রকৃতিগত নহে।

এই কারণে লর্ড ব্রাইস শাসনতন্ত্রকে সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয়—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রকে সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে পরিবর্তিত করা যায়, আর দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনসাধন করিতে হইলে বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। গ্রেট ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ : সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের যাহা গুণ দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের তাহা ত্রুটি এবং সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের যাহা ত্রুটি দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের তাহা গুণ। সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র পরিবর্তনশীল ও সংকটকালীন অবস্থার বিশেষ উপযোগী কিন্তু স্থিতিশীলতার অভাব ইহার প্রধান দুর্বলতা। উপরন্তু, ইহা জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না, মৌলিক অধিকার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থও সংরক্ষণ করিতে পারে না।

অপরদিকে, দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র স্থিতিশীল, নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। ইহা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণেরও অধিকতর উপযোগী। এইরূপ শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু ইহা সংকটকালীন অবস্থার বিশেষ উপযোগী নহে ; সময়ের পরিবর্তনশীলতার সহিতও ইহা তাল রাখিতে পারে না। পরিশেষে এইরূপ শাসনতন্ত্র বিচার বিভাগের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হইতে পারে।

সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত দোষত্রুটির জন্য ল্যাস্কির মত অনেক লেখক উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

শাসনতন্ত্রের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ : বিভিন্নভাবে শাসনতন্ত্র পরিবর্ধিত ও সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রধান তিনটি পদ্ধতি হইল (ক) শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথার উদ্ভব ; (খ) বিচারালয়ের ব্যাখ্যা ; এবং (গ) আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন।

সুশাসনতন্ত্রের উপাদান : প্রথমত, সংবিধান নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হইবে। সংবিধানের ভাষার অস্পষ্টতা থাকিলে বিবাদ-বিসংবাদের সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত, সামগ্রিকভাবে শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকিবে ; কিন্তু শাসনতন্ত্র বৃহদায়তন হইবে না। যথাসম্ভব সংক্ষেপের মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয় সম্বন্ধেই আইনগত ব্যবস্থা থাকিবে। তৃতীয়ত, অনেকের মতে, কতকগুলি মৌলিক অধিকার সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত হইবে। পরিশেষে, শাসনতন্ত্র সংশোধনের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। এ-বিষয়ে সংবিধান অত্যন্ত দুষ্পরিবর্তনীয় কিংবা অত্যন্ত সুপরিবর্তনীয় হইবে না।

প্রশ্নোত্তর

1. "The difference between rigid and flexible constitutions is one of degree." Examine the statement. (২৮৮-২৯০ পৃষ্ঠা)

2. What are the different ways of development and expansion of constitutions ? (২৯৩-২৯৪ পৃষ্ঠা)

সপ্তদশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

(DIFFERENT ORGANS OF GOVERNMENT)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদে সরকারের তিনটি বিভাগকে সমক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইলেও বলা হয় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবস্থা বিভাগই অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদাসম্পন্ন। ইহার কারণ হইল, ব্যবস্থা বিভাগের কার্য অপর দুই বিভাগের কার্য অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আইনানুসারে শাসন করিবার বা আইনভংগের জন্য শাস্তিপ্রদান করিবার পূর্বে প্রয়োজন আইন প্রণয়নের। ব্যবস্থা বিভাগই আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং ব্যবস্থা বিভাগের কার্য অপর দুই বিভাগের কার্যের পূর্ববর্তী। পূর্ববর্তী বলিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি প্রবর্তিত থাকিলেও ইহা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ; এবং এই কারণে ব্যবস্থা বিভাগ অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। সুতরাং ব্যবস্থা বিভাগ সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা হইতেছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে ব্যবস্থা বিভাগ অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পন্ন

ব্যবস্থা বিভাগ (The Legislature) : বলা হইয়াছে যে, গণতন্ত্রে ব্যবস্থা বিভাগই অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন। এই উক্তি হইতে ধরিয়া লওয়া যায় যে, অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে ব্যবস্থা বিভাগ শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর কর্তৃত্বসম্পন্ন নহে। বস্তুত, রাজতন্ত্রের অধীনে, একনায়কতন্ত্রের অধীনে, আমলাতন্ত্রের অধীনে ব্যবস্থা বিভাগের স্থান

শাসন বিভাগের উর্ধ্বে নির্দিষ্ট হয় না, বরং শাসন বিভাগই ব্যবস্থা বিভাগের উর্ধ্বে অবস্থান করে। জারের অধীনে রাশিয়ার ব্যবস্থাপক সভা মর্যাদায় শাসন-কর্তৃপক্ষের উপদেষ্টা পরিষদ ছাড়া কিছুই ছিল না। বর্তমানে বহু ইসলাম ধর্মীয় রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা ঐ মর্যাদাই ভোগ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতা ও মর্যাদা অনুরূপই ছিল। ইহা শাসন-কর্তৃপক্ষের নীতি ও কার্যের সমালোচনা করিতে পারিত কিন্তু শাসন-কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত না। হিটলার ও মুসোলিনীর ন্যায় একনায়ক (Dictator) ব্যবস্থা বিভাগকে একরূপ উপেক্ষাই করিয়াছিলেন। মুসোলিনী বলিয়াছিলেন, "পার্লামেণ্ট একটি ক্রীড়নক মাত্র ; কিন্তু এই ক্রীড়নককে লোকে পছন্দ করে।"* সুতরাং পার্লামেণ্টের মাত্র অস্তিত্বটুকু বজায় রাখিয়া তিনি ইহার সর্বক্ষমতা অপহরণ করিয়াছিলেন।

অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিন্তু শাসন বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগের উর্ধ্বে অবস্থান করে

কার্যাবলী : দেখা গেল, ব্যবস্থা বিভাগের ক্ষমতা ও মর্যাদায় গণতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রভূত পার্থক্য রহিয়াছে। একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের কথা ধরিলেও সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থা বিভাগ মর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পন্ন নহে। পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের উপর ব্যবস্থা বিভাগের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার অপেক্ষা অধিকতর প্রকাশিত। ইহার কারণ হইল, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকে অস্বীকার করে কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মূল ভিত্তিই হইল ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যবস্থা বিভাগের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা সকল দেশে এক এবং অভিন্ন নহে। ফলে কার্যাবলীও অভিন্ন হইতে পারে না। অভিন্ন না হইলেও অন্তত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে একরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এই সকল মূল কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইল :

সকল গণতান্ত্রিক দেশেও ব্যবস্থা বিভাগ সমান ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পন্ন নহে

তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এই কার্যাবলীর মধ্যে একরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে

(১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য : ইহাই ব্যবস্থা বিভাগের প্রধান কার্য। বর্তমানে ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইনই আইনের প্রধান উৎস। আইন প্রণয়নের অন্যান্য পদ্ধতি ধীরে ধীরে এই উৎসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতেছে। আজিকার দিনের ব্যবস্থাপক সভা পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সংগতি বজায় রাখিবার জন্য প্রথাগত আইনের সংশোধন করে, প্রয়োজন হইলে ইহার বিলোপসাধন করে এবং ইহার স্থানে নূতন আইন প্রবর্তন করে।

আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা বিভাগের প্রধান কার্য

(২) আলোচনামূলক কার্য : আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়—প্রকৃত আইন প্রণয়ন ও আলোচনা। যদিও ইহারা একই কার্যপদ্ধতির

* "Parliament is a plaything ; but a plaything people like to have."

দুইটি অংশ তবুও অনেকের মতে ইহাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। প্রকৃত আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য হইল সুদক্ষ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কার্য। জনসাধারণের সাধারণ প্রতিনিধিগণ ঠিকমত এই কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। সুতরাং জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ লেখকের মতে, এই কার্যের ভার কয়েকজন সুদক্ষ লইয়া গঠিত একটি ক্ষুদ্র কমিটির উপর ন্যস্ত করা উচিত।

আলোচনামূলক কার্যের গুরুত্ব

প্রকৃত আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য কমিটির মাধ্যমে সম্পাদন করা হইলেও আলোচনামূলক কার্য ন্যস্ত থাকিবে সমগ্র ব্যবস্থাপক সভার উপর। তাহা না হইলে ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইনে সকলের মত প্রতিফলিত হইবে না। প্রত্যেকের ধ্যানধারণা তাহার পারিপার্শ্বিকের আপেক্ষিক হয়। আইনের প্রয়োজনীয়তা, রূপ, প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ক্ষুদ্র কমিটির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলে সমগ্র দেশের চিন্তা ও মতামত আইনে প্রতিফলিত হইবে না। তখন আইন হইবে ক্ষুদ্রতম গণ্ডির ধ্যানধারণার প্রতিবিম্ব। এইজন্য প্রয়োজন সকল স্বার্থ, সকল শ্রেণীর পক্ষে আইন প্রণয়নের আলোচনায় অংশগ্রহণের। সুতরাং আলোচনাকার্য হইবে সমগ্র ব্যবস্থাপক সভার, মাত্র কমিটির নহে।

জাতীয় অর্থের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করা ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম প্রধান কার্য

(৩) অর্থ সংক্রান্ত কার্য : বর্তমানে জনশাসনের অন্যতম মৌলিক নীতি হইল যে, জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের সম্মতি ব্যতীত কোন কর-ধার্য বা ব্যয়-বরাদ্দ করা উচিত নহে। অতীতে জনসাধারণকে এই অধিকার আদায় করিবার জন্য বিশেষ সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। বর্তমানে সভ্য জগতে এই নীতি গৃহীত হওয়ায় সকল সভ্য দেশে জাতীয় অর্থের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করা ব্যবস্থা বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক রাষ্ট্রে ব্যবস্থা বিভাগের এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা এত ব্যাপক যে, ইহার সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না। ব্যবস্থাপক সভার হস্তে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করার অর্থ হইল যে যুদ্ধে বিরাট অর্থ ব্যয় হয় এবং যেখানে অর্থব্যয়ের প্রশ্ন রহিয়াছে সেখানে জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের সম্মতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপক সভা জাতীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে বলিয়া ইহা সমগ্রভাবে আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক নীতিও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

জাতীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব

ব্যবস্থা বিভাগ নানাভাবে শাসন সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে

৪। শাসন সংক্রান্ত কার্য : তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে শাসন পরিচালনা ব্যবস্থা বিভাগের কার্য নহে। তবুও দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা বিভাগ শাসন সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ায় ব্যবস্থাপক সভার কমিটির মাধ্যমে নানাপ্রকার শাসন সংক্রান্ত কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত

সরকারেও ব্যবস্থাপক সভা শাসন সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ব্যবস্থাপক সভার ঊর্ধ্বতন পরিষদ সিনেটের (Senate) হস্তে শাসন সংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে। সিনেট মার্কিন-রাষ্ট্রপতির সহিত পরামর্শক্রমে সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রপতি কোন সন্ধি সম্পাদন করিলে তাহা সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাধিক্য দ্বারা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত না হইলে কার্যকর হয় না।

(৫) বিচার সংক্রান্ত কার্য : ব্যবস্থাপক সভা অনেক ক্ষেত্রে বিচার সংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা, নিজ সভ্যগণের আচরণের বিচার, রাষ্ট্রপতি প্রভৃতি উচ্চপদাধিকারিগণের কার্যাকার্যের বিচার বা ইম্‌পিচমেণ্ট প্রভৃতি এই সকল বিচার সংক্রান্ত কার্যের অন্তর্ভুক্ত। অনেক রাষ্ট্রে আবার ব্যবস্থাপক সভার ঊর্ধ্বতন কক্ষ চূড়ান্ত আপিল বিচারের আদালত হিসাবে কার্য করিয়া থাকে। ইংল্যাণ্ডে লর্ড সভা হইল দেশে উদ্ভূত সকল মামলার আপিল বিচারের চূড়ান্ত আদালত।

ব্যবস্থা বিভাগের বিচার সংক্রান্ত কার্যও রহিয়াছে

(৬) সংবিধান সংক্রান্ত কার্য : সংবিধান সংক্রান্ত কার্য বলিতে সংবিধানের পরিবর্তন ও সংবিধানের ব্যাখ্যার কার্য বুঝায়। অনেক রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা সমগ্র বা আংশিকভাবে সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে। ভারত এই সকল রাষ্ট্রের অন্যতম।

ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা সংবিধানের ব্যাখ্যার আলোচনায় সুইজারল্যাণ্ডের কথাই সর্বাগ্রে এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। সুইজারল্যাণ্ডে জাতীয় ব্যবস্থাপক সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা-কর্তা। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিবার কোন ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের নাই।

অনেক ক্ষেত্রে উহার হস্তে সংবিধানের পরিবর্তন এবং ব্যাখ্যার ভার থাকে

ব্যবস্থাপক সভার সংগঠন (Organisation of the Legislature) **:** বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রেরই জাতীয় ব্যবস্থাপক সভার দুইটি অংশ আছে : প্রথম বা নিম্ন পরিষদ এবং দ্বিতীয় বা উচ্চ পরিষদ। এইরূপ ব্যবস্থাকে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা **(Bi-cameralism)** বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং ব্যবস্থাপক সভা একটিমাত্র পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে সেই ব্যবস্থাকে এক-পরিষদ ব্যবস্থা (**Unicameralism**) বলা হয়।

দ্বি-পরিষদ ও এক-পরিষদ ব্যবস্থা

ব্যবস্থাপক সভা দ্বি-পরিষদসম্পন্ন হইলে প্রথম বা নিম্ন পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে জনপ্রিয় পরিষদ বলিয়াও আখ্যা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিষদ ইংল্যাণ্ডের মত শুধু অভিজাতদের লইয়া অথবা কানাডার মত মনোনীত ধনী ব্যক্তিবর্গকে লইয়া অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত আংগিক রাজ্যগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে লইয়া অথবা অন্যভাবেও গঠিত হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিষদের গঠন

দ্বি-পরিষদ আইনসভার উদ্ভবের ইতিহাসঃ এখানে যে-সকল রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে আইনসভা লইয়া আলোচনা করা হইতেছে সেগুলিকে প্রধানত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। বর্তমানে আইনসভাগুলিকেই গণতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়, কারণ আইনসভাগুলির মাধ্যমেই জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

ফরাসী বিপ্লব আইনসভাগুলিকে গণতান্ত্রিক রূপদান করে

ফরাসী বিপ্লবই আইনসভাগুলিকে গণতান্ত্রিক রূপদান করে। ইহার পূর্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আইনসভা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে গঠিত ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে তখন সামন্তপ্রথার প্রতিফলন হিসাবে এক হইতে চারি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা দৃষ্ট হইত। এই সময়ের পূর্বে ইংল্যাণ্ডে দ্বি-পরিষদ একরূপ গড়িয়া উঠিলেও ক্রমওয়েলের শাসনকালে লর্ড সভার বিলোপসাধন করা হয়। কিছুদিন পরেই অবশ্য ইহা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে ইংল্যাণ্ডে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে।

ইংল্যাণ্ড

বিপ্লবের পর ফরাসীরা এক-পরিষদ ব্যবস্থাই গ্রহণ করে। কিন্তু শীঘ্রই দ্বি-পরিষদ-সম্পন্ন আইনসভা প্রতিষ্ঠিত করিতে একরূপ বাধ্য হয় বলা চলে। এক-পরিষদ ব্যবস্থা লইয়া ফরাসীদের পরীক্ষা সফল হয় নাই।

ফ্রান্স

আমেরিকার রাষ্ট্র-সমবায়ে প্রথমে এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় দেখা গেল যে শাসনতন্ত্র-প্রণেতৃবর্গের অধিকাংশই দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার পক্ষপাতী। আমেরিকায় প্রথমে অংগরাজ্যসমূহের অধিকাংশ এক-পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেও পরে পেন্‌সীলভানিয়া ছাড়া সকলেই দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার প্রতিষ্ঠা করে। এইদিক দিয়া পেন্‌সীলভানিয়াও শীঘ্র অপরাপর রাজ্যের পদাংক অনুসরণ করে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা পূর্ণভাবে প্রবর্তিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

অন্যান্য ইউরোপীয় এবং ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্র

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ইউরোপীয় ল্যাটিন ও আমেরিকান রাষ্ট্র এক-পরিষদ ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা করিলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে তাহারাও ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করিয়া দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

সম্প্রতি আবার এক-পরিষদ ব্যবস্থার দিকে ঝোঁক বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে। ইউরোপীয় ও ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির মধ্যে গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হণ্ডুরাস, পানামা, স্যালভেডর প্রভৃতি ইতিমধ্যেই এক-পরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন বা পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছে। কানাডার প্রদেশগুলির একটি ছাড়া অন্যগুলিতে দ্বিতীয় পরিষদের বিলোপসাধন করা হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলিতেও দ্বিতীয় পরিষদ নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর

সাম্প্রতিক গতি

নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশ—যথা, যুগোশ্লাভিয়া, এস্‌থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। মাত্র ১৯৩৪ সালে আমেরিকায় নেব্রাস্কা দ্বি-পরিষদের পরিবর্তে এক-পরিষদ পদ্ধতির প্রবর্তন করে।

বর্তমানে এইভাবে একদিকে এক-পরিষদ ব্যবস্থার দিকে ঝোঁক দৃষ্ট হওয়ায় এবং অপরদিকে পৃথিবীর সংখ্যাধিক সুসভ্য রাষ্ট্রে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকায় দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার পর্যালোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নে এই পর্যালোচনাই করা হইতেছে।

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা (Arguments for and against Bi-cameralism) : বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে যে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে তাহার কারণ বহুবিধ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অধিকাংশ রাষ্ট্র ইংল্যাণ্ডকে অনুসরণ করিয়া দ্বি-পরিষদত্বের প্রবর্তন করে; যুক্তরাষ্ট্রগুলি আমেরিকাকে অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় পরিষদের মাধ্যমে জাতীয় ও অংগরাজ্যগুলির স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে; কতকগুলি আবার এক-পরিষদ ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা করিয়া পরে দ্বি-পরিষদত্বের সমর্থনকারী হইয়া দাঁড়ায়। এই তিনটি কারণে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার দিকে এক সময় এরূপ অনুরাগ দৃষ্ট হয় যে, মনে করা হইত ব্যবস্থাপক সভা দ্বি-পরিষদসম্পন্ন হইবেই। ইহার সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই হইল প্রধান :

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রধান তিনটি কারণ

সপক্ষে যুক্তি :

(ক) দুইটি পরিষদের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করিলে তবেই সুচিন্তিতভাবে জাতীয় স্বার্থের অনুপন্থী আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়। এক-পরিষদ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি বিষয় পুংখানুপুংখভাবে আলোচিত হইতে পারে না। এই কারণে ইহাতে সর্বদাই অবিবেচনা-প্রসূত আইন প্রণীত হইবার আশংকা রহিয়াছে। এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা মুহূর্তের আবেগে আকস্মিক আইনও পাস করিতে পারে। ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত এমনকি বিপর্যস্ত হইবার আশংকাও রহিয়াছে। কিন্তু দুইটি পরিষদ থাকিলে এরূপ ঘটা দুষ্কর। প্রথম পরিষদ কোন বিল পাস করিলে দ্বিতীয় পরিষদ ধীরভাবে ইহার বিচার করে। ইহার ফলে বিলটির দোষত্রুটি ধরা পড়ে এবং বিচারে যে-কালক্ষেপ হয় তাহাতে অনেক সময় প্রথম পরিষদের ক্ষণিকের আবেগ অন্তর্হিত হয়। তখন প্রথম পরিষদ বিলটি সম্বন্ধে পুনরায় চিন্তা করিতে পারে। এইভাবে দ্বিতীয় পরিষদ অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

১। আকস্মিক আইন প্রণয়ন ব্যাহত হয়

(খ) আইনসভার দুইটি পরিষদ থাকিলে তবেই সাধারণের ইচ্ছার (General Will) যথার্থ ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়। আইনসভা যদি এক-পরিষদসম্পন্ন হয় এবং যদি ইহার সদস্যগণ একই সময়ে নির্বাচিত হন তবে ইহা কার্যকাল অতিক্রম করিবার পূর্বেই জনমতের সহিত সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু আইনসভার দুইটি

২। ইহাতে সাধারণের ইচ্ছার যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়

পরিষদ বিভিন্ন সময় নির্বাচিত হইলে এরূপ আশংকা থাকে না। ইহাতে তখন প্রবাহমান জনমত সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে।

(গ) দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার সপক্ষে পরবর্তী যুক্তি হইল, ইহা নাগরিকগণকে একমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে। লর্ড ব্রাইসের মতে, সকল আইনসভারই স্বৈরাচারী হইবার একটি অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি আছে। আইনসভা যদি এক-পরিষদসম্পন্ন হয় তবে ইহার স্বৈরাচারী ও আদর্শভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা বিশেষ পরিমাণে বর্তমান থাকে। এইজন্য আইনসভাকে দুইটি পরিষদে বিভক্ত করিয়া পরিষদ দুইটিকে সমান ক্ষমতা প্রদান করা উচিত। সমক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ দুইটির প্রত্যেকে অপরের স্বৈরাচারিতাকে সংযত রাখিতে পারে।*

৩। ইহা নাগরিকগণকে একমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে

বর্তমান যুগে লর্ড ব্রাইসের যুক্তিটি বিশেষ মানিয়া লওয়া হয় না। দেখা যায় যে, যাঁহারা দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার পক্ষপাতী তাঁহাদের প্রায় কেহই দ্বিতীয় পরিষদকে জনপ্রিয় পরিষদের ন্যায় সমক্ষমতাসম্পন্ন করিবার পক্ষপাতী নহেন।

(ঘ) দ্বিতীয় পরিষদ যে শুধু নাগরিকগণকে এক-পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে তাহাই নহে, ইহা শাসন-বিভাগকেও একমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে—এরূপ যুক্তিও অনেক সময় প্রদর্শন করা হয়। বলা হয় যে, শাসন বিভাগ যদি দেখে যে, প্রথম পরিষদ খেয়ালখুশিমত কার্য করিয়া সুশাসনের বিঘ্ন ঘটাইতেছে তখন ইহা দ্বিতীয় পরিষদের নিকট আবেদন করিয়া প্রথম পরিষদের স্বৈরাচার ও খামখেয়াল হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

৪। ইহা শাসন বিভাগকেও একমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে

দ্বি-পরিষদের সপক্ষে এই যুক্তিরও বিশেষ সারবত্তা নাই, কারণ দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম পরিষদকে সংশোধন বা তিরস্কার করিবার ক্ষমতা দ্বিতীয় পরিষদের থাকে না। উপরন্তু, পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ একমাত্র নিম্নতন পরিষদের নিকটই দায়িত্বশীল। সুতরাং শাসন বিভাগের পক্ষে ইহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পরিষদের নিকট অভিযোগের প্রশ্নই উঠে না।

(ঙ) দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা সহজেই সম্ভবপর হয়। প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় যে, রাষ্ট্রনীতিতে উৎসাহী ও অভিজ্ঞ এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহেন না। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনয়নের মাধ্যমে সহজেই আইনসভায় তাঁহাদের স্থান করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

৫। ইহাতে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়

* "The necessity of two chambers is based on the belief that the innate tendency of an assembly to become hateful, tyrannical and corrupt needs to be checked by the co-existence of another house of equal authority." Bryce

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা থাকিলে আবার অধিকাংশ সময় দ্বিতীয় পরিষদে সকল শ্রেণী, স্বার্থ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকে। এরূপ ঘটিলে আইনসভা সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ফলে জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন হইয়া দাঁড়ায়।

৬। ইহাতে সুচিন্তিত, প্রগতিমূলক, কাম্য আইন প্রণয়নের অধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে

(চ) দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে সংগঠিত দুইটি পরিষদ একে অপরের দোষত্রুটি সংশোধন করিয়া সুচিন্তিত কাম্য আইন প্রণয়নের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করিতে পারে। দ্বিতীয় পরিষদের বিজ্ঞ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ প্রথম পরিষদের উৎসাহী অথচ অনভিজ্ঞ সভ্যগণকে সংযত রাখিতে ও তাঁহাদের দোষত্রুটি সংশোধন করিতে পারেন। প্রথম পরিষদও দ্বিতীয় পরিষদের রক্ষণশীলতা কতকাংশে দূর করিয়া আইনসভাকে বিশেষভাবে জনমতের অনুবর্তী করিয়া তুলিতে পারে। এইভাবে উভয় পরিষদের সম্মিলিত বিবেচনার ফলে সুচিন্তিত, প্রগতিমূলক আইন প্রণীত হইতে পারে।

৭। অনেকে বলেন, কার্যবৃদ্ধি হওয়ার জন্য আইনসভার একটি মাত্র পরিষদ সম্ভব নহে

(ছ) বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিশেষভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় আইনসভার কার্যও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকাংশের ধারণায়, আইনসভায় একটি মাত্র পরিষদ থাকিলে সুষ্ঠুভাবে এই কার্য পরিচালনা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রয়োজন দুইটি পরিষদের। অপেক্ষাকৃত অল্প বিতর্কমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলিকে প্রথম পরিষদের পরিবর্তে দ্বিতীয় পরিষদে উত্থাপিত করা যাইতে পারে।) দ্বিতীয় পরিষদ এইরূপ বিলগুলির সম্যক আলোচনা করিয়া মতামত সহ নিম্নতন পরিষদে প্রেরণ করিলে তখন আর প্রথম পরিষদের পক্ষে এগুলি সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না। ইহা বিলগুলি সম্পর্কে উর্ধ্বতন পরিষদের মতামত গ্রহণ করিয়াই কার্যে অগ্রসর হইতে পারে। এইভাবে জনপ্রিয় পরিষদের যে-সময়সংক্ষেপ হয় তাহা অধিকতর বিতর্কমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলির বিবেচনায় ব্যয় করা যাইতে পারে।

৮। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে

(জ) দ্বিতীয় পরিষদেও প্রত্যেক বিল সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা হইতে জনসাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষালাভ করে। একটি মাত্র পরিষদ থাকিলে হয়ত' বিতর্ক ও আলোচনায় ত্রুটি থাকিয়া যাইত। ফলে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাও ত্রুটিপূর্ণ হইত।

৯। অনেকের মতে, দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য

(ঝ) অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে দ্বি-পরিষদত্ব সম্পূর্ণ অপরিহার্য। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি নীতির বা স্বার্থের সন্ধান পাওয়া যায়—জাতীয় (National) এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)। এই দুই নীতি বা স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন দ্বি-পরিষদত্বের। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত নিম্নতন পরিষদে থাকিবেন জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিগণ এবং অংগরাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ থাকিবেন দ্বিতীয় পরিষদে। অংগরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকিলে তাহাদের স্বার্থহানির সম্ভাবনা; এবং তাহাদের স্বার্থহানি ঘটিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কার্যকর হইয়া উঠিতে পারিবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে ল্যাস্কি

অধ্যাপক ল্যাস্কি অবশ্য এই ধারণা সমর্থন করেন না। তাঁহার মতে, যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলির স্বার্থসংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতার আদি বণ্টন, শাসনতন্ত্রের চরমতা এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা অংগরাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষে পর্যাপ্ত। সুতরাং দ্বিতীয় পরিষদে অংগরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব একরূপ অনাবশ্যক।

বিপক্ষে যুক্তি : আবে সিয়ের মন্তব্য

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার বিপক্ষের যুক্তির সংক্ষিপ্তসার হিসাবে আবে সিয়ের (Abbe's Sie'ye's) বিখ্যাত মন্তব্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। মন্তব্যটি হইল : দ্বিতীয় পরিষদ যদি প্রথম পরিষদকে অনুসরণ করে তবে ইহা অনাবশ্যক, যদি ইহা প্রথম পরিষদকে অনুসরণ না করে তবে উহা অনিষ্টকর।* ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, প্রথম পরিষদই জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক পরিষদ। দ্বিতীয় পরিষদ যদি জনপ্রিয় পরিষদের কার্যে বাধা সৃষ্টি করে তবে গণতন্ত্রের দিক দিয়া ইহা কাম্য হইতে পারে না। সুতরাং ইহার বিলোপসাধনই করা উচিত। অপরদিকে, দ্বিতীয় পরিষদ যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে জনপ্রিয় পরিষদের কার্য সমর্থন করিতেই থাকে তবে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া সময়ক্ষেপ ও অর্থব্যয় করা সম্পূর্ণ অহেতুক। অতএব, এক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পরিষদের বিলোপসাধন করা উচিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আবে সিয়ের মতে, দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নাই। এই মতের সমর্থনকারিগণ সংখ্যায় নগণ্য নহেন। ইঁহাদের মধ্যে বেঞ্জামিন ফ্রাংক্লিন ও হিতবাদী বেন্থামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার বিপক্ষে সিয়ে, ফ্রাংক্লিন, বেন্থাম প্রভৃতি মনীষীদের প্রদর্শিত যুক্তির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই হইল প্রধান :

সংক্ষেপে আবে সিয়ের মতে, দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই

(ক) বলা হয় যে, গণতন্ত্র দুই মুখে কথা বলিতে পারে না। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন ব্যবস্থা বিভাগের সম্পূর্ণ ঐক্য। সিয়ে বলিয়াছেন, আইন হইল জনসাধারণের ইচ্ছা মাত্র। জনসাধারণ একই বিষয়ে দুই প্রকারের মত বা ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং যে আইনসভা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিবে তাহা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধই হইবে —দুইটি পরিষদে বিভক্ত হইবে না। ফ্রাংক্লিনের মতে, দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা বিপরীতমুখী গতিসম্পন্ন অশ্ব ও অশ্বযানেরই মত।

১। দুই পরিষদে বিভক্ত গণতান্ত্রিক আইনসভা সফল হইতে পারে না

(খ) আরও বলা হয়, এক পরিষদ ব্যবস্থাতেই আইনসভার দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর। দুইটি পরিষদ থাকিলে দায়িত্ব বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং পরস্পর পরস্পরের উপর দোষ চাপাইয়া অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিবে।

২। দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থায় আইনসভার দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন

---

* "If the second chamber agrees with the first it is superfluous ; if it disagrees it is pernicious."

দ্বিতীয় পরিষদও সকল সময় বিবেচনার সহিত কার্য করে না। ইহা একরূপ ধরিয়া লয় যে, বিরোধিতা করাই ইহার কর্তব্য। বিরোধিতা করিতে করিতে ইহা অভ্যাসে পরিণত হইতে পারে। ফলে ইহা অনেক সময় সুচিন্তিত কাম্য আইন প্রণয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। অন্য দিকে আবার বাধাপ্রাপ্তির ভয়ে নিম্নতন কক্ষ প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধনে অগ্রসর হইতে পারে না। দুই পরিষদ সমক্ষমতাসম্পন্ন হইলে এইরূপ বিপদের আর অন্ত থাকে না।

৩। দ্বিতীয় পরিষদ শ্রেণীস্বার্থের সংরক্ষক হইয়া উঠিতে পারে

(গ) দ্বিতীয় পরিষদে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ফলে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হইয়া শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে। গণতন্ত্রের দিক দিয়া ইহাও কোনমতে কাম্য নহে।

৪। দ্বিতীয় পরিষদের গঠন দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান যুক্তি

(ঘ) বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের ভিত্তিতে দ্বি-পরিষদের গঠনও দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আর এক প্রবল যুক্তি। আইনসভা জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত হইবে—ইহাই অন্যতম মৌলিক গণতান্ত্রিক নিয়ম। কিন্তু দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভায় দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পরিষদ সাধারণত বিত্তশালী, রক্ষণশীল ও মনোনীত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান কোন ব্যক্তি আইনসভার এরূপ গঠন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন না।

৫। দ্বিতীয় পরিষদ যে প্রথম পরিষদের অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নের পথে বাধাপ্রদান করে—এই যুক্তিরও বিরোধিতা করা হয়

(ঙ) দ্বিতীয় পরিষদ যে জনপ্রিয় পরিষদের অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে—এ যুক্তিরও বিরোধিতা করা হয়। বলা হয় যে, বর্তমানে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন আইনই পাস করা হয় না। পরিষদে যখন কোন বিল সম্পর্কে আলোচনা চলিতে থাকে তখন ইহা লইয়া সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চে আলোচনা চলে। পরিষদের সভ্যগণ সংবাদপত্রে প্রতিফলিত জনমতের অনুবর্তী হইয়াই আইন প্রণয়নের পথে অগ্রসর হন। সুতরাং দ্বিতীয় পরিষদের অস্তিত্ব অনাবশ্যক। ইহার জন্য যে-অর্থব্যয় হয় তাহা অপব্যয় মাত্র এবং যে-সময়ক্ষেপ হয় তাহা প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন বিলম্বিত করে মাত্র।

৬। বর্তমানে ধারণা হইল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজন নাই

(চ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্বন্ধে বলা হয়, ইহার জন্য দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজন নাই। শাসনতন্ত্রে নানাভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

৭। যুক্তরাষ্ট্রেও দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই

(ছ) যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় পরিষদের সদস্যগণ অংগরাজ্যসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণের পরিবর্তে দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণেই সচেষ্ট থাকেন। দলীয় ভিত্তিতে যখন আইনসভার কার্য চলিতে থাকে তখন দ্বিতীয় পরিষদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে রূপ দিবার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল।

উপসংহার : অনেক আধুনিক লেখক এই ধারণা পোষণ করেন যে, দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের একটি বিশেষ অধ্যায় সূচিত করে মাত্র। অভিজাততান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের মধ্যে বুঝাপড়ার সমাপ্তি যে-পর্যন্ত ঘটে নাই সে-পর্যন্ত দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত রাখিতেই হইবে। গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ জয় ঘটিলে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার বিলোপসাধন করাই যুক্তিযুক্ত। অধ্যাপক ল্যাস্কি উক্তি করিয়াছেন যে, বর্তমান রাষ্ট্রের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন এক পরিষদ আইনসভাই প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয়।*

অপরদিকে কিন্তু অনেকে আবার এই মত স্বীকার করিয়া লন না। তাঁহারা বলেন যে, দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরায় নাই। ইহার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে তাহা ইহার অগণতান্ত্রিক রূপের জন্যই। যদি দ্বিতীয় পরিষদকে গণতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া গঠন করা যায় তবে ইহা চিরকালই সংশোধনকারী পরিষদ হিসাবে জনকল্যাণে নিয়োজিত থাকিতে পারে।

***সার্বভৌম ও অ-সার্বভৌম আইনসভা* (Sovereign and Non-sovereign Law-making Bodies) :** দেখা গিয়াছে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে জাতীয় আইনসভা সার্বভৌম এবং যুক্তরাষ্ট্রে সকল আইনসভাই অ-সার্বভৌম হয়। সার্বভৌম আইনসভা বলিতে বুঝায় সকল প্রকার আইন প্রণয়ন ও আইন সংশোধন ব্যাপারে চূড়ান্ত এবং অপ্রতিহত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আইনসভাকে। সার্বভৌম আইনসভা প্রণীত সকল আইনই আদালত মানিয়া লইতে বাধ্য। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট হইল এইরূপ একটি সার্বভৌম আইনসভা ; ইহা যে-কোন আইন পাস করিতে পারে, যে-কোন আইনের পরিবর্তন-সাধন করিতে পারে। দেশের সকল আদালতই পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন প্রয়োগ করিতে বাধ্য। বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়া পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনকে বাতিল করিবার ক্ষমতা আদালতের নাই।

সার্বভৌম আইনসভার স্বরূপ

যে কোন আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারে বলিয়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের জাতীয় আইনসভা শাসনতান্ত্রিক আইনেরও (constitutional law) পরিবর্তনসাধন করিতে পারে। ইহার জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হয় না।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের জাতীয় আইনসভার এই বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাগুলিতে পরিলক্ষিত হয় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাগুলির ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট। কোন আইনসভা কোন সময়ে নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কার্য করিয়াছে কিনা এবিষয়ে বিচার করিবার এক্তিয়ার আদালতের রহিয়াছে। গণ্ডি অতিক্রম করিলে আদালত আইনকে ক্ষমতা-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিয়া ইহাকে বাতিল করিয়া দিতে পারে।

---

* "The single chamber and magnicompetent legislative assembly seems.... best to answer the needs of the modern State."

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উদাহরণ লইয়া অ-সার্বভৌম আইনসভার স্বরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে। কংগ্রেস হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আইনসভা। কিন্তু ইহার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট এলাকার বাহিরে কোন বিষয়ে আইন পাস করিবার ক্ষমতা ইহার নাই। নির্দিষ্ট এলাকার বাহিরে গিয়া ইহা এককভাবে শাসনতন্ত্রের কোন পরিবর্তনসাধন করিতে পারে না। স্থতরাং বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা জাতীয় আইনসভায় নিবদ্ধ নাই। এই জাতীয় আইনসভা বা কংগ্রেস হইল অ-সার্বভৌম আইনসভা। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নহে, সকল যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাই এইরূপ অ-সার্বভৌম আইনসভা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস অন্যতম অ-সার্বভৌম আইনসভা

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য স্থানে এইরূপ অ-সার্বভৌম আইনসভা দৃষ্ট হয়। ডাইসি সকল উপনিবেশের আইনসভাকেই অ-সার্বভৌম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মত হইল, এই সকল আইনসভা রেলওয়ে কোম্পানী বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ভুক্ত। ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি বলিয়াছেন যে, এইরূপ ঔপনিবেশিক আইনসভার ক্ষমতা সাম্রাজ্যের প্রধান আইনসভার (Parliament) আইন দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট। এই নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে আইন প্রণয়ন করিলে উপনিবেশের আইনসভার সেই আইন বাতিল হইয়া যাইবে।

ডাইসির মতে, সকল ঔপনিবেশিক আইনসভাই অ-সার্বভৌম

অধ্যাপক জেনিংস ডাইসির এই ধারণার বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন। জেনিংসের মতে, উপনিবেশের আইনসভাগুলিকে কিছুতেই রেলওয়ে কোম্পানী বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। রেলওয়ে কোম্পানী বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে না, উপ-আইন (by-law) প্রণয়ন করিতে পারে মাত্র। কিন্তু উপনিবেশের আইনসভাগুলি আইনই প্রণয়ন করিয়া থাকে। উপরন্তু, রেলওয়ে কোম্পানী প্রভৃতির ক্ষমতা হইল অর্পিত ক্ষমতা (delegated powers) মাত্র। অর্পিত ক্ষমতা বলিয়া ইহারা ক্ষমতা আর কাহাকেও অর্পণ করিতে পারে না। কারণ, আইনের অন্যতম মূলনীতি হইল, অর্পিত ক্ষমতা পুনরায় অর্পণ করা যায় না (*delegatus non potest delegare*)। কিন্তু উপনিবেশের আইনসভাগুলির ক্ষমতা অর্পিত ক্ষমতা নহে, প্রকৃত ক্ষমতা। পরিশেষে, অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রণীত উপ-আইন অযৌক্তিক হইলে ক্ষমতা অর্পণকারী সংস্থা তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু উপনিবেশের কোন আইনসভা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া আইন প্রণয়ন করিলে অযৌক্তিকতার কারণে সেই আইনকে বাতিল করিয়া দেওয়া যায় না। স্থতরাং উপনিবেশের আইনসভার ক্ষমতা যে প্রকৃত ক্ষমতা, অর্পিত ক্ষমতা নহে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই কারণে জেনিংস উপনিবেশের আইনসভাগুলিকে অ-সার্বভৌম না বলিয়া 'সীমার মধ্যে সার্বভৌম' (sovereign within powers) বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। জেনিংসকে

ডাইসির মতের সমালোচনা

সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাই সীমার মধ্যে সার্বভৌম—অ-সার্বভৌম নহে

অনুসরণ করিয়া সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভাকে এরূপ সীমার মধ্যে সার্বভৌম বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়।

শাসন বিভাগ (The Executive) **:** ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগ আইন প্রণয়ন ও বিচারের সহিত সম্পর্কিত ছাড়া সরকারের অপর সকল কর্মচারীকেই লইয়া গঠিত হয়। এই দিক দিয়া শাসন বিভাগ হইল "আইনের মাধ্যমে প্রকাশিত রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে কার্যকর করিবার জন্য সকল কর্মসচিব ও কর্মচারীর সমষ্টি।"

শাসন বিভাগের গঠন সম্বন্ধে মতানৈক্য

কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাধারণত এই ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগকে বুঝানো হয় না। মাত্র প্রধান কর্মকর্তা (**Chief Executive**) ও প্রধান কর্মসচিবগণকে লইয়াই শাসন বিভাগ গঠিত বলিয়া ধরা হয়। শাসন বিভাগকে এইরূপ সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিবার সপক্ষে যুক্তি হইল যে, প্রধান কর্মকর্তা ও প্রধান কর্মসচিবগণই আইনানুসারে নীতি নির্ধারণ করিয়া নিম্নতন কর্মচারিগণের মাধ্যমে তাহা কার্যকর করেন। সুতরাং তাঁহাদের কার্য হইল নীতি নির্ধারণ। নিম্নতন কর্মচারীদের কার্য হইল নীতি প্রবর্তন। নীতি নির্ধারণই শাসন বিভাগের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ কার্য। এই কার্যের সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিদের শাসন বিভাগের অপর সকল কর্মচারী হইতে পৃথক করিয়া দেখা উচিত। অপরদিকে আবার বলা যায় যে, শাসন বিভাগের সকলের কার্যই যখন আইনের মাধ্যমে প্রকাশিত রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে কার্যকর করা তখন আর তাহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়নের পদ্ধতিসমূহ (Modes of Choice of Chief Executive) : প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়নের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে চারিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যথা, উত্তরাধিকারসূত্রে মনোনয়ন, নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনয়ন, ব্যবস্থাপক সভ্য দ্বারা মনোনয়ন, এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃত্ব দ্বারা মনোনয়ন।

প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়ন পদ্ধতি প্রধানত চারিটি

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়ন রাজতন্ত্রের সহিতই জড়িত। রাজতন্ত্রে উত্তরাধিকারসূত্র অনুসারে উত্তরাধিকারী রাজপদে অভিষিক্ত হন; এবং রাজাই হইলেন প্রধান কর্মকর্তা। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে রাজা তত্ত্বগতভাবে এরূপ প্রধান কর্মকর্তা হইলেও কার্যত তিনি নামসর্বস্ব শাসনকর্তা। এই সকল দেশে রাজার প্রকৃত ক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছে প্রকৃত শাসকবর্গ বা মন্ত্রি-পরিষদের নিকট।

১। উত্তরাধিকারসূত্রে মনোনয়ন

নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধান কর্মকর্তার মনোনয়ন দুই প্রকারের রূপ গ্রহণ করিতে পারে: (ক) প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচন, এবং (খ) পরোক্ষভাবে নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) দ্বারা নির্বাচন। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচন হইল জনগণের সার্বভৌমিকতারই একটি প্রকাশ। জার্মেনীর ভূতপূর্ব ওয়েমার শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে এইভাবেই নির্বাচিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

২। নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনয়ন

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্যগুলির প্রধান কর্মকর্তাসমূহ ও সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলির স্থানীয় শাসকবর্গ এইভাবেই মনোনীত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা তত্ত্বের দিক দিয়া পরোক্ষ হইলেও দলীয় সংগঠনের ফলে কার্যত ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩। ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা মনোনয়ন

ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়নের ব্যবস্থা প্রথমে করা হয় ফ্রান্সে। ১৮৭৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জাতীয় আইনসভার দুই কক্ষের সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (The Federal Council) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা দ্বারাই নির্বাচিত হয়। ভারতীয় সংবিধানও আইনসভার মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার মাধ্যমে প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়নের সপক্ষে প্রদর্শিত যুক্তি হইল যে, শাসন পরিচালনার সহিত যাঁহারা বিশেষভাবে সম্পর্কিত তাঁহাদের হস্তেই প্রধান শাসক মনোনয়নের ভার দেওয়া উচিত। বস্তুত, এই ব্যবস্থাতে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। অপরদিকে বলা হয় যে, এই ব্যবস্থা ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের মূলে কুঠারাঘাত করে বলিয়া ইহা সম্পূর্ণ কাম্য নহে।

৪। উর্ধ্বতন কর্তৃত্ব দ্বারা মনোনয়ন

যে-সকল প্রধান কর্মকর্তা উর্ধ্বতন কর্তৃত্ব (superior authority) দ্বারা মনোনীত হন তাঁহারা কখনই সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নহেন কারণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন কর্তৃত্ব বলিয়া কিছু নাই। ডোমিনিয়নগুলিকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া গ্রহণ করিলে বলা যায় যে, ব্রিটেনের রাণী দ্বারা ইহাদের গভর্ণর-জেনারেলের মনোনয়ন সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মনোনয়ন করিয়া থাকে ডোমিনিয়নের ক্যাবিনেট। রাণী সম্মতি প্রদান করেন মাত্র। ভারত পরাধীন থাকাকালীন ব্রিটিশরাজ (The British Monarch) ভারতের গভর্ণর-জেনারেলকে প্রকৃতই মনোনয়ন করিতেন। মাউণ্টব্যাটেন যখন ডোমিনিয়ন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হন তখনই এই ব্যাপার আনুষ্ঠানিক হইয়া দাঁড়ায়। বর্তমানে ভারতের রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন।

রাষ্ট্রভৃত্য ও মন্ত্রিবর্গের মধ্যে পার্থক্য

রাষ্ট্রভৃত্য বা জনপালন কৃত্যক (The Civil Service)ঃ প্রধান কর্মকর্তা ও মন্ত্রিবর্গের নিম্নে শাসন বিভাগের যে-সকল কর্মচারী থাকেন সামগ্রিকভাবে তাঁহারা রাষ্ট্রভৃত্য বা জনপালন কৃত্যক বলিয়া অভিহিত হন। এরূপ রাষ্ট্রভৃত্যগণের সহিত প্রধান শাসক ও মন্ত্রিবর্গের বিশেষ পার্থক্য হইল যে, প্রথমোক্ত কর্মচারিগণ স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রকার্যে নিযুক্ত হন কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসকবর্গের পদ সম্পূর্ণ অস্থায়ী ও রাষ্ট্রনীতির সহিত জড়িত। দলীয় রাষ্ট্রনীতির আবহাওয়া পরিবর্তিত হইলে প্রধান শাসক ও মন্ত্রিবর্গকে হয় নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অথবা যে-কোন সময় পদত্যাগ করিতে হয়। তখন অন্য আর এক রাষ্ট্রনৈতিক দল

সরকার গঠন করে। সরকারের এই পরিবর্তনের মধ্যে শাসন বিভাগের কার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন রাষ্ট্রভৃত্যগণ। ইঁহারা কোন দলীয় রাষ্ট্রনীতির সহিত কোনরূপে সম্পর্কিত নহেন। নিরপেক্ষতা ইঁহাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য ইংল্যাণ্ডের মত রাজতন্ত্রে শাসকপ্রধান রাজা বা রাণী আমৃত্যু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলির উর্ধ্বে থাকিয়া কার্য করেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রভৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

জনপালন কৃত্যকের কার্যাবলীর উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, রাষ্ট্রভৃত্যগণই আইন ও নীতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, নীতি নির্ধারণে প্রধান শাসক ও মন্ত্রিবর্গকে ইঁহারা ইঁহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত করিয়া থাকেন এবং পরিশেষে ইঁহারা শাসন বিভাগের কার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন।*

জনপালন কৃত্যকের কার্যাবলী

নিয়োগ পদ্ধতি (Modes of Appointment) : জনপালন কৃত্যকের কার্যাবলীর গুরুত্বের জন্য রাষ্ট্রভৃত্যদের নিয়োগ পদ্ধতির উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। দেখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রভৃত্যগণ যেন কর্মকুশলতা, সততা প্রভৃতিতে বিশেষ উচ্চস্তরের মানুষ হন। এই দিক দিয়া প্রয়োজন হইল একমাত্র গুণকে নিয়োগের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা। ল্যাস্কির মতে, রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ ব্যাপারে শাসন কর্তৃপক্ষের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নহে। রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ শাসন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিলে সমগ্র শাসনযন্ত্র দূষিত হইয়া পড়িবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ ব্যাপারে পরীক্ষা হইতে ল্যাস্কির এই উক্তির সত্যতাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ স্থায়ী নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন বিশেষ পদ্ধতিতে এরূপভাবে করা উচিত যাহাতে শাসনকর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ বিতরণের কোন সুযোগ না থাকে। অধিকাংশ সুসভ্য রাষ্ট্রই বর্তমানে এইরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরীক্ষা হইতে এই অভিজ্ঞতাও লাভ করা গিয়াছে যে, সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাই হইল এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। এই পরীক্ষা গ্রহণ করিবে এই উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ একটি পরিষদ। এই পরিষদের উপর শাসনকর্তৃপক্ষের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না।** পরিষদের সভ্যগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মনোনীত হইবেন এবং একবার মনোনীত হইলে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একমাত্র অক্ষমতা ও দুষ্কর্মতার জন্য ছাড়া অন্য কারণে তাঁহাদের পদচ্যুত করা যাইবে না। পদচ্যুত করা যাইবে বিচারকগণকে যেরূপভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে পদচ্যুত করা হয় সেইভাবে—সাধারণভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশিতে নহে।

নিয়োগে একমাত্র গুণকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত

স্থায়ী নিয়মাবলী অনুসারে সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

* বিস্তৃততর আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড শাসন-ব্যবস্থায় 'ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা'র 'বেসামরিক সরকারী চাকরি' অধ্যায় দেখ।

** "....the appointment of officials should be in the hands of a commission independent of the government of the day.'' H. J. Laski

শাসন বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Executive): রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির সংগে সংগে শাসন বিভাগের কার্যও বিশেষ পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ যে-সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ

(ক) আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনাঃ পূর্বে মনে করা হইত যে, রাষ্ট্রের কার্য হইল সংখ্যায় মাত্র দুইটি—যথা, আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এবং বহিরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষা। বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির ফলে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা রাষ্ট্রের বহুবিধ কার্যের অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে মাত্র, এবং ইহাকে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা না বলিয়া ব্যাপকতরভাবে আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা (internal administration) বলিয়া অভিহিত করা হয়। আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা বলিতে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ছাড়াও নিম্নতন কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, রাষ্ট্রভৃত্যদের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন, জরুরী অবস্থায় অস্থায়ী আইন পাস প্রভৃতি বুঝায়। যে দপ্তরের উপর আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনার ভার থাকে তাহাকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Department) বা আভ্যন্তরীণ দপ্তর (Department of the Interior) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়।

আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনার অর্থ

(খ) পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্যঃ বর্তমানে পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্যকে শাসন বিভাগের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য বলিয়া ধরা হয়। যাতায়াত, যানবাহন ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে বলা চলে। বর্তমানে কোন দেশই এককভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং বহিঃরাষ্ট্রসমূহের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি করিয়া পররাষ্ট্র দপ্তর আছে এবং এই দপ্তরের সাহায্যে রাষ্ট্র পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালনা করিয়া থাকে।

পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্যের গুরুত্ব

পররাষ্ট্র ব্যাপার পরিচালনা বলিতে অপরাপর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ; অপরাপর রাষ্ট্র হইতে রাষ্ট্রদূত গ্রহণ; রাষ্ট্রনৈতিক, বাণিজ্যিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন; যুদ্ধে অংশগ্রহণ বা সাহায্য দান প্রভৃতি বুঝায়। অনেক রাষ্ট্রে অবশ্য যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার শাসন বিভাগের হস্তে ন্যস্ত নাই। কিন্তু এ-সকল ব্যাপারে শাসন বিভাগেরও সম্মতি প্রয়োজন। সুইজারল্যাণ্ডে আবার ১৫ বৎসরের অধিককাল সন্ধিকে কার্যকর করিতে হইলে গণভোটের প্রয়োজন। তবুও সাধারণভাবে বলা যায় যে, যুদ্ধ সন্ধি ইত্যাদি পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপার শাসন বিভাগেরই কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালনা বলিতে কি বুঝায়

(গ) যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষাঃ যুদ্ধ ঘোষণা অনেক সময় ব্যবস্থা বিভাগের সম্মতির উপর নির্ভর না করিলেও যুদ্ধ পরিচালনা প্রধানত শাসন বিভাগই করিয়া থাকে। শাসন বিভাগের যিনি প্রধান তিনিই সাধারণত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

(Supreme Commander of the Armed Forces) হইয়া থাকেন। সর্বাধিনায়ক হিসাবে তিনি সেনানায়কগণকে নিযুক্ত ও পদচ্যুত করিয়া থাকেন, সৈন্য বাহিনীকে পরিচালনাও করিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে তিনি সামরিক আইন জারি করিতে পারেন, সাধারণের মৌলিক অধিকার অস্থায়ীভাবে কাড়িয়া লইতে পারেন, সামরিক প্রয়োজনে সরকারের কর্তৃত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিতে পারেন। যে দপ্তরের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী ও সমরবিষয়ক ব্যাপার পরিচালনা করা হয় তাহাকে প্রতিরক্ষা দপ্তর (Defence Department) বা যুদ্ধ দপ্তর (War Department) বলে।

যুদ্ধ পরিচালনা প্রধানত শাসন বিভাগই করিয়া থাকে

(ঘ) অর্থসংক্রান্ত কার্য : সকল সরকারের পক্ষে বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়। অর্থ যখন ব্যয় হয় তখন অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থাও সরকারকে করিতে হয়। সরকারী ব্যয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করা হয় করধার্য করিয়া, সেবামূলক কার্য সম্পাদন করিয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে। অবশ্য ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি ব্যতীত করধার্য বা ব্যয়-বরাদ্দের ব্যবস্থা করা না গেলেও কার্যক্ষেত্রে কর-সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া থাকে শাসন বিভাগ। যে বিভাগের মাধ্যমে এই কার্য করা হইয়া থাকে তাহাকে অর্থদপ্তর (Finance Department) বা রাজস্ব দপ্তর (Treasury) বলে। করসংগ্রহ ও ব্যয়-বরাদ্দ করা ছাড়াও অর্থদপ্তর হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করে।

কার্যক্ষেত্রে কর-সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া থাকে শাসন বিভাগ

(ঙ) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য : পার্লামেণ্টীয় সরকারে শাসন বিভাগের কর্মকর্তৃগণ সরাসরি আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়ন কার্য পরিচালনাই করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারেও শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ আইন প্রণয়ন কার্যে কিছু কিছু অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রায় সকল রাষ্ট্রেই শাসনকর্তৃপক্ষের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিবার, অধিবেশন স্থগিত রাখিবার এবং আইনসভার নিম্নতন কক্ষকে ভাঙিয়া দিবার অধিকার থাকে। অনেক রাষ্ট্রে আবার শাসন বিভাগীয় প্রধানের ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক পাস করা বিলে অসম্মতি জ্ঞাপন করিবার প্রকৃত ক্ষমতা আছে। এরূপ অসম্মতি জ্ঞাপন করা হইলে বিশেষ সংখ্যাধিক্যে পুনরায় পাস করা ব্যতীত কোন উপায়ে ঐ বিলকে আইনে পরিণত করা যায় না। ওয়েমার শাসনতন্ত্রের অধীনে জার্মেনীতে রাষ্ট্রপতি বিলে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে তাহা গণভোটের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করা যাইত।

পার্লামেণ্টীয় সরকারে শাসনকর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন পরিচালনা করেন

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারেরও শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা রহিয়াছে

বিলে শাসন বিভাগীয় প্রধানের অসম্মতি জ্ঞাপন করিবার ক্ষমতা নানা কারণে সমর্থন করা হয়। বলা হয়, এরূপ ক্ষমতা থাকিলে শাসন বিভাগ আইন প্রণয়ন-

কার্যে ত্রুটি দূর করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আবার জনমতের চাপে আইনসভা কোন বিল পাস করিতে বাধ্য হইতে পারে। কিন্তু পাস করে এই আশায় যে এরূপ বিল শাসন বিভাগ নাকচ করিয়া দিবে।

অনেক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের জরুরী অবস্থায় অর্ডিন্যান্স জারি করিবার ক্ষমতাও আছে।

ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতি বিচারসংক্রান্ত কার্য

(চ) বিচারসংক্রান্ত কার্য : অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা শাসন বিভাগ বিচারসংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। শাসন বিভাগের এইরূপ বিচারসংক্রান্ত কার্য সমর্থন করা হয় এই কারণে যে, বিচার বিভাগ সকল সময় আইনের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই সকল বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া রায় দেয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিচারের ত্রুটি থাকিতে পারে। শাসন বিভাগ উপরি-উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এই ত্রুটি সংশোধন করে মাত্র।

অন্যান্য বিচার-সংক্রান্ত কার্য

ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতি ছাড়াও শাসন বিভাগ অন্যভাবে বিচারসংক্রান্ত কার্যে অংশগ্রহণ করে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি শাসন বিভাগের নিকট আনয়ন করা যায়; অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করা হইলে শাসন বিভাগের নিকট আবেদন দ্বারা তাহার প্রতিকার পাওয়া যাইতে পারে; ইত্যাদি।

শাসন বিভাগের কার্য বৃদ্ধি

(ছ) অন্যান্য কার্য : বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় শাসন বিভাগকেও অন্যান্য নানাবিধ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইতেছে। শিক্ষা বিভাগ ও ডাক বিভাগ পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি মামুলী কর্তব্য ছাড়াও রাষ্ট্র আজ নানাবিধ সেবামূলক কার্য সম্পাদন করে। ফলে শাসন বিভাগকেও এই সকল কার্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে হয়। আজিকার জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ উত্তরোত্তর জনকল্যাণের সহিত জড়াইয়া পড়িতেছে।

উপসংহার

লর্ড ব্রাইস লিখিয়াছেন, জনসাধারণের স্বাধীনতা স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আদায় করিতে হইয়াছে বলিয়া বহুদিন পর্যন্ত লোকে শাসন বিভাগের ক্ষমতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। কিন্তু জনসাধারণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই সন্দেহ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্তমানে অনেকে ব্যবস্থা বিভাগকে ক্ষমতা প্রদানের পরিবর্তে শাসন বিভাগের হস্তেই অধিক ক্ষমতা সমর্পণের পক্ষপাতী। দেখা গিয়াছে শক্তিশালী, কর্মকুশল শাসনকর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা বিভাগ অপেক্ষা অধিক জনকল্যাণসাধনে সমর্থ। গেটেল বলেন, মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির পথেই রাষ্ট্রনীতি অগ্রসর হইবে।*

বিচার বিভাগ (The Judiciary) : সরকারের তৃতীয় অংগ হইল বিচার বিভাগ। ইহার প্রধান কার্য হইল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অথবা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে

* "It seems likely that the immediate future of political development will be marked by a further expansion of the powers of the executive. . . ."

বিবাদ বাধিলে তাহার মীমাংসা করিয়া ন্যায় বিচার করা। বলা হয় যে, জনকল্যাণ, জন-স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। লর্ড ব্রাইস অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা সরকারের যোগ্যতা বিচারের অধিকতর উপযোগী মানদণ্ড আর নাই। হেনরি সিজউইকও (Henry Sidgwick) অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন।*

বিচার বিভাগের কর্ম-কুশলতা সরকারের যোগ্যতা বিচারের মানদণ্ড

প্রাচীন কালে বিচার ও শাসন কার্যের পৃথকিকরণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। চরম রাজতন্ত্রের অধীনে উভয় কার্যই নৃপতি সম্পাদন করিতেন। এইরূপ ব্যবস্থায় জনসাধারণের স্বাধীনতা অলীক প্রতিপন্ন হওয়ায় ইহাকে 'স্বৈরাচারের নামান্তর' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কারণে বর্তমানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা না হইলেও অধিকাংশ লোকই বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। ফলে অধিকাংশ দেশেই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে বা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বর্তমানে সকলেই বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী

বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Judiciary): বিচার বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইনের ব্যাখ্যা করা এবং আইনের প্রয়োগ করা। এখানে আইন বলিতে ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইন, লিখিত শাসনতান্ত্রিক আইন, প্রথাগত আইন—সকলকেই বুঝানো হইতেছে। কিন্তু সকল সময় প্রচলিত আইনের সাহায্যে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারকগণ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ অনুসারে বিচার করেন। এইরূপ বিচারের রায় ভবিষ্যৎ বিচারকার্যে আইন হিসাবে গণ্য হয়; এবং এইরূপ আইনকে বিচারকগণ প্রণীত আইন ((judge-made laws) বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিচারকগণ শুধু আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগই করেন না—আইনের সৃষ্টিও করেন।

১। বিচার বিভাগের প্রধান কার্য আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা

২। বিচারকগণ আইনের সৃষ্টিও করেন

সাধারণত বিচার বিভাগই হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের অভিভাবক ও চরম ব্যাখ্যাকর্তা। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত শাসনতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

৩। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অভিভাবক

বিচার বিভাগের আরও কতকগুলি কার্য আছে যাহাদিগকে ঠিক বিচারকার্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ কর্মচারী ও অভিভাবক নিয়োগ, লাইসেন্স

* "....in determining a nation's rank in political civilisation, no test is more decisive than the degree in which justice, as defined by law, is actually realised in its judicial administration, both as between one private citizen and another, and as between private citizens and members of the Government."

প্রদান, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা, দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদায়কারীর কার্য করা, প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক সময়ে ইহা আবার দুষ্কর্ম রহিত করিবার ব্যবস্থা করে; এবং এই উদ্দেশ্য ও সাধারণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন লেখ (writs) ও নির্দেশ জারি করে।

৪। অন্যান্য কার্য

অনেক দেশে বিচারালয় হইতে শাসন বিভাগ অথবা ব্যবস্থাপক সভা পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে। ভারত ও ইংল্যাণ্ডে বিচারালয় কর্তৃক শাসন বিভাগকে এইরূপ পরামর্শদানের ব্যবস্থা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলেও কতকগুলি অংগরাজ্যে ইহা প্রবর্তিত রহিয়াছে।

৫। শাসন বিভাগকে পরামর্শ দান

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary)ঃ পক্ষপাতহীন ন্যায় বিচারের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। বিচার বিভাগের এই স্বাধীনতা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করেঃ

১। বিচারকগণের নিয়োগ পদ্ধতির উপর

(ক) বিচারকগণের নিয়োগ পদ্ধতিঃ প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে বিচারকগণকে নিয়োগ করা যাইতে পারে—সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন, আইনসভা দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচন এবং শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ। ফরাসী বিপ্লবের ফলে জনগণের সার্বভৌমিকতা অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইলে অনেক দেশে সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন বিচারকগণের নিয়োগের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। ফ্রান্সে কিছুদিন এই পদ্ধতি লইয়া পরীক্ষাকার্য চালাইয়া পরে ইহাকে প্রত্যাহার করা হয়। ফ্রান্সের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি অংগরাজ্য ইহা গ্রহণ করে এবং আজও এই অংগরাজ্যগুলির কয়েকটিতে এই পদ্ধতি বর্তমান আছে। সুইজারল্যাণ্ডে নিম্নতন আদালতসমূহের জন্য বর্তমানে এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও এই পদ্ধতি কতকাংশে অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল যে, জনসাধারণ অধিকাংশ সময় যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচন করিতে পারে না। ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত ও প্রচারকার্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া তাহারা এমন প্রার্থীকে নির্বাচিত করে যাহাদের পক্ষে বিচারকার্যের উপযুক্ত না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। অধিকন্তু যোগ্য ব্যক্তিগণ এইরূপ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করিতে চাহেন না। ফলে, জনসাধারণ অযোগ্য ব্যক্তিগণকেই নির্বাচিত করিতে বাধ্য হয়। এই পদ্ধতি সম্পর্কে ল্যাস্কি বলেন, "বিচারকগণের নিয়োগের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন হইল ব্যতিক্রমবিহীনভাবে নিকৃষ্ট।"*

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারকগণের নিয়োগ পদ্ধতি

ল্যাস্কির মতে ইহা নিকৃষ্ট পদ্ধতি

* "Of all methods of appointment, that of election by the people at large is without exception the worst."

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের উপর আস্থা না থাকায় এবং বিচার বিভাগের উপর শাসন বিভাগের প্রভাব প্রতিপত্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অংগরাজ্য প্রথমে আইনসভা দ্বারা বিচারকগণের পরোক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতি গ্রহণ করে। বর্তমানে ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি রাজ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারকগণের নিয়োগ ব্যাপারে সুইজারল্যাণ্ডে প্রবর্তিত আছে। এই পদ্ধতিও বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ, কারণ ইহা বিচার বিভাগকে ব্যবস্থা বিভাগের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলে। ইহাতেও যোগ্য ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হন না, কারণ এরূপ নির্বাচন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলীয় ভিত্তিতেই হইয়া থাকে।

আইনসভা দ্বারা নিয়োগ

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। উর্ধ্বতন বিচারকগণ সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা নিযুক্ত হইলেও এই সকল দেশে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা নিম্নতন বিচারকগণকে নিয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রপ্রধান দ্বারা উর্ধ্বতন বিচারকগণের নিয়োগের বেলাতেও অনেক সময় এইরূপ নিয়ম আছে যে, নিয়োগ সাধারণভাবে বিচারপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়াই করা হইবে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রধান ধর্মাধিকরণ বা সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টসমূহের বিচারপতিগণের নিয়োগের ভার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিলেও নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে এরূপ পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। ল্যাস্কির মতে, বিচারকগণের সহিত পরামর্শের এইরূপ কতকটা অনির্দিষ্ট পদ্ধতির পরিবর্তে এইরূপ একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, এই নিয়োগ কয়েকজন উর্ধ্বতন বিচারপতি লইয়া গঠিত একটি স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুসারে হইবে।

শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগই বর্তমানে অনুসৃত পদ্ধতি

নিয়োগ ব্যাপারে আরও কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বনের কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, শাসন বিভাগের কার্যে ব্যাপৃত কোন ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ করা অনুচিত, কারণ যে-ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের স্বার্থ জড়িত থাকে সে-ক্ষেত্রে ইঁহারা ন্যায় বিচারের মনোভাব লইয়া বিচার মীমাংসা করিতে সমর্থ হন না। আবার বিচারকদেরও কোন রাষ্ট্রনৈতিক পদে নিয়োগ করা সমীচীন নয়, কারণ তাহা হইলে বিচারকগণ ভবিষ্যতে রাষ্ট্রনৈতিক পদের আশায় শাসন বিভাগের পক্ষ টানিয়া বিচারকার্য সম্পাদন করিতে প্রলুব্ধ হইবেন।

(খ) বিচারকগণের কার্যকাল: বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতার জন্য বিচারকগণের কার্যকাল তাঁহাদের নিয়োগ পদ্ধতির ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিচারকগণকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয় এবং অক্ষমতা বা দুষ্কর্ম প্রণোদিত না হইলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না। গণতান্ত্রিক সূত্র ধরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-সকল রাজ্য বিচারকগণের জন্য স্বল্পস্থায়ী কার্যকালের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহারাও কার্যক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে পুনর্নির্বাচিত বা পুনর্নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইতেছে। বস্তুত, বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতা

২। বিচারকগণের কার্যকালের উপর

বিচারপতিগণের কার্যকালের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। যে-সকল বিচারপতি অল্পকালের জন্য নিযুক্ত হন তাঁহাদের পক্ষে পদের অপব্যবহার করা বিশেষভাবে সম্ভব। হ্যামিলটনের (Hamilton) মতে, বিচারপতিগণের পদের স্থায়িত্ব সাম্প্রতিক সরকারী ব্যবস্থার অন্যতম উৎকর্ষের নিদর্শক। রাজতন্ত্রের অধীনে ইহা স্বৈরাচারের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ ; প্রজাতন্ত্রে ইহা জনপ্রতিনিধিদের আতিশয্য ও অত্যাচার রোধ করে।*

৩। বিচারকগণের পদচ্যুতির পদ্ধতির উপর

(গ) বিচারপতিগণের পদচ্যুতি : স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলে একমাত্র দুষ্কর্ম বা অক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন কারণে বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করা যায় না। এখন প্রশ্ন হইল দুষ্কর্ম বা অক্ষমতা প্রমাণ করিবে কে? এই সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম হইল যে এই ভার একাধিক ব্যক্তির হস্তে থাকা উচিত এবং ইহা বিশেষ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। ব্রিটেনে কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা রাজা বা রাণীর হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু রাজা বা রাণী পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নিকট হইতে সম্মিলিত আবেদন না পাইলে পদচ্যুত করিতে পারেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ইমপিচমেণ্ট' পদ্ধতিতে বিচারকগণকে পদচ্যুত করা হয়। এই ইমপিচমেণ্ট পদ্ধতিতে কংগ্রেসের নিম্নতন কক্ষ বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে এবং এই অভিযোগের বিচার করে উর্ধ্বতন কক্ষ। ভারতে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের মোট সংখ্যাধিক্য এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ যদি কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে তবে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দ্বারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

৪। বিচারকগণের বেতন ও ভাতার উপর

(ঘ) বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা : যোগ্য ব্যক্তিদের বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা উচিত। সাধারণত প্রখ্যাত ব্যবহারজীবিগণের মধ্য হইতেই এইরূপ যোগ্য ব্যক্তিদের সন্ধান করা হয়। আইনজীবিগণ যখন বিচারপতি পদে উন্নীত হন তখন তাঁহাদের বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হইতে পারে। এইজন্য দেখা উচিত, বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা যেন বিশেষ স্বল্প না হয়। বিচারপতিগণকে পর্যাপ্ত বেতন না দিলে তাঁহারা তাঁহাদের পদের মর্যাদা বজায় রাখিতে পারেন না। দেখা গিয়াছে, স্বল্প-বেতনভোগী বিচারপতিগণ দুষ্কর্মের জন্য অধিকতর উন্মুখ থাকেন। উপরন্তু, সমগ্র কার্যকালের মধ্যে বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতার পরিবর্তন করা উচিত নয়।

৫। বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রিকরণের উপর

(ঙ) বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রিকরণ : পরিশেষে, বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতা নির্ভর করে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রিকরণের উপর। একই ব্যক্তির হস্তে কোন মতে আইন প্রণয়ন এবং শাসন বা বিচারের ভার থাকা উচিত নয়। ক্ষমতা

* It is "certainly one of the most valuable of the modern improvements in the practice of governments. In a monarchy, it is an excellent barrier to the despotism of the prince ; in a republic, it is no less excellent barrier to the encroachments and oppressions of the representative body."

স্বতন্ত্রিকরণ নীতি আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে স্বতন্ত্রিকরণের মোহ ক্রমশ দূর হইলেও বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করা হয়।

উপসংহার ঃ এইভাবে উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিয়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইলে বিচারকগণ সমভাবে সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হন। স্যর অ্যালফ্রেড ডেনিং-এর (Sir Alfred Denning) ভাষায় বলা যায়, বিচারকগণ ব্যক্তির মধ্যে এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিচারের মানদণ্ড সমভাবে ধরিয়া নির্ভীকভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।* ল্যাস্কি প্রমুখ লেখকগণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আলোচনা প্রসংগে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমভাবে ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীনতার তাৎপর্য বা মূল্য কতটুকু তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলির দিকে নজর দেওয়াই যথেষ্ট নয়। সমাজের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি তাহার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে; কারণ মুখ্যত বিচারকগণ রাষ্ট্রের কর্মচারী এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকেই তাহাদের কার্যকর করিতে হয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় আইনের মধ্যে। যখন ব্যক্তিদের মধ্যে অথবা রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে আইনভংগের অভিযোগে বিবাদ বাদে তখন বিচারককে রাষ্ট্রীয় কর্মচারী হিসাবে বিবাদের বিচার-মীমাংসা করিতে হয়।** এই বিচার-মীমাংসা তাঁহাকে রাষ্ট্রের আইনানুসারেই করিতে হয়। তাঁহার ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা আইনের গণ্ডির উর্ধ্বে উঠিতে পারে না। কোন বিচারকের হয়ত' মনে হইতে পারে যে বিনাবিচারে নিবর্তনমূলক আটক গণতন্ত্রের পরিপন্থী, কিন্তু রাষ্ট্রের আইনে ঐ ব্যবস্থা থাকিলে তাঁহাকে উহা প্রয়োগ করিতেই হইবে। আবার কোন বিচারকের ধারণা থাকিতে পারে যে ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের অনুকূল নয়, কিন্তু আইনে ঐ ব্যবস্থা থাকিলে তাঁহাকে ঐ আইন অনুসারেই বিচার-মীমাংসা করিতে হইবে। সুতরাং সাধারণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইবে কিনা তাহা বিচারকদের স্বাধীনতার উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে সমাজ রাষ্ট্র ও আইনের প্রকৃতির উপর। অবশ্য একথা বলা যাইতে পারে যে বিচারক যখন আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, অথবা কোন্ কোন্ তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট মামলায় প্রাসংগিক তাহা নির্ধারণ করেন অথবা সংশ্লিষ্ট কোন্ আইন প্রযুক্ত হইবে তাহা স্থির করেন তখন তাঁহার নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী কার্য করিবার কতকটা অবকাশ থাকে। এই ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সহিত বিচারকদের নিরপেক্ষতার

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার তাৎপর্য

---

* "Secure from any fear of removal, the judges..do their duty fearlessly, holding the scales even, not only between man and man, but also between man and the State."

** Laski, The Danger of Being a Gentleman

(impartiality) প্রশ্ন উঠে। এখানেও নানা কারণে বিচার-মীমাংসা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যাভিমুখী হইতে বাধ্য। প্রথমত, বিচারক নিয়োগের সময় দেখা হয় যে, প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ব্যক্তিগণই যেন বিচারকপদে নিযুক্ত হন। দ্বিতীয়ত, বিচারকদের আইনগত শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশ তাঁহাদের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলে। যখন কোন কারণে বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রাদর্শের সহিত সংগতি হারাইয়া ফেলে তখন সংবিধানের সংশোধন, আইনের পরিবর্তন, নূতন বিচারক নিয়োগের দ্বারা সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি প্রভৃতি পন্থার মাধ্যমে বিচার বিভাগকে 'অভিপ্রেত'-পথে পরিচালিত করা হয়। প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের (social relations) সংরক্ষণই হইল রাষ্ট্রভৃত্য হিসাবে বিচারকদের কার্য। যেখানে এই সম্পর্ক অর্থ নৈতিক বৈষম্যের উপর ভিত্তিশীল সেখানে বিচারকার্যেও অসাম্য দেখা দিতে বাধ্য।

সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতির উপর বিচার বিভাগের উৎকর্ষ নির্ভর করে

সংক্ষিপ্তসার

ব্যবস্থা বিভাগ : ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদে সরকারের তিনটি বিভাগকে সমক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইলেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থা বিভাগ অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন। তবে সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই ব্যবস্থা বিভাগের ক্ষমতা ও মর্যাদা একরূপ নহে। পার্লামেন্টীয় সরকারে ব্যবস্থা বিভাগের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার অপেক্ষা অধিকতর প্রকাশিত।

ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলী : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে : (১) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য, (২) আলোচনামূলক কার্য, (৩) অর্থসংক্রান্ত কার্য, (৪) শাসনসংক্রান্ত কার্য, (৫) বিচারসংক্রান্ত কার্য, এবং (৬) সংবিধানসংক্রান্ত কার্য।

ব্যবস্থা বিভাগের সংগঠন : ব্যবস্থা বিভাগ বা আইনসভা এক-পরিষদসম্পন্ন অথবা দ্বি-পরিষদ-সম্পন্ন হইতে পারে। ইংল্যাণ্ডই দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক। অপরদিকে বিপ্লবের পর ফরাসীরা এক-পরিষদ ব্যবস্থা লইয়া প্রথমে পরীক্ষা করিলেও পরে দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হয় বলা চলে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থাই ছিল সাধারণ নিয়ম। তবে বর্তমানে কিন্তু এক-পরিষদ ব্যবস্থার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়াছে বলা যায়।

দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার গুণাগুণ : দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার সপক্ষে সাধারণত নিম্নলিখিত গুণ নির্দেশ করা হয়—১। আইনসভার দুইটি পরিষদ থাকিলে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভবপর হয়। ২। ইহাতে সাধারণের ইচ্ছার যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়। ৩। ইহা নাগরিকগণকে একমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে। ৪। ইহা শাসন বিভাগকেও একমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে। ৫। ইহাতে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়। ৬। সকল শ্রেণীর মতের প্রতিফলনের জন্য ইহাতে কাম্য আইন প্রণয়নের অধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে। ৭। অনেকে বলেন, রাষ্ট্রকার্যবৃদ্ধির দরুন একটি মাত্র পরিষদ পর্যাপ্ত নহে। ৮। দ্বি-পরিষদ

ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। ৯। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

ত্রুটি : ১। দুই পরিষদে বিভক্ত গণতান্ত্রিক আইনসভা সফল হইতে পারে না। ২। ইহাতে দায়িত্ব অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন। ৩। দ্বিতীয় পরিষদ শ্রেণীস্বার্থের সংরক্ষক হইয়া উঠিতে পারে। ৪। ইহা অগণতান্ত্রিক। ৫। দ্বিতীয় পরিষদের জন্যই সুচিন্তিত আইন প্রণীত হইবে এ যুক্তি মানিয়া লওয়া হয় না। ৬। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের সংরক্ষণ অন্যভাবেও করা যাইতে পারে। ৭। যুক্তরাষ্ট্রেও দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজন নাই।

সার্বভৌম ও অ-সার্বভৌম আইনসভা : সার্বভৌম আইনসভা বলিতে বুঝায় সকলপ্রকার আইন প্রণয়ন ও আইন সংশোধন ব্যাপারে চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতাসম্পন্ন আইনসভাকে। সার্বভৌম আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিবার ক্ষমতা কোন আদালতের নাই। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই আইনসভার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অ-সার্বভৌম আইনসভার ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা বা অন্য উপায়ে সীমানির্দিষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও ঔপনিবেশিক আইনসভাসমূহকে এইরূপ অ-সার্বভৌম বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু এই সকল আইনসভা প্রকৃত অ-সার্বভৌম নহে ; ইহাদিগকে 'সীমার মধ্যে সার্বভৌম' বলিয়াই বর্ণনা করা যুক্তিসংগত।

শাসন বিভাগ : শাসন বিভাগ আইনকে কার্যকর করে। ইহা প্রধান কর্মকর্তা, কর্মসচিব প্রভৃতি লইয়া গঠিত। প্রধান কর্মকর্তা (ক) উত্তরাধিকার সূত্রে, (খ) নির্বাচনের মাধ্যমে, (গ) ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা এবং (ঘ ঊর্ধ্বতন কর্তৃত্ব দ্বারা মনোনীত হইতে পারেন। প্রধান কর্মকর্তা ও মন্ত্রিবর্গের নিম্নে শাসন বিভাগের স্থায়ী কর্মচারীরা থাকেন। নিরপেক্ষতা ইঁহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইঁহারা শাসন বিভাগের কার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন। ইঁহাদের নিয়োগ সম্বন্ধে বলা হয় যে, স্থায়ী নিয়মাবলী অনুসারে সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাই শ্রেষ্ঠ।

শাসন বিভাগের কার্যাবলী : শাসন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান— ১। আভ্যন্তরাণ শাসন পরিচালনা। ২। পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য। ৩। যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার। ৪। অর্থসংক্রান্ত কার্য। ৫। আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য। ৬। বিচারসংক্রান্ত কার্য। ৭। অন্যান্য বিবিধ কর্তব্য।

বিচার বিভাগ : বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা সরকারের যোগ্যতা বিচারের মানদণ্ড। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী : নিম্নলিখিতগুলি হইল বিচার বিভাগের কার্যাবলী—১। বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেন। ২। বিচারকগণ আইনের সৃষ্টিও করেন। ৩। বিচার বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অভিভাবক। ৪। ইহা শাসন বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকে। ৫। শাসনসংক্রান্ত কিছু কিছু কার্যও এই বিভাগ সম্পাদন করিয়া থাকে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : বলা হয় যে, পক্ষপাতহীন ন্যায় বিচার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। বিচার বিভাগের এই স্বাধীনতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে—(ক) বিচারকগণের নিয়োগ পদ্ধতির উপর ; (খ) বিচারকগণের কার্যকালের উপর ; (গ) বিচারকগণের পদচ্যুতির পদ্ধতির উপর ; (ঘ)

বিচারকগণের বেতন ও ভাতার উপর ; এবং (ঙ) ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রিকরণের উপর।

প্রশ্নোত্তর

1. Argue for and against Bi-cameralism. (৩০৩-৩০৮ পৃষ্ঠা)

2. Explain what do you understand by Non-sovereign Law-making Bodies. (৩০৮-৩১০ পৃষ্ঠা)

3. Analyse the functions of the executive in modern States. (C. U. 1954) (৩১৩-৩১৫ পৃষ্ঠা)

4. Explain the role of the judiciary in a morden State. Indicate the factors upon which the independence of the judiciary depends. (C. U. 1961) (৩১৫-৩২১ পৃষ্ঠা)

অষ্টাদশ অধ্যায়

নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্ব

(ELECTORATE AND REPRESENTATION)

গণতন্ত্র বর্তমানে প্রতিনিধিমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থাকে কার্যক্ষেত্রে সফল করিয়া তোলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, কারণ ইহা সংগঠনের ক্ষেত্রে নানারূপ জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের মূল সমস্যা হইল শাসন কর্তৃপক্ষের উপর জনগণের কর্তৃত্ব বজায় রাখা। এই মূল সমস্যা পরোক্ষ গণতন্ত্রের সংগঠনসংক্রান্ত সমস্যাগুলির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের সংগঠনসংক্রান্ত সমস্যা বলিতে নির্বাচকমণ্ডলীসংক্রান্ত সমস্যা, জনগণ কর্তৃক শাসন কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত সমস্যা, এবং জনমত ও রাষ্ট্রনৈতিক দল সম্পর্কিত সমস্যাই বুঝায়। এই অধ্যায়ে শুধু নির্বাচকমণ্ডলীসংক্রান্ত সমস্যারই আলোচনা করা হইবে এবং পরবর্তী দুই অধ্যায়ে জনমত ও রাষ্ট্রনৈতিক দল সম্পর্কিত সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। জনগণ কর্তৃক শাসন কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত সমস্যার আলোচনা সাধারণভাবে গণতন্ত্রের আলোচনা প্রসংগে পূর্বেই করা হইয়াছে।*

নির্বাচকমণ্ডলীসংক্রান্ত সমস্যা (Problems of Electorate)ঃ

নির্বাচকমণ্ডলীসংক্রান্ত সমস্যা প্রধানত তিনটি

নির্বাচকমণ্ডলীসংক্রান্ত সমস্যা প্রধানত তিনটি—যথা, (ক) ভোটাধিকারের ভিত্তি, (খ) নির্বাচত পদ্ধতি, এবং (গ) সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব। এই তিনটি সমস্যা লইয়া আলোচনা করিবার পূর্বে নির্বাচকমণ্ডলীর সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন।

---

* ২২৮-২৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

সংক্ষেপে নির্বাচকমণ্ডলী বলিতে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের সেই সকল অধিবাসীদের বুঝায় যাহারা ব্যবস্থাপক সভা অথবা নির্বাচন সংস্থায় (The Electoral College) প্রতিনিধি নির্বাচনে আইনত ভোটদানের অধিকারী। ইহারা হইল ভোটদানের অধিকারী নাগরিকগণের সমষ্টি।

নির্বাচকমণ্ডলীর সংজ্ঞা

ভোটাধিকারের ভিত্তি কি হইবে এই লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে এবং ফলে বহু মতবাদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল মতবাদের মধ্যে দুইটিই হইল প্রধান। প্রথম মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রাধীন সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের পক্ষে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের (universal adult suffrage) ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে সকলকে নয়, শুধু যোগ্য ব্যক্তিদিগকেই ভোটাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

ভোটাধিকারের ভিত্তি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাভাবিক অধিকার সম্বন্ধে মতবাদ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে বিশেষ প্রবল সমর্থন হইয়া দাঁড়ায়। এই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, সার্বভৌমিকতা জনসাধারণের মধ্যেই নিহিত এবং ভোটাধিকার নাগরিকের জন্মগত অধিকার। ভোটাধিকারের ফলেই নাগরিক সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া জনগণের সার্বভৌমিকতাকে সার্থক রূপদান করে।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে যুক্তি :

দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে, শাসননীতির ফল যখন সকলকেই স্পর্শ করে তখন শাসননীতি নির্ধারণে সকলেরই হাত থাকা উচিত।* জনগণের যদি শাসন-ব্যবস্থা ও শাসননীতি নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা না থাকে তবে গণতন্ত্রকে 'জনগণের শাসন' (Rule of the People) বলা যায় কিরূপে? সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ব্যতিরেকে গণতন্ত্র অসার কল্পনাতে পরিণত হয়।

১। ইহা জনগণের সার্বভৌমিকতাকে রূপদান করে

২। ইহা গণতন্ত্রকে সফল করে

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে প্রদর্শিত তৃতীয় যুক্তি হইল সাম্যের যুক্তি। গণতন্ত্র শুধু স্বাধীনতা নহে, সাম্যের অবস্থাও কল্পনা করে। মানুষে মানুষে সাম্য ব্যতীত গণতন্ত্র সম্পূর্ণ অলীক। সুতরাং সকল নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। একমাত্র বয়স ব্যতীত অন্য কোন অজুহাতে ভোটাধিকার প্রদান ব্যাপারে নাগরিকগণের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করা গণতন্ত্রের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

৩। সাম্যের যুক্তি

উপরি-উক্তি রাষ্ট্রনৈতিক কারণসমূহ ছাড়া নৈতিক কারণেও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারকে সমর্থন করা হয়। এইরূপ সমর্থনকারীরা বলেন, ভোটাধিকার জন্মগত অধিকার না হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ইহা সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় অধিকার। ভোটাধিকার

৪। নৈতিক যুক্তি

* "What touches all should be decided by all."

না থাকিলে নাগরিকের চরিত্রের একটা দিক—রাষ্ট্রনৈতিক দিক পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে না। ফলে সে অপরিণত মানব থাকিয়া যায়। সুতরাং নৈতিক কারণেই সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত।

৫। অভিজ্ঞতার যুক্তি

পরিশেষে, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারকে সমর্থন করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, যাহাদের ভোটাধিকার নাই তাহাদের অভাব সম্বন্ধে শাসনকর্তৃপক্ষ কখনই সচেতন থাকেন না এবং তাহাদের অভিযোগে কেহই কর্ণপাত করেন না। তাহাদের দাবি উপেক্ষিত হইতেই থাকে। সুতরাং সর্বসাধারণের মংগলসাধন যদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হয় তবে ইহাকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি গ্রহণ করিতেই হইবে।

বিরুদ্ধে যুক্তি :

১। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বলিতে কি বুঝায় তাহা সকল সময় সুস্পষ্ট নহে

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সপক্ষে এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল যে সমর্থনকারিগণ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বলিতে কি বুঝেন তাহা কোন সময়েই বিশেষ সুস্পষ্ট নহে। যদি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বলিতে রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজবিরোধী নহে এইরূপ প্রত্যেক সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিকেই বুঝায় তবে বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এই মতের প্রতি শ্রদ্ধা না জানাইয়া পারা যায় না। আর যদি 'প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক' বলিতে উন্মাদ, দেউলিয়া গ্রহণকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিগণকেও বুঝায় তবে এই মতকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

২। ভোটাধিকার জন্মগত অধিকার নহে ; ইহা যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র-প্রদত্ত অধিকার

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের বিরোধিতা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ব্লুণ্টস্‌লি, লেকী (Lecky), জন ষ্টুয়ার্ট মিল এবং স্যর হেনরী মেইন প্রধান। ইঁহাদের মতে, ভোটাধিকার কখনই মানুষের জন্মগত অধিকার নহে। ইহা রাষ্ট্র-প্রদত্ত অধিকার এবং রাষ্ট্রের উচিত বিশেষ বিবেচনা সহকারে এই অধিকার প্রদান করা। যাহাদের অধিকার ব্যবহার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা নাই তাহাদিগকে কখনই ইহা প্রদান করা উচিত নয়। ভোটাধিকার সাধারণ অধিকার নহে, ইহার সহিত উপযুক্তভাবে ব্যবহারের পবিত্র কর্তব্যও জড়াইয়া আছে। সুতরাং জনসাধারণকে এই অধিকার প্রদান করার অর্থ হইল গণতন্ত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে লইয়া যাওয়া। ভোটাধিকার প্রদানের জন্য যোগ্যতার যে-সকল মানদণ্ডের নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সম্পত্তি—এই দুইটিই প্রধান।

যোগ্যতার মানদণ্ড—শিক্ষা ও সম্পত্তি

মিলের মতে, শিক্ষাই প্রধান মানদণ্ড

মিলের মতে, শিক্ষাই ভোটাধিকার প্রদানের যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। যে ব্যক্তির সাধারণ অক্ষর-পরিচয়ও নাই—অর্থাৎ, যে প্রাথমিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত হয় নাই তাহাকে ভোটদানের অধিকার প্রদান করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সুতরাং সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্বে সার্বিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।*

* "Universal teaching must precede universal enfranchisement."

মিলের এই মত বিশেষ গ্রহণীয় নহে। মিল প্রাথমিক শিক্ষার কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক যোগ্যতা ও কর্তব্যের পথে কতদূর লইয়া যাইতে পারে? দেখা গিয়াছে, প্রাথমিক স্তর হইতেও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন এবং নীতি ও বুদ্ধিমত্তার পথে ইহার সমাধান করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নন। সুতরাং শিক্ষাকে ভোটদানের যোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড করা চলিতে পারে না। অবশ্য ইহা সত্য যে, নির্বাচনের ব্যাপারে অধিকাংশ অশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি কাম্য। কিন্তু তাই বলিয়া সকল অশিক্ষিত ব্যক্তিকেই ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। নির্বাচনে শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করা উচিত যে, সার্বিক ভোটাধিকারের সংগে সংগে যেন সার্বিক শিক্ষার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়।

মিলের মতের সমালোচনা

যাঁহাদের মতে, সম্পত্তির মালিকানা ভোটাধিকারের যোগ্যতার ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত তাঁহারা বলেন, যাহাদের সম্পত্তি নাই রাষ্ট্রের উপর তাহাদের দরদও থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের ভোটাধিকার প্রদান করা রাষ্ট্র কল্যাণের পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে। উপরন্তু, এই যুক্তি দেখানো হয় যে সম্পত্তিহীন লোকে কর প্রদান করে না; এবং যাহারা কর প্রদান করে না তাহাদের পক্ষে অমিতব্যয়ী ও অপচয়ী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। মিল এই মতের সমর্থনে বলিয়াছেন অপরের অর্থে অমিতব্যয়ী হইবার দিকে ঝোঁক সাধারণের সর্বদাই রহিয়াছে।

সম্পত্তিকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করার সপক্ষে যুক্তি

সম্পত্তিকে ভোটদানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার নীতি অন্যতম সামন্ততান্ত্রিক (feudal) নীতি। সামন্ততান্ত্রিক যুগে মাত্র সম্পত্তির অধিকারিগণকেই ভোটাধিকার প্রদান করা হইত। কিন্তু বর্তমানে সামন্ততন্ত্রের এই নীতি অযৌক্তিক বলিয়া ক্রমশই বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে। দেখা গিয়াছে, সম্পত্তিহীন ব্যক্তির রাষ্ট্রের প্রতি কোন অংশে কম দরদ থাকে না। দ্বিতীয়ত, সামন্ততান্ত্রিক যুগে যখন শুধু প্রত্যক্ষ করই ধার্য করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হইত তখন মাত্র সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণই কর প্রদান করিত। কিন্তু বর্তমানে পরোক্ষ করও প্রবর্তিত হওয়ায় সকলেই কিছু-না-কিছু কর প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং করপ্রদান না করিবার অজুহাতে সম্পত্তিহীন ব্যক্তিদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না।

সম্পত্তিকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে যুক্তি

উপসংহারে বলা যায় যে, পরোক্ষ গণতন্ত্রের ভিত্তিই হইল সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার। পূর্ণবিকশিত নাগরিকতাকে ভোটাধিকার প্রদান দ্বারা স্বীকার না করিলে ইহার স্বরূপ বজায় রাখা যায় না। যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া নাগরিক নিজ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয় তখনই তাহাকে ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। একমাত্র এইভাবেই গণতন্ত্র প্রকৃত জনগণের শাসনে পরিণত হইতে পারে।

উপসংহার

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার (Women Suffrage)ঃ নারীর ভোটাধিকার সমস্যা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সমস্যারই অংগীভূত। যদি সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরই ভোট দিবার অধিকার থাকে তবে নারীকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার যুক্তিসংগত কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই সহজ যুক্তি সেদিন পর্যন্তও মানিয়া লওয়া হয় নাই। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার লইয়া সর্বপ্রথম আন্দোলন সুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই আন্দোলন ক্রমশ সমগ্র ইয়োরোপে প্রসার লাভ করে। ইংল্যাণ্ডে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিলে প্রথম ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিশ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক স্ত্রীলোকগণের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন সংশোধন করিয়া স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রাপ্তির বয়স পুরুষদের বয়সের সহিত সমান করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্স ও ইতালীতে নারীর ভোটাধিকার ছিল না। বর্তমানে অবশ্য উভয় দেশেই তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে। জাপানে সর্বপ্রথম ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রীলোকদিগকে নির্বাচকমণ্ডলীভুক্ত করা হয়। এখনও ইয়োরোপের অনেক রাষ্ট্রে স্ত্রীলোকগণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচনে ভোট দিতে পারে কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে পারে না।

নারীর ভোটাধিকার সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের অংগীভূত

নারীর ভোটাধিকারের যাঁহারা বিরোধী তাঁহাদের মতে, নারীর স্থান গৃহের মধ্যে; রাষ্ট্রনীতির ঘূর্ণাবর্তে তাহাদিগকে টানিয়া আনা অন্যায়। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের কঠোরতার সহিত সন্তানপালন ও পারিবারিক কর্তব্যের সংগতি-বিধান করা যায় না। একবার রাষ্ট্রনীতির মধ্যে নারীকে টানিয়া আনিলে গৃহের শান্তি নষ্ট হইবে, পারিবারিক জীবন ও সমাজের বুনিয়াদ ধ্বংস হইবে এবং নারীর স্বভাবজাত গুণাবলী বিকশিত হইতে পারিবে না। উপরন্তু, সমানাধিকারের জন্য সমকক্ষ হওয়া প্রয়োজন। শারীরিক কারণে নারীরা পুরুষের সমকক্ষ নয়; সুতরাং তাহারা পুরুষের সহিত সমানাধিকার দাবি করিতে পারিবে না।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের সমর্থকগণ এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে বলেন যে নীতি ও যুক্তির ভিত্তিতেই ভোটাধিকার প্রদান করা হইয়া থাকে, শারীরিক কারণে নহে। শারীরিক কারণে স্ত্রীলোকগণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইলে দুর্বল পুরুষগণকেও বঞ্চিত করিতে হয়। সিজউইক বলেন, কেবলমাত্র নারীত্বের অজুহাতে কোন আত্মনির্ভরশীল স্ত্রীলোককে ভোটাধিকার প্রদান করিতে অস্বীকার করার কোন সংগত কারণ থাকিতে পারে না; এবং যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র অবিবাহিত ও বিধবা স্ত্রীলোকগণকে সাধারণ শ্রমিক জীবনের অন্নসংস্থান প্রতিযোগিতায় কোনরূপ বিশেষ সুবিধা বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে না পারিতেছে ততদিন এইরূপ অস্বীকারের ফলে অন্যায়ের মাত্রা বাড়িয়াই যাইবে। শারীরিক

সপক্ষে যুক্তিঃ

১। স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার অস্বীকার করিলে অন্যায় করা হয়

দুর্বলতার জন্য স্ত্রীলোকগণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত না করিয়া এইজন্যই তাহাদের নির্বাচকমণ্ডলীভুক্ত করা উচিত। কারণ, দুর্বলের পক্ষেই অধিকতর সংরক্ষণের প্রয়োজন। নারীস্বার্থ সম্পর্কিত কোন সমস্যা নির্ধারণের ভার স্ত্রীলোকগণের উপরই থাকা উচিত। ভোটাধিকার অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। ইহা ব্যতীত স্ত্রীলোকদের পক্ষে অন্যান্য সামাজিক অধিকারও উপলব্ধি করা কঠিন। উপরন্তু, শারীরিক শক্তিতে নারী পুরুষের সমকক্ষ না হইলে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন কোন শারীরিক শক্তির কার্যে তাহারা পুরুষের পশ্চাতে পড়িয়া নাই। গত মহাসমরে নারী রক্ষিবাহিনী বিভিন্ন স্থানে পুরুষবাহিনীর প্রায় সমকক্ষ কার্যই করিয়াছিল। শিক্ষা প্রভৃতিতেও নারী পুরুষের পশ্চাতে পড়িয়া নাই। পরিশেষে বলা যায় যে, নারীকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে সমাজের অর্ধাংশকে অন্ধকারে আবদ্ধ রাখা হয়।

২। দুর্বল বলিয়াই নারীর ভোটাধিকার প্রয়োজন

৩। অনেক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমকক্ষতা প্রমাণ করিয়াছে

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য পর্দা, সংস্কার প্রভৃতি কারণে সকল দেশে নারী পূর্ণভাবে এখনও রাষ্ট্রনৈতিক কর্মক্ষেত্রে আসিয়া হাজির হইতে পারে নাই। তবে শোভাযাত্রা যে সুরু হইয়াছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বর্তমানে নারীর ভোটাধিকার অন্যতম স্বীকৃত অধিকার

***নির্বাচন পদ্ধতি* (Modes of Election) ঃ** গণতন্ত্রের সফলতা শুধু নির্বাচকমণ্ডলীর আয়তনের উপর নির্ভর করে না, প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতির উপরও নির্ভর করে। প্রতিনিধি নির্বাচন দুইটি পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচকগণ সরাসরি প্রতিনিধিবর্গকে নির্বাচিত করে। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোটদাতৃগণ প্রথমে একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন সংস্থা (electoral college) মনোনয়ন করে এবং পরে এই নির্বাচন সংস্থার সভ্যগণ চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। অনেক সময় অবশ্য প্রতিনিধি মনোনয়নের উদ্দেশ্যেই নির্বাচক সংস্থা গঠিত হয় না; ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণই পরে নির্বাচন সংস্থা হিসাবে কার্য করিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের বিশেষ উদ্দেশ্যেই নির্বাচন সংস্থা গঠিত হয়, কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ ও রাজ্যের বিধান সভাসমূহের নির্বাচিত সভ্যগণকে লইয়া এক নির্বাচন সংস্থার দ্বারা।

নির্বাচন পদ্ধতি দুইটি —প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণাগুণ (Merits and Defects of Direct Election) ঃ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রধান গুণ হইল যে, ইহা নাগরিকগণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। নির্বাচন পদ্ধতি প্রত্যক্ষ হইলে প্রতিনিধি ও ভোটদাতৃগণের মধ্যে সম্বন্ধ নিকটতর হইবে। সম্বন্ধের এই নৈকট্যের জন্য নাগরিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয় এবং প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করিতে

গুণ ঃ ১। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে

সচেষ্ট হয়। ফলে জনমতের অনুপন্থী আইন প্রণীত হয় এবং জনমতবিরোধী কার্য সহজে সাধিত হইতে পারে না।

২। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষারও বিস্তার ঘটে

এই পদ্ধতি রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। যেহেতু নাগরিকগণকেই চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে হইবে এইজন্য তাহারা বিভিন্ন দল ও প্রার্থীর কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি অনুশীলন করে। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। বস্তুত, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৩। ইহাতে দুর্নীতির আশংকাও কম থাকে

প্রত্যক্ষ নির্বাচনে দুর্নীতির আশংকাও কম থাকে। প্রার্থী বা দলের পক্ষে নির্বাচক সংস্থার কতিপয় সদস্যকে প্রভাবান্বিত করা সহজ কিন্তু বিপুল নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রভাবান্বিত করা সহজ নহে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে নৈতিক পথে সুযোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের অধিকতর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ত্রুটি

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রধান ত্রুটি হইল সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ত্রুটি। বলা হয় যে, অজ্ঞ জনসাধারণ যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারে না। তাহাদের পক্ষে আবেগ বা প্রচার দ্বারা পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা বিশেষ-ভাবে রহিয়াছে। উপরন্তু, প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নানারূপ অসাধু ও অশোভন আচরণ করিতে হয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিগণ এইরূপ নির্বাচন পরিহার করেন। ইহার অর্থ হইল সমূহ জাতীয় ক্ষতি।

পরোক্ষ নির্বাচনের গুণাগুণ (Merits and Defects of Indirect Election)ঃ বলা হয় যে, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও জনতার শাসনের (mob rule) ত্রুটিগুলি দূর করিবার একমাত্র উপায় হইল পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা থাকে নির্বাচক সংস্থার সভ্যগণের হস্তে। সংস্থার সভ্যগণ বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়া অজ্ঞ জনসাধারণ অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের মানুষ বলিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন তাহারা যেরূপ উপযুক্তভাবে করিতে পারে সাধারণ নির্বাচকগণ তাহা পারে না।

গুণঃ ১। ইহা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও জনতার শাসনের ত্রুটিগুলি দুর করে

২। ইহাতে ব্যয়-সংক্ষেপ হয় এবং দলপ্রথার ত্রুটি কতকাংশে দুর হয়

চূড়ান্ত ভোটদাতৃগণ বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত হইবার ফলে বিশেষভাবে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রচারকার্য চালানো অর্থহীন হইয়া পড়ে। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং দলীয় প্রচারকার্য তীব্ররূপ ধারণ করিতে পারে না। ফলে দলপ্রথার ত্রুটিগুলি কতকাংশে দূর হয়। আবার দুইবার নির্বাচন সময়-সাপেক্ষ। এই সময়ের মধ্যে নির্বাচনজনিত

৩। ইহা সময়-সাপেক্ষ বলিয়া ইহাতে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন হইতে পারে

তীব্রতা ও আবেগ দূর হইতে পারে এবং ইহার ফলে মধ্যবর্তী নির্বাচকগণের পক্ষে ধীরভাবে চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অবকাশ থাকে। ইহাও বলা হয় যে, যে দেশের জনসাধারণের অধিকাংশ অশিক্ষিত সে দেশের পক্ষে পরোক্ষ নির্বাচনই সম্যক পদ্ধতি।

উপরি-উক্ত গুণ সত্ত্বেও পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অগণতান্ত্রিক বলিয়া বর্তমানে ইহাকে আর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয় না। গণতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন জনসাধারণ ও প্রতিনিধির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগস্থাপন। কিন্তু পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে ইহা সম্ভব নয়। সুতরাং এই পদ্ধতি গণতন্ত্রকে বিকৃত করে বলা যায়। এই পদ্ধতি রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তারেও সহায়তা করে না। জনসাধারণ ও প্রতিনিধিগণের মধ্যে নির্বাচন সংস্থার সভ্যগণের অবস্থানের ফলে জনসাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। এই দিক দিয়াও এই পদ্ধতি কাম্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। উপরন্তু, ইহা দলপ্রথার ক্রটিগুলি দূর না করিয়া ইহাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। মধ্যবর্তী ভোটারদের থাকার জন্য উৎকোচ, ভীতি প্রদর্শন ও অন্যান্য নানারূপ গূঢ় অভিসন্ধি ও দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের অধিক সম্ভাবনা থাকে। আবার দলপ্রথা থাকিলে পরোক্ষ নির্বাচন কার্যক্ষেত্রে একরূপ অপ্রয়োজনীয় বহিরংগ হইয়া দাঁড়াইতে পারে—কারণ এরূপ ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী নির্বাচকগণ প্রাথমিক ভোটারদের নিকট দলীয় প্রার্থীকে সমর্থন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংবিধান অনুসারে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে এক নির্বাচন সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন। কিন্তু বর্তমানে কার্যত এই নির্বাচনে যখন কেহ ভোটদান করে তখনই সে জানে যে, মধ্যবর্তী নির্বাচক রাষ্ট্রপতির পদের জন্য তাহার দলীয় প্রার্থীকেই সমর্থন করিবে। পরিশেষে, যুক্তির দিক দিয়াও পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নহে। এই ব্যবস্থা এই ধারণার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, প্রাথমিক নির্বাচক সংস্থার সভ্য নির্বাচন করিবার যোগ্য কিন্তু চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার যোগ্য নহে। যে ব্যক্তি নির্বাচক মনোনয়নে যোগ্য সে প্রতিনিধি মনোনয়নে অযোগ্য হইবে কেন? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

ক্রটি : ১। ইহা বিকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

২। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ও উৎসাহ বিস্তারের পরিপন্থী

৩। ইহাতে দলপ্রথার ক্রটিগুলি বৃদ্ধি পাইতে পারে

৪। পরোক্ষ নির্বাচন বহিরংগ হইয়া উঠিতে পারে

৫। ইহা অযৌক্তিক

***ভৌগোলিক এবং কর্মগত বা পেশাগত প্রতিনিধিত্ব* (Territorial and Functional or Occupational Representation) ঃ** বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই আইনসভা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে

বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রত্যেক নাগরিকই সমান অধিকার ভোগ করে। নির্বাচনের স্থবিধার জন্য সমগ্র দেশকে বিভিন্ন নির্বাচন এলাকায় বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই সকল ভৌগোলিক নির্বাচন এলাকা হইতে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। ভোটদান বা নির্বাচন কোন পেশাগত ভিত্তিতে সংগঠিত হয় না; নির্বাচন এলাকার মধ্যে বসবাসকারী ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তি সার্বভৌম শক্তির আধার জনসাধারণের অংশ হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের প্রধান যুক্তি হইল নির্বাচন এলাকার অন্তর্ভুক্ত সকল লোকের স্বার্থ মূলত একরূপ স্থতরাং ভিন্ন ভিন্ন পেশা বা স্বার্থের ভিত্তিতে আইনসভা সংগঠিত করিবার কোন যুক্তি নাই। ইহা করা হইলে বৃহত্তর সাধারণ স্বার্থের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রধান হইয়া দাঁড়াইবে।

ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব

ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের যুক্তি

অপরদিকে ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার সমালোচনাও করা হইয়াছে। ইহাদের মতে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রসম্মত নয়। বর্তমান অবস্থার সহিত ইহার কোন সংগতি নাই। কারণ নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী সকল লোকের স্বার্থ এক নয় এবং বর্তমান সমাজ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত। অতএব আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি এই সকল বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করিতে পারে না। স্থতরাং আঞ্চলিক নির্বাচন এলাকার ভিত্তিতে গঠিত আইনসভা কখনই প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে না। একজন ডাক্তার অপর আর একজন ডাক্তারের প্রতিনিধি হইতে পারে, উকিল উকিলের হইতে পারে, চাষী চাষীর হইতে পারে কিন্তু পেশাগত বা স্বার্থগত সম্পর্কবিহীন রাম শ্যামের প্রতিনিধি হইতে পারে না। সমাজ যখন বিভিন্ন পেশা ও স্বার্থগোষ্ঠীতে বিভক্ত তখন গণতন্ত্রকে সার্থক রূপ দিতে হইলে আইনসভাকে পেশাগত ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে। একই কার্যে রত বা একই পেশার অন্তর্ভুক্ত লোকের স্বার্থ যতটা সমজাতীয় একই অঞ্চলে বসবাসকারী লোকের স্বার্থ ততটা নয়। পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচিত ব্যক্তিই প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করিতে পারে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ সম্যকভাবে সংরক্ষণ করিতে পারে। আইনসভাও সার্থকভাবে প্রতিনিধিমূলক হইবে কারণ সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীবিন্যাস অথবা কর্মগত বা পেশাগত বিভাগ দেখা যায় তাহা আইনসভায় প্রতিফলিত হইবে। অনেকে আবার বলেন যে আইনসভাকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট করিয়া এক কক্ষকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং অপর কক্ষকে পেশার ভিত্তিতে নির্বাচিত করা সমীচীন।

ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের সমালোচনা

পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচনের যুক্তি

পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচন-ব্যবস্থাকে যাহারা সমর্থন করেন তাহাদের মধ্যে ফরাসী লেখক ডুগুই (Duguit), অষ্ট্রিয়ান লেখক শেফ্‌লে (Albert Shaffle),

ইংরাজ লেখক কোল (G. D. H. Cole) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোল বলেন, জাতীয় জীবনে যতগুলি পৃথক কার্য থাকিবে আইনসভায়ও ততগুলি সংঘের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। ডুগুইয়ের মতে সমাজের বিভিন্ন স্বার্থের (groups) প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমেই সাধারণের ইচ্ছা প্রকাশিত হইতে পারে। তাঁহার ভাষায় বলা যায়, শিল্প, সম্পত্তি, ব্যবসা, কারখানা, পেশা প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সকল প্রধান শক্তিগুলির প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।*

পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচনের সমালোচনা

পেশাগত প্রতিনিধিত্বের নীতিকে অনেক লেখকই তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ফরাসী লেখক ইজমে (Esmein) ইহাকে অলীক ও ভ্রান্ত নীতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যাহার ফলে সংঘর্ষ, বিশৃংখলা এবং এমনকি অরাজকতার সৃষ্টি হয়।** পেশাগত প্রতিনিধিত্ব যে স্বভাবতই সাধারণ স্বার্থের হানি করে তাহা সহজেই অনুমেয়। পেশা বা বিভিন্ন সংঘের ভিত্তিতে আইনসভা গড়িয়া উঠিলে উহাতে বিভিন্ন দল নিজ নিজ ক্ষুদ্র সংঘস্বার্থের প্রতিই লক্ষ্য রাখে, ফলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বা সমগ্র দেশের কল্যাণ ব্যাহত হইতে বাধ্য। মানুষের পেশাগত স্বার্থই সব নয়। নাগরিক হিসাবেও সমগ্র সমাজের প্রতি তাহার কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে যদি তাহার পেশা বা সংঘের স্বার্থের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়া নাগরিক কর্তব্যকে অবহেলা করে তবে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

১। ইহাতে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়

ইহা ব্যতীত পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচন-ব্যবস্থার ফলে সমাজ কৃত্রিমভাবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে; এবং ইহাদের মধ্যে সকল সময় স্বার্থের সংঘাত লাগিয়াই থাকে। স্বভাবতই সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে এবং জাতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়। পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচিত আইনসভাও তাহার কার্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, ইহা নিছক বিতর্ক-সভায় (a debating society) পরিণত হয়। ইহার পক্ষে দৃঢ়তার সহিত কোন পন্থা অবলম্বন করাও সম্ভব হয় না—কারণ আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলির মধ্যে চুক্তি ও বোঝাপড়া চলিতে থাকে। যেখানে কেবিনেট শাসন-ব্যবস্থা থাকে সেখানে সরকারও অস্থায়ী ও দুর্বল হইয়া পড়ে।

২। বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে অনবরত সংঘাত বাধে এবং জাতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়

৩। আইনসভার দক্ষতা কমিয়া যায়

---

* "All the great forces of the national life ought to be represented,—industry, property, commerce, manufacturing, professions, etc." M. Duguit, *Droit Constitutionel*

** The principle of representation of interests is 'an illusion and a false principle, which would lead to struggles, confusion and even anarchy.'

উপসংহারে বলা যায় যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আঞ্চলিক নির্বাচন-ব্যবস্থার ত্রুটি থাকিলেও উহা পেশাগত নির্বাচন-ব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেয়। কারণ জনসংখ্যার ভিত্তিতে আঞ্চলিক নির্বাচন-ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল যে, ইহাতে সাধারণ স্বার্থের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারণ সাধারণ লোকসমূহ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইলেও ইহার ফলে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে আকৃষ্ট হয়।* অন্যতম রাষ্ট্রনীতিবিদ ল্যাস্কির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন সমাজজীবনের মতদ্বৈধতার মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক নির্বাচন-এলাকা হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া সংগঠিত আইনসভাই প্রকৃষ্টতম পন্থা।** অবশ্য আইনসভাকে বিভিন্ন পেশাগত সংঘ ও স্বার্থের অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য আইনসভায় বিভিন্ন পেশা বা স্বার্থের প্রতিনিধি থাকার প্রয়োজন নাই। পরামর্শদান সংস্থার (advisory bodies) মাধ্যমে বিভিন্ন পেশা বা স্বার্থসমূহের সহিত আইনসভার সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

ভৌগোলিক নির্বাচন-ব্যবস্থাই কাম্য

***সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব* (Minority Representation):** এক দিক দিয়া দেখিলে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের সংগঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র বলিতে সর্বসাধারণের সরকার বুঝায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে বর্তমান গণতন্ত্রগুলি সকলের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বসাধারণের সরকার নহে, তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার মাত্র। অনেকের মতে, মাত্র এইরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব থাকিলে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে না এবং ইহাকে অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক অন্যায় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। বস্তুত, সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকিলে সংখ্যালঘিষ্ঠগণ জানিবে যে, তাহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই। তাহারা নির্বাচকমণ্ডলীর মোট সংখ্যার শতকরা ৪৯ ভাগ হইলেও তাহারা প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে ভোটদান অর্থহীন কার্য হইয়া পড়ে। এরূপ মনোভাব সংখ্যালঘিষ্ঠদের সুন্দর ও সুশৃংখল রাষ্ট্রনৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক নহে।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভোটাধিকারের গুরুত্ব

ইহা বলা হয় যে, আইন হইল জনসাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র।† কিন্তু আইন প্রণয়নকারীরা যদি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি হন তবে এরূপ আইনকে সর্বসাধারণের ইচ্ছার প্রকাশ বলিয়া অভিহিত করা যায় কিরূপে? আইন মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রকাশ হইলে তত্ত্বের দিক দিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠের পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে এইরূপ আইনকে অস্বীকার করিবার। ফলে অন্তর্বিপ্লবের

তত্ত্ব ও রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতার দিক হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন আছে

* 'The very idea of the common welfare irradiates the consciousness of sectional aims.' MacIver, The Modern State

** 'The territorial assembly built upon universal suffrage seems....the best method of making final decisions in the conflict of wills within the community.' H. J. Laski

† ১৩৯-১৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

অভ্যুত্থানও ঘটিতে পারে। সুতরাং যুক্তি ও রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতার দিক দিয়া প্রয়োজন হইল সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের সুবন্দোবস্ত করিবার।

বিরুদ্ধে যুক্তি

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতাও করা হইয়াছে। বলা হয় যে, এরূপ ব্যবস্থা নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে অযথা বিভেদের সৃষ্টি করে। দল বা স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকিলে প্রত্যেকে নির্বাচক ও প্রতিনিধি দলীয় স্বার্থের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ হইতেই জাতীয় সমস্যার আলোচনা করে। ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয় এবং ব্যবস্থাপক সভা বিরোধী দলসমূহের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। উপরন্তু, এই ব্যবস্থা জটিল বলিয়াও ইহাকে পরিহার করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

উপসংহার

সংখ্যালঘিষ্ঠের বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ যতই মূল্যবান হউক না কেন এই সমস্যার গুরুত্বকে কোনমতে অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়ের দিক ছাড়াও ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন যে আছে তাহার আলোচনা ইতিমধ্যে করা হইয়াছে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতি **(Different Methods of Minority Representation) :** সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে (ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, (খ) সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি, (গ) স্তূপীকৃত ভোট পদ্ধতি, এবং (ঘ) দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতিই প্রধান। নিম্নে পদ্ধতিসমূহের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

(ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation) : এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রনৈতিক, জাতিগত, ভাষাগত, সম্প্রদায়গত প্রভৃতি সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর প্রত্যেকেরই উহার সমর্থনের সমান অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও লেকী (Lecky) ছিলেন এইরূপ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সর্বপ্রধান সমর্থক। অবশ্য তাঁহারা উভয়েই 'সংখ্যালঘিষ্ঠ' বলিতে প্রধানত রাষ্ট্রনৈতিক সংখ্যালঘিষ্ঠ দলই বুঝিয়াছেন। লেকী ঘোষণা করিয়াছেন যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করার গুরুত্ব কোনমতে অস্বীকার করা যায় না। "যখন কোন নির্বাচন এলাকার দুই-তৃতীয়াংশ একদলের পক্ষে এবং এক-তৃতীয়াংশ অপর দলের পক্ষে ভোটদান করে তখন ন্যায্যত সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ আসন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ আসন গ্রহণ করা উচিত।" মিল স্বীকার করিয়াছিলেন, গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের দলই শাসন করিবে—কিন্তু ইহার উপর জোর দিয়াছিলেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি সকল সংখ্যালঘিষ্ঠ দল তাহাদের সংখ্যার সমানুপাতে প্রতিনিধি

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে লেকী ও মিল

প্রেরণ করিতে না পারে তবে ইহা সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারের পরিবর্তে অসাম্য ও বিশেষ সুযোগসুবিধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকার হইয়া দাঁড়ায়।"

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দুইটি প্রধান পদ্ধতি আছে: হেয়ারের পদ্ধতি (The Hare System) এবং তালিকা পদ্ধতি (The List System)। হেয়ারের পদ্ধতিকে একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (proportional representation by means of single transferable vote) বলা হয়। এই পদ্ধতি ১৮৫১ সালে ইংরাজ লেখক টমাস হেয়ার লিখিত প্রতিনিধি নির্বাচন (Election of Representatives) নামক পুস্তকে সর্বপ্রথম প্রচার করা হয় বলিয়া ইহা হেয়ারের নামের সহিতই বিশেষভাবে জড়িত।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দুইটি প্রধান পদ্ধতি—হেয়ারের পদ্ধতি ও তালিকা পদ্ধতি

হেয়ারের পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচন-এলাকাসমূহ এরূপভাবে বিভক্ত হয় যেন প্রত্যেক এলাকা হইতে অন্তত তিনজন প্রতিনিধি নির্বাচন করা যায়। তিনজনের পরিবর্তে আট-দশ জনকেও নির্বাচিত করা যাইতে পারে। তবে, গিলক্রাইষ্টের মতে, পনের জনের অধিককে একই নির্বাচন এলাকা হইতে নির্বাচিত না করাই ভাল। নির্বাচন এলাকায় আসনের সংখ্যা যতই হউক না কেন প্রত্যেক নির্বাচকের প্রকৃত কার্যকরী ভোটসংখ্যা একটির বেশী থাকে না। নির্বাচক কিন্তু আসনের সংখ্যা অনুসারে প্রার্থিগণের মধ্যে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা তাহার মনোনয়ন বা পছন্দ প্রকাশ করিতে পারে। পনেরটি আসন থাকিলে সে পনেরটি পছন্দই এইভাবে জ্ঞাপন করিতে পারে।

হেয়ারের পদ্ধতি

এই ব্যবস্থায় সাধারণত দুইটি পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট বা কোটা (Quota) নির্ধারণ করা হয়। প্রথম পদ্ধতিতে যত ভোটদান করা হইয়াছে সেই সংখ্যাকে যত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে সেই সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে কোটা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে এই প্রতিনিধিসংখ্যার সহিত এক যোগ করিয়া যে সংখ্যা হয় তাহার দ্বারা প্রদত্ত ভোটসংখ্যাকে ভাগ করিয়া এই কোটা নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতির এই কোটাকে ড্রুপ কোটা (The Droop Quota) বলে।

কোটা ও ড্রুপ কোটা

প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট পাইয়া কোটা সংগ্রহ করিতে পারেন তাঁহারা সরাসরি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হন। নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে কোটার অতিরিক্ত প্রথম মনোনয়ন থাকিলে তাহা যে-যে প্রার্থী দ্বিতীয় মনোনয়ন পাইয়াছেন তাঁহাদের হিসাবে জমা দেওয়া হয়। এইরূপে দ্বিতীয় পছন্দের ভোটে কোটা পাইয়া আরও কয়েকজন নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় পছন্দের পর প্রয়োজন হইলে তৃতীয় পছন্দও গণনা করা হয়। এইরূপে যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্দিষ্টসংখ্যক আসন পূর্ণ হয় ততক্ষণ গণনাকার্য চলিতে থাকে।

হেয়ারের পদ্ধতিতে উপরি-উক্ত সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ইংরাজেরা বিশেষ পছন্দ করিলেও ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র তালিকা পদ্ধতিরই (The List System) পক্ষপাতী। (তালিকা পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দল প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রে তাহার প্রার্থীদের একটি করিয়া তালিকা প্রদান করে। নির্বাচক তাহার পছন্দ অনুসারে যে কোন একটি তালিকাকে ভোটদান করে। অবশ্য যে তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের মধ্যে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা তাহার পছন্দ জানাইতে পারে। ভোটদান সমাপ্ত হইলে দলগুলি তাহাদের তালিকাতে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত হিসাবে আসন অধিকার করে।

তালিকা পদ্ধতি

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বর্তমানে স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং মধ্য ইউরোপের কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে প্রবর্তিত আছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের পদ্ধতিকেও 'একহস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার কয়েকটি নগরীর পৌরসভার নির্বাচনেও এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের গুণাগুণ (Merits and Defects of Proportional Representation): সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের গুণাবলী একরূপ স্বতঃপ্রকাশিত। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক সংখ্যালঘিষ্ঠ দল তাহার শক্তি অনুসারে প্রতিনিধিত্ব পায়। ফলে ব্যবস্থাপক সভা জাতির প্রকৃত প্রতিফলন হইয়া দাঁড়ায় এবং গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে। বলা হয় যে, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত গণতন্ত্র সাম্যের নীতিকে রূপদান করিতে পারে না। হেয়ারের পদ্ধতিতে প্রত্যেক নির্বাচক তাহার পছন্দ জ্ঞাপন করিতে পারে। পছন্দ জ্ঞাপন করিতে হয় বলিয়া সে বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা করে এবং ইহার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক ও পৌর চেতনা জাগ্রত হয়।

গুণ: ১। ইহা গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে
২। ইহা সাম্যের নীতিকে রূপদান করে
৩। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক ও পৌর চেতনা জাগ্রত হয়

বর্তমানে কিন্তু সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। ল্যাস্কির মতে, প্রতিনিধিত্ব প্রথার সংস্কারসাধনের দ্বারা সরকারের সাম্প্রতিক সমস্যাগুলির সমাধান করা যায় না। ইহার জন্য প্রয়োজন হইল সাধারণ নাগরিকের আর্থিক, নৈতিক, মানসিক অবস্থার উন্নয়ন।** প্রকৃতপক্ষে, দেখা গিয়াছে, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে ইহার অবনতিই

ত্রুটি: ১। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে না

---

*এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 'শাসন-ব্যবস্থা'য় ভারতের শাসন-ব্যবস্থা দেখ।

**The difficulties of the modern state..should be met more "by the elevation of the popular standard of intelligence and the reform of the economic system, than by making men choose in proportion with neatly graded volume of opinion".

ঘটাইয়াছে। এই পদ্ধতি প্রবর্তিত থাকায় লোকে জাতির পরিবর্তে দলের কথা চিন্তা করে। ফলে সরকারের স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়, জাতীয় স্বার্থ পদে পদে ব্যাহত হয় এবং সুচিন্তিত জনমতের কথা চিন্তাই করিতে পারা যায় না। উপরন্তু, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকিলে যে সকল সংখ্যালঘিষ্ঠ দলই তাহাদের সংখ্যা অনুযায়ী সমান প্রতিনিধিত্ব পাইবে এমন কোন কথা নাই। দেখা গিয়াছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সুচিন্তিত পদ্ধতিতে কাজ করিলে নির্বাচন এলাকার সকল বা অধিকাংশ আসনই সংগ্রহ করিতে পারে। তালিকা পদ্ধতিতে নির্বাচকের পছন্দ যে তালিকাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয় তাহাও আদর্শের দিক দিয়া কাম্য নহে। তালিকাভুক্ত অনেক অযোগ্য প্রার্থী থাকিতে পারে। অপরদিকে, হেয়ারের পদ্ধতি হইল জটিল পদ্ধতি ইহা সাধারণ নির্বাচকগণের বোধগম্যের বাহিরে। এই সকল কারণে অনেক আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করিয়াছেন। বিরোধিতা করিতে গিয়া ফাইনার (Dr. Herman Finer) বলিয়াছেন, "সংখ্যালঘিষ্ঠের দিক্‌চক্রবাল নির্বাচন এলাকার মধ্যে কোনমতেই সীমাবদ্ধ নহে।"* ফরাসী লেখক ইজমিঁ (Prof. Esmien) বলেন, "সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিলে দ্বি-পরিষদত্ব দ্বারা যে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাকে প্রকৃত হলাহলে পরিণত করা যায়: ইহাতে বিশৃংখলার সৃষ্টি করা হয় এবং ব্যবস্থাপক সভার শক্তি হরণ করা হয়; ইহাতে মন্ত্রি-পরিষদের একদলীয় রূপ নষ্ট করিয়া উহাকে অস্থায়ী করিয়া তোলা হয় এবং ফলে পার্লামেণ্টীয় সরকারও অসম্ভব হইয়া পড়ে।"

২। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয় এবং সুচিন্তিত জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে না

৩। ইহা কার্যকর নাও হইতে পারে

৪। হেয়ারের পদ্ধতি জটিল

ফাইনার ও ইজমিঁর উপসংহার

(খ) সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি (Limited Vote Plan): এই পদ্ধতিতেও প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্র বহু আসনসমন্বিত করা হয়। নির্বাচনে নির্বাচক যতগুলি আসন থাকে তাহা অপেক্ষা একটি কম ভোটদান করিতে পারে। ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রে অন্তত একটি করিয়া আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ধরা যাউক, কোন নির্বাচন কেন্দ্রে পাঁচটি আসন আছে। সেখানে নির্বাচক চারিটি করিয়া ভোট দিতে পারে এবং ইহাতে একটি আসন সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের অধিকারে আসিবে। অবশ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যায় বহু হইলে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যায় বিশেষ প্রবল হইলে সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি কার্যকর হইতে পারে না। তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সুচিন্তিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সকল আসনই সংগ্রহ করিতে পারে।

সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি কার্যকর নাও হইতে পারে

(গ) স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি (Cumulative Vote Plan): এই পদ্ধতিতে নির্বাচন এলাকায় যতগুলি আসন থাকে প্রত্যেক নির্বাচকের ততগুলি

* "The horizon of a minority is not limited by the boundaries of a constituency".

করিয়াই ভোট থাকে। নির্বাচক ভোটগুলি প্রার্থীদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারে বা প্রার্থীকেই স্তূপীকৃতভাবে ভোটগুলি দান করিতে পারে। এইভাবে স্তূপীকৃত ভোটদানের ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল কিছু আসন সংগ্রহ করিতে পারে। সমস্ত ভোট যদি একটিমাত্র প্রার্থীকেই দেওয়া হয় তবে তাহাকে plumping বলে।

(ঘ) দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি (The Second Ballot System)ঃ এই পদ্ধতিতে নির্বাচনে দুইজনের অধিক প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলে কেহ যদি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (absolute majority) লাভ করিতে না পারেন তবে দ্বিতীয়বার ব্যালট গ্রহণের সাহায্যে নিম্নতন স্থানাধিকারী ছাড়া অপর সকলের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। ধরা যাউক, কোন একটি আসনসমন্বিত কেন্দ্রে তিনজন মাত্র প্রার্থী আছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম জন ৪,০০০, দ্বিতীয় জন ৩,০০০ এবং তৃতীয় জন ২,০০০ ভোট পাইয়াছেন। প্রথম জন অধিক সংখ্যক ভোটলাভ করিলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রার্থীর মিলিত ভোট ইহার অপেক্ষা অধিক। এখানে প্রথম প্রার্থী অপর দুইজন প্রার্থীর তুলনায় অধিক সংখ্যক ভোট পাইলেও মোট ভোটদাতাগণের অধিকসংখ্যকের সমর্থন পান নাই। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ভোটগ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়বার ভোটগ্রহণ কালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে নিম্নসংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া হইবে। ফলে বর্তমান উদাহরণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রার্থীর মধ্যে। এই দ্বিতীয়বার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া দ্বিতীয় প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারেন। অধ্যাপক গিলক্রাইষ্টের মতে, তিন বা ততোধিক প্রার্থী থাকিলে দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতিতে সমস্ত নির্বাচকমণ্ডলীর মত অধিকতর সঠিকভাবে প্রকাশিত হইতে পারে।

সকলের প্রতিনিধিত্বের জন্য অনেক সময় দ্বিতীয়বার ভোটগ্রহণের প্রয়োজন হয়

উপসংহারঃ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া অন্য সকল পদ্ধতি সংখ্যালঘিষ্ঠের সংখ্যার সমানুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে না; সাধারণভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে মাত্র। এইজন্য সংখ্যালঘিষ্ঠের মনোভাব যেখানে প্রবল সেখানে এই সকল পদ্ধতি গ্রহণের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় নাই। বরং সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের উপর আসন সংরক্ষণ, পৃথক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রভৃতি গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ইহার অন্যতম উদাহরণ।

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমানে গণতন্ত্র হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। এই পরোক্ষ গণতন্ত্রের সংগঠন সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত সমস্যা প্রধানত তিনটি—(ক) ভোটাধিকারের ভিত্তি, (খ) নির্বাচন পদ্ধতি, এবং (গ) সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব।

ভোটাধিকারের ভিত্তি ঃ ভোটাধিকারের ভিত্তি সম্বন্ধে বহু মতবাদ আছে। তন্মধ্যে দুইটিই প্রধান। প্রথম মতবাদ অনুসারে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের

ব্যবস্থা করা কর্তব্য। দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে সকলকে নয়—মাত্র যোগ্য ব্যক্তিগণকেই ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত।

সার্বিক ভোটাধিকারের সপক্ষে যুক্তি—১। ইহা জনগণের সার্বভৌমিকতাকে সার্থক রূপদান করে। ২। ইহা গণতন্ত্রকে সফল করে। ৩। মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সকল নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। ৪। ভোটাধিকার ব্যতিরেকে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। ৫। যাহাদের ভোটাধিকার নাই তাহাদের দাবিতে কেহ কর্ণপাত করে না।

বিপক্ষে যুক্তি—১। সকল নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া যুক্তিসংগত নহে। ভোটাধিকার জন্মগত অধিকার নহে; ইহা যোগ্যতার কারণে রাষ্ট্র-প্রদত্ত অধিকার। যোগ্যতার মানদণ্ড হিসাবে শিক্ষা ও সম্পত্তিকে নির্দেশ করা হয়। সমালোচনা হিসাবে বলা যায় যে, শিক্ষা বা সম্পত্তি কোনটাকেই যোগ্যতার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারই হইল আদর্শ।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার: স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের একটি অংশ। অবশ্য নানা অজুহাতে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের বিরোধিতা করা হয়; তবে বর্তমানে অধিকাংশ দেশই নারীকে পুরুষের সমানাধিকার প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ও যুক্তি মানিয়া লইয়া নারীর ভোটাধিকার নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।

নির্বাচন পদ্ধতি: নির্বাচন পদ্ধতি দুই প্রকারের হইতে পারে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সপক্ষে নিম্নলিখিত গুণগুলি নির্দেশ করা হয়—১। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। ২। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষারও বিস্তার ঘটে। ইহাতে দুর্নীতির আশংকা কম থাকে। অপরদিকে নিম্নলিখিতগুলি হইল পরোক্ষ নির্বাচনের ত্রুটি—১। জনসাধারণ যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারে না। ২। তাহাদের পক্ষে ভাবাবেগ বা প্রচার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ৩। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সহিত নানারূপ অসাধু ও অশোভন আচরণ জড়িত থাকে।

পরোক্ষ নির্বাচনের সপক্ষে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি প্রদর্শন করা হয়—১। ইহা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও জনতার শাসনের ত্রুটিগুলি দূর করে। ২। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং দলপ্রথার ত্রুটি অনেকাংশে দূর হয়। ৩। ইহাতে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারে। অপরদিকে পরোক্ষ নির্বাচনের ত্রুটিগুলি এইরূপ—১। পরোক্ষ নির্বাচন জনসাধারণ ও প্রতিনিধির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিতে দেয় না বলিয়া ইহা বিকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। ২। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ও উৎসাহ বিস্তারের পরিপন্থী। ৩। ইহাতে দলপ্রথার ত্রুটিগুলি বৃদ্ধি পাইতে পারে। ৪। পরোক্ষ নির্বাচন মাত্র অপ্রয়োজনীয় বহিরংগ হইয়া উঠিতে পারে। ৫। যুক্তির দিক দিয়াও পরোক্ষ নির্বাচনকে সমর্থন করা যায় না। যে ব্যক্তি নির্বাচক মনোনয়নে যোগ্য সে প্রতিনিধি মনোনয়নে অযোগ্য হইবে কেন?

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব: গণতন্ত্রকে সকলের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার বলিয়া মানিয়া লইলে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়। উপরন্তু, রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতার দিক দিয়াও ইহা সমর্থনীয়।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি প্রচলিত আছে—সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, স্তূপীকৃত ভোট পদ্ধতি, সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি।

(ক) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব : সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বলিতে বুঝায় দল বা সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যার সমানুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ। ইহার জন্য দুইটি প্রধান পদ্ধতি আছে—১। হেয়ারের পদ্ধতি, এবং ২। তালিকা পদ্ধতি।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সপক্ষে নিম্নলিখিতগুলি নির্দেশ করা যাইতে পারে—১। ইহা গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। ২। ইহা সাম্যের নীতিকে রূপদান করে। ৩। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক ও পৌর চেতনা জাগ্রত হয়। অপরদিকে নিম্নলিখিতগুলি হইল সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রধান ত্রুটি—১। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে না। ২। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয় এবং সুচিন্তিত জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে না। ৩। ইহা জটিল পদ্ধতির অনুসরণ করে বলিয়া কার্যকর নাও হইতে পারে।

(খ) সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে যতগুলি আসন থাকে নির্বাচক তাহা অপেক্ষা একটি কম ভোটদান করে। কিন্তু ইহাও জটিল পদ্ধতি।

(গ) স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক এলাকায় যতগুলি আসন থাকে প্রত্যেক নির্বাচকের ততগুলি করিয়াই ভোট থাকে। নির্বাচক স্তূপীকৃতভাবে সবগুলি ভোটই একজন প্রার্থীকে প্রদান করিতে পারে।

(ঘ) দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে দুইজনের অধিক প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলে কেহ যদি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারে তবে নিম্নতর স্থানাধিকারীকে বাদ দিয়া দ্বিতীয়বার ব্যালট গ্রহণ করা হয়।

উপসংহার : সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া অপর তিনটি পদ্ধতি সংখ্যালঘিষ্ঠের সংখ্যার সমানুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে না, সাধারণভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে মাত্র।

প্রশ্নোত্তর

1. Distinguish between territorial representation and functional representation. Which of them would you recommend and why ? (C. U. 1960) (৩৩০-৩৩১ পৃষ্ঠা)

2. Argue for and against minority representation. Summarise and discuss the means adopted in different States to secure minority representation.

(৩৩১-৩৩৮ পৃষ্ঠা)

ঊনবিংশ অধ্যায়

জনমত

(PUBLIC OPINION)

জনমতের গুরুত্ব (Importance of Public Opinion)ঃ পূর্বকার অবহেলিত জনসাধারণ আজ রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত। আজ শাসকের ক্ষমতা যে অন্য দেবতার পরিবর্তে গণদেবতার নিকট হইতে প্রাপ্ত, ইহাকে তত্ত্বের দিক দিয়া অন্তত অস্বীকার আর বড় একটা কেহ করে না। যে শাসন পরিচালনা এক সময় সাধারণ লোকের পক্ষে অজ্ঞেয় সমস্যা এবং অগম্য পথ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত সেই শাসনকার্য যে তাহাদের নির্দেশেই পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন—এই তত্ত্ব আজ সর্ববাদীস্বীকৃত। এক সময় যাহাদের কর্তব্য ছিল বিনা প্রশ্নে এবং বিনা দ্বিধায় প্রভুশ্রেণীকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আনুগত্য জানানো তাহারাই আজ প্রভু হইয়া উঠিয়াছে। আর শাসকের আজ কার্য দাঁড়াইয়াছে জনসাধারণের ইচ্ছাকে বলবৎ করা। সম্পত্তির বা বংশের আভিজাত্যের দাবির পরিবর্তে ব্যক্তিত্বের দাবি অলংঘনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই দিক হইতে বলা হয় যে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সকল ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার ও সুখশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার অধিকার বর্তমান থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র মানুষের আচরণকে নির্দিষ্ট ধারায় পরিচালিত করিবার যন্ত্রস্বরূপ। আইনকানুনের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি এই পরিচালনকার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তিকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন করা—কারণ, যেখানে সরকার অনুভব করে যে, শাসনক্ষমতার উৎস হইল জনসাধারণ সেখানে সাধারণের আশা-আকাংক্ষা রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে প্রভাবান্বিত করিতে বাধ্য।

রাষ্ট্রশক্তিকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন করার প্রয়োজনীয়তা

অতীতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্রশক্তি যখনই কোন বিশেষ শ্রেণীর করায়ত্ত হয়, তখনই সেই বিশেষ শ্রেণী ঐ শক্তিকে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য নিয়োজিত করে এবং নিজেদের স্বার্থকে সামাজিক কল্যাণ বলিয়া প্রচার করে। সেইজন্য প্রাচীনকালে দাসপ্রভুরা দাসত্বপ্রথাকে দাসদের পক্ষে কল্যাণজনক এবং নিজেদের প্রভুত্বকে স্বাভাবিক নিয়মসিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিত। আবার সামন্ততান্ত্রিক যুগে সামন্তপ্রভুরা সামন্তপ্রথাকে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিত। তারপর সামন্তপ্রথা বিপ্লবের ঢেউয়ে ভাসিয়া গেল। স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের নামে সামন্তপ্রথার উপর আঘাত হানা হইল। স্বভাবতই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের

সার্বভৌমিকতা এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইল। এইভাবে জন্মগ্রহণ করিল যাহাকে বলা হয় উদারনৈতিক বা ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Liberal or Capitalist Democracy)। সরকার পরিচালনায় চরম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে সাধারণের স্থান নির্দিষ্ট হইল। শাসন-পরিচালকবৃন্দ হইয়া দাঁড়াইলেন জনসাধারণের সেবক মাত্র। তাঁহাদের কর্তব্য হইল সাধারণের কল্যাণ, সাধারণের মতামত অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা। এইজন্যই গণতন্ত্রকে জনমত-নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হয়।*

এইরূপ নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থাই গণতন্ত্র বলিয়া অভিহিত

এই শাসন-ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, সমাজের মংগলসাধন করিতে হইলে রাষ্ট্রাভ্যন্তরীণ সকল লোকের বুদ্ধি-বিবেচনা ও সামাজিক অভিজ্ঞতাকে রাষ্ট্রের কার্যে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। একমাত্র গণতন্ত্রেই এই সর্ত পূরণ হইয়া থাকে, কারণ ইহাতে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকায় প্রত্যেকে তাহার ধ্যানধারণা, আশা-আকাংক্ষা ব্যক্ত করিতে পারে। রাষ্ট্রও সাধারণের অভিমত ও অভিজ্ঞতা জানিয়া তদনুযায়ী নিয়মকানুন ও নীতি-নির্ধারণ করিতে পারে।

এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি: ১। ইহাতে সকলের ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হইতে পারে ২। সাধারণের স্বার্থের অনুপন্থী আইনকানুন প্রণীত হয়

গণতন্ত্র সাধারণ লোকের শক্তিতে বিশ্বাসী। প্রত্যেক লোকেরই সমাজকে কিছু-না-কিছু দান করিবার আছে। শিক্ষাদীক্ষা এবং সুষ্ঠু পরিবেশের সাহায্যে ব্যক্তিত্বকে গড়িয়া তুলিতে পারিলে মানুষের সম্ভাবনা অপরিমেয়।

৩। ইহা মানুষের অপরিমেয় সম্ভাবনাকে রূপ দিতে পারে

ইহা ব্যতীত বলা হয় যে, গণতন্ত্রে জনমতের ভয়ে শাসন-পরিচালকগণ স্বৈরাচারী হইতে সাহসী হন না। জনসাধারণের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সরকারী নীতির সমালোচনার সুযোগ থাকায় শাসন-পরিচালকগণকে সতর্ক থাকিতে হয়। কারণ, তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের ক্ষমতা জনমতের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। জনসাধারণের বিশ্বাস হারাইলে নির্বাচনে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব তাঁহাদের সকল সময়েই জনমতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং উহার সহিত সংগতি রাখিয়া সরকারী নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করিতে হয়। অনেক সময় জনমত অনুকূলে না থাকার জন্য আইনসভা বা মন্ত্রিসভাকে নিজস্ব পরিকল্পনা বা নীতিকে পরিহার করিতে হয়। অপরপক্ষে আবার জনমতের চাপে নূতন নীতি, সংস্কার বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়। যে-সকল গণতান্ত্রিক দেশের ভিত্তি হইল দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানে বিরোধী দল সরকারী দলের ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতা জনসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরে যাহাতে জনমত বিরোধী দলের অনুকূলে প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে সরকারী দল যাহা খুশি তাহা করিতে পারে না। ইহা

৪। জনমতের জন্য স্বৈরাচারিতার পথ রুদ্ধ হয়

৫। জনমতের চাপে নূতন নীতি বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়

* ২২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

সকল সময়েই চেষ্টা করে যাহাতে শাসন পরিচালনায় দুর্বলতা বা দোষ-ত্রুটি না থাকে অথবা বিরোধী দল যাহাতে আক্রমণ করিবার কোন রকম সুযোগ না পায়। এইভাবে যাঁহাদের উপর শাসন পরিচালনার ভার তাঁহারা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত থাকেন।

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে জনমত গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। গণতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইল সুচিন্তিত ও সতর্ক জনমত গঠন।

জনমত গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ

জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষিত করিবার জন্য লিখিত শাসনতন্ত্র, অধিকারের সনদ, আদালতের স্বাধীনতা ইত্যাদি যতপ্রকার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাই করা যাউক না কেন, কিছুই কার্যকর হয় না যদি-না জনসাধারণ তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে, যদি-না তাহারা বুঝিতে পারে যে কোন্ কোন্ শক্তি সমাজের মধ্যে কার্য করে, যদি-না তাহাদের সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে। মোটকথা, গণতন্ত্রের সফলতার প্রধান সর্ত হইল সুষ্ঠু ও সবল জনমত গঠন এবং উহা দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ। অতএব বলা যায়, কোন রাষ্ট্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে জনমতের উৎকর্ষের উপর। আবার জনমতের উৎকর্ষ হইল জনগণের উৎকর্ষ।

বলা যায়, গণতন্ত্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে জনমতের উৎকর্ষের উপর

বলিষ্ঠ ও কল্যাণকর জনমত সৃষ্টির জন্য কতকগুলি সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ, ভোটাধিকার বিস্তার এবং মতামত গঠনের উপায়সমূহের উন্নতির ফলে একদিকে যেমন জনমতের গুরুত্ব ও শক্তি বাড়িয়াছে, অপরদিকে তেমনি অনিষ্টের সম্ভাবনাও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেডিও, সিনেমা, সংবাদপত্র এবং প্রচারের অন্যান্য কলাকৌশল এত শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, জনসাধারণকে বিভ্রান্ত এবং জনমতকে বিপথে পরিচালিত করাও স্বার্থান্বেষীদের পক্ষে বিশেষ সহজ হইয়া পড়িয়াছে।* সুতরাং বলিষ্ঠ জনমত গঠনের জন্য কি কি সর্তের প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে ইংগিত দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাহার পূর্বে 'জনমত' বলিতে কি বুঝায় তাহার আলোচনাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

বলিষ্ঠ ও কল্যাণকর জনমত সৃষ্টির সর্ত

জনমত কাহাকে বলে? (What is Public Opinion ?) :

'জনমত' শব্দটির সংজ্ঞা লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। অধ্যাপক আর্থার হোলকম্বে (Arthur Holcombe) এই প্রসংগে এক মজার বর্ণনা দিয়াছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কোন এক সভায় 'জনমতে'র অর্থ কি তাহা লইয়া আলোচনা সুরু হয়। আলোচনা আরম্ভ হইতে না হইতেই কেহ কেহ মত প্রকাশ করিলেন যে, জনমত

জনমতের সংজ্ঞা সম্বন্ধে মতবিরোধ

* "....public opinion is a formidable weapon. The methods of organising it, crystallising it, and inflaming it to the point of hysteria are so well understood and the technique is so perfect that, given the malleability of the people, there appears to be no limit beyond which they cannot be led." Andre Siegfried

বলিয়া কোন কিছু নাই ; কেহ কেহ জনমতের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিলেন না কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্ণয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন ; আর কেহ কেহ সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া কোন্ অর্থ গৃহীত হইবে সেই সম্পর্কে একমত হইতে পারিলেন না। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে জনমত শব্দটির অর্থ নির্ণয় খুব সহজসাধ্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া জনমতের অস্তিত্ব ও প্রভাবকে সন্দেহ করিবার কোন সংগত যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু জনমতের অস্তিত্ব ও প্রভাব অনস্বীকার্য

সাধারণত সমাজ সংক্রান্ত কোন সাধারণ বা বিশেষ প্রশ্ন সম্পর্কে জনগণ বা সমাজের অভিমতকে 'জনমত' আখ্যা দেওয়া হয়। অধ্যাপক লাওয়েল (Lowell) বলেন, জনমত বলিয়া অভিহিত হইবার জন্য অভিমত সমগ্র সমাজের ঐক্যমত হওয়ার প্রয়োজন হয় না; অপরদিকে আবার ইহার জন্য কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হওয়াই যথেষ্ট নয়।* বলা হয়, সমাজ সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে ঐক্যমত না থাকাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া বিভিন্ন লোক প্রশ্নটি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করে। যখন এইভাবে মতামত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন কোন কোন মত অন্যান্যগুলি অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। এই অভিমতগুলিকে তখন জনমত বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। আবার কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হইলেই উহা জনমত বলিয়া স্বীকৃত হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তা জনমত গঠনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে।** অধিকসংখ্যক লোকে কোন মত পোষণ করিলেও উহাতে তাহাদের আস্থা দৃঢ় না হইলে উহা জনমত বলিয়া গৃহীত হয় না। বস্তুত, কোন সমাজে যে মতামত সরকার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে কার্যকর হয় তাহা সুসংবদ্ধ ও চেতনাসম্পন্ন শ্রেণীর অভিমত। এইজন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সুসংগঠিত সংখ্যালঘুর সুদৃঢ় মতামত জনমত বলিয়া পরিচিত হয়।

জনমতের একটি সাধারণ সংজ্ঞা

লাওয়েল-প্রদত্ত সর্ত

সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মাত্রেই জনমত বলিয়া পরিগণিত হইবে এমন কোন কথা নাই

জনমত গঠনে সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে

জনমতের সমালোচনা করিতে যাইয়া অনেক চিন্তাবীর এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে 'জনমত' 'জনগণের নয়' এবং 'মতও নয়'। জনসাধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদাসীন বা অজ্ঞ হয় অথবা সমস্যা সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত থাকে না। এই অবস্থায় যাহা 'জনমত' নামে পরিচিত তাহা প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন অথবা স্বার্থান্বেষীশ্রেণীর মত। মতামত গঠনে অনুকরণ-প্রবণতাও বিশেষ কার্যকর। এইজন্য ফরাসী লেখক টার্ডে (Tarde) তাঁহার 'অনুকরণের ধারা' † নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, মতামত

জনমত সম্বন্ধে ধারণার সমালোচনা —ইহা 'জনগণের নয়' এবং 'মতও নয়'

* "....a majority is not enough and unanimity is not required."

** "...public opinion is not strictly the numerical majority, and no form of its expression measures the mere majority, for individual views are always to some extent weighed as well as counted." Lowell

"Public opinion is a composite of numbers and intensity." Munro and Ozanne

† Laws of Imitation

স্বল্পসংখ্যক লোক কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া সমস্ত সমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আবার বলা হয় যে, জনমত মতও নয়। ইহার অর্থ হইল মতগঠনের পিছনে থাকা চাই জ্ঞান, যুক্তি ও চিন্তা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসাধারণের অভিমত হইল সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ ইত্যাদি উপাদানের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এইগুলির কোনটাই যৌক্তিকতার লক্ষণ নয়।

কিভাবে সুষ্ঠু, সবল ও সুচিন্তিত জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে:

এই সমালোচনার ভিত্তিতে আমরা সুষ্ঠু, সবল ও সুচিন্তিত জনমত কিভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার আলোচনা করিতে পারি। প্রথমত, জনসাধারণের ভালমন্দ, সত্যতা, সমাজগতির ধারা ও সমাজাভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন শক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। ব্যাপক শিক্ষার প্রসারের ফলেই এই প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে। বাস্তব সমাজজীবনের সহিত অবশ্যই এই শিক্ষার সংগতি থাকা চাই।

১। সুপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থা

অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ফলাফল বিষময়। ইহা মনুষ্যত্বকেই শুধু পংগু করিয়া দেয় না, জটিল সমস্যাবহুল বর্তমান জগতে তাহাকে অন্যের হাতে ক্রীড়নকও করিয়া ফেলে। অশিক্ষার সুযোগ লইয়া স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিগণ জনসাধারণকে কিভাবে প্রবঞ্চিত করিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল জার্মেনীতে হিটলারের ক্ষমতালাভ।

২। জনমত প্রকাশের ব্যবস্থা ও সভাসমিতির স্বাধীনতা

বর্তমান সময়ে প্রচার-পদ্ধতি এত উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, শিক্ষা ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা না থাকিলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা খুবই সহজসাধ্য। দ্বিতীয়ত, শুধু শিক্ষার ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার ফলকে সমাজজীবনের কল্যাণে নিয়োজিত করিবার জন্য স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ, সভাসমিতির গঠন ইত্যাদির সুযোগ বর্তমান থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত,

৩। জনমত গঠনের যন্ত্রসমূহকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণাবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা

মতামত গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রকাশের উপায়সমূহ—যেমন, মুদ্রাযন্ত্র, চলচ্চিত্র, বেতার, যাহাতে স্বাধীনভাবে জনসাধারণের হিতার্থে কার্য করে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহাদের মাধ্যমে যে-খবরাখবর সাধারণের নিকট পরিবেশন করা হয় তাহার ভিত্তিতেই জনমত গড়িয়া উঠে। সুতরাং অকৃত্রিম ও অবিকৃত সংবাদ যাহাতে প্রকাশিত হয় তাহার জন্য মতামত গঠনের যন্ত্রসমূহকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণাবদ্ধ করিতে হইবে।

৪। মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণা ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা

পরিশেষে বলা হয়, মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণাদি এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে মতৈক্য থাকা আবশ্যক। সমাজে সহিষ্ণুতা ও বুঝাপড়ার মনোভাব না থাকিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চলিতে পারে না। একদিকে যেমন সংখ্যালঘু দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে মানিয়া লইতে হইবে, অন্যদিকে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সংখ্যালঘু দলের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সমালোচনা করিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে।

উপরের জনমত গঠনের জন্য যে-সমস্ত শক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কার্যকর হওয়া সম্ভব হয় না যদি-না সমাজ-ব্যবস্থা সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্য শুধু রাষ্ট্রনৈতিক নহে, সামাজিক এবং আর্থিকও বটে। যে-সমাজ শ্রেণীবিভক্ত, যেখানে মুষ্টিমেয়ের হাতে দেশের সমস্ত সম্পদের মালিকানা কেন্দ্রীভূত সেখানে আর্থিক প্রতিপত্তিশালীশ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে হউক বা পরোক্ষভাবে হউক রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করে এবং নিজশ্রেণীর স্বার্থ কায়েমীভাবে সংরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে উপযোগী ধ্যানধারণা ও আদর্শের সৃষ্টি করিয়া উহা জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেয়। প্রচারের কলাকৌশলের অপরিমেয় উন্নতি এবং মুদ্রাযন্ত্র, বেতার, চলচ্চিত্র প্রভৃতি প্রচারযন্ত্রের মালিকানা সংকুচিত হওয়ায় মালিকশ্রেণীর পক্ষে জনসাধারণের মতকে পরিচালিত করা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি স্কুল-কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকেও আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করিতে শাসকশ্রেণী সংকোচবোধ করে না।

৫। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা

বাস্তবের দিক দিয়া দেখিলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জনমত আর্থিক প্রতিপত্তিশালী-শ্রেণীর মত। অবশ্য একথা সত্য যে সমাজ গতিশীল। যখন এক সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া গিয়া অন্য সমাজ-ব্যবস্থা আবির্ভূত হয় তখন আবার নূতন প্রতিপত্তিশালী-শ্রেণীর ধ্যানধারণা ও আদর্শ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকিতে বাধ্য। যখনই কোন সমাজ-ব্যবস্থার সম্ভাবনা নিঃশেষ হইয়া যাইতে থাকে তখনই এই দ্বন্দ্ব প্রকট রূপ ধারণ করে। স্বভাবতই এই দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয় আদর্শের সংঘাতের মধ্যে। পূর্বতন ধ্যানধারণা ও আদর্শের সহিত উদীয়মানশ্রেণীর ধ্যানধারণা ও আদর্শের বাধে সংঘাত। ফলে চারিদিকে দেখা দেয় বিশৃংখলা এবং শাসকশ্রেণী মতামত প্রকাশ ও সমালোচনা করিবার স্বাধীনতাকে কঠোর হস্তে দমন করিতে প্রয়াসী হয়। এই অবস্থায় বুঝাপড়া ও মীমাংসার সাহায্যে সরকার পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া থাকে। পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রগুলির অসুবিধা হইল এইখানে। এই দেশগুলিতে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য স্বীকৃত হইলেও সামাজিক বা আর্থিক সাম্য স্বীকৃত হয় নাই। যতদিন ধনতন্ত্র প্রসারণশীল ছিল ততদিন অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশেষ একটা মতবিরোধ দেখা দেয় নাই। কিন্তু বর্তমান সময়ে ধনতন্ত্রের সম্ভাবনা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশেষ প্রকট রূপ ধারণ করিতেছে। আদর্শের ক্ষেত্রেও এই সংঘাত প্রকটতর হইতেছে। গণতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এই দ্বন্দ্বের অবসান করিয়া সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে।

***জনমত প্রকাশ ও গঠনের মাধ্যম* (Means of Expressing and Formulating Public Opinion) ঃ** জনমত প্রকাশ ও গঠনের প্রধান উপায়সমূহ হইল ঃ (১) মুদ্রাযন্ত্র, (২) বেতার ও চলচ্চিত্র, (৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, (৪) সভাসমিতি, (৫) রাষ্ট্রনৈতিক দল, এবং (৬) আইনসভা।

১। মুদ্রাযন্ত্র (The Press): জনমত গঠন ও প্রকাশে মুদ্রাযন্ত্র এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। শিক্ষার বিস্তারের সংগে সংগে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, পুস্তক ইত্যাদির পাঠকের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। সংবাদপত্রগুলিতে সংবাদের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় এবং যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা জনসাধারণের মতামতকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে। আবার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণ তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। সরকারও জনসাধারণের মুখপত্র হিসাবে সংবাদপত্রের সমালোচনার ভয়ে সংযত থাকে। এইজন্যই বলা হয় যে, গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হইল স্বাধীন সংবাদপত্র। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যদি সংবাদপত্রগুলি অকপট ও অবিকৃতভাবে বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ করে তবেই সুস্থ ও সবল জনমত গঠিত হইয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এইখানেই ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রগুলিতে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলি মুনাফার জন্য ব্যবসায় হিসাবে পরিচালিত হয়। বর্তমানে মালিকানাস্বত্বও ক্রমশ সংকুচিত হইয়া মুষ্টিমেয় মূলধন-মালিকদের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সংবাদ পরিবেশনের প্রকৃতি নির্ধারিত হইতেছে। প্রথমত, সংবাদপত্রের আয়ের অধিকাংশ আসে ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন হইতে। সুতরাং পুঁজিপতিদের স্বার্থবিরোধী কোন সংবাদ যে প্রকাশিত হইবে তাহা আশা করা বৃথা। দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্রের মালিকেরা নিজেরাই পুঁজিপতি। সুতরাং তাঁহারা যে সমাজ-ব্যবস্থায় মুনাফা করিতেছেন সেই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না। এই সমস্ত কারণে প্রধান প্রধান সংবাদপত্র ধনিকশ্রেণীর মুখপত্র হিসাবে কাজ করে এবং তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সংবাদকে বিকৃত করে এবং সত্য ঘটনাকে চাপিয়া যায়। পুস্তক, সাময়িকপত্র ইত্যাদি সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। সামাজিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে।

মুদ্রাযন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থান

সংবাদ পরিবেশনের প্রকৃতির গুরুত্ব

ধনতান্ত্রিক দেশে সংবাদ পরিবেশনের প্রকৃতি কিভাবে নির্ধারিত হয়

২। চলচ্চিত্র ও বেতার (The Cinema and The Radio): চলচ্চিত্র ও বেতার সংবাদপত্রের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র ইত্যাদি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু চলচ্চিত্র ও বেতারের মাধ্যমে বর্ণপরিচয়হীন জনসাধারণের নিকট সংবাদাদি পরিবেশন করা সম্ভবপর হয়। চলচ্চিত্র ও বেতারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহাদের হিতাহিত করিবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংবাদপত্রের মত চলচ্চিত্র ব্যবসায় হিসাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা মুনাফার অংকই চিত্র প্রযোজনায় প্রধান শক্তি হিসাবে কার্য করে। ইহা ব্যতীত চিত্রগৃহগুলির মালিকেরা নিজেরা ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন হইতে মোটা আয় করেন। ইঁহারা নিজেদের স্বার্থবিরোধী কার্য করিবেন এইরূপ

জনমত গঠনে বেতার ও চলচ্চিত্র সংবাদপত্রের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে

বর্তমানে চলচ্চিত্র ব্যবসায় কিভাবে পরিচালিত হয়

আশা করা যায় না। সরকারের প্রভাবও যথেষ্ট। কোন্ প্রকারের চিত্র দেখানো হইবে না হইবে তাহা সরকার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। আবার সরকার চিত্রগৃহগুলিকে নিজ-প্রযোজিত সংবাদচিত্র প্রদর্শন করিতে বাধ্য করে। ইহার দ্বারা যে-দল সরকারী ক্ষমতা পরিচালনা করে সেই দলের সুবিধা হয়।

বাধ্যতামূলকভাবে সংবাদচিত্র প্রদর্শন

সংবাদপত্র ও চলচ্চিত্রের মত জনমত নিয়ন্ত্রণে আজ বেতারের প্রভাবও অপরিসীম। আজ বেতারের মাধ্যমে দেশবিদেশের খবরাখবর ও নেতাদের মতামত জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। শিক্ষাক্ষেত্রেও বেতারের ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে। উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইলে ইহা সমাজের প্রভূত উপকার করিতে সমর্থ। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, বেতারের সহিত সরকারের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। জনসাধারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে সরকারী দল বিপক্ষীয় দলের মতামত বন্ধ করিয়া দিতে প্রয়াস পায়।

জনসাধারণ দ্বারা বেতারের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

৩। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions): জনমত গঠনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদ্যকার ছাত্রবৃন্দ আগামী দিনের সক্রিয় নাগরিক, চিন্তানায়ক এবং শাসন পরিচালক। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রেরা যে ধ্যান-ধারণা আদর্শ ও নৈতিক মূল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়। শিক্ষার বলিষ্ঠতার উপর জাতির বলিষ্ঠতা নির্ভর করে। গণতন্ত্রে এই শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রসম্মত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—কারণ, সমাজে আর্থিক প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সচেষ্ট হয়। পাঠ্যবস্তু যাহাতে তাহাদের ধ্যান-ধারণার অনুকূল হয় তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় কোথায় কি গলদ আছে তাহা ছাত্রসমাজের দৃষ্টির আড়ালে রাখিবার চেষ্টা হয়।

গণতান্ত্রিক শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত

কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সাধারণত ইহা কিরূপ হয়

৪। সভাসমিতি (The Platform): সভাসমিতি করিয়াও জনসাধারণকে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা হয়। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সভাসমিতিতে মিলিত হইয়া বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা করেন। বিভিন্ন নেতার আলোচনা ও সমালোচনা শুনিয়া জনসাধারণ নিজেদের মতামত গঠন করিয়া থাকে। আবার এই সভাসমিতির মধ্য দিয়া জনমনোভাবের গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। এইজন্য বলা হয় যে, সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংগস্বরূপ। বৈষম্যমূলক ধনতান্ত্রিক সমাজে এই স্বাধীনতা সমভাবে সমস্ত শ্রেণীর লোক ভোগ করিতে পারে না। সভাসমিতি সংগঠনের জন্য যে আর্থিক শক্তির প্রয়োজন তাহা দরিদ্রশ্রেণীর নাই। ইহা ব্যতীত

সভাসমিতির স্বাধীনতাকে কেন গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংগ বলিয়া গণ্য করা হয়

ধনতন্ত্র যতই সংকটের সম্মুখীন হইতেছে এবং যতই বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিতেছে ততই আর্থিক প্রতিপত্তিশীল শাসক-শ্রেণী রাষ্ট্রদ্রোহিতা, শান্তি ও শৃংখলা ভংগের অজুহাতে প্রগতিশীল সভাসমিতিকে দমন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

৫। রাষ্ট্রনৈতিক দল (Political Parties): রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্য হইল আপনাপন দলের সমর্থনে জনসাধারণকে প্ররোচিত করিয়া নির্বাচনে জয়লাভ এবং শাসনক্ষমতা অধিকার করা। সুতরাং প্রত্যেক দলই আপন কর্মসূচী নির্ধারণ করিয়া তাহার সপক্ষে জনমত গঠনের জন্য সংবাদপত্র, সভাসমিতি ও বক্তৃতা, প্রচারপুস্তিকা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইতে থাকে। জনসাধারণ দলীয় আলোচনা-সমালোচনার মধ্য হইতে বিভিন্ন কর্মসূচীর গুণাগুণ বিচার করিয়া আপন মতামত গঠন করিতে সমর্থ হয়। বলা হয় যে, দলীয় ব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার প্রসার এবং বহুমুখী সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহায্য করে। উপরন্তু, মতবিরোধ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও হিংসাত্মক কার্যকলাপ ব্যতীতই নির্বাচনের মারফত দলীয় ব্যবস্থার সাহায্যে শান্তিপূর্ণভাবে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে, দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে জনমত গঠন করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইলে সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিগণ ও দলগুলির মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে মতৈক্য বর্তমান থাকা প্রয়োজন। আর্থিক বৈষম্যমূলক ধনতান্ত্রিক সমাজে এই মতৈক্য বেশী দিন রক্ষিত হয় না। সংকটেরস ম্মুখীন হইলেই আর্থিক প্রতিপত্তিশালীশ্রেণী ও দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত প্রকট আকার ধারণ করে। বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিমূলক দলগুলির মধ্যে বুঝাপড়ার মনোভাব আর থাকে না এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সুযোগকে বিকৃত ও ক্ষুণ্ণ করার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। এই স্বার্থের সংগ্রামে আর্থিক প্রতিপত্তিশালী দলের সুবিধা বেশী, কারণ ইহা প্রচারের মাধ্যম—যেমন, সংবাদপত্র, মুদ্রাযন্ত্র, চলচ্চিত্র প্রভৃতি আপন শ্রেণীর স্বার্থে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ সংকটাবস্থায় সামাজিক কল্যাণকর সুষ্ঠু ও সবল জনমত গঠন করিয়া শাসন পরিচালনা করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী এবং ইহা কিভাবে জনমত গঠন করে

সমাজ-ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে মতৈক্যের প্রয়োজনীয়তা

ধনতান্ত্রিক সমাজে ইহা কেন সম্ভব হয় না

৬। আইনসভা (The Legislature): আইনসভা হইল বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের বিশেষ কার্যক্ষেত্র। এখানে বিতর্ক, সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সরকারী দল ও বিরোধী দল পরস্পরের দোষত্রুটিগুলি জনসমক্ষে ধরিয়া বা নিজ দলের উৎকর্ষ প্রমাণ করিয়া জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়। আইনসভার কার্যপদ্ধতি ও অনুষ্ঠান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সুতরাং সভাসমিতি অপেক্ষা আইনসভা জনমত গঠনে কোন অংশে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করে না। জনমতের

আইনসভা জনমত গঠন অপেক্ষা জনমতের প্রতিফলন ক্ষেত্র হিসাবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে

গঠন ছাড়া জনমতের প্রতিফলন ক্ষেত্র হিসাবে আইনসভাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে।

সংক্ষিপ্তসার

জনমতের গুরুত্ব ঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অন্তত তত্ত্বের দিক দিয়া জনসাধারণ ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ রাষ্ট্রে শাসন-পরিচালকবৃন্দকে জনসাধারণের সেবক হিসাবে ধরা হয়। তাঁহাদের কর্তব্য হইল সাধারণের কল্যাণে, সাধারণের মতামত অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা। এইজন্য গণতন্ত্রকে জনমত-নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হয়।

গণতন্ত্র বা জনমত-নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থার সপক্ষে সাধারণত নিম্নলিখিত গুণগুলি প্রদর্শন করা হয়—(১) ইহাতে রাষ্ট্রের আইনকানুন ও নীতিতে সকলের ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হইতে পারে ; (২) ফলে সাধারণের স্বার্থের অনুপন্থী আইনকানুন প্রণীত হইতে পারে ; (৩) গণতন্ত্র সাধারণ লোকের শক্তিতে বিশ্বাসী বলিয়া ইহা মানুষের অপরিমেয় সম্ভাবনাকে রূপ দিতে পারে ; (৪) জনমতের জন্য স্বৈরাচারিতার পথ রুদ্ধ হয় এবং জনসাধারণের শাসনের স্বরূপ বজায় থাকে।

সুতরাং জনমত গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইল সুচিন্তিত ও সতর্ক জনমত গঠন। কিন্তু কতকগুলি সর্ত পুরিত না হইলে বলিষ্ঠ ও কল্যাণকর জনমত সৃষ্ট হয় না।

জনমত কাহাকে বলে ? ঃ জনমতের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। সাধারণত সমাজসংক্রান্ত কোন সাধারণ বা বিশেষ প্রশ্ন সম্পর্কে জনগণ বা সমাজের অভিমতকেই জনমত আখ্যা দেওয়া হয়। লাওয়েলের মতে, জনমত বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য সমগ্র সমাজের ঐক্যমত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে আবার ইহার জন্য মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতই যথেষ্ট নহে। জনমত গঠনে সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। এইজন্য অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠেরই সুদৃঢ় মতামত জনমত বলিয়া পরিগণিত।

জনমত সম্বন্ধে ধারণার অন্যতম সমালোচনা হইল যে, ইহা 'জনগণের নয়' এবং 'মতও নয়'। দেখা যায় যে, জনমত বলিয়া যাহা পরিচিত অনেক ক্ষেত্রেই তাহা মুষ্টিমেয় কয়েকজন অথবা স্বার্থান্বেষী শ্রেণীর মত। ফরাসী লেখক টার্ডে বলিয়াছেন, মতামত স্বল্পসংখ্যক লোক কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া সমগ্র সমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। জনমত যে 'মতও' নয় তাহার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায়, মত গঠনের পিছনে থাকা চাই জ্ঞান, যুক্তি ও চিন্তা; কিন্তু অনেক সময়ই জনসাধারণের অভিমত হইল সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ ইত্যাদি উপাদানের অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

উপরি-উক্ত সমালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সুষ্ঠু, সবল ও সুচিন্তিত জনমত গঠনের জন্য অপরিহার্য সর্ত হইল—(১) সুপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ; (২) জনমত প্রকাশ ও সভাসমিতির স্বাধীনতা ; (৩) মুদ্রাযন্ত্র, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি জনমত গঠনের মাধ্যমের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ; (৪) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণা সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যমত ; (৫) সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা।

জনমত প্রকাশ ও গঠনের মাধ্যম : জনমত প্রকাশ ও গঠনের প্রধান প্রধান মাধ্যম হইল—(১) মুদ্রাযন্ত্র ; (২) বেতার ও চলচ্চিত্র ; (৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ; (৪) সভাসমিতি ; (৫) রাষ্ট্রনৈতিক দল ; এবং (৬) আইনসভা।

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate the importance of Public Opinion in a modern democracy. (৩৪১-৩৪৩ পৃষ্ঠা)

2. What do you mean by Public Opinion ? How is it formulated and moulded? (C. U. 1953) (৩৪৩-৩৫০ পৃষ্ঠা)

বিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক দল
(POLITICAL PARTIES)

রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব (Rise of Political Parties) **:** বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে-দলীয় ব্যবস্থা আমরা দেখি তাহার উদ্ভব ও প্রসার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। অবশ্য রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি যে কাজকর্ম করে তাহার সন্ধান অতি পুরাকালের রাষ্ট্র-ব্যবস্থাতেও পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসের সমাজ বংশ ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। ইহারাই রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে দলের মত কার্য করিত। আবার প্রাচীন রোমে গোষ্ঠীগুলি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব এবং সরকারী নীতি পরিচালনা করিত। তারপর যখন মধ্যযুগ আসিল তখন বংশ বা গোষ্ঠীর স্থান অধিকার করিল অভিজাতসম্প্রদায় (The Nobles), পুরোহিতসম্প্রদায় (The Clergy) এবং সহরের অধিবাসিগণ অথবা সওদাগরশ্রেণী (The Burgers)। বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন এই প্রধান প্রধান শ্রেণী রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজাকে সাহায্য করিত।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, প্রতিনিধিত্ব, অধিকার ও দায়িত্ব বংশ, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হইত, ব্যক্তিবিশেষের ভিত্তিতে নহে।

তারপর যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য হইতে উদারনৈতিক গণতন্ত্র জন্মগ্রহণ করিল তখন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিনিধিত্ব এবং অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারিত হইল এবং তত্ত্বগতভাবে জনসাধারণের সার্বভৌমিকতা স্বীকৃত হইল। ক্রমশ ভোটাধিকার প্রসারিত হইল। তখন বলা হইতে লাগিল, যেহেতু জনসাধারণ সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, শান্তিপূর্ণভাবে সামাজিক পরিবর্তনের মারফত সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন করা খুবই সহজ। কিন্তু জনসাধারণ সুসংগঠিত নয়। যাহাতে তাহাদের শক্তি ও কর্মপ্রেরণার সম্ভাবনাকে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে

গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা

শৃংখলার সহিত নিযুক্ত করা যায় তাহার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রনৈতিক দলের। যদিও অনেক সংবিধানেই রাষ্ট্রনৈতিক দলের কথা উল্লিখিত হয় না তাহা হইলেও উহাকে বর্তমান যুগের বৃহদাকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অপরিহার্য অংগ হিসাবে গণ্য করিতে হয়।*

রাষ্ট্রনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায়? (What is a Political Party?): বিভিন্ন লেখক রাষ্ট্রনৈতিক দলের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। আমরা ইহাদের মধ্যে দুই-একটির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞার বিভিন্নতা

বার্কের (Burke) মতে, কোন নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে এবং সংযুক্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ প্রসারকল্পে সম্মিলিত হইয়াছে এইরূপ জনসমষ্টিকেই রাষ্ট্রনৈতিক দল আখ্যা দেওয়া যায়।** সাম্প্রতিক কালের লেখকগণের মধ্যে বার্কার (Barker) বার্ক-প্রদত্ত সংজ্ঞারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে, যদিও রাষ্ট্রনৈতিক দল বিশেষ মতধারার দ্বারা পরিচালিত তবুও ইহা জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ এবং সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া নির্বাচকদের অনুমোদন পাইতে প্রয়াসী হয়।†

বার্কের মতানুসারে সংজ্ঞা

বার্কার-প্রদত্ত সংজ্ঞা

উপরি-উক্ত সংজ্ঞানুসারে রাষ্ট্রনৈতিক দলের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করা যাইতে পারে: (১) রাষ্ট্রনৈতিক দলের সভ্যগণ সমমতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একত্রিত হয়; (২) ইহাদের বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগি বা মতাদর্শ থাকিলেও ইহারা সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণসাধনে সচেষ্ট হয়; (৩) ইহারা যাহাতে সরকার গঠন করিয়া নিজ নিজ নীতিকে কার্যকর করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কর্মসূচী প্রণয়ন করে এবং অধিকসংখ্যক নির্বাচকের সমর্থন পাইতে চেষ্টা করে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

এখন প্রশ্ন উঠে যে ভিন্ন ভিন্ন নীতির ভিত্তিতে যে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল সংগঠিত হয় তাহার হেতু কি? উত্তরে বলা হয়, রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠনের একাধিক ভিত্তি আছে। প্রথমত, প্রগতি বা সংস্কারের গতি কি হইবে ইহার ভিত্তিতে রাষ্ট্রনৈতিক

* "Although party is often 'extra-constitutional' it is an essential organ of every large-scale democracy." MacIver, The Web of Government

** "Party is a body of men united for promoting, by their joint endeavours, the *national* interest upon some particular principle in which they are all agreed."

† "A party is a *particular* body of opinion (otherwise it would not be a party), which is none the less concerned with the *general national* interest, and which forms, and presents to the choice of the electorate, a programme of general national scope and width."

দলসমূহ গঠিত হইতে পারে। যেমন, একদল হয়ত' দ্রুত সংস্কার চাহিতে পারে, অন্য একদল হয়ত' সতর্কতার সহিত এবং অতীতের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিতে চায়। দ্বিতীয়ত, ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলের উৎপত্তি হইতে পারে। অবশ্য বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে ধর্মের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। তৃতীয়ত, জাতীয়তার (the feeling of nationalism) ভিত্তিতে রাষ্ট্রনৈতিক দল গড়িয়া উঠিতে পারে। একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন জাতির বসবাস থাকিতে পারে এবং উহারা আপনাপন স্বার্থরক্ষার্থে বিভিন্ন দল সংগঠিত করিতে পারে। আবার যখন কোন দেশ বহিঃশত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে চায় তখন অন্যান্য স্বার্থকে চাপা দিয়া এক ও অভিন্ন জাতীয় মনোভাব সৃষ্টি করিবার এবং একটি মাত্র জাতীয় দলের মধ্যে সমস্ত নাগরিককে সংগঠিত করিবার চেষ্টা করা হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তির বিভিন্নতার কারণ

পরিশেষে বলা যায়, উপরি-উক্ত কারণগুলি আপাতদৃষ্টিতে দলগত বিভিন্নতার ভিত্তি মনে হইলেও দলের প্রকৃত ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক স্বার্থ।* প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে সে কিভাবে জীবিকার্জন করে। অতএব ম্যাডিসনের (Madison) ভাষায় বলা যায়, "পৃথক স্বার্থসম্পন্ন দলগুলির (factions) উৎস হইল সম্পত্তি।"** অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রতিপত্তিশালী মালিকশ্রেণী নিজ স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে চালু রাখিতে চেষ্টা করে। অপরদিকে সহায়-সম্বলহীন জনসাধারণ চায় ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান করিয়া সমাজতান্ত্রিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা করিতে। এইভাবে মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী রক্ষণশীল দল এবং সম্পত্তিবিহীন জনসাধারণের সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে থাকে।

দলের বিভিন্নতার প্রকৃত কারণ অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতা

এই প্রসংগে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সম্প্রসারণশীল ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত তীব্র না হওয়ায় শ্রেণীদ্বন্দ্বের ভিত্তিতে দলীয় দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট রূপ ধারণ নাও করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংল্যাণ্ডের দলগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। ১৬৮৯ সালের পর হইতে প্রথমে টোরী (The Tory) ও হুইগ (The Whigs) এবং পরে রক্ষণশীল (The Conservatives) ও উদারনৈতিক (The Liberals) এই যে দুইটি দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত প্রকৃতপক্ষে উহাদের

সম্প্রসারণশীল ধনতান্ত্রিক সমাজে দলীয় দ্বন্দ্ব প্রকট রূপ ধারণ নাও করিতে পারে

* "....national parties cannot be maintained by transitory impulses or temporary needs. They must be founded upon permanent sectional interests, above all upon those of an economic character." Arthur Halcombe

"The party is a mechanism to control public opinion about property in the particular way its members deem desirable." Laski

** "..the only durable source of faction is property." Madison

দুইটি দল বলা চলে না। উহারা একটি দলের দুইটি শাখা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কারণ, উভয়ই মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিত এবং উভয়ই উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়া দলীয় যুদ্ধের প্রহসনে অংশগ্রহণ করিত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিত তাহা ঘরোয়া বিবাদের সামিল ছিল। কিন্তু ক্রমশ, বিশেষত যুদ্ধোত্তর কালে, যখন ধনতন্ত্রের গতি শ্লথ হইয়া পড়িল তখন নাড়া পড়িল সমাজ-ব্যবস্থার মূলে এবং উদ্ভব হইল সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মেহনতী ও সম্পত্তিবিহীন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী শ্রমিক দলের। কিন্তু বর্তমানে শ্রমিক দলে দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রাধান্য থাকায় ঐ দল কোন মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহার ফলে সমাজের বুকে যে স্বার্থ-সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে তাহা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সম্যকরূপে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই।

ইংল্যাণ্ড হইতে দৃষ্টান্ত

এই ঐতিহাসিক ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে বার্ক এবং বার্কার প্রদত্ত রাষ্ট্রনৈতিক দলের উপরি-উক্ত সংজ্ঞা দুইটি বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে, কারণ উভয় লেখকই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দলেরই উদ্দেশ্য হইল সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণসাধন করা। কিন্তু শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ মূলত বিভিন্ন। অতএব পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি যে শ্রেণী নির্বিশেষে সাধারণের স্বার্থসাধন করিবে এই যুক্তির বিশেষ কোন সারবত্তা আছে বলিয়া মনে হয় না।

ঐতিহাসিক ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে বার্ক ও বার্কার প্রদত্ত সংজ্ঞার সমালোচনা

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্য ও গুণাবলী **(Functions and Merits of Political Parties) :** বলা হয়, দলীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংগ। বিভিন্ন নীতির মধ্য হইতে নীতি নির্ধারণ এবং বিভিন্ন নীতির সমর্থনকারী নির্বাচনপ্রার্থীদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবার স্বাধীনতা ব্যতীত জনসাধারণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণ এবং প্রতিনিধি মনোনয়ন করা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না, যদি-না নির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন নীতি ও ঐ নীতিসমূহ সমর্থনকারী প্রার্থিগণকে জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা হয়। এই কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি।

বলা হয়, দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংগ

সমাজের সম্মুখে অগণিত সমস্যা বিশৃংখলভাবে ছড়ানো থাকে। তাহাদের মধ্য হইতে নিজ নিজ বিবেচনানুসারে অধিক গুরুত্বসম্পন্নগুলিকে বাছিয়া লইয়া বিভিন্ন দল কর্মসূচী ও নীতি নির্ধারণ করে এবং উহার ভিত্তিতে জনসাধারণের সমর্থন পাইতে চেষ্টা করে। এইভাবে দলগুলি বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করিয়া জনসাধারণকে নীতি নির্বাচনে সহায়তা করে। কারণ, অল্পসংখ্যক নির্দিষ্ট বিকল্প নীতির মধ্য হইতে নির্বাচন

করা জনসাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য হয়, অথচ মনোনয়নের ব্যাপারে তাহাদের স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হয় না। নীতি নির্ধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি নির্বাচনেও জনসাধারণের সুবিধা হয়। বিভিন্ন দল আপনাপন কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করায়। নির্বাচকগণ যখন কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোটপ্রদান করে তখন সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে যে তাহারা কোন্ কর্মসূচী ও নীতির পক্ষে ভোটদান করিতেছে। দলীয় ব্যবস্থা থাকার জন্য অসংখ্য নির্বাচনপ্রার্থীর পরিবর্তে অল্পসংখ্যক প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। ইহাতে নির্বাচকদের পক্ষে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে সুবিধা হয়। আবার একাধিক নির্বাচনপ্রার্থী থাকায় পছন্দ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার স্বাধীনতাও ব্যাহত হয় না।

১। দলীয় ব্যবস্থা নীতিনির্ধারণ ও প্রার্থীনির্বাচনে সাহায্য করে

দলীয় ব্যবস্থার আরও কতকগুলি কার্য গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। বিকল্প নীতি ও কর্মসূচীর বিভিন্ন দিকের আলোচনা ব্যতীত নির্বাচকগণ সুসিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারে না। বলা হয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদিত হয় দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে। বিভিন্ন দল নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচীর পক্ষে প্রচারকার্য চালাইয়া জনসাধারণের সমর্থন পাইতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে একদিকে যেমন জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা প্রসারলাভ করে, অন্যদিকে তেমনি আবার নির্বাচকগণ দলীয় নীতি ও কর্মসূচীসমূহের গুণাগুণ জানিয়া কর্তব্য স্থির করিতে পারে।

২। দলীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার করে

দলীয় ব্যবস্থার সপক্ষে আরও বলা হয় যে, দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় থাকিলে স্বৈরাচারিতার উদ্ভব হইতে পারে না। নির্বাচনের ফলে কোন দল বা সম্মিলিত দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত হইলেও উক্ত দলকে সংযত হইয়া রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা করিতে হয়। কারণ, বিরোধী দল বা দলসমূহ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা সম্মিলিত দলের ত্রুটিবিচ্যুতির দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বীয় পক্ষে জনমতকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। সুতরাং যাহাতে জনসমর্থন কোনক্রমে হ্রাস না পায় তাহার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে যথাসম্ভব ত্রুটিবিচ্যুতি পরিহার করিয়া চলিতে হয়। যাঁহারা একাধিক দলের উপযোগিতা সম্পর্কে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন তাঁহাদের মতে, একদলীয় ব্যবস্থা স্বৈরাচারিতার নামান্তর মাত্র।

৩। দলীয় ব্যবস্থার ফলে স্বৈরাচারিতার উদ্ভব হইতে পারে না

নিজ নিজ কর্মসূচীর ভিত্তিতে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি জনমতের সমর্থন পাইতে এবং নির্বাচনে জয়লাভ করিতে চেষ্টা করে। যে-দল অধিকসংখ্যক নির্বাচকের সমর্থন প্রাপ্ত হইয়া আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের দায়িত্ব থাকে নিজ কর্মসূচীকে আইনে পরিণত করিবার। এইভাবে জনমত দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তব রূপ গ্রহণ করে।

৪। রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহের মাধ্যমেই জনমত বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে

দলীয় ব্যবস্থার সপক্ষে নির্দেশিত পরবর্তী গুণ হইল যে, ইহার মাধ্যমে শান্তি ও শৃংখলা ভংগ না করিয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন সাধন করা যায়।

৫। দলীয় ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন সম্ভবপর হয়

রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি জনমতকে নিজ নিজ দলের পক্ষে পরিচালিত করিয়া নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিতে চেষ্টা করে। বিজয়ী দল নির্বাচনের পর নিজ কর্মসূচী অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিয়া জনমতানুমোদিত সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে। এইভাবে সমাজের অভ্যন্তরে যে স্বার্থের বিভিন্নতা বা সংঘর্ষ থাকে তাহার মীমাংসা শান্তিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়।

রাষ্ট্রের ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারগুলির কার্যের সমন্বয়সাধন ব্যাপারে দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লিখিত হয়। পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রি-পরিষদ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে। দলীয় ব্যবস্থা থাকায় মন্ত্রিগণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। স্থতরাং ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। দলীয় ব্যবস্থা না থাকিলে আইনসভার সমর্থনপ্রাপ্ত স্থায়ী সরকার গঠন করা অসম্ভব হইত। অবশ্য এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বহুদলীয় ব্যবস্থায় স্থায়ী সরকার গঠন করা কঠিন। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত যে-সকল রাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে সেখানে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে বিরোধের ফলে শাসনকার্যে অচল অবস্থার স্থষ্টি হইতে পারে। একমাত্র দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই দুই বিভাগকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা সম্ভবপর। তাহা ছাড়া একই রাষ্ট্রে, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে, স্থানীয় সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত যে-সমস্ত বিভিন্ন পর্যায়ের সরকার থাকে তাহাদের কার্য ও নীতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে দলীয় ব্যবস্থা সহায়তা করে। কারণ, একই দল যদি বিভিন্ন অংশের সরকারগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সকল সরকারই একই নীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

৬। দলীয় ব্যবস্থা বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ও বিভিন্ন সরকারের মধ্যে সমন্বয়সাধনের সূত্র

দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি (Demerits of Party System):

দলীয় ব্যবস্থার বিশেষ গুণকীর্তন করা হইলেও উহার কতকগুলি দোষত্রুটির কথা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না।

১। দলীয় ঐক্য ও সংহতি কৃত্রিম এবং দলীয় কর্মসূচী অগণতান্ত্রিক

প্রথমত, সমাজের বিভিন্ন লোকের মতামত যে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় তাহা মাত্র কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ দলের মধ্যে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয় না। এইজন্য দলীয় ঐক্য বা সংহতি কৃত্রিম এবং দলীয় কর্মসূচীও অগণতান্ত্রিক বলিয়া অভিযুক্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, এই কৃত্রিম দলীয় বিরোধিতার ফলে মানুষের ব্যক্তিত্ব পংগু হইয়া পড়ে। দলের সংহতি রক্ষাকল্পে সদস্যগণের পক্ষে নিজস্ব মতামতকে চাপা দিয়া দলীয় নীতিকে সমর্থন করিতে হয়। কারণ, অন্যথায় দল হইতে বহিষ্কৃত হইবার ভয় থাকে।

২। ইহাতে ব্যক্তিত্ব পংগু হইয়া পড়ে

তৃতীয়ত, দলীয় ব্যবস্থায়, বিশেষত ব্রিটেনের মত দ্বিদলীয় ব্যবস্থায়, কোন প্রশ্নের গুণাগুণ বিচার না করিয়াই সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরোধিতা করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়। সুতরাং ইহা অনিষ্টকর।

৩। দলীয় ব্যবস্থার ফলে অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়

চতুর্থত, রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থই বড় করিয়া দেখে এবং দলগত স্বার্থকে জনসাধারণের স্বার্থ বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে।

৪। দলগুলি মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে

পঞ্চমত, দেশের কায়েমী স্বার্থভোগীরা অর্থসাহায্য এবং সংবাদপত্রে প্রচারের সুযোগ প্রদান করিয়া কোন কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলকে স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থসাধনে নিয়োজিত করিয়া থাকে। নির্বাচনে ব্যাপক প্রচারের সাহায্যে জনসাধারণকে দেশের প্রকৃত রূপ হইতে অনেক দূরে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়, যাহার ফলে নির্বাচনের পর কায়েমী স্বার্থভোগীরা স্বীয় স্বার্থের অনুকূলে সরকারকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। এইভাবে মিথ্যা প্রচার, প্রবঞ্চনা, দুর্নীতি প্রভৃতি প্রশ্রয় পাইয়া সমাজের নৈতিক মানকে নিম্নস্তরে টানিয়া নামায়।

৫। দলীয় ব্যবস্থার ফলে সমাজের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে

৬। ইহাতে অনেক সময় যোগ্য ব্যক্তি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন

ষষ্ঠত, দলীয় ব্যবস্থার ফলে অনেক সময় যোগ্যতম ব্যক্তিগণ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন—কারণ বিজয়ী দল নিজ দলের সমর্থকদের মধ্য হইতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদগুলি পূরণ করিয়া থাকে।

৭। ইহাতে বর্তমানে চমকপ্রদ কিন্তু ভবিষ্যতে দেশের পক্ষে অকল্যাণকর আইন প্রণীত হইতে পারে

পরিশেষে, অনেক ক্ষেত্রে আবার ক্ষমতাপ্রাপ্তদল জনসাধারণের সমর্থন ও ভোটসংগ্রহের উদ্দেশ্যে এমন সমস্ত আইন পাস করে যাহা আপাতদৃষ্টিতে চমকপ্রদ হইলেও দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

ইহা ব্যতীত বলা হয়, নির্বাচনের সময় জনসাধারণের মধ্যে যে অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করা হয় তাহাতে জাতীয় জীবনের মর্যাদার হানি করা হয়। হিংসা, দ্বেষ, মনোমালিন্য, অশোভনীয় বক্তৃতাদি ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

৮। অন্যান্য ত্রুটি

***দ্বিদলীয় এবং বহুদলীয় ব্যবস্থা* (Bi-Party and Multi-Party System) :** দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হিসাবে বলা হয়, ইহার মাধ্যমে সমাজে যে বিভিন্ন মতধারা প্রচলিত থাকে তাহা সম্যকভাবে প্রকাশিত হইতে

পারে না। সুতরাং যদি বহুদল থাকে তাহা হইলে বিভিন্ন মত উহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইতে পারে। ইহার উত্তরে আবার বলা হয়, সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে দেশের শাসনকার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য দ্বিদলীয় ব্যবস্থাই অধিকতর উপযোগী। নীতি ও প্রতিনিধি নির্বাচনে নাগরিকগণের স্বাধীনতা, আলোচনা এবং শাসনক্ষমতায় সংযম এই তিনটি গুণকে গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয়। এই তিনটি বিষয়েই বহুদলীয় ব্যবস্থা হইতে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

সকল দিকে সুবিবেচনা করিলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকেই সমর্থন করিতে হয়

১। দ্বিদলীয় ব্যবস্থার উৎকর্ষ : দ্বিদলীয় ব্যবস্থা নীতি-নির্বাচনকার্যকে সহজ করিয়া তুলে

প্রথমত, নীতি নির্বাচন ব্যাপারে যদি দুইটি পরিষ্কার বিকল্প নীতি থাকে তাহা হইলে নাগরিকদের পক্ষে নির্বাচনকার্য খুব সহজ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বহুদল যদি বহু রকমের নীতি জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করে তাহা হইলে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং নির্বাচনকার্যও কঠিন হইয়া পড়ে।

২। আলোচনার সুযোগ প্রদানেও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থা হইতে শ্রেয়

গণতন্ত্রের দ্বিতীয় গুণ হইল আলোচনার সুযোগ। এক্ষেত্রেও বহুদল অপেক্ষা দ্বিদল অধিকতর শ্রেয়। কারণ, দুই দলের দুইটি কর্মসূচী সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং অন্যের আলোচনা উপলব্ধি করা যত সহজ, বহুদলের বহু প্রকারের কর্মসূচীর বিচার-বিবেচনা ও আলোচনা করা তত সহজ নয়।

৩। দ্বিদলীয় ব্যবস্থাতেই সুসংবদ্ধ সরকারী দল ও শক্তিশালী বিরোধী দল গড়িয়া উঠে

তৃতীয়ত, দ্বিদলীয় ব্যবস্থা থাকার দরুন একদিকে শাসনক্ষমতার অধিকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেমন নির্দিষ্ট ও শক্তিশালী হয়, অন্যদিকে বিরোধী দলও সম্যকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের বিরোধিতা করিতে পারে। ইহাতে শাসকবর্গ সংযত থাকিতে বাধ্য হন। কিন্তু বহুদল থাকিলে সরকারও সুসংবদ্ধ হয় না, বিরোধিতাও শক্তিশালী হয় না।

উপসংহার

বস্তুত, বহুদলীয় ব্যবস্থা মারাত্মক রকমের দোষে দুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। দুইটি দল থাকিলে নির্বাচকগণ সরাসরিভাবে নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রের শাসননীতি ধার্য করিয়া দিতে পারে। কারণ, তাহারা জানিতে পারে যে, দুইটি দলের মধ্যে যে-দলটিকে তাহারা অধিক সমর্থন জানাইবে সেই দলই শাসন-পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যেখানে বহুদল বর্তমান থাকে সেখানে নির্বাচকরা জানিতে পারে না সরকারের রূপ এবং সরকারী নীতি কি হইবে, কারণ বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত সম্মিলিত সরকার গঠিত হইয়া থাকে। আইনসভায় বিভিন্ন দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার ফলেই এই সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়। এইরূপ সরকার ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল হইতে বাধ্য। স্বভাবতই সরকারী নীতিতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। আইনসভার বিভিন্ন দলের মধ্যে সকল সময়েই ক্ষমতা অধিকারের জন্য ষড়যন্ত্র

চলিতে থাকে, এবং সরকারও কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সাহসী হয় না। একারণে অনেক রাষ্ট্রনীতিবিদ দুই দলের উপর ভিত্তিশীল রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাকে কাম্য ব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন।*

***একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র* (One-Party System and Democracy) ঃ** পশ্চিমী গণতন্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহাদের মতে, একাধিক দল ব্যতীত কোন প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বার্কারকে অনুসরণ করিয়া বলা হয় যে একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অস্বীকার মাত্র। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ, স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রনৈতিক দল সংগঠিত করিয়া জনমত গঠন ও রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অধিকার করিয়া আপন নীতি অনুসারে আইনকানুন প্রণয়ন, ইত্যাদি হইল গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। এই সকল স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষের ব্যক্তিত্ব পংগু হইয়া পড়ে এবং স্বৈরাচারিতার ফলে শাসকগোষ্ঠীর হস্তে নাগরিকগণ নিষ্পেষিত হয়। এই অবস্থায় শারীরিক মৃত্যু না ঘটিলেও মানসিক অপমৃত্যু ঘটে।

স্বাধীনভাবে দল গঠনের অধিকার গণতন্ত্রের অন্যতম মূলভিত্তি হিসাবে গণ্য

বলা হয় যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি দেশে এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মেনীতে নাৎসী দল, ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট দল এবং সোবিয়েত রাষ্ট্রে কমিউনিষ্ট দলের উদ্ভবের ফলে ঐ দেশগুলিতে অন্যান্য রাষ্ট্রনৈতিক দলকে কঠোর হস্তে দমন করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের পথ প্রশস্ত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মেনী ও ইতালীতে নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট দলের অবসান ঘটে বটে, কিন্তু সোবিয়েত ইউনিয়নে সর্বগ্রাসী কমিউনিষ্ট দল শুধু টিকিয়াই থাকে নাই বরং অধিকতর শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানেও কমিউনিষ্ট দল একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল হিসাবে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী চিন্তাবিদগণ ইহাতে শুধু হতাশাই প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন না, উহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, সোবিয়েত রাষ্ট্র নিষ্পেষণের একটা বিরাট যন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে এবং সমগ্র দেশ একটা বিরাট জেলে পরিণত হইয়াছে। অভিযোগ করা হয়, ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের প্রধান সর্ত—স্বাধীন চিন্তাধারা ও স্বাধীন সমালোচনার পবিত্র অধিকার সোবিয়েত ইউনিয়নে অতি নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত। এককথায় মানব-সভ্যতার যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর এবং যাহা কিছু মানুষ শত শত বৎসরের সংগ্রামের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা সমস্তই বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সোবিয়েত ইউনিয়নে।

সোবিয়েত রাষ্ট্র ও তথাকার কমিউনিষ্ট দল সম্বন্ধে পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের মন্তব্য

অপরপক্ষে, অন্যান্য বহু চিন্তাশীল রাষ্ট্রনীতিবিদ বিশেষত সোবিয়েত নেতৃবৃন্দ উপরি-উক্ত মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে, সত্যকারের দল

* "....a political system is the more satisfactory, the more it is able to express itself through the antithesis of two great parties." H. J. Laski

কোন শ্রেণীর অংশমাত্রকে লইয়া গঠিত হয়। এই অংশ শ্রেণীর অন্যান্য সকলের অপেক্ষা অগ্রগামী। ইহারা শ্রেণীর প্রকৃত স্থায়ী স্বার্থ কি সেই সম্পর্কে চেতনাসম্পন্ন হয় এবং ঐ স্বার্থ অনুযায়ী সমস্ত শ্রেণীকে পরিচালিত করে। সুতরাং যে-সমাজে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী—যেমন, পুঁজিপতি ও শ্রমিক, জমিদার ও কৃষক ইত্যাদি থাকে সেই সমাজেই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসাবে দ্বন্দ্বশীল দল থাকা সম্ভব হয়। কিন্তু যেখানে শোষণের অবসান করা হইয়াছে, সেখানে পরস্পরবিরোধী স্বার্থ-সম্পন্ন, দ্বন্দ্বশীল শ্রেণী থাকে না। ফলে সেখানে একাধিক দলও থাকিবার কারণ থাকে না। সোবিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত শোষকশ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রমিক ও কৃষক এই যে দুই শ্রেণী বর্তমান আছে তাহাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী নয়। উভয় শ্রেণীরই স্বার্থ হইল সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাকে দৃঢ় করিয়া সমভোগী সমাজ (communistic society) প্রবর্তন করা। এই অবস্থায় উভয় শ্রেণীই যে একটি মাত্র দল—কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করিতে অগ্রসর হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে? এইজন্যই সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১২৬ ধারায় বলা হইয়াছে যে, শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন অংশের অধিকার রহিয়াছে কমিউনিষ্ট দলে সংঘবদ্ধ হইবার। এই দল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি ও প্রসারের সংগ্রামে মেহনতী জনসাধারণের অগ্রণী অংশ এবং মেহনতী জনসাধারণের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের পরিচালনার প্রধান শক্তি।

সোবিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের মন্তব্যের সমালোচনা

এই সমালোচকগণের মতে, বিভিন্ন দলের অস্তিত্বের কারণ

সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিষ্ট দলের ভূমিকা

এখানে প্রশ্ন তোলা হয়, যদি শোষকশ্রেণীর অবসান করিয়া সমাজতন্ত্রই সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়া থাকে তবে আদৌ কোন রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিবার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ইহার উত্তরে বলা হয়, যে-পর্যন্ত না সম্পূর্ণভাবে সমাজ সমভোগবাদ বা কমিউনিজমের স্তরে পৌঁছায়, যে-পর্যন্ত না সমস্ত প্রকারের বিরোধী শক্তি ও প্রভাব হইতে সমাজ মুক্ত হয় সে-পর্যন্ত দলের প্রয়োজন আছে। দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবসান হইলেও পূর্বতন শোষণ-ব্যবস্থা যে-ধ্বংসাবশেষ রাখিয়া যায় তাহার বিরুদ্ধে মেহনতী শ্রেণীর সংগ্রাম চলিতে থাকে। এই সংগ্রামের সম্মুখভাগে থাকে শ্রমিক এবং অন্যান্য মেহনতী জনসাধারণের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও চেতনাসম্পন্ন অংশকে লইয়া গঠিত কমিউনিষ্ট দল। সংগ্রামের উদ্দেশ্য হইল অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী সংগঠনকার্যের প্রসার করা, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে শাসনকার্যে সর্বত্র গণতন্ত্রের বিস্তার করা এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী শিক্ষার সাহায্যে ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভংগির বিলোপসাধন করা। সুতরাং সোবিয়েত ইউনিয়ন যে

কেন সোবিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিষ্ট দলের অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে

কমিউনিষ্ট দল কাহাদের লইয়া গঠিত

সামাজিক তত্ত্ব ও মানে বিশ্বাসী তাহার বিরুদ্ধে কার্যকলাপকে বরদাস্ত করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সেখানে যদি কেহ সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার স্থলে ব্যক্তিগত মুনাফার ভিত্তিতে ধনতন্ত্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রচার বা দল গঠন করিতে চায় তাহা হইলে উক্ত প্রচেষ্টাকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সমভোগবাদী সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে যে-সকল পন্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলি সম্পর্কে কোন সমালোচনার স্থান সোবিয়েত ইউনিয়নে নাই—এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই প্রসংগে ১৯৫২ সালের ঊনবিংশ দলীয় কংগ্রেসে যে-রিপোর্ট দাখিল করা হয় তাহার উল্লেখ করা যায়। উক্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, বর্তমানে দলের সদস্যদের মধ্যে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার প্রসার অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহা দলের নিম্নস্তর হইতে অধিকমাত্রায় হওয়া প্রয়োজন। যাহারা এই সমালোচনাকে নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে চায় তাহারা দলের শত্রু এবং তাহাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা অবশ্য কর্তব্য।

সোবিয়েত ইউনিয়নে আদর্শের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা চলে না, পন্থার বিরুদ্ধে চলে

সুতরাং দেখা যাইতেছে, উপরি-উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর চিন্তাবিদগণ এবং সোবিয়েত নেতৃবৃন্দের মতানুসারে শোষণবিহীন রাষ্ট্রে সমস্বার্থের ভিত্তিতে একটি মাত্র দল থাকাই স্বাভাবিক। ইহাতে গণতন্ত্র ব্যাহত না হইয়া বরঞ্চ অধিকমাত্রায় প্রসারলাভ করিয়া থাকে।*

এক শ্রেণীর মতবাদ অনুসারে সমস্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে একটিমাত্র দল থাকাই স্বাভাবিক

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। অবশ্য রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি যে-সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে তাহার সন্ধান অতি পুরাকালের রাষ্ট্র-ব্যবস্থাতেও পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব গণতন্ত্র ও সার্বিক ভোটাধিকারের ফল। রাষ্ট্রনৈতিক দলের মাধ্যমেই সাধারণের শাসনকার্যে রূপান্তরিত হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায়ঃ কোন নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে এবং সংযুক্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সম্প্রসারণকল্পে সম্মিলিত হইয়াছে এইরূপ জনসমষ্টিকেই রাষ্ট্রনৈতিক দল আখ্যা দেওয়া হয়। এই সংজ্ঞানুসারে রাষ্ট্রনৈতিক দলের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করা যাইতে পারে—১। রাষ্ট্রনৈতিক দলের সদস্যগণ সমমতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একত্রিত হয় ; ২। দলগুলির প্রত্যেকটি সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকে ; ৩। ইহারা যাহাতে সরকার গঠন করিয়া নিজ নিজ নীতিকে কার্যকর করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কর্মসূচী প্রণয়ন করে এবং অধিকসংখ্যক নির্বাচকের সমর্থন পাইতে চেষ্টা করে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের ভিত্তিঃ রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। ইহার মধ্যে (১) সংস্কারের রূপ, (২) ধর্মের ভিত্তি, (৩) জাতীয়তার ভিত্তি এবং (৪) অর্থনৈতিক

* এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 'শাসন-ব্যবস্থা'য় সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থা আলোচনা প্রসংগে একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা হইয়াছে।

ভিত্তিই প্রধান। আবার এই চারিটি ভিত্তির মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতাকে প্রকৃত ভিত্তি বলিয়া গণ্য করা যায়। অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্নতা যদি প্রকৃত ভিত্তি হয় তবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সকল রাষ্ট্রনৈতিক দলই যে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকিবে এইরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্য ও গুণাবলী : দলীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংগ। ১। ইহা বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করিয়া জনসাধারণকে নীতি ও প্রতিনিধি নির্বাচনে সহায়তা করে; ২। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসারসাধন করে; ৩। দলীয় ব্যবস্থার ফলে স্বৈরাচারিতার উদ্ভব হইতে পারে না; ৪। ইহার মাধ্যমে জনমত বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে; ৫। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন সম্ভবপর; ৬। ইহা শাসন ও ব্যবস্থা বিভাগকে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে।

দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি : দলীয় ব্যবস্থার নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির উল্লেখ করা যায়—১। দলীয় ঐক্য ও সংহতি কৃত্রিম এবং দলীয় কর্মসূচী অগণতান্ত্রিক; ২। দলীয় নিয়মানুবর্তিতা ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে; ৩। অনেক সময় দলীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান পায়; ৪। দলগুলি মিথ্যাপ্রচার দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করে; ৫। দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে মিথ্যাপ্রচার, প্রবঞ্চনা, দুর্নীতি প্রভৃতি প্রশ্রয় পাইয়া সমাজের নৈতিক মানের অবনতি ঘটায়; ৬। সুযোগ্য লোক শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন; ৭। ইহা চমকপ্রদ কিন্তু ভবিষ্যতে দেশের পক্ষে অকল্যাণকর আইন প্রণীত হইতে পারে; ৮। নির্বাচনের সময় অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি হয়।

দ্বিদলীয় এবং বহুদলীয় ব্যবস্থা : সকল দিক বিবেচনা করিলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকেই সমর্থন করিতে হয়, কারণ—১। ইহা নীতি-নির্বাচনকার্যকে সহজ করিয়া তুলে; ২। আলোচনার সুযোগ প্রদানেও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থা হইতে শ্রেয়; ৩। এইরূপ ব্যবস্থাতেই সুসংবদ্ধ সরকারী দল এবং শক্তিশালী বিরোধী দল গড়িয়া উঠে।

একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র : পশ্চিমী গণতন্ত্রের উপাসকদের মতে, একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অস্বীকার মাত্র। সোবিয়েত ইউনিয়নের উল্লেখ করিয়া ইঁহারা বলেন যে, ঐ রাষ্ট্র নিষ্পেষণের একটা বিরাট যন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে এবং সমগ্র দেশ একটা বিরাট জেলে পরিণত হইয়াছে।

বিরোধী পক্ষ বলেন যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সত্যকারের রাষ্ট্রনৈতিক দল কোন শ্রেণীর অংশমাত্রকে লইয়া গঠিত হয়। এই অংশ শ্রেণীর অন্যান্য সকলের অপেক্ষা অগ্রগামী। ইহা শ্রেণীর প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং ঐ স্বার্থ অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে শ্রেণীকে পরিচালিত করে। সুতরাং যে-সমাজে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী—যেমন, পুঁজিপতি ও শ্রমিক, জমিদার ও কৃষক, ইত্যাদি থাকে সেখানেই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসাবে দ্বন্দ্বশীল দল থাকা সম্ভব হয়। কিন্তু যেখানে শোষণের অবসান করা হইয়াছে, সেখানে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন দ্বন্দ্বশীল শ্রেণী থাকে না। ফলে সেখানে একাধিক দলও থাকিবার প্রয়োজন হয় না। সোবিয়েত ইউনিয়নের কৃষক ও শ্রমিক মাত্র এই দুইটি শ্রেণী বর্তমান আছে। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থাকে দৃঢ় করিয়া সমভোগী সমাজ প্রবর্তন করা। ফলে উভয়ে যে একটি মাত্র দলে সমবেত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

প্রশ্ন উঠে যে সোবিয়েত ইউনিয়নে যদি শোষকশ্রেণীর অবসান ঘটিয়া সমাজতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তবে আদৌ রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিবার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ? ইহার উত্তরে বলা হয়, যে-পর্যন্ত না সম্পূর্ণভাবে সমাজ সমভোগবাদ বা কমিউনিজমের স্তরে পৌঁছায় যে-পর্যন্ত না সমস্ত প্রকারের বিরোধী শক্তি ও প্রভাব হইতে সমাজ মুক্ত হয় সে-পর্যন্ত দলের প্রয়োজন আছে। এই কারণেই সোবিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রনৈতিক দল রহিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the use, abuse and true role of party system in Democracy.
(C. U. 1951, '53, '55)

[ইংগিত : বলা হয় যে, দলীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংগ। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির ভূমিকা বা কার্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয় : (১) দলীয় ব্যবস্থা নীতি-নির্ধারণে ও প্রার্থী-নির্বাচনে নির্বাচককে সাহায্য করে ; (২) দলীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ও শিক্ষার প্রসার করে ; (৩) দলীয় ব্যবস্থার ফলে স্বৈরাচারিতার উদ্ভব হইতে পারে না; (৪) রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহের মাধ্যমেই জনমত বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে ; (৫) দলীয় ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হয় ; (৬) দলীয় ব্যবস্থা শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগকে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করে।

দলীয় ব্যবস্থার কতকগুলি ত্রুটির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়—(১) দলীয় ঐক্য ও সংহতি কৃত্রিম এবং দলীয় কর্মসূচীও অগণতান্ত্রিক : (২) ইহাতে ব্যক্তিত্ব পংগু হইয়া পড়ে ; (৩) দলীয় ব্যবস্থার ফলে অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয় ; (৪) দলগুলি মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে ; (৫) দলীয় ব্যবস্থার ফলে সমাজের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে ; (৬) ইহাতে অনেক সময় যোগ্য ব্যক্তি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন ; (৭) ইহাতে অনেক সময় চমকপ্রদ কিন্তু সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর আইন প্রণীত হয়। ইহা ব্যতীত, হিংসা, দ্বেষ, মনোমালিন্য ইত্যাদিও দলীয় ব্যবস্থার ফলে ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে।···৩৫৪-৩৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

2. Can Democracy function in a one-party State ? Give reasons for your answer. (C. U. 1960)

[ইংগিত : একদলীয় রাষ্ট্রে গণতন্ত্র থাকিতে পারে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সমালোচকগণ বলেন যে, একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অস্বীকার মাত্র। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ, স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রনৈতিক দল সংগঠিত করিয়া জনমত গঠন ও রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অধিকার করিয়া আপন নীতি অনুসারে আইনকানুন প্রণয়ন ইত্যাদি হইল গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। এই সকল স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষের ব্যক্তিত্ব পংগু হইয়া পড়ে এবং স্বৈরাচারিতার ফলে শাসকগোষ্ঠীর হস্তে নাগরিকগণ নিষ্পেষিত হয়। ইঁহাদের মতে, সোবিয়েত ইউনিয়ন নিষ্পেষণের একটা বিরাট যন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। কারণ সেখানে দলগঠনের স্বাধীনতা নাই এবং সংবিধানে কমিউনিষ্ট দল একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে।

অপরপক্ষে আর একদল চিন্তাবিদ আছেন যাঁহারা এই মতকে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, সত্যকারের দল কোন শ্রেণীর অংশমাত্রকে লইয়া গঠিত হয়। এই অংশ শ্রেণীর অন্যান্য সকলের অপেক্ষা অগ্রগামী এবং শ্রেণীর প্রকৃত স্বার্থ সম্পর্কে চেতনাসম্পন্ন। শ্রেণীকে ঐ স্বার্থ অনুযায়ী পরিচালনা করা ইহার কার্য। সুতরাং যে-সমাজে পরস্পরবিরোধী স্বার্থ সম্পন্ন শ্রেণী থাকে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসাবে দ্বন্দ্বশীল একাধিক দল থাকা স্বাভাবিক। প্রকৃত ক্ষমতা কিন্তু আর্থিক প্রতিপত্তিশালী সংখ্যালঘু শোষকশ্রেণীর হাতে থাকে। আবার শ্রেণীদ্বন্দ্ব যখন চরমে পৌছায় তখন শোষকশ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতী শ্রেণীকে খোলাখুলিভাবে দমন করিয়া একদলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। জার্মেনীতে নাৎসী দল এবং ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট দলের উদ্ভব এই অবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু যে-সমাজে শোষণকে অবসান করা হয়, যেখানে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন দ্বন্দ্বশীল শ্রেণী থাকে না সেখানে একাধিক দলও থাকিবার কোন কারণ থাকে না। সোবিয়েত ইউনিয়নের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, সেখানে শোষকশ্রেণী বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রমিক ও কৃষক এই যে দুই শ্রেণী বর্তমান আছে তাহাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী নয়। উভয় শ্রেণীরই স্বার্থ হইল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় করিয়া সমভোগী সমাজ প্রবর্তন করা। এই অবস্থায় উভয় শ্রেণীই এই একটি মাত্র দল—কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করিতে অগ্রসর হইবে ইহাই স্বাভাবিক। এই দল মেহনতী সর্বসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে বলিয়া ইহা গণতন্ত্রসম্মত ; অপরপক্ষে ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী গণতন্ত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দল সংখ্যাল্প শোষণকারী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে।..এবং ৩৫৯-৩৬১ পৃষ্ঠা দেখ।]

3. Discuss the strength and weakness of the party system in the modern democratic states. What differences do you observe in this regard in dictatorial states ?

(B. U. 1961)

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের ইংগিত : একনায়কতন্ত্রে দ্বিদলীয় বা বহুদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থা থাকে। একটি মাত্র দল থাকায় সেখানে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতির অবকাশ থাকে না ; অপরদিকে নাগরিকের দল নির্বাচনের স্বাধীনতাও থাকে না। ...এবং ৩৫৪-৩৫৭ এবং ৩৫৯-৩৬১ পৃষ্ঠা দেখ।]

একবিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি

(THE SPHERE OF STATE ACTIVITY)

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য **(Nature and Ends of the State) :** রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি লইয়া প্লেটোর সময় হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ চলিয়া আসিতেছে। এই মতবিরোধের কারণ হইল রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতবিরোধ। প্রথমে রাষ্ট্রের প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ বিশেষ করিয়া প্লেটো ও এ্যারিষ্টটল, জার্মান ও ইংরাজ আদর্শবাদিগণ, হিতবাদী দার্শনিকগণ (Utilitarian Philosophers), বিবর্তনবাদিগণ, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদিগণ (State Socialists), সমভোগবাদিগণ এবং নাৎসী ও ফ্যাসিবাদিগণ হয় রাষ্ট্রকে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে সীমাহীন করিতে চাহিয়াছেন, না-হয় জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তারের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবিরোধ

অপরদিকে, নৈরাজ্যবাদিগণ (Anarchists), মধ্যযুগের খ্রীষ্টধর্মপ্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ (Ecclesiastics), অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ, আন্তর্জাতিকতাবাদিগণ, বহুত্ববাদিগণ প্রভৃতি সাধারণত ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া হয় রাষ্ট্রকে একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছেন, না-হয় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি যথাসম্ভব সংকুচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ণনা করিবার ফলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও দার্শনিকগণ একমত হইতে পারেন নাই। প্লেটো ও এ্যারিষ্টটলের মতে, সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব।* আদর্শবাদিগণের মতে, রাষ্ট্রের স্বার্থকতা আপনার মধ্যেই নিহিত। অপরদিকে, আবার খ্রীষ্টধর্মপ্রতিষ্ঠান (Church), ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ প্রভৃতির মতে, রাষ্ট্র একটি অকল্যাণকর অথচ অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। মানুষের প্রকৃতিগত ত্রুটির জন্যই ইহার অস্তিত্ব। সমভোগবাদিগণের মতে, রাষ্ট্র শক্তিপ্রয়োগের অন্যতম বাস্তব প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্দেশ্য হইল শ্রেণীসম্বন্ধ ও শ্রেণীস্বার্থকে বজায় রাখা।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী মত

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই দুই বিপরীত চরম মতবাদের মধ্যপন্থাও অনেকে অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের অন্যতম হইলেন ইংরাজ দার্শনিক লক। লক বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য মানবসমাজের মংগলসাধন করা, কারণ—"মানুষের মহান ও প্রধান উদ্দেশ্য হইল নিজেদের সরকারের অধীনে সংঘবদ্ধ করিয়া সম্পত্তির সংরক্ষণের ব্যবস্থা

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মধ্যপন্থা অনুসরণকারীদের মত

---

* The State exists to promote good life.

করা।"* সুতরাং লকের মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংরক্ষণই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ্যাডাম স্মিথের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ—যথা, ব্যক্তিকে আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করা, সামাজিক অত্যাচার ও অন্যায় হইতে রক্ষা করা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে-সকল কার্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয় সেই কার্যগুলি সম্পাদন করা। জার্মান লেখকগণের মধ্যেও অনেকে রাষ্ট্রের অনেকটা এইরূপ ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের নির্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য ব্লুণ্টস্‌লি বলেন যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ নয়, দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হইল জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য জাতীয় শক্তি ও সম্ভাবনার বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। উইলোবির (Willoughby) মতে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও চরম—এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রের শান্তিশৃংখলা এবং স্বাধীনতা রক্ষা করা; মাধ্যমিক উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথ সুগম করা; এবং চরম উদ্দেশ্য হইল সাধারণের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণের বৃদ্ধি করা। অধ্যাপক গার্ণারও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করার পক্ষপাতী। তাঁহার মতে, প্রথমত রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা করিয়া ন্যায়-বিচারের ব্যবস্থা করিবে; দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত মংগলের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকিবে; এবং চরম পর্যায়ে নিজেকে মানব-সভ্যতার উন্নয়নে নিয়োজিত করিয়া বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

লক ও এ্যাডাম স্মিথ

জার্মান দার্শনিকগণ এবং উইলোবি

গার্ণার

ল্যাস্কির ন্যায় আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এইরূপ দার্শনিক তত্ত্বকে পরিহার করিয়া রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ করিতে চাহেন। ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, "রাষ্ট্র হইল জনসাধারণের সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ সম্ভব করিবার জন্য সংগঠন। ইহার কার্যাবলী মানুষের আচরণের ঐক্যসাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ; এবং পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে এই সীমার সংকোচন বা সম্প্রসারণ ঘটিবে। সুতরাং মানুষের সমগ্র কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্র উদ্ভূত হয় নাই। ইহা সমাজজীবনের পরিধি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজজীবন অভিন্ন নহে।"**

ল্যাস্কি প্রভৃতির রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সুস্পষ্ট ধারণা সহজেই করা যাইবে যে, চিরকাল ও সর্বজনের জন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের নির্দেশ করা যায় না। দেশ ও কালভেদে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যেরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। তবুও সাধারণভাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সামগ্রিক কল্যাণসাধন—কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের কল্যাণসাধন নয়।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সর্ব কাল ও সর্ব দেশের জন্য এক এবং অভিন্ন নহে

* "....the great and chief end of men uniting into commonwealths and putting themselves under government is the preservation of their property."

** "....the State..does not set out to compass the whole range of human activity. It may set the keynote of the social order, but it is not identical with it."

কিন্তু এইভাবে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনার ফলে সমস্যার সমাধান না হইয়া সমস্যা জটিলতর আকারই ধারণ করে। প্রশ্ন উঠে যে, সমগ্র নাগরিক সম্প্রদায়ের প্রকৃত কল্যাণের পথ কি? কেই বা ইহা নির্ধারণ করিল? ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত কল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক কি হইবে? কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কল্যাণের সংগে অপরাপর রাষ্ট্রনৈতিক সম্প্রদায়ের কল্যাণের সমন্বয়সাধন কিভাবে করা যাইবে?—ইত্যাদি।

বলা যায়, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সামগ্রিক কল্যাণসাধন

গেটেল বলেন, সরকারের শ্রেষ্ঠ রূপ কি—সে-সম্বন্ধে মানুষ যেমন কখনও একমত হইতে পারে নাই তেমনি কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র ইহার উদ্দেশ্যসাধন—অর্থাৎ সামগ্রিক মংগলসাধন করিতে পারে সে-সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত মতৈক্য পরিলক্ষিত হয় নাই। বোধ হয় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে যেরূপ মতবিরোধ রহিয়াছে সেরূপ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার আর কোন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না।

কি কি কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র সামগ্রিক কল্যাণসাধন করিতে পারে সে বিষয়ে মতৈক্য নাই

***রাষ্ট্রের কার্যাবলী* (Functions of the State):** প্রাচীন গ্রীকগণ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধনের পন্থা হিসাবে রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলিয়াই কল্পনা করিয়াছেন। গ্রীকদের নগর-রাষ্ট্র ছিল একাধারে নগর ও রাষ্ট্র। বার্কারের ভাষায়, ইহা ছিল নৈতিক সমাজ, উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান, সুন্দর সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। বার্ক যে-রাষ্ট্রকে সম্প্রদায়ের সমগ্র ব্যবসায়-বাণিজ্য, সমগ্র বিজ্ঞান, সমগ্র চারুকলা, সমগ্র সংগঠন এবং সমগ্র স্বার্থকতায় চুক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা গ্রীক নগর-রাষ্ট্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য বলিয়াই অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন।*

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

প্রাচীন গ্রীস

প্রাচীন রোমকরা গ্রীকদের এই ধারণা সামান্য পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করে। তাহারা রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে সামাজিক প্রথা ও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সচেষ্ট হয় নাই। রোমে পারিবারিক স্বাধীনতাও অধিক পরিমাণে বর্তমান ছিল। অবশ্য ইহা হইতে এ-ধারণা ভুল হইবে যে, তত্ত্বগতভাবে রোমক রাষ্ট্রশক্তি অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তত্ত্বের দিক দিয়া রাষ্ট্রশক্তির কোন প্রকার লাঘব রোমক যুগে ঘটে নাই। রাষ্ট্র নিজের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত করিয়া আনিয়াছিল মাত্র। ইহার ফলে কার্যত ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রের গণ্ডি হইয়াছিল প্রসারিত।

প্রাচীন রোম

মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্মের সহিত সংঘাতের ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র আরও সংকুচিত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায় 'আইন ও রাষ্ট্রনীতির সম্প্রদায় —ধর্ম ও উপাসনার নহে।'** তখন ব্যক্তি তাহার সত্তা রাষ্ট্রকে

মধ্যযুগ

* ৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

** The State became "a community of law and politics, no longer also of religion and worship."

সমর্পণ করিতে অস্বীকার করে; এবং এই তত্ত্ব পরিস্ফুটিত হয় যে, ব্যক্তির অধিকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমা নির্দেশ করে। মধ্যযুগে আবার সামন্ততন্ত্র প্রবর্তিত থাকায় ব্যক্তি ভূমির মালিক হিসাবে সার্বভৌম হইয়া দাঁড়ায়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার অগণিত ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সরকারের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রূপ রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রকে বিশেষভাবে সংকুচিত করিয়া আনে এবং জন্মগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অধিকার সম্বন্ধে ধারণা।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের জন্ম

মধ্যযুগের পর ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাতীয় রাজতন্ত্রের (National Monarchies) উদ্ভব, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বহির্বাণিজ্যের প্রসারের ফলে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র আবার বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়। রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায় সকলের অভিভাবক। অভিভাবক রাষ্ট্রের (Paternal State) অধীনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্রমশ সংকুচিত হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুরু হয় এবং ফলে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হইল, রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংকীর্ণতম গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা।* ইহা ফিজিওক্র্যাটদের (Physiocrats), অবাধ বাণিজ্যের সমর্থনকারীদের (Free Traders), অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবীদের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কিছুটা পর্যন্ত ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অপ্রতিহত প্রাধান্য। তারপর ইহার বিষময় ফলের জন্য সুরু হইল ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া। দেখা গেল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র কখনই সমাজজীবনের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করিতে পারে না। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে শক্তি ও সংগতিসম্পন্ন লোক বিশেষ সুবিধা ভোগ করে এবং দুর্বল শ্রমজীবী ক্রমশ পশুর পর্যায়ে নামিয়া আসে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজন হস্তক্ষেপের।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবসান

ক্রমশ ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। ফলে কারখানা আইন, খনিসংক্রান্ত আইন, দোকানের কর্মচারী আইন প্রভৃতি পাস হয়। এইভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের যুগের অবসান ঘটে।

সমষ্টিবাদ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পর যে-যুগ সুরু হয় সংক্ষেপে তাহাকে সমষ্টিবাদের যুগ (age of collectivism) বলিয়া অভিহিত করা যায়। সমষ্টিবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ব্যাপক এবং প্রসারিত হইবে। মধ্যে সমষ্টিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও ইহার যুগ এখনও চলিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সকলই অল্পবিস্তর সমষ্টিবাদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের শেষ আশ্রয়স্থল বলিয়া গণ্য করা হয়; কিন্তু এই দেশও সমষ্টিবাদমূলক পরীক্ষাকে পরিহার করিতে পারে নাই। সুতরাং সমষ্টিবাদকে বিশ্বজনীন বলিয়া অভিহিত না করিবার কোন কারণ নাই।

---

* এই অধ্যায়ের শেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমষ্টিবাদের উপর টীকা দেখ।

কিন্তু সমষ্টিবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের কোন অভিন্ন রূপ নির্দেশ করে না। অন্যভাবে বলা যায়, সমষ্টিবাদে বিশেষ পরিমাণভেদ রহিয়াছে; এবং ফলে, এক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র অপর এক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র হইতে বিশেষ ভিন্ন প্রকৃতির হইতে পারে।

পূর্ণ ও আংশিক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র

মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র দুই শ্রেণীর: (ক) পূর্ণ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র, এবং (খ) আংশিক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র। পূর্ণ সমষ্টিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ধ্বংসাবশেষও রাখিতে দিতে প্রস্তুত নয়। ইহা ব্যক্তিজীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করিতে চায়। বর্তমানের এইরূপ সকল পূর্ণ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Socialist State) নামে অভিহিত, এবং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (Socialistic View) নামে পরিচিত। অপরদিকে আংশিক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে বলা হয় সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলি সমাজ-কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত। কিন্তু ইহারা এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী যে, সমাজ-কল্যাণের জন্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং এই শ্রেণীর রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া নিজেদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে। কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে ইহাদের ধারণাকে সামাজিক কল্যাণ মতবাদ (Social-welfare View) বলা হয়।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

সামাজিক কল্যাণ মতবাদ

সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রগুলির সংখ্যাধিক্য

বলা যায়, বর্তমান পৃথিবীতে রাষ্ট্রসমূহ সামাজিক কল্যাণ মতবাদকেই বিপুল সংখ্যাধিক্যে গ্রহণ করিয়া পথ চলিয়াছে; এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সংখ্যায় অত্যল্প। সুতরাং সমাজ-কল্যাণ রাষ্ট্রগুলির কার্যাবলীর বর্ণনা হইল একরূপ আজিকার দিনের রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের বর্ণনা। নিম্নে এই বর্ণনাই করা হইতেছে।

***সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী* (Functions of the Social-welfare States) :** সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র বিবর্তন পদ্ধতিতে প্রয়োজনমত ব্যক্তির গণ্ডির মধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণ (the greatest good of the greatest number) সাধন করতে চায়।

এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে ইহাদিগকে নিম্নলিখিত কর্মসমূহ সম্পাদন করিতে হয়:

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বলিতে কি বুঝায়

ইহা রাষ্ট্রের এক অপরিহার্য কর্তব্য

(ক) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা: ইহাকেই যে-কোন সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে গণ্য করা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা বলিতে রাষ্ট্রাভ্যন্তরে আপদবিপদ হইতে ব্যক্তিকে রক্ষা করা এবং বহিরাক্রমণ হইতে সমগ্র রাষ্ট্রকে রক্ষা করা বুঝায়। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র আইনকানুন প্রণয়ন করে, বিচারের ব্যবস্থা করে, রক্ষিবাহিনীর দ্বারা শান্তিশৃংখলা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে, বহিঃরাষ্ট্রসমূহের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে, ইত্যাদি। রাষ্ট্রের এই সকল কার্যাবলীকে অপরিহার্য

বলিয়া বর্ণনা করা যায়—কারণ, সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসাবে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই রাষ্ট্রকে এই সকল কর্তব্য পালন করিতে হয়।

(খ) সম্পত্তিসংক্রান্ত কার্য: সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রসমূহে সকলকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হইলেও এই অধিকার কখনও অব্যাহত নহে। সামাজিক স্বার্থে সম্পত্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্র আইনকানুন প্রণয়ন করিয়া সেগুলিকে প্রয়োগ করিয়া থাকে।

(গ) পরিবারসংক্রান্ত কার্য: পরিবার গঠনের অধিকার অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার। কিন্তু পারিবারিক জীবন যাহাতে সমাজ-কল্যাণের অনুপন্থী হয় রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সেদিকে লক্ষ্য রাখা। সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র তাহাই করে। ইহা সামাজিক কল্যাণসাধনের জন্য পারিবারিক জীবনকে কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ফলে দেখা যায় বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত আইনকানুন। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র জনসংখ্যাবৃদ্ধির গতিরোধ করিবার জন্য পরিবার পরিকল্পনার (Family Planning) ব্যবস্থা করে। অপরদিকে আবার জনসংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিবাহে আর্থিক সাহায্য, সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভাতা প্রভৃতি প্রদান করে।

সামাজিক প্রয়োজনে পরিবারসংক্রান্ত কার্য সম্পাদন

(ঘ) অধিকার ও তৎসংক্রান্ত কার্য: রাষ্ট্র নাগরিকগণের প্রধানত রাষ্ট্রনৈতিক এবং কয়েক স্থলে সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া তাহা সংরক্ষণ ও কার্যকরকরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

(ঙ) শিল্প-বাণিজ্যসংক্রান্ত কার্য: শিল্প-বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রসমূহের আর একটি বিশেষ লক্ষণ। একদিন এই হস্তক্ষেপের প্রয়োজনেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতির (*Laissez Faire*) অবসান ঘটিয়াছিল। বর্তমানে রাষ্ট্রকে একই সংগে উৎপাদক, শ্রমিক, ভোগ্যপণ্যক্রেতা (consumer) এবং বিনিয়োগকারী (investor) স্বার্থ-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বিশেষ ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রকে একই সংগে শ্রমিক, উৎপাদক, ব্যবহারকারী ও বিনিয়োগকারীর স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়

রাষ্ট্র উৎপাদনের স্বার্থে সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও অন্যান্য উপায়ে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার তীব্রতা দূর করে, শ্রমিকসংক্রান্ত আইন পাস করিয়া শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা ও শ্রমকল্যাণ সাধন করে এবং বিনিয়োগকারীর স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য ব্যবসায় সংগঠন, ব্যাংক প্রভৃতির অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করিয়া থাকে।

(চ) কৃষিসংক্রান্ত কার্য: কৃষি এখনও অধিকাংশ দেশের মূল শিল্প। এই মূল শিল্পের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে—যথা, কৃষককে মহাজন ও জমিদারের কবল হইতে নানাভাবে রক্ষা করে, তাহাকে স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করে, কৃষিদ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার

উন্নতিতে সচেষ্ট থাকে, জলসেচের বন্দোবস্ত করে, কৃষিসংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে, ইত্যাদি।

(ছ) বণ্টনসংক্রান্ত কার্য: উৎপন্নের সামাজিক বণ্টনও (distribution) রাষ্ট্রের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ কর্ম নহে। যাহাতে দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে উহা উত্তরোত্তর সংকীর্ণ হইয়া আসে, যাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি অধিকতর উৎপাদনে নিয়োজিত হয়, সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। রাষ্ট্র এই কার্য আংশিকভাবে মজুরি ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং আংশিকভাবে কর-পদ্ধতির (tax system) দ্বারা সম্পাদন করে। বিভিন্ন গতিশীল কর নির্ধারণ করিয়া ধনীদের নিকট হইতে যে-অর্থ পাওয়া যায় তাহা হইতে বার্ধক্য ভাতা, অসুস্থতা ভাতা, বেকারী ভাতা প্রভৃতি প্রদান করা হয়।

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য দূরিকরণ রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য

(জ) অন্যান্য কার্য: সমাজের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রকে অন্যান্য নানাবিধ কর্তব্যও সম্পাদন করিতে হয়। ইহার মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও তদারক করা, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা, দরিদ্র ও অসহায়কে সাহায্য দান, বেকার-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইহা ছাড়া সকল রাষ্ট্র এমন সকল কার্যাবলী সম্পাদন করে যাহা ব্যক্তির পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয় বা যাহা ব্যক্তিগত উদ্যোগের অধীনে সম্পাদিত হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। উদাহরণস্বরূপ বিমানপথ, রেলপথ, ডাকবিভাগ প্রভৃতির সরকারী পরিচালনা, জাতীয় মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থার (currency and credit) পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ, আদমসুমারি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ, এই সকল তথ্য সম্বন্ধে প্রচার, প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র আরও অগ্রসর হয়। শুধু বিমানপথ, রেলপথ নয়, অন্যান্য যানবাহনও জাতীয় মালিকানায় আনিয়া তাহাদের পরিচালনা করিতে পারে; কতকগুলি বিশেষ শিল্প গঠন ও ইহাদের পরিচালনার দায়িত্ব একচেটিয়াভাবে নিজেই গ্রহণ করিতে পারে, জরুরী অবস্থায় সমগ্র আর্থিক কাঠামোটি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিতে পারে; ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাহা সম্ভব নয় বা বাঞ্ছনীয় নয়, রাষ্ট্র সেগুলি সম্পাদন করে

ভারতের উদাহরণ লইয়া সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles) অনুসারে রাষ্ট্র এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিবে যাহাতে জাতীয় জীবনের সর্বত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। উপরন্তু, উৎপাদকের উপাদানসমূহ যাহাতে কয়েক জনের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া সাধারণের স্বার্থের হানি না করে রাষ্ট্রকে তাহাও দেখিতে হইবে। মোটকথা সংবিধান অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতের দৃষ্টান্ত

সমাজ-কল্যাণের এই ধারণাকে রূপদান করিবার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্র অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার একরূপ সকল দিককেই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ভূমি-সংস্কার, সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য, পরিবার পরিকল্পনা, হিন্দু সংহিতায় বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান, শিল্প-বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ ও উহাদের নিয়ন্ত্রণ, নূতন নূতন গতিশীল প্রত্যক্ষ করধার্য, সামাজিক নিরাপত্তার (social security) ব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণেরই সূচক।

বলা হয়, সমাজ-কল্যাণের পথ বাহিয়া ভারত সমাজতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হইতেছে।

রাষ্ট্রকার্যবৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ (Reasons for Increased State Activity) ঃ দেখা গেল যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রের তুলনায় বর্তমান সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্য অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন বিশ্লেষণ করিয়া কারণগুলিকে পর্যায়ক্রমে দেখানো হইতেছে।

১। শিল্প-বিপ্লব

প্রথমত, শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থ-ব্যবস্থায় এরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয় যে, রাষ্ট্র পূর্বেকার ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করিয়া পারে না। শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার্থে, বেকার-সমস্যার সমাধানে, উৎপন্নের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য উহাকে স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (*Laissez Faire*) পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলি নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

২। একচেটিয়া কারবার ও ব্যবসায়-সংঘের উদ্ভব

দ্বিতীয়ত, ধনিকতন্ত্রের অধীনে বিশেষ এক পর্যায়ে কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ একচেটিয়া কারবার এবং ব্যবসায়-সংঘের (trusts and cartels) উদ্ভব হওয়ায় রাষ্ট্রকে সাধারণ ব্যবহারকারীর, ছোট ছোট ব্যবসায়ীর এবং শ্রমিকের স্বার্থসংরক্ষণে সচেষ্ট হইতে হয়।

৩। ভোটাধিকারের প্রসার

তৃতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীতে ভোটাধিকারের প্রসার শ্রমিক জগতে বিশেষ এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। নানা শ্রমিক সংঘ ও শ্রমিক দল প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ফলে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার্থে রাষ্ট্র আরও কার্যভার গ্রহণ করে।

৪। দুই বিশ্বযুদ্ধ

চতুর্থত, দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন দেশে জাতীয় জীবন একরূপ সম্পূর্ণভাবেই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। ফলে লোকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে একরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায়। যুদ্ধোত্তর যুগেও নিয়ন্ত্রণাধিক্যের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ শোনা যায় না।

৫। সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসার

পঞ্চমত, একরূপ মস্তকে কলংক ধারণ করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিদায় গ্রহণ করিলে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বিভিন্ন রূপ সাধারণ লোকের মনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ দূর না করিলে সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণ কখনই সাধিত হইতে পারে না। ফলে সর্বাংগীণ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে এই কর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হইতে হয়।

রাষ্ট্রের কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ **(Classification of State Functions) :** সামগ্রিক কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের সাধারণ উদ্দেশ্য হইলেও দেশ ও কালভেদে রাষ্ট্রের কার্যাবলীতে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে—কারণ, কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া, কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া উক্ত উদ্দেশ্যসাধন করা যাইতে পারে সে-সম্বন্ধে সকল রাষ্ট্র একমত নহে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, স্বাচ্ছন্দ্য নীতির (*Laissez Faire*) পথেই সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইবে; অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণা হইল, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ব্যতীত সমষ্টিগত কল্যাণকে সর্বাধিক করিয়া তোলা যায় না। আবার সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র মনে করে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত মীমাংসা করিয়াই এ-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐক্যমত থাকিলেও কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে নাই

তবুও যে-কোন রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এইরূপে প্রথম শ্রেণীবিভাগ হইল (ক) অপরিহার্য (Essential), এবং (খ) ইচ্ছাধীন (Optional) কার্যাবলীর মধ্যে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অপরিহার্য কার্য বা কর্তব্য হইল সেগুলি যাহা রাষ্ট্রকে সার্বভৌম শক্তি হিসাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই সম্পাদন করিতে হয়।* অপরপক্ষে, সামগ্রিক কল্যাণবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত রাষ্ট্রকার্যসমূহকে 'ইচ্ছাধীন' বলিয়া অভিহিত করা হয়—অর্থাৎ, এগুলি সম্পাদন না করিলেও সার্বভৌম শক্তির আধার হিসাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলীর একটি শ্রেণীবিভাগ—
ক। অপরিহার্য কার্য
খ। ইচ্ছাধীন কার্য

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ও আইনগত প্রকৃতি এবং সাধারণ উদ্দেশ্যের দিক দিয়া উহার কার্যাবলী আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) যে-সকল কার্য রাষ্ট্রশক্তির সহিত সম্পর্কিত; (২) যে-সকল কার্য নাগরিক-অধিকারের সহিত সম্পর্কিত; এবং (৩) যে-সকল কার্য সামগ্রিক কল্যাণবৃদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি শ্রেণীর কার্যাবলীকে 'অপরিহার্য' এবং শেষোক্ত শ্রেণীর কার্যাবলীকে 'ইচ্ছাধীন' বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

আর একটি শ্রেণী-বিভাগ

১। রাষ্ট্রশক্তির সহিত সম্পর্কিত কার্যাবলী: সার্বভৌম শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করে, যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করে, করধার্য করিয়া শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যবস্থা করে। এই সকল কার্য রাষ্ট্রকর্তৃত্বের (**state authority**) নির্দেশক।

১। রাষ্ট্রশক্তির সহিত সম্পর্কিত কার্যাবলী

২। নাগরিক-অধিকারের সহিত সম্পর্কিত কার্যাবলী: লকের মতে, ব্যক্তির কতকগুলি অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের পত্তন করা হইয়াছিল। বর্তমানেও এ-ধারণা পোষণ করা হয় যে, নাগরিকের কতকগুলি অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ করা

* ৩৬৯-৩৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

রাষ্ট্রের কর্তব্য। এই সকল অধিকারের মধ্যে লক-নির্দেশিত জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার আছে ; তদুপরি আছে ভোটাধিকারের ন্যায় রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার ন্যায় অর্থনৈতিক অধিকার প্রভৃতি। এই সকল অধিকার যাহাতে সরকার বা অন্যান্য নাগরিক দ্বারা ব্যাহত না হয় রাষ্ট্রকে তাহা দেখিতে হইবে। ইহা রাষ্ট্রের অন্যতম অপরিহার্য কর্তব্য। কোন্ রাষ্ট্র কি পরিমাণে অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে তাহাই তাহার উৎকর্ষের মানদণ্ড।*

২। নাগরিক অধিকারের সহিত সম্পর্কিত কার্যাবলী

৩। সামগ্রিক কল্যাণবৃদ্ধির সহিত সম্পর্কিত কার্যাবলী :

৩। সামগ্রিক কল্যাণবৃদ্ধির সহিত সম্পর্কিত কার্যাবলী : সামগ্রিক কল্যাণবৃদ্ধির সহিত সম্পর্কিত বা রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন কার্যাবলীকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) অ-সমাজতান্ত্রিক (Non-socialistic), এবং (খ) সমাজতান্ত্রিক (Socialistic)।

ক। অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী

(ক) অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী : অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী হইল সেগুলি যাহা ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত রাখিলে কাম্যভাবে সম্পাদিত হয় না। ফলে রাষ্ট্রকে এগুলি সম্পাদন করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, পথঘাট, বন্দর-পোতাশ্রয় নির্মাণ, সেচকার্যের প্রসার, ডাক বিভাগ পরিচালনা, শিক্ষার বিস্তার, তথ্যানুসন্ধান ও আদমসুমারি গ্রহণ, নূতন বনভূমির পত্তন (afforestation programme) প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

খ। সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী

(খ) সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী : সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলী হইল সেইগুলি যাহা ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন থাকিলে নানারূপ অন্যায়-অমংগল দেখা দেয়, অথবা যেগুলি রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীনে আনীত হইলেই অধিক দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় বলিয়া বিশ্বাস। রেলপথ, বিমানপথ প্রভৃতি পরিচালনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সেচ-ব্যবস্থা নির্মাণ, মূল শিল্পের সংগঠন, পূর্ণ নিয়োগাবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টা, সামাজিক নিরাপত্তার (social security) ব্যবস্থা, সম্পদ ও সুযোগের ন্যায্য বণ্টনের প্রচেষ্টা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন প্রভৃতি এই সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর অন্তর্গত।

অ-সমাজতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর মধ্যে সীমারেখা অতি অস্পষ্ট

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অ-সমাজতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর মধ্যে সীমারেখা অতি অস্পষ্ট। এক দেশে যাহা সমাজতান্ত্রিক ধরনের কার্য বলিয়া স্বীকৃত, অপর এক দেশে তাহা রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন সাধারণ বা অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অনুরূপভাবে কালভেদেও সমাজতান্ত্রিক ও অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। বিশ বৎসর পূর্বে রাষ্ট্র কর্তৃক রেলপথ পরিচালনা সমাজতান্ত্রিক কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু আজ

* "Every State is known by the rights that it maintains." H. J- Laski

অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র পরিবহণ-ব্যবস্থার পরিচালনাকেও সমাজতান্ত্রিকতার সূচক বলিয়া গণ্য করা হয় না। মনে করা হয় যে, ইহা রাষ্ট্রের সাধারণ অ-সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত, সমাজ-সংগঠনের রূপ যতই জটিল হইতেছে সমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর ধারণাও তত সংকীর্ণ (restricted) হইয়া উঠিতেছে এবং ইহাদের প্রতি বিশেষ প্রবণতাও দেখা দিতেছে।

রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন কার্যাবলী সম্বন্ধে মত-বিরোধ ও বিভিন্ন মতবাদ

রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ মতদ্বৈধতা না থাকিলেও এই ইচ্ছাধীন কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে মতবিরোধ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার সূত্রপাত হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ফলে বিভিন্ন মতবাদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নে ইহাদের কয়েকটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

***রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ* (Theories of State Functions) :** রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে মতবাদগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : (ক) নৈরাজ্যবাদ (Anarchism), (খ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism), এবং সমষ্টিবাদ (Collectivism)। নৈরাজ্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের অস্তিত্বেরই প্রয়োজন নাই; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কার্যাবলী হইবে সংখ্যায় ন্যূনতম এবং ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য হইবে অপ্রতিহত; এবং সমষ্টিবাদ অনুসারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে সমষ্টিকল্যাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাষ্ট্রকর্তৃত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

নৈরাজ্যবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমষ্টিবাদের প্রত্যেকটিতে প্রকারভেদ (variation) আছে। ইহার মধ্যে আবার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয় সমষ্টিবাদে। বস্তুত, সমাজতন্ত্রবাদ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মতবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ প্রভৃতি প্রত্যেকটি মতবাদই সমষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলিয়া সমষ্টিবাদের অন্তর্ভুক্ত। এখন গুরুত্ব অনুসারে এই মতবাদগুলি সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হইতেছে।

নৈরাজ্যবাদ (Anarchism) : রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করিয়া নৈরাজ্যবাদিগণ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে সকল সমস্যার সমাধান করিতে চান। ইঁহাদের মতে, আধুনিক রাষ্ট্র দুর্নীতির আশ্রয়স্থল এবং নিষ্পেষণের যন্ত্রমাত্র। ইহা শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত হয়। সুতরাং ইহার বিলোপসাধন দ্বারা ব্যক্তিগত উদ্যোগ, উৎসাহ বা সম্ভাবনাকে মুক্ত করিতে হইবে। বিলোপসাধনের পর রাষ্ট্রের স্থানাধিকার করিবে কতকগুলি সংঘ যাহাতে মানুষ স্বেচ্ছায় যোগদান করিবে এবং স্বেচ্ছায় যাহাদের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে পারিবে।

নৈরাজ্যবাদ উনবিংশ শতাব্দীর মতবাদ। এই সময় সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ—এই দুইটি মতবাদই বিশেষ প্রবল ছিল। নৈরাজ্যবাদ উভয়েরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। ব্যক্তিগত আচরণ ও উদ্যোগের স্বাধীনতা কিন্তু

ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির বিলোপ হইল নৈরাজ্যবাদের আদর্শ। ইহার মধ্যে প্রথমটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং দ্বিতীয়টি সমাজতন্ত্রবাদ হইতে আহৃত।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (The Individualistic Theory) : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দুইটি পর্যায় আছে—উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ইহাদের মধ্যে পুরাতন বা উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হইল প্রকৃতপক্ষে সংঘস্বাতন্ত্র্যবাদ।

যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের গণ্ডি সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করিয়া আসিয়াছিল তাহাকে রাষ্ট্রের দিক হইতে অবাধ নীতি বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (*Laissez Faire*) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই নীতি বা মতবাদের মূল বক্তব্য হইল, যে সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে তাহাই শ্রেষ্ঠ। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ইহার আদর্শ ছিল রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে সংকীর্ণতম গণ্ডির মধ্যে আনয়ন করা। জন ষ্টুয়ার্ট মিল এই আদর্শকে তাঁহার স্বাধীনতাসংক্রান্ত গ্রন্থে (On Liberty) সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই মানুষ অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সুতরাং একমাত্র অপরের ক্ষতিসাধন হইতে বিরত করিবার উদ্দেশ্যেই সভ্য সমাজের কোন ব্যক্তির উপর বলপ্রয়োগ করা যাইতে পারে—তাহার নিজের মংগলসাধনের জন্য নহে। "নিজের উপর, নিজ দেহ ও চিত্তের উপর মানুষ হইল সার্বভৌম।"* সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য হইল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ। হার্বার্ট স্পেনসারের ভাষায় বলা যায় যে, ব্যক্তির একটিমাত্র অধিকার আছে—ইহা হইল অপর সকলের সহিত সমান স্বাধীনতার অধিকার এবং রাষ্ট্রের মাত্র একটি কর্তব্য আছে—ইহা হইল ব্যক্তির এই অধিকারকে সংরক্ষণের কর্তব্য।** ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ বা একমাত্র কর্তব্যপালনের জন্য রাষ্ট্র মাত্র দুইটি কার্য সম্পাদন করিবে—(১) রাষ্ট্রাভ্যন্তরে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা; এবং (২) ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বহিরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষা। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য হইল মাত্র রক্ষাকার্য; এবং এইরূপ রাষ্ট্রকে পুলিসী রাষ্ট্র (Police State) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা নীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কর্তব্য

অবাধ নীতি বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে নানাদিক দিয়া সমর্থন করা হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তিই তাহার নিজের ভালমন্দ সম্যকভাবে বুঝিতে পারে। সুতরাং তাহারা তাহাদের কল্যাণের সহায়ক কার্যাবলী যেভাবে সম্পাদন করিবে রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন :
১। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে

* "Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign."

** "The individual has but one right, the right of equal freedom with everybody else, and the State has but one duty, the duty of protecting that right..."

জীববিজ্ঞানের দিক হইতে যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যোগ্যতমেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া দুর্বলকে রক্ষা করার চেষ্টা অযৌক্তিক। উপরন্তু, ইহা অন্যায়ও বটে। ইহাতে সমাজ-জীবনের ক্ষতি হয়। প্রাণীর মত সমাজের স্বাস্থ্যও কতকগুলি নিয়মপালনের উপর নির্ভর করে। এই নিয়মাবলীর মধ্যে অন্যতম হইল যে, প্রত্যেক অংশ নিজ কার্য সম্পাদন করিবে মাত্র। রাষ্ট্রের কার্য হইল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকের কার্য করা। ইহার উপরে রাষ্ট্র যদি আর কোন কার্য সম্পাদন করিতে যায় তবে তাহা দ্বারা সমাজের ক্ষতিসাধনই করে। সবল ও যোগ্য ব্যক্তিকে দলিত করিয়া রাষ্ট্র যদি দুর্বল অযোগ্যকে রক্ষা করে তবে সুষ্ঠু সমাজ-জীবন কখনই গড়িয়া উঠিতে পারে না।

২। জীববিজ্ঞানের দিক হইতে

অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থন করা হইয়াছে এইভাবে যে, ইহার ফলে যেরূপ অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে তাহাতে ভোগ্যদ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হয়। সমাজের দিক দিয়া অর্থ-ব্যবস্থার এই দুইটি দিকই বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্য নীতি অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া সম্পূর্ণভাবে কাম্য।

৩। অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতে

অভিজ্ঞতা হইতে ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে জাতীয় জীবন অনেক সময় বিপর্যস্ত হইয়াছে। সরকারী নীতি অধিকাংশ সময় অপরিবর্তিত থাকে না; এই নীতি পরিবর্তনের ফল সকল সময় শুভময় হয় না। আবার সরকার বিভিন্ন নীতি লইয়া পরীক্ষা চালায়। ইহার ফলেও সাধারণ জীবন হইয়া উঠে ব্যতিব্যস্ত। অধিকন্তু, রাষ্ট্রীয় পরিচালনা বলিতে বুঝায় আমলাতান্ত্রিক যান্ত্রিক পরিচালনা। ইহাতে সময় ও অর্থের অপব্যয় হয়; কার্যও সুপরিচালিত হয় না।

৪। অভিজ্ঞতা হইতে

সমালোচনা: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তিনটি প্রধান ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত—যথা, (ক) প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভালমন্দ বুঝিবার সমান ক্ষমতা ও সমান দূরদৃষ্টি আছে; (খ) প্রত্যেকেই যাহা চায় তাহা পাইবার জন্য প্রত্যেকেরই অপর সকলের ন্যায় সমান ক্ষমতা ও সমান স্বাধীনতা আছে; এবং (গ) সকল ব্যক্তির অভাবপূরণের অর্থই হইল সম্প্রদায়ের সামগ্রিক কল্যাণসাধন। জোডের (**C. E. M. Joad**) মতে, এই তিনটি ধারণাই ভ্রান্ত। অবাধ প্রতিযোগিতা তখনই সুফল প্রসব করে যখন সকলেরই দরাদরির সমান ক্ষমতা থাকে। শ্রমিক নিয়োগকর্তার সহিত দরাদরি করিয়া কখনই শ্রমের উচিত মূল্য আদায় করিতে পারে না। সুতরাং অবাধ নীতির অধীনে শ্রমিকের দরাদরির স্বাধীনতা অনাহারে থাকিবার স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ স্বাধীনতাকে যুক্তি দিয়া, নীতি

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের তিনটি প্রধান ধারণা

জোডের মতে তিনটি ধারণাই ভ্রান্ত

দিয়া, আদর্শ দিয়া কখনই সমর্থন করিতে পারা যায় না। অতএব রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল নিয়োগকর্তার স্বাধীনতা খর্ব করিয়া প্রতিযোগিতাকে নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।

দ্বিতীয়ত, জোড়ের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, মানুষ অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় অন্ধভাবে অগ্রসর হয়। সুতরাং অনেক সময় এরূপ ফল দেখা যায় যাহা ব্যক্তি বা সমাজ কাহারও পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। আপ্পাদোরাই (A. Appadorai) ইহার একটি উদাহরণ দিয়াছেন। যদি কোন ব্যাংক সম্বন্ধে জনশ্রুতি রটিয়া যায় যে, ঐ ব্যাংক হইতে অনেকেই টাকা তুলিয়া লইতেছে তখন অধিকাংশেই টাকা তুলিয়া লইবার চেষ্টা করে এবং ফলে ব্যাংকটির পতন ঘনাইয়া আসে—যদিও ব্যক্তি বা সমাজ কেহই চাহে না যে ব্যাংকটির পতন ঘটুক। এইরূপ অন্ধ অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইল রাষ্ট্রের। ব্যক্তির অজ্ঞতা ও স্বার্থপ্রণোদিত কাজকর্মের ত্রুটির প্রতিবিধান করিয়া রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই মংগলসাধন করে। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণের ধারণা যে, রাষ্ট্র অমংগলকর প্রতিষ্ঠান—তাহা ভুল। অত্যধিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অমংগলকর হইতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা আছে।

মানুষের অন্ধ অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টাকে আলোর পথে লইয়া যাইবার জন্য প্রয়োজন হইল রাষ্ট্রের

উপসংহার : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গুণগুলিও উপেক্ষণীয় নহে। ইহা ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা দেয়, তাহাকে উদ্যোগী করিয়া তুলে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, অত্যধিক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব (paternalism) এবং অত্যধিক রাষ্ট্রীয় সহায়তা (maternalism) উভয়ই কাম্য নহে। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যে ভূমিকা রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ভূমিকা রহিয়াছে

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Modern Individualism) : ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে সমষ্টিবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ক্রমশ প্রসারিত হইতে থাকে। অপরদিকে আবার রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে উদ্ভূত নূতন দার্শনিক মতবাদ—আদর্শবাদও (Idealistic Theory) রাষ্ট্রকার্যবৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।* উভয় কারণে ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়া পড়িলে বিপরীত দিক দিয়াও—অর্থাৎ, রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। এই শেষোক্ত প্রতিক্রিয়াই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নামে অভিহিত।

রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (reaction against reaction) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।** ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার

ইহা হইল প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

* ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা দেখ।

** "The reaction against individualism has produced a reaction on its own turn." Joad

ফলে হয় রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বৃদ্ধি ; আবার ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে হয় আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম।

উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষণ ঃ

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভবের উপরি-উক্ত কারণকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ঃ

প্রথমত, আদর্শবাদের বিরোধিতা ক্রমশ প্রকাশ পাইতে থাকে। আদর্শবাদ অনুসারে রাষ্ট্র এক অতিমানবীয় সংস্থা। ইহার সার্থকতা আপনার মধ্যেই নিহিত। ইহা মানুষের স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও চূড়ান্ত সংগঠন। ইহা কোন অন্যায় করিতে পারে না। সুতরাং অন্ধভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

১। আদর্শবাদের বিরোধিতা

আদর্শবাদের প্রভাবে সমাজ-জীবনের সমগ্র কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সংঘ ও ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র ব্যক্তির যথাসর্বস্ব দাবি করিতে থাকে ; শান্তির সময়েও নিত্যনূতন আইনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সংঘের জীবনে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। উপরন্তু, আদর্শবাদ যুদ্ধের পূজারী। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে, যুদ্ধপ্রবণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধ্বংসকারক রাষ্ট্রকে ব্যক্তি পূজা করিবে কেন? উহার ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইবে কোন্ যুক্তিতে?

দ্বিতীয়ত দেখা যায়, সমষ্টিগত জীবনে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইলেও ব্যক্তিগত জীবন হইতে রাষ্ট্র ক্রমশ দূরে সরিয়া গিয়াছে। বর্তমানে ব্যক্তি একমাত্র রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কিত নহে, সে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘের মধ্য দিয়াও নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। পরিবারের ন্যায় রাষ্ট্র তাহার পক্ষে আবশ্যিক সংগঠন বটে, কিন্তু সে স্বেচ্ছায় অন্যান্য সংগঠনের সভ্যপদভুক্ত হয়। সুতরাং এই মতবাদ প্রচার করা হয় যে, একমাত্র রাষ্ট্রই ব্যক্তির আনুগত্য দাবি করিতে পারে না ; অন্যান্য সংঘেরও অনুরূপ দাবি রহিয়াছে।

২। সংঘস্বাতন্ত্র্যের দাবি

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি জনমত নামক নিষ্পেষণ-যন্ত্র হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে চায়। এ-ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় এরূপ এক রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের যাহা (ক) আইনগত সার্বভৌমিকতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট সমর্পণে বাধাপ্রদান করিবে, এবং (খ) কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রিকরণের ব্যবস্থা করিয়া ব্যক্তিকে জনতার হাত হইতে রক্ষা করিবে।

৩। সংখ্যাগরিষ্ঠের হাত হইতে ব্যক্তিকে রক্ষার প্রয়াস

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ব্যাখ্যা ও প্রচারোদ্দেশ্যে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে অন্তত দুইখানির উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহারা হইল নরম্যান এঞ্জেলের (Norman Angell) 'দি গ্রেট ইলিউশন' (The Great Illusion) এবং গ্রাহাম ওয়ালাসের (Graham Wallas) 'গ্রেট সোসাইটি' (Great Society)।

রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্যে আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ

এঞ্জেলের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, মানুষ বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতেই সমচেতনা লাভ করে এবং এই সকল অর্থনৈতিক স্বার্থকে অনেক সময় রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইতে এবং রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করিতে দেখা যায়। সুতরাং ব্যক্তিকে প্রধানত নাগরিক হিসাবে দেখা এক বিরাট ভ্রান্তি (a great illusion)। মূলত ব্যক্তি অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য; এবং ফলে জাতীয় রাষ্ট্রকে—যাহা ব্যক্তিকে নাগরিক হিসাবেই দেখে—এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ আন্তর্জাতিক সংগঠনের সৃষ্টি হইলে রাষ্ট্রকার্য হ্রাস পাইবে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা।

গ্রাহাম ওয়ালাস বলিতে চাহিয়াছেন যে, সমষ্টিবাদ অনুসারে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সমষ্টিগত চেতনা (collective mind); কিন্তু বর্তমানের প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা এই সমষ্টিগত চেতনার সৃষ্টি করিতে পারে না। বর্তমানে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে নির্বাচনে 'জনমতের' প্রকৃত প্রতিফলন সম্ভব হয় না। উপরন্তু, নির্বাচনের পর ব্যবস্থাপক সভার উপর জনসাধারণের আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

সুতরাং ওয়ালাসের মত হইল, নির্বাচকমণ্ডলীকে পেশাগত ভিত্তিতে কয়েকটি সংঘে (groups) বিভক্ত করিতে হইবে; এবং ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় পরিষদ সম্পূর্ণভাবে এই সংঘসমূহের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত হইবে। নিম্নতন পরিষদ অবশ্য বর্তমানের মত ভৌগোলিক ভিত্তিতে হইতে পারে। এইভাবে ওয়ালাস ব্যক্তিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন:

আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপরি-উক্ত আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে উহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যাইতে পারে:

(ক) আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হেগেলীয় ও সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রের বিরোধী;

(খ) ইহা সংঘস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী;

(গ) ইহা রাষ্ট্রকে সার্বভৌম শক্তির একমাত্র অধিকারী হিসাবে না দেখিয়া 'যুক্তসংঘ' (a federation of groups) হিসাবেই দেখে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আলোচনার সূচনাতেই বলা হইয়াছে যে, এই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নহে; ইহা সংঘস্বাতন্ত্র্যবাদ।*

উপসংহারে বলা যায়, আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনেকাংশে বহুত্ববাদেরই প্রতিলিপি। যে-যুগে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও বিশেষ স্বার্থের মধ্যে ব্যক্তির আনুগত্য লইয়া সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় সেই যুগেই এইরূপ মতবাদের উদ্ভব হয়। বর্তমানে বিশেষ বিশেষ স্বার্থ ও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের মধ্যে সম্বন্ধ একপ্রকার নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। সংঘসমূহের অস্তিত্ব ও কর্মক্ষেত্র স্বীকৃত হইয়াছে সত্য কিন্তু যুদ্ধ, প্রতিরক্ষা, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরোধিতাও অতীতের অন্তর্ভুক্ত

উপসংহার

* "The New Individualism differs from the old in regarding the group and not the individual as its unit for political purposes." Joad

হইয়া গিয়াছে। ফলে বহুত্ববাদের ন্যায় আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদও ঐতিহাসিক মতবাদে পরিণত হইয়াছে।

***সমষ্টিবাদ* (Collectivism) :** সমষ্টিবাদ অনুসারে সমষ্টির কর্তৃত্বই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নহে। সুতরাং প্রয়োজনমত রাষ্ট্রকার্যের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইবে, ব্যক্তি-জীবনকে সমষ্টিগত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনয়ন করিতে হইবে।

সমষ্টিবাদ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) : সমাজতন্ত্রবাদ একাধারে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব ও আন্দোলন। ইহা অন্যতম অর্থ নৈতিক তত্ত্ব হিসাবেও গণ্য। সমাজতন্ত্রবাদ উৎপাদনের মালিকানা রাষ্ট্রের অধীনে আনিয়া রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে চায়। সমাজতন্ত্রবাদিগণও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহাদের ধারণা যে, অবাধ প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানেই এই স্বাধীনতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা বলিতে সমাজতন্ত্রবাদিগণ যথেচ্ছচারের ক্ষমতা বুঝেন না, বুঝেন দৈনন্দিন অভাবঅভিযোগ হইতে মুক্তি, সকলের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সুযোগসুবিধা।

সমাজতন্ত্রবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

স্বাচ্ছন্দ্য নীতির অধীনে অর্থ-ব্যবস্থা যে ধনতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করে তাহার প্রতিবাদস্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম। ধনতন্ত্রের অধীনে উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নির্দেশে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় সমাজের পক্ষে অনেক বিষময় ফল পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, পুঁজিপতি একমাত্র মুনাফার লোভেই উৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় অথচ তাহাতে পুঁজিপতির মুনাফার সম্ভাবনা নাই এরূপ দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় না। অপরদিকে, সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর কিন্তু তাহাতে পুঁজিপতির মুনাফার সম্ভাবনা বিশেষমাত্রায় বর্তমান এরূপ দ্রব্যাদিই উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদিত দ্রব্যাদির বণ্টন সামাজিক মংগলের দিক হইতে করা হয় না। করা হয় পুঁজিপতির স্বার্থের দিক হইতে; কারণ তাহার নির্দেশেই বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ফলে শ্রমিক তাহার শ্রমের উপযুক্ত মজুরি পায় না; তাহার কর্মশক্তিকে নিয়োগ করিবার উপযুক্ত সুযোগসুবিধাও পায় না। এইভাবে ধনিক সম্প্রদায় ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তির কর্মশক্তির অপচয় ঘটিতে থাকে। তৃতীয়ত, ধনতন্ত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা বলিয়া কিছুই নাই। বেকারাবস্থা, অর্ধাহার ও অনাহারের ভয় তাহার সর্বদাই রহিয়াছে। চতুর্থত, এই সকল কারণে সর্বদাই সংঘাত বর্তমান রহিয়াছে মালিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে উৎপাদনের

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম

ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার বিষময় ফলসমূহ

উপকরণসমূহ হইতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপসাধন করিয়া ব্যক্তিগত মুনাফার লোভ দূর করিলেই কাম্য অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে এক বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থাও বুঝায়

সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে অবশ্য শুধু কাম্য অর্থ-ব্যবস্থাই বুঝায় না, কাম্য সমাজ-ব্যবস্থাও বুঝায়। এরূপ সমাজ শ্রেণীহীন ও বর্ণহীন এবং ইহাতে সকলেরই দায়িত্ব রহিয়াছে নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুসারে পরস্পরকে সহায়তা করিবার।

কোলের মতে, সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

কোলের (G. D. H. Cole) মতে, সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে চারিটি অপরিহার্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয় বুঝায়ঃ (ক) শ্রেণীহীন, বর্ণহীন, সমাজের পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধন; (খ) এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা যেখানে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান নাই; (গ) সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন-উপাদানের মালিকানা সাধারণের; এবং (ঘ) সকল নাগরিকের উপর নিজের শক্তিসামর্থ্য অনুসারে ন্যস্ত দায়িত্ব।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা বর্তমানে সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে সমাজতন্ত্রবাদের আর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়। ইহা হইল কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নির্দেশে উৎপাদনের উৎসসমূহ এইভাবে ব্যবহৃত হয় যাহাতে সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

***সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ* (Forms of Socialism):** সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিগুলি সম্পর্কে সকলে একরূপ একমত হইলেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার রূপ, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকৃতি এবং উপলব্ধির পদ্ধতি সম্পর্কে সমর্থকগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে সমাজতন্ত্রবাদও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। জোড বলেন, সমাজতন্ত্রকে এরূপ একটি টুপির সহিত তুলনা করা চলে যাহা সকলেই পরিধান করে বলিয়া গঠন হারাইয়া ফেলিয়াছে।*

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ গ্রহণের কারণ

প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার রূপ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সমভোগবাদ (Communism) এবং যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism) রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করিতে চায়; অপরদিকে কিন্তু রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism) এবং সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism) রাষ্ট্রকে বজায় রাখিয়া সর্বাধিক কল্যাণসাধন করিতে চায়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রধানত রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতেই সমাজতন্ত্রকে দেখে। অপরদিকে সমভোগবাদ ও যৌথব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে সমাজতন্ত্র

* "Socialism....is like a hat that has lost its shape because everybody wears it."

প্রতিষ্ঠার দ্বারা মূলত অর্থনৈতিক বিপ্লবই আনয়ন করা হয়। তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দুইটি পদ্ধতির নির্দেশ করা হয়—বিবর্তন ও বিপ্লব। বিবর্তন পদ্ধতির পক্ষপাতী হইল রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ বা সমষ্টিবাদ* এবং সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ; অপরদিকে বৈপ্লবিক পন্থায় বিশ্বাসী হইল সমভোগবাদ এবং যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ। নিম্নে সমাজতন্ত্রবাদের এই চারিটি রূপ—যথা, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, সমভোগবাদ এবং যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা হইতেছে।

রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism)ঃ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ নিয়মতান্ত্রিক বিবর্তনমূলক পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া সামাজিক সাম্য ও সর্বাধিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের এইরূপ প্রসার চায় না; চায় সমাজে ন্যায় ও প্রকৃত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ইংল্যাণ্ডের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদিগণের (Fabian Socialists) মতবাদ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ফেবিয়ান মতবাদ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ

ফেবিয়ান মতবাদ অনুসারে ফেবিয়াস (Fabius) যেমন হ্যানিবলের (Hannibal) বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুদিন ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া ঠিক সময়মত আঘাত করিয়াছিলেন, সমাজতন্ত্রাকাংক্ষীকেও তেমনি ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিয়া সময়মত আঘাত করিতে হইবে। অর্থাৎ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের পদ্ধতি গ্রহণ করা চলিবে না; ধীরে ধীরে বিবর্তন-পদ্ধতিতে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করিয়া ইহা আনয়ন করিতে হইবে।

ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদের বর্ণনা

ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা নানাদিকে ত্রুটিপূর্ণ। ইহা বহুর বেদনায় রচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মাত্র কয়েকজনকে ভোগ করিতে দেয়। ইহা সাধারণের সম্মুখে বর্তমান রাখিয়াছে আগামী কালের ভাবনা এবং তাহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে অর্থনৈতিক দাসত্ব বন্ধনে; ইহা সৃষ্টি করিয়াছে প্রাচুর্যের মাঝে কৃত্রিম অভাবঅনটনের।

অতএব, এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে উক্ত ত্রুটিগুলি দূরীভূত হইয়া সুযোগের সাম্য (equality of opportunity) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন হইল উৎপাদনের উপকরণসমূহের রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। বলা হইয়াছে যে, ধীরে ধীরে বিবর্তন-পদ্ধতিতে পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে। প্রথমে অতি সামান্যভাবে আরম্ভ করা প্রয়োজন। ন্যূনতম মজুরি,

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাধ্যমেই এ-কার্য সম্পাদন করিতে হইবে

* 'সমষ্টিবাদ' শব্দটি সমষ্টিগত কর্তৃত্ব ছাড়াও সমাজতন্ত্রবাদের একটি বিশেষ রূপ—রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়।

বেকারাবস্থা, বার্ধক্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, অধিকতর গতিশীল কর-পদ্ধতি, জনসেবামূলক কার্যাদি (public utility services) এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রভৃতি লইয়া আরম্ভ করা যাইতে পারে। তারপর অবশ্য সমস্ত জমি ও শিল্পগত মূলধনের জাতীয়করণ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে আবার বিরতিবিহীন প্রচারকার্যের মাধ্যমে সমাজকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া চলিতে হইবে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও বজায় থাকিবে

সংক্ষেপে বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাধ্যমেই এই বিরাট সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করা ফেবিয়ানদের লক্ষ্য। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বজায় থাকে সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে উৎপাদন ও বণ্টন কার্য পরিচালনা করিবার জন্য।

সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism) : সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিমূল অধিকার করিয়া থাকিবে শিল্পসংঘগুলি

শিল্পসংঘ ও শ্রমিকসংঘ

(Trade Guilds)। এই শিল্পসংঘ বর্তমান শ্রমিকসংঘেরই (Trade Unions) পরিবর্তিত রূপ। প্রথমত, সকল শ্রেণীর শ্রমিকই—সাধারণ শ্রমিক, এঞ্জিনিয়ার, পরিচালক—শিল্পসংঘের অন্তর্ভুক্ত, বর্তমানের মত মাত্র সাধারণ শ্রমিক নহে। দ্বিতীয়ত, শিল্পসংঘের উদ্দেশ্য হইল সংশ্লিষ্ট শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা, শ্রমিকসংঘের মত মাত্র সুযোগসুবিধা আদায় করা নহে। সুতরাং শিল্পসংঘ ও শ্রমিকসংঘের মধ্যে পার্থক্য হইল গঠন ও উদ্দেশ্যগত। তবুও বর্তমানের শ্রমিক সংঘগুলিই ভবিষ্যতের শিল্পসংঘে পরিণত হইবে এবং এই শ্রমিকসংঘগুলির মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।*

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদীরা অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদীদের সহিত একমত। কিন্তু ইঁহাদের মতে, এই সকল ত্রুটির মধ্যে দুইটি

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটির প্রথমটি রাষ্ট্রনৈতিক এবং দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক। রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইঁহারা বলেন যে, আঞ্চলিক নির্বাচন এলাকার (territorial constituency) ভিত্তিতে গঠিত আইনসভা কখনই প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে না। একজন ডাক্তার অপর একজন ডাক্তারের প্রতিনিধি হইতে পারে, উকিল উকিলের হইতে পারে, চাষী চাষীর হইতে পারে কিন্তু পেশাগত সম্পর্কবিহীন রাম শ্যামের প্রতিনিধি হইতে পারে না। সুতরাং পেশার ভিত্তিতেই আইনসভাসমূহকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এইরূপ যখন করা হইবে তখনই আইনসভাসমূহ সার্থক হইয়া উঠিবে। কারণ, তখনই আইনসভাসমূহে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হইবে। কোলের ভাষায় বলা যায়, জাতীয় জীবনে যতগুলি পৃথক কার্য থাকিবে আইনসভায়ও ততগুলি সংঘের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। উপরন্তু, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন যে রাষ্ট্র অন্যতম সংঘ মাত্র,

* "The Trade Unions of today will become the Guilds of tomorrow ;" and... "the Trade Unions are the organizations by means of which the actual transition is to be accomplished." Joad

একমাত্র সংঘ নহে। এই কারণে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সংকুচিত করিয়া সংঘসমূহকে স্বাতন্ত্র্যপ্রদান করিতে হইবে।

অর্থনৈতিক দিক হইতে বলা হয় যে, বর্তমানের মজুরি-ব্যবস্থা (wage system) সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্যায়।

শ্রমিক তাহার পরিশ্রমের পরিবর্তে কেবলমাত্র মজুরি পাইবে ইহা কোনমতে সমর্থনীয় নহে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য শ্রমিককে শিল্প-পরিচালনার ভারও দিতে হইবে।

সংঘমূলক সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের রূপ

পেশাগত ভিত্তিতে আইনসভা সংগঠিত হইলে এবং সকল শ্রেণীর শ্রমিক শিল্প-পরিচালনা ভার গ্রহণ করিলে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে তাহার রূপ এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

(ক) প্রত্যেক শিল্পে একটি করিয়া সংঘ থাকিবে—যথা, বস্ত্রশিল্প সংঘ, ইস্পাতশিল্প সংঘ ইত্যাদি। (খ) এই সকল সংঘ সমাজের হইয়া সংশ্লিষ্ট শিল্পের পরিচালনা করিবে। (গ) প্রত্যেক ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে একটি করিয়া ভোগ্যপণ্য-ক্রেতা পরিষদ (Consumers' Council) থাকিবে। এই সকল পরিষদ শিল্পসংঘ-গুলির মধ্যে পরামর্শ দ্বারা ভোগ্যপণ্যের মূল্য, বণ্টন ইত্যাদি নির্ধারিত হইবে। (ঘ) পেশাগত ভিত্তিতে সংগঠিত আইনসভা প্রতিরক্ষা, করধার্য প্রভৃতি সাধারণ কার্য সম্পাদন করিবে। (ঙ) আঞ্চলিক সংস্থাগুলি আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

প্রধানত, বিবর্তন-পদ্ধতিতেই এই প্রকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হইবে; তবে একান্ত প্রয়োজন হইলে বিপ্লবের সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উপসংহার

সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ হিসাবে ইহার মূল্য রহিয়াছে। কিন্তু পেশাগত প্রতিনিধিত্বের উপর ইহা যে আস্থা স্থাপন করিয়াছে তাহা সমর্থিত হয় নাই। অন্যতম আধুনিক রাষ্ট্রনীতিবিদগণ ইহাকে অলীক ও ভ্রান্ত নীতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যাহার ফলে সংঘর্ষ, বিশৃংখলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই কারণে ল্যাস্কির মতে, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত আইনসভাসমূহই কাম্য।

পেশাগত প্রতিনিধিত্বের ত্রুটি

দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের প্রকৃতির উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহা ভ্রান্ত। সুতরাং সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদের ব্যবহারিক মূল্য নাই বলিলেও চলে।

যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism) : যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদিগণ শ্রমিক সংঘগুলির মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক সংগ্রামের (direct economic action) পক্ষপাতী। ইহারা সমভোগবাদিগণের সহিত এ-বিষয়ে একমত যে, ধনতন্ত্রকে বজায় রাখিবার জন্যই রাষ্ট্রশক্তি প্রযুক্ত হয়। সুতরাং যৌথ

ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণের মতে, এই রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের বিলোপসাধন করা প্রয়োজন। পন্থা হিসাবে তাঁহারা দেশের প্রধান প্রধান শিল্পে ধর্মঘট নাশকতামূলক কার্যকলাপ (sabotage) ইত্যাদির নির্দেশ করেন। এই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হইবে এবং রাষ্ট্রের অবসান ঘটিবে।

রাষ্ট্রের অবসান ঘটিলে শ্রমিক সংঘগুলি সমাজের সম্মতিক্রমে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিচালনভার গ্রহণ করিবে। তাহার পর সমগ্র শ্রমিক সংঘগুলি মিলিয়া একটি শ্রমিক-সমবায় (Confederation of Labour) গঠন করিবে এবং ইহা রেলপথ, ডাক বিভাগ, মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কার্য সম্পাদন করিবে। এই শ্রমিক-সমবায় ও আঞ্চলিক শ্রমিক সংঘগুলি শ্রমিক ও দেশের জনসাধারণের অপরাংশের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবে।

সংঘমূলক ও যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে পার্থক্য

সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism) ও যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদের (Syndicalism) মধ্যে কতকাংশে মিল থাকিলেও উভয়ের মধ্যে মূল পার্থক্যকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না। পার্থক্যটি হইল যে সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করিতে চায় কিন্তু যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ চায় রাষ্ট্রের বিলুপ্তি।

সমভোগবাদ (Communism): রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ এবং সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করিতে চাহে না। সমভোগবাদ কিন্তু তাহাই চায়। সমভোগবাদিগণের মতে, রাষ্ট্র শক্তিপ্রয়োগের বাস্তব প্রতিষ্ঠান। ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখাই ইহার প্রধান কার্য। ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিলে ক্রমশ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও ফুরাইবে। সুতরাং তখন ইহা বিলুপ্তও হইবে। অবশ্য, ধনতান্ত্রিক যুগের পরই রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে না। ধনতন্ত্রের পর আসে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র আনয়ন করে সর্বহারার বিপ্লব (Proletarian Revolution)। সমাজতান্ত্রিক যুগে পূর্বেকার পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থভোগীর দল আবার নানারূপ কলাকৌশলে পূর্বতন সমাজ-ব্যবস্থাকে ফিরাইয়া আনিতে চায়। ইহাদের বাধা দিবার জন্যই সমাজতান্ত্রিক যুগে প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তির। তারপর সমাজতন্ত্রের অধীনে অর্থ-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে থাকিলে একদিন এরূপ অবস্থা আসিবে যাহাতে প্রত্যেক মানুষ তাহার সামর্থ্যমত কার্য করিবে এবং প্রত্যেকে তাহার প্রয়োজনমত ভোগ্যদ্রব্যাদি পাইবে। সকলে তখন সর্বাধিক সামাজিক মংগলসাধনের জন্য আনন্দসহকারেই কার্য করিবে—কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনের মজুরি উপার্জনের জন্য নয়। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র অপ্রয়োজনীয় হওয়ায় ইহা বিলুপ্ত হইবে the state will wither away) এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে সমভোগবাদী সমাজ-ব্যবস্থা (communistic society)।*

পূর্ণ সমভোগবাদী সমাজে রাষ্ট্রের স্থান নাই

* এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 'শাসন-ব্যবস্থায়' সোবিয়েত ইউনিয়নের শাসন-ব্যবস্থা আলোচনা প্রসংগে সমভোগবাদ বা কমিউনিজম সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইয়াছে।

উপসংহার ঃ উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই ধারণা সহজেই করা যাইবে যে, সমাজতন্ত্রবাদের সকল রূপই 'রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের' বৃদ্ধি সমর্থন করে না। বরং রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদিগণ ছাড়া সমাজতন্ত্রবাদের অন্যান্য সমর্থক হয় রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করিতে চান, না-হয় রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করিতে চান। তবে সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপের মধ্যে এই দিক দিয়া মিল রহিয়াছে যে, ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা কোনমতেই দেওয়া যাইতে পারে না। সমাজের সর্বাংগীণ ও সর্বাধিক মংগলের জন্য ব্যক্তিকে হয় রাষ্ট্রের না-হয় সমাজের কর্তৃত্বাধীনে আসিতেই হইবে। সুতরাং রাষ্ট্র পশ্চাতে সরিয়া গেলে তাহার স্থানাধিকার করে সমাজ; এবং সমাজের কার্য পরিচালনার জন্য যে-সংগঠন থাকে তাহার কর্মক্ষেত্র কোনমতে গণ্ডি দিয়া নির্ধারিত নয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমাজতন্ত্রবাদের মতে হয় রাষ্ট্রকে না-হয় অন্য কোন সামাজিক সংগঠনকে মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহার বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকের কার্য করিতে হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদের সকল রূপই হয় রাষ্ট্রীয় না-হয় সামাজিক কর্তৃত্বের অনুপন্থী

সমাজতন্ত্রবাদের মূল্য নির্ধারণ (An Estimate of Socialism): সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অধীনে উদ্ভূত ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিক্রিয়া। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি—যথা, বৈষম্য, দারিদ্র্য, নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতির যে বিলোপসাধন প্রয়োজন সে-বিষয়ে সমাজতন্ত্রবাদীদের সহিত সকলে একরূপ একমত। সমাজতন্ত্রবাদ বলে ঃ সুন্দর জীবন সম্ভব করিতে হইলে অর্থনৈতিক ভিত্তিকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে; দুর্বলকে সবলের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে; অবাধ প্রতিযোগিতার স্থলে স্থাপন করিতে হইবে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা।

অপরদিকে, সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচকেরা প্রধানত দুইটি প্রশ্ন করেন—যথা, ইহা কি সম্ভব? এবং ইহা কি কাম্য? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন যে, সমাজতন্ত্রবাদের অধীনে রাষ্ট্রের কার্য এত বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে যে, তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং এই শ্রেণীর সমালোচকের মতে, সমাজতন্ত্রবাদিগণ রাষ্ট্রশক্তির কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে অযৌক্তিকভাবে ধারণা পোষণ করেন। দ্বিতীয়ত বলা হয়, মানুষের প্রকৃতি অনুশীলনে সমাজতন্ত্রবাদিগণ বিশেষ ভুল করিয়াছেন। মানুষ সমাজের জন্য আনন্দসহকারে কাজ করিতে চায় না—ব্যক্তিগত মংগলের জন্যই চায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। প্লেটোর সমভোগবাদের (Communism) সমালোচনা করিতে গিয়া এ্যারিষ্টটল বলিয়াছিলেন যে, ইহা অস্বাভাবিক—কারণ, সামাজিক কল্যাণের দায়িত্ব সকলেরই বলিয়া এ-দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে কাহারও নহে। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃত্ব চাহিদা ও যোগানের সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন করিতে পারিবে না—এ-ধারণাও প্রচার করা হয়।

ইহা কি সম্ভব ?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সমালোচকগণ সমাজতন্ত্রবাদের অন্যান্য দোষ-ত্রুটির নির্দেশ করেন—যথা, রাষ্ট্র সর্বদাই মন্থর গতিতে ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্য করে; রাষ্ট্র কর্তৃক

পরিচালনা বলিতে বুঝায় সরকার কর্তৃক পরিচালনা এবং সরকার সাধারণ মানুষ লইয়াই গঠিত হয়—ফলে রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীনে উৎকোচ, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য দুর্নীতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে; মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ কখনই শুভফল প্রসব করিতে পারে না; ইত্যাদি। আরও বলা হয়, সমাজতন্ত্রের অর্থ হইল দাসত্ব। সমাজতন্ত্রের অধীনে সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের ক্রীতদাসে পরিণত হয়।*

ইহা কি কাম্য?

পরিশেষে, মার্কিন লেখক জেমস্ বার্ণহাম** এই অভিযোগ করিয়াছেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা শ্রেণীহীন (classless) সমাজ-ব্যবস্থা নয়। ইহার অধীনে পুঁজিপতিশ্রেণী বিলুপ্ত হইয়া এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী হইল পরিচালক-শ্রেণী (the managerial class)। পরিচালকবর্গের পারিশ্রমিক সাধারণ শ্রমিক হইতে অনেক অধিক এবং সমগ্র রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা ইঁহাদের করতলগত থাকে। ফলে সমাজতন্ত্রের অধীনে ধীরে ধীরে, সমগ্র রাষ্ট্র ইঁহাদের সম্পত্তিতে (property) পরিণত হয়। সুতরাং পুঁজিপতিগণের স্থলাধিকার করে এক নূতন শাসকগোষ্ঠী (a new ruling class)। বার্ণহামের মতে, সোবিয়েত ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে এইরূপই ঘটিয়াছে।

নূতন শাসকগোষ্ঠীর উদ্ভব

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত চিরাচরিত সমালোচনা পিগুর (Prof. A. C. Pigou) ন্যায় অনেক অর্থবিদ্যাবিদ গ্রহণ করেন নাই। মানুষ মুনাফার লোভ ছাড়াও অন্যান্য কারণে আনন্দসহকারে কর্মসম্পাদন করিতে পারে। খেলোয়াড়ের অধিকাংশ সময় কোন মুনাফার লোভ নাই; কিন্তু সে তাহার কৃতিত্ব প্রদর্শনে কখনই বিশেষ কার্পণ্য করে না। তেমনি সমাজতন্ত্রবাদের অধীনে যদি এই খেলোয়াড়ী মনোভাব (*sport motif*) জন্মগ্রহণ করে তবে ব্যক্তির পক্ষে সমাজের জন্য আনন্দসহকারে কাজ না করিবার কোনই হেতু নাই। উপরন্তু, সমাজতন্ত্রবাদ কোনরূপ অপরিবর্তনীয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়। প্রয়োজনবোধে ইহার পরিবর্তনসাধন করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সকল বিষয়ই যে একমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হইবে এমন কোন কথা নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচালনভার সংঘের অধীনেও দেওয়া যাইতে পারে। সংঘের অধীনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের ক্ষেত্র থাকে। পরিচালকশ্রেণীর উদ্ভব সম্বন্ধে অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন যোগ্য প্রত্যুত্তর সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচকেরা দিতে পারেন নাই।

অর্থবিদ্যাবিদগণ কর্তৃক সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনার উত্তর

---

* "Each member of the community as an individual would be a slave of the community as a whole." Spencer

** J. Burnham, The Managerial Revolution

মধ্যপন্থা অবলম্বনকারিগণ বলেন, চরম সমাজতন্ত্রবাদ কাম্য কি না সে-বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত এখনই প্রকাশ করা উচিত নয়। এ-বিষয়ে যে পরীক্ষা বর্তমানে চলিতেছে তাহার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন। তবে বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র যে কতকাংশে সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় ইঁহাদের মতে, রাষ্ট্রের প্রকৃত মতবাদ হইবে একাধারে সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ভিত্তিক।* আধুনিককালে অধিকাংশ রাষ্ট্র যে এই মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছে তাহার আলোচনা সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বেই করা হইয়াছে।

বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়ই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি লইয়া দার্শনিকগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। এই কারণে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধেও মতৈক্য পরিলক্ষিত হয় না। রাষ্ট্রকে যাঁহারা কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করেন তাঁহারা উহার কর্মক্ষেত্র বিস্তারের পক্ষপাতী; অপরদিকে যাহারা রাষ্ট্রকে অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখেন তাঁহারা উহার কর্মক্ষেত্রকে যথাসম্ভব সংকুচিত করিতে চান। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে উক্ত মতবিরোধের জন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও বিশেষ মতানৈক্য রহিয়াছে; তবুও বলা যায়, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সামগ্রিক কল্যাণসাধন। কিন্তু কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র সামগ্রিক কল্যাণসাধন করিতে পারে সে-বিষয়েও দার্শনিকগণের মধ্যে মতৈক্য নাই।

রাষ্ট্রকার্যের ঐতিহাসিক পরিক্রমা : প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন ছিল বলিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ সীমাহীন। প্রাচীন রোমে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র কিছুটা সংকুচিত হয়। মধ্যযুগে এই সংকোচন বৃদ্ধি পাইলেও মধ্যযুগের পর রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র আবার প্রসারলাভ করিতে থাকে; এবং রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায় সকলের অভিভাবক। ক্রমে অভিভাবক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলে জন্মগ্রহণ করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কিছুটা পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি নির্ধারণ করিত; কিন্তু তারপর ইহার বিষময় ফলের জন্য সুরু হইল ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধিতার ফলে উদ্ভব হয় সমষ্টিবাদের।

বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদ হইল প্রধানত তিনটি (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, (খ) সমষ্টিবাদ, (গ) সমাজ-কল্যাণ মতবাদ। ইহাদের মধ্যে সমাজ-কল্যাণ মতবাদ প্রথম দুইটি মতবাদের মধ্যে মীমাংসারই ফল। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই সমাজ-কল্যাণ মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের কর্মক্ষেত্রের গণ্ডি নির্ধারণ করিয়াছে।

সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী : সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণসাধন করিবার উদ্দেশ্যে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র যে যে কার্য সম্পাদন করে তাহাদিগকে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যাইতে পারে : (১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা; (২) সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্য; (৩) পরিবার

* "....a true theory of the State must be socialistic and individualistic at once." M'Kechnie, The State and the Individual

সংক্রান্ত কার্য ; (৪) অধিকার ও তৎসংক্রান্ত কার্য ; (৫) শিল্পবাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য ; (৬) কৃষি সংক্রান্ত কার্য ; (৭) বন্টন সংক্রান্ত কার্য ; এবং (৮) অন্যান্য কার্য।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য ভারত অন্যতম সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী যে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কারণ হইল—(১) শিল্পবিপ্লব, (২) একচেটিয়া কারবার প্রভৃতির উদ্ভব, (৩) ভোটাধিকারের প্রসার, (৪) বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধ, এবং (৫) সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসার।

রাষ্ট্রের কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ : যে-কোন রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) অপরিহার্য, (২) ইচ্ছাধীন। অপরিহার্য কার্য বা কর্তব্য হইল সেগুলি যাহা রাষ্ট্রকে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য সম্পাদন করিতে হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি রাষ্ট্রকর্তৃত্বের নির্দেশক আবার কতকগুলি ব্যক্তি অধিকারের পরিচায়ক। ইচ্ছাধীন কার্য সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক উভয়ই হইতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক কার্যাবলীর মধ্যে সীমারেখা অতি অস্পষ্ট।

রাষ্ট্রকার্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ : রাষ্ট্রকার্য সম্বন্ধে মতবাদ প্রধানত তিনটি : (ক) নৈরাজ্যবাদ, (খ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, এবং (গ) সমষ্টিবাদ। ইহাদের মধ্যে সমষ্টিবাদ বর্তমানে সমাজতন্ত্রবাদের রূপেই প্রকাশিত। সমাজতন্ত্রবাদেরও অবশ্য বিভিন্ন রূপ আছে—যথা, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, সমভোগবাদ এবং যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ।

নৈরাজ্যবাদ : নৈরাজ্যবাদ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণের সমস্যাসমাধানকল্পে রাষ্ট্রকেই বিলুপ্ত করিতে চায়। সমাজতন্ত্রবাদীদের মত নৈরাজ্যবাদিগণ রাষ্ট্রকর্তৃত্বে অবিশ্বাসী, অপরদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অনুপ্রেরণায় তাহারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে আস্থাবান। নৈরাজ্যবাদিগণের মতে, রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইলে উহার স্থানাধিকার করিবে কতকগুলি স্বেচ্ছা-প্রতিষ্ঠিত সংঘ ; এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীনভাবেই ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দুইটি রূপ আছে—পুরাতন ও আধুনিক। পুরাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বলিতে বুঝায় উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ হিসাবে জন ষ্টুয়ার্ট মিল এবং হার্বার্ট স্পেনসারই ইহাকে বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত করেন। মিলের মতে, সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা হইবে অব্যাহত। সুতরাং একমাত্র আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যক্তি অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে। "নিজের উপর, নিজ দেহ ও চিত্তের উপর মানুষ হইল সার্বভৌম"। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য হইল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা অধিকারের সংরক্ষণ। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র মাত্র দুইটি কার্য সম্পাদন করিবে—(১) দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা করিবে, (২) বহিরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবে। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য হইবে পুলিসের ন্যায় রক্ষাকার্য মাত্র। এইরূপ রাষ্ট্রকে পুলিসী রাষ্ট্র বলা হয়।

এইরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে (১) মনস্তত্ত্বের দিক হইতে, (২) জীববিজ্ঞানের দিক হইতে, (৩) অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতে, এবং (৪) অভিজ্ঞতা হইতে সমর্থন করা হইয়াছে।

সমালোচনা : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যে তিনটি প্রধান ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সমালোচকগণের মতে তাহাদের প্রত্যেকটিই ভ্রান্ত। সকলেরই ভালমন্দ বুঝিবার সমান দুরদৃষ্টি এবং সকলেরই সমান ক্ষমতা ও সমান স্বাধীনতা থাকে না ; এবং সকল ব্যক্তির অভাবপূরণের অর্থই সামগ্রিক কল্যাণ-

সাধন নয়। বস্তুত, সমাজে সকলে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন নয় বলিয়া এবং মানুষ অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় অন্ধভাবে অগ্রসর হয় বলিয়া প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের।

উপসংহার : অত্যধিক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বও কিন্তু কাম্য নহে ; সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কিছুটা মূল্য রহিয়াছে।

আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ : আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে 'প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া' বলিয়া অভিহিত করা হয়। (১) আদর্শবাদের বিরোধিতা, (২) সংঘস্বাতন্ত্র্যের দাবি, (৩) সংখ্যাগরিষ্ঠের হাত হইতে ব্যক্তিকে রক্ষার প্রয়াসে উদ্ভূত সাম্প্রতিককালের সংঘস্বাতন্ত্র্যবাদকেই 'আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। নরম্যান এঞ্জেলের 'দি গ্রেট ইলিউসন' এবং গ্রাহাম ওয়ালাসের 'গ্রেট সোসাইটি'—এই দুইখানি গ্রন্থই বিশেষভাবে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ব্যাখ্যাও প্রচার করে।

বলা হইয়াছে, আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রকৃতপক্ষে সংঘস্বাতন্ত্র্যবাদ। ইহাকে বহুত্ববাদের প্রতিলিপি বলিয়াও গণ্য করা চলে।

সমষ্টিবাদ : সমষ্টিবাদ ব্যক্তি-জীবনকে সমষ্টিগত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনিতে চায়। বলা হইয়াছে যে, ইহা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে এবং তন্মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজতন্ত্রবাদ : ইহা একদিকে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব ও আন্দোলন। ইহা অন্যতম অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসাবেও গণ্য। সমাজতন্ত্রবাদ উৎপাদন-উপাদানের মালিকানা রাষ্ট্রের অধীনে আনিয়া রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে চায়। সমাজতন্ত্রবাদিগণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ; কিন্তু স্বাধীনতা বলিতে তাঁহারা যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা না বুঝিয়া বুঝেন দৈনন্দিন অভাবঅভিযোগ হইতে মুক্তি, সকলের বিকাশের উপযোগী সুযোগসুবিধা।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে উদ্ভূত ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম।

সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে অর্থ-ব্যবস্থা ছাড়াও এক বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থা বুঝায়। এইরূপ সমাজে (১) ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য নাই ; (২) সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধন রহিয়াছে ; (৩) প্রত্যেকেরই উপর নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে সমাজ-কল্যাণের দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে ; এবং (৪) সমস্ত উৎপাদন-উপাদানের মালিকানা হইল সাধারণের।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃত্বের অধীনে সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকেও সমাজতন্ত্রের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ : সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপগ্রহণের কারণ হইল সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা আনয়নের পদ্ধতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবিরোধ।

১। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ : ইহা বিবর্তনমূলক পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী। ইহা সমাজে ন্যায় ও প্রকৃত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিতে চায়। ফেবিয়ান মতবাদ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

২। সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ : ইহাও বিবর্তন-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিমূল অধিকার করিয়া থাকিবে শিল্পসংঘগুলি। অপরদিকে ভোগ্যপণ্যক্রেতা পরিষদও থাকিবে। উভয়ে মিলিয়া ভোগ্যপণ্যের মূল্য, বণ্টন প্রভৃতি নির্ধারণ

করিবে ; এবং পেশাগত ভিত্তিতে সংগঠিত আইনসভা প্রতিরক্ষা, করধার্য প্রভৃতি সাধারণ কার্য সম্পাদন করিবে।

সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদের দুইটি প্রধান ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় প্রথমত পেশার ভিত্তিতে গঠিত আইনসভা কাম্য নহে ; এবং দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে ইহা মানুষের প্রকৃতির উপর অযৌক্তিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে।

সংঘ লক সমাজতন্ত্রবাদের বিশেষ কোন ব্যবহারিক মূল্য নাই।

৩। সমভোগবাদ : সমভোগবাদ বা কমিউনিজম বৈপ্লবিক পন্থার সাহায্যে বর্ণহীন, শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে চায়। পূর্ণ সমভোগবাদী সমাজে রাষ্ট্রের স্থান নাই।

৪। যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ : সমাজতন্ত্রবাদের এই রূপ শ্রমিক সংঘগুলির মাধ্যমে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ অথ নৈতিক সংগ্রামের পক্ষপাতী। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সাধিত হইলে শমিক সংঘগুলি মিলিয়া একটি শ্রমিক-সমবায় গঠন করিবে এবং এই সমবায় রেলপথ, ডাকবিভাগ, মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

সমাজতন্ত্রবাদের মূল্য নির্ধারণ : সমাজতন্ত্রবাদ ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রশ্ন হইল—(১) ইহা কি সম্ভব? (২) ইহা কি কাম্য? অনেকে ইহাকে সম্ভব নয় বলিয়াই মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে, (১) রাষ্ট্রশক্তির কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রবাদিগণ অযথা উচ্চাশা পোষণ করেন ; (২) সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ; (৩) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃত্ব চাহিদা ও যোগানের সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন করিতে পারে না।

বলা হয় যে, রাষ্ট্র সর্বদা মন্থরগতি ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে বলিয়া, রাষ্ট্র সাধারণ মানুষকে লইয়াই গঠিত হয় বলিয়া সমাজতন্ত্রবাদ কাম্যও নহে। উপরন্তু, সমাজতন্ত্রবাদের অধীনে এক নূতন শাসকগোষ্ঠীর উদ্ভব হইতে দেখা যায়।

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সকলগুলি ইহার সমর্থকরা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে, সমাজতন্ত্রবাদ কোন দুষ্পরিবর্তনীয় ব্যবস্থা নয়। প্রয়োজনবোধে ইহার পরিবর্তনসাধন দ্বারা ইহাকে কার্যকর ও কাম্য করিয়া তোলা যাইতে পারে।

বর্তমানে সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উভয় মতবাদই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss various theories of the end and purpose of the State.

(C. U. 1952) (৩৬৫-৩৬৭ পৃষ্ঠা)

2. What, in your opinion, should be the proper sphere of the State? Give reasons for your answer.

(C. U. 1950, '55, '61)

[ইংগিত : রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি লইয়া বহু মতবাদ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে অবশ্য দুইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—যথা, সমষ্টিবাদ (Collectivism) এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)। সমষ্টিবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের কোন সীমা নির্ধারণ করা হইবে না—সমষ্টির কল্যাণে রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করিবে। অপরদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের কার্যাবলী হইবে সংখ্যার ন্যূনতম—রক্ষামূলক মাত্র।

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্র এই দুই মতবাদের মধ্যে একটা বুঝাপড়া করিয়া লইয়া তাহাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি নির্ধারণ করিয়াছে। এই সকল রাষ্ট্র সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র (Social-welfare

States) নামে অভিহিত। ইহারা সমষ্টি বা সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যতটা প্রয়োজন রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি ততটাই প্রসারিত করিয়াছে। মনে হয়, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি এইভাবেই নির্ধারিত হওয়া উচিত।

এই প্রসংগে ম্যাকেক্‌নির (M'Kechnie) উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি একাধারে সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদভিত্তিক ধারণা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।··· এবং ৩৭৫-৩৭৬, ৩৮১-৩৮২ ও ৩৮৭-৩৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

3. Examine the functions of government, carefully distinguishing between those which are essential and those which are optional. (B. U. 1961)

[ইংগিত: বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য কার্য হইল সেইগুলি যেগুলির সম্পাদন সার্বভৌম-শক্তির অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্রকে সম্পাদন করিতেই হইবে: যেমন, প্রতিরক্ষা, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা, ইত্যাদি। অপরদিকে সামাজিক কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে-সকল কার্য সম্পাদন করে তাহাদিগকেই ইচ্ছাধীন কার্য বলা হয়।··· এবং ৩৬৯-৩৭২, ৩৭৩-৩৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।]

4. Write notes on: (a) Anarchism; (b) Guild Socialism; (c) Syndicalism.
(৩৭৫-৩৭৬; ৩৮৪-৩৮৫; ৩৮৫-৩৮৬ পৃষ্ঠা)

5. Distinguish between territorial representation and functional representation. Which of them would you recommend, and why? (C. U. 1960)
(৩৩০-৩৩৩ এবং ৩৮৪-৩৮৫ পৃষ্ঠা)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

অতিজাতীয় আন্দোলন ও সভ্যতার সংকট
(SUPER-NATIONAL MOVEMENTS AND CRISIS IN CIVILIZATION)

অতিজাতীয় আন্দোলন (Super-national Movements): সুদূর অতীতকাল হইতেই মানুষ বিশ্ব-সংগঠন, বিশ্ব-শান্তি ও বিশ্ব-ঐক্যের সন্ধান করিয়া আসিতেছে।* শান্তিবাদী ও আদর্শবাদিগণ এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন যেখানে যুদ্ধ থাকিবে না, যেখানে সকল রাষ্ট্র মিলিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে এবং যেখানে অপার শান্তি ও অপূর্ব সমৃদ্ধি বিরাজ করিবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা আন্তর্জাতিক আইন, কূটনীতি ও বিচারনিষ্পত্তির মাধ্যমে শান্তিরক্ষা বিষয়ে নানা তত্ত্ব প্রচার করিয়া আসিতেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে আবার আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, যানবাহন ও আদান-প্রদানের সুযোগসুবিধার উন্নতিসাধন প্রভৃতির ফলে বহুপ্রকারের সাধারণ আন্তর্জাতিক সমস্যা আসিয়াও দেখা দিতে থাকে। ইহাদের সমাধানকল্পে রাষ্ট্রনেতৃগণ বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়িয়া তুলিতে একপ্রকার বাধ্য হন। এইভাবে একদিকে আদর্শবাদীদের তত্ত্ব এবং অপরদিকে বাস্তব অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমবিকাশে সহায়তা

নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন

আন্তর্জাতিক সমস্যা-সমূহের সমাধানের প্রচেষ্টা

---

* "All nations shall beat their swords into ploughshares, and their spears into pruning-hooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more." Isaiah ii, 4

করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (The League of Nations) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) প্রতিষ্ঠায় অভিজ্ঞতা ও তত্ত্ব উভয়ই প্রেরণা যোগাইয়াছে।

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, রোমক সাম্রাজ্য ও মধ্যযুগের বিশ্ব-ঐক্যের কল্পনা* চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের সংগে সংগে অন্তর্হিত হয়। যে-পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী ঐক্যের আদর্শ প্রচলিত ছিল সে-পর্যন্ত সত্যকারের আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় নাই। মহাকবি দান্তে (Dante) যে বিশ্ব-সংগঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও ছিল সাম্রাজ্যের আদর্শ।** তাঁহার সমসাময়িক লেখক পিরে দুবুই (Pierre Dubois) অধিকতর বাস্তব দৃষ্টিভংগি লইয়া সমস্যাটিকে দেখিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের রাজন্যবর্গকে লইয়া একটি সংঘ গঠনের প্রস্তাব করেন; এবং আন্তর্জাতিক সালিসী ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে সুপারিশ করেন। তিনি অতিজাতীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে বলবৎ করিবার জন্য অর্থনৈতিক অসহযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন।

বিশ্ব-সংগঠনের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা: দান্তে

পিরে দুবুই

সপ্তদশ শতাব্দীতে এমেরিক ক্রুচে (Emeric Cruce) বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। এই সংঘ আলাপ-আলোচনা ও সালিশীর মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ও শান্তিরক্ষা করিবে। ১৬৩৪ সালে সালির (Sully) লেখায় ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরীর এক মহান্ পরিকল্পনার (a Great Design) কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইয়োরোপকে ১৫টি শক্তির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে এবং ইহাদের লইয়া গঠিত এক সাধারণ সভার (a General Council) হস্তে আইন ও শাসনের সার্বভৌম দায়িত্ব থাকিবে। কোন রাষ্ট্র যুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাহার বিরুদ্ধে সমবেতভাবে আক্রমণ চালাইতে হইবে।

এমেরিক ক্রুচে ও সালি

১৬৯৩ সালে উইলিয়াম পেন (William Penn) আইনের শাসন ও বিরোধ-মীমাংসার জন্য রাজন্যবর্গকে লইয়া গঠিত এক সংসদের প্রস্তাব করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক গ্রোটিয়াসের (Grotius) নামও এই প্রসংগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি নিয়মকানুন রচনা করেন। কিন্তু ঐ নিয়মগুলি বলবৎ করিবার জন্য কোন সংগঠনের কথা উল্লেখ করেন নাই।

উইলিয়াম পেন

গ্রোটিয়াস

* "My city and country, so far as I am Antonius is Rome, but so far as I am a man, is the world." Marcus Aurelius

** Dante, De Monarchia

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবে সেণ্ট পিরে (Abbe' Saint Pierre) স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ৩৯টি রাষ্ট্র লইয়া একটি সমবায় গঠনের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে রুশো ১৭৬১ সালে মত প্রকাশ করেন যে, ইয়োরোপে রাষ্ট্র-সমবায় গঠন ভিন্ন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না। বেন্থাম (Jeremy Bentham) তাঁহার 'আন্তর্জাতিক আইনের নীতি' (Principles of International Law) নামক পুস্তকে রুশোর উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেন।

আবে সেণ্ট পিরে

রুশো ও বেন্থাম

ইহার পর ইমানুয়েল কান্তের কথা উল্লেখ করিতে হয়। তিনি ১৭৯৫ সালে স্থায়ী শান্তি সম্পর্কে এক রচনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন মানবজাতির সম্মুখে প্রধান সমস্যা হইল এমন এক সুসভ্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করা যেখানে আইনানুযায়ী অধিকার নির্ধারিত হইবে; এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধের কারণসমূহকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রগুলির বহিঃসম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কান্ত

এ-পর্যন্ত যে-সকল পরিকল্পনার উল্লেখ করা হইল তাহাদের সম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ঐগুলি হয় আদর্শবাদী চিন্তাবিদগণের কল্পনাপ্রসূত না-হয় কোন জাতি বা স্বৈরাচারী নৃপতির প্রাধান্য বা শক্তি প্রসারকল্পে প্রণীত। উপরন্তু, এই সময় অধিকাংশ দেশের লোকের দৃষ্টি আপন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সীমার বাহিরে প্রসারিত হয় নাই। ফলে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এই সমস্ত কারণে রাষ্ট্রনেতৃগণের মনে ঐ সমস্ত পরিকল্পনা বিশেষ কোন সাড়া জাগাইতে পারে নাই এবং কার্যক্ষেত্রেও উহারা ফলপ্রসূ হয় নাই।

উপরি-উক্ত পরিকল্পনা-সমূহের প্রকৃতি

কিন্তু সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে মানুষের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন আসিল। উনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া আমরা অবস্থান্তর দেখিতে পাই। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দ এখন আর আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রশ্নকে নির্লিপ্তভাবে এড়াইয়া যাইতে পারিলেন না। একদিকে 'পবিত্র মৈত্রী' (The Holy Alliance) এবং 'ইয়োরোপের কনসার্টে'র (The Concert of Europe) মত কূটনৈতিক সংগঠন গঠিত হয়; অপরদিকে আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়নের (The International Postal Union) মত একাধিক সমাজমূলক প্রতিষ্ঠান বিবর্তিত হয়। ১৮১৫ সালে রুশ জারের (The Tsar) উদ্যোগে রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে পবিত্র মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়। এই মৈত্রী-সমবায়ের চুক্তির দ্বারা তিনটি রাজ্যের রাজা ন্যায়, শান্তি ইত্যাদি পবিত্র ধর্মের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত এবং সৌভ্রাত্রের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। অপরাপর শক্তি এই সমস্ত নীতিকে মানিয়া লইলে তাহাদের মৈত্রী-সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইত। শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইলেও

উনবিংশ শতাব্দী

পবিত্র মৈত্রী ও 'ইয়োরোপের কনসার্ট'

পবিত্র মৈত্রীর স্বরূপ

এই মৈত্রীচুক্তির আসল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলির সংরক্ষণ। এই মৈত্রী-সমবায় বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই, কারণ শক্তিসমূহ চুক্তি অনুযায়ী কার্য করিতে পারে নাই। মৈত্রী-সমবায়ের বিলুপ্তির পর ইয়োরোপের প্রধান প্রধান শক্তি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া চলিবার প্রথা প্রবর্তিত করে। ইহাই 'ইয়োরোপের কনসার্ট' নামে পরিচিত। রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং ব্রিটেন নিজেদের সাধারণ স্বার্থ এবং ইয়োরোপের শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহ মিলিতভাবে বিচার-বিবেচনা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কিন্তু জাতীয় মনোভাব এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সদস্যদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয় এবং ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর 'ইয়োরোপের কনসার্ট' অকার্যকর হইয়া পড়ে।

'ইয়োরোপের কনসার্ট'র প্রকৃতি

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমী শক্তিগুলি সহযোগিতা করিতে না পারিলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে উহারা সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। রেল, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, বৈদেশিক ভ্রমণ, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদির অভূতপূর্ব প্রসারের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে আর বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব হইল না। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্মিলিত ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হইয়া পড়িল; ফলে আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান, স্বাস্থ্য, ব্যবসায় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বিশেষ সফলতার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন; সাধারণ স্বার্থের খাতিরে ইহারা উপরি-উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সমরাস্ত্র, উপনিবেশ, অনুন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সুবিধাভোগ, শুল্ক, নিরাপত্তা, রাজ্যের সীমানা, ইত্যাদি প্রশ্ন সম্বন্ধে দৃষ্টিভংগির সমতার এখনও সন্ধান পাওয়া যায় না। এবং পরস্পর নির্ভরশীল জগতে সার্বভৌমিকতা আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বা নিয়ন্ত্রণকে কোন প্রকারে মানিয়া লইতে পারিতেছে না।

রাষ্ট্রনৈতিক ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংঘের প্রতিষ্ঠা ও ইহাদের সফলতা

কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতাও ইহার কারণ

অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালের অতিজাতীয় আন্দোলন সম্পর্কিত ঘটনার মধ্যে 'হেগ সম্মেলনে'র (The Hague Conference) কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৯ সালে হেগ সহরে রুশ সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী ২৬টি রাষ্ট্রের একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয় এবং ৪৪টি রাষ্ট্র উহাতে যোগদান করে। এই দুই সম্মেলন বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই; তবে আন্তর্জাতিক বিবাদ-মীমাংসার জন্য এক স্থায়ী আন্তর্জাতিক সালিসী আদালত (The Permanent Court of Arbitration) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানকে 'আদালত' কিংবা 'স্থায়ী'

হেগ সম্মেলন

স্থায়ী আন্তর্জাতিক সালিসী আদালত

বলিয়া বর্ণনা করা ভুল। আসলে স্বাক্ষরকারী শক্তিসমূহ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হয়। যখন কোন বিবাদ-মীমাংসার প্রয়োজন দেখা দিত তখন সালিসীর জন্য ঐ তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সালিসীদের (arbitrators) নিযুক্ত করা হইত।

এই আদালতের প্রকৃতি

জাতিসংঘ **(The League of Nations)ঃ** অতিজাতীয়তার স্বপ্ন সফল করিবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার দ্বারা। মিত্রশক্তির জাতিসমূহ বিশ্বশান্তি রক্ষাকল্পে স্থায়ী এক বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯১৯ সালে শান্তিবৈঠকের অন্যতম কার্য হয় এক বিশ্বসংঘের প্রতিষ্ঠা। প্রেসিডেণ্ট উইলসন, দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল স্মাটস্, ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার তাঁহাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন। এই সমস্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে জাতিসংঘের নিয়মপত্র প্রণীত হয় এবং উহা ১৯১৯ সালের ২৮শে এপ্রিল সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে গৃহীত হয়। জাতিসংঘের নিয়মপত্রকে ভার্সাই চুক্তির (The Treaty of Versailles) অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং জাতিসমূহের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারি জাতিসংঘ সরকারীভাবে প্রবর্তিত হয়।

অতিজাতীয়তার স্বপ্ন সফল করিবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা

আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের জন্ম

প্রথমে চুক্তি-স্বাক্ষরকারী মিত্র রাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশ জাতিসংঘের সদস্য হয়। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে প্রাথমিক সদস্যের সংখ্যা ৪০-এ দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে অন্যান্য মিত্রশক্তিদের সদস্য হইবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। জাতিসংঘের সভার (Assembly) দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে কোন রাষ্ট্রকে সদস্যভুক্ত করা যাইত। প্রথমদিকে জার্মেনী, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি পূর্বতন শত্রুরাষ্ট্রগুলিকে সদস্যপদ দেওয়া হয় না। ক্রমশ অধিকসংখ্যায় অন্যান্য রাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান করায় ১৯৩২ সালে সদস্যদের সংখ্যা হয় ৫৫। সোবিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৪ সালের পূর্বে সদস্যপদে গৃহীত হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান করিতে অস্বীকার করে। সদস্যপদ ত্যাগ বা উহার পরিসমাপ্তির পথও যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। প্রথমত, যে-কোন রাষ্ট্র সদস্যপদ ত্যাগের অভিপ্রায় জানাইয়া ২ বৎসরের নোটিশ দিলে জাতিসংঘের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে পারিত। অবশ্য সদস্যপদ ত্যাগের সময় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র তাহার আন্তর্জাতিক দায়িত্বসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকিলে তবেই তাহাকে সম্পর্ক ত্যাগ করিতে দেওয়া হইত। দ্বিতীয়ত, কোন সদস্য-রাষ্ট্র জাতিসংঘের চুক্তিপত্রের সর্ত ভংগ করিলে অন্য সদস্যরা সর্বসম্মত ভোটে ইহাকে সংঘ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিত। তৃতীয়ত, যথাযথভাবে গৃহীত জাতিসংঘের চুক্তিপত্রের কোন সংশোধনকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে ইহার সদস্যপদের পরিসমাপ্তি ঘটিত।

সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি

সদস্যপদ ত্যাগ বা উহার পরিসমাপ্তির পদ্ধতি

জাতিসংঘের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ইহা রাষ্ট্র বা অতিজাতীয় রাষ্ট্র ছিল না। সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমিকতা অক্ষুণ্ণই ছিল। স্বেচ্ছায় গৃহীত চুক্তিপত্রের সর্তাদি পালন ব্যতীত অন্য কোন দায়িত্ব সদস্যদের ছিল না। মোটকথা, জাতিসংঘ কতকগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্র লইয়া সংগঠিত সমিতি বা রাষ্ট্র-সমবায় ছিল। ইহার নিজস্ব কোন নাগরিক বা শক্তিপ্রয়োগের জন্য সৈন্য বাহিনী বা পুলিস বাহিনী ছিল না।

জাতিসংঘের প্রকৃতি

গঠন

জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রধান ছিল সভা (Assembly), পরিষদ (Council) এবং কর্মদপ্তর (Secretariat)।

সভা (Assembly): সকল সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিই জাতিসংঘের সদস্য ছিল। প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র তিনজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিত, কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোটপ্রদানের অধিকার ছিল। জাতিসংঘের চুক্তিপত্র অনুসারে সভা সংঘের এলাকাধীন অথবা বিশ্বশান্তি সংক্রান্ত যে-কোন বিষয় লইয়া বিচার-বিবেচনা করিতে পারিত। কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হইত উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের সর্বসম্মত ভোট। সভ্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের দ্বারা নূতন সদস্য নির্বাচিত হইত। ইহা আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের সাহায্যে সংঘের চুক্তিপত্র সংশোধন করিতে পারিত, কিন্তু উহা পরিষদ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হওয়ার প্রয়োজন হইত। সদস্য-রাষ্ট্ররা কোন সংশোধন গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল না; তবে এরূপ ক্ষেত্রে অসম্মত রাষ্ট্রকে সংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হইত। অন্যান্য কার্যের মধ্যে সভা আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন সাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার বিচার-বিবেচনা করিত, পরিষদের কার্যের তদারক করিত এবং জাতিসংঘের বাৎসরিক বাজেট নির্ধারণ করিত।

সভার ক্ষমতা, কার্য ইত্যাদি

পরিষদ (Council): জাতিসংঘের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল এই পরিষদ। প্রথমে স্থির করা হইয়াছিল যে পরিষদ ৯ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। ইহাদের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইবে স্থায়ী সদস্য এবং অপর ৪ জন সদস্য অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্য হইতে সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান না করায় একটি স্থায়ী আসন শূন্য পড়িয়া থাকে। ১৯২৬ সালে জাতিসংঘে যোগদান করিবার পর জার্মেনী ঐ আসনটি অধিকার করে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পরিষদে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সোবিয়েত ইউনিয়ন এই তিনটি রাষ্ট্র স্থায়ী সদস্য এবং অপরাপর ১১জন অস্থায়ী সদস্য থাকে।

পরিষদই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ

স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য

জাতিসংঘের সভার মত পরিষদও সংঘের এলাকাভুক্ত অথবা বিশ্বশান্তি সম্পর্কিত

যে-কোন বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করিতে সমর্থ ছিল। পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটপ্রদানের অধিকার ছিল ; এবং কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিতে হইত। আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ, নিরস্ত্রিকরণের পরিকল্পনা প্রণয়ন, সভার সুপারিশ-সমূহ কার্যকরকরণ ইত্যাদি পরিষদের কার্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কার্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা ছিল পরিষদের প্রধান দায়িত্ব। মধ্যস্থতা বা বিচারের মাধ্যমে কোন বিবাদের মীমাংসা না করা হইলে উহাকে পরিষদের নিকট পেশ করিতে হইত। মীমাংসায় অকৃতকার্য হইলে পরিষদ হয় সর্বসম্মতিক্রমে না-হয় সংখ্যাধিক্যের ভোটের সাহায্যে বিবাদ সংক্রান্ত তথ্য এবং সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট প্রকাশ করিত। বিবাদমান পক্ষ ব্যতীত অন্য সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে এবং বিবাদমান রাষ্ট্রের একপক্ষ পরিষদের সুপারিশসমূহকে মানিয়া লইলে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিবার অংগীকার জাতিসংঘের সদস্যরা করিতে পারিত। যে-ক্ষেত্রে রিপোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে প্রকাশিত হইত না সে-ক্ষেত্রে ন্যায় ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা করিবার অধিকার জাতিসংঘের সদস্যদের ছিল। জাতিসংঘের চুক্তিপত্র ভংগকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ সম্পর্কে সুপারিশ করিবার ক্ষমতা পরিষদের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

পরিষদের ক্ষমতা, কার্য ইত্যাদি

কর্মদপ্তর (Secretariat) ঃ জাতিসংঘের কর্ম পরিচালনা করিবার জন্য একটি স্থায়ী কর্মদপ্তর ছিল। এই দপ্তরের কার্য প্রধান কর্মসচিবের (Secretary-General) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। তিনি সভার সম্মতিক্রমে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার অধীনে প্রায় ৬০০ শতের মত অন্যান্য কর্মচারী ছিল। এই দপ্তরের কার্য ছিল সভা কিংবা পরিষদের আলোচ্য বিষয়ের কর্মসূচী প্রণয়ন, জাতিসংঘের দলিলপত্রাদি সংরক্ষণ, জাতিসংঘের কার্যকলাপ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা, ইত্যাদি।

প্রধান কর্মসচিব

সভা, পরিষদ এবং কর্মদপ্তর ব্যতীত জাতিসংঘের অন্যান্য সংগঠনও ছিল। ইহাদের মধ্যে জাতিসংঘের সহকারী সংস্থা আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের [International Labour Organisation (ILO)] নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতি-সংঘের সকল সদস্যই এই আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের সদস্য ছিল। বর্তমানে এই সংগঠন জাতিপুঞ্জের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র এক ধরনের শ্রম আইন প্রবর্তিত করা হইল আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের উদ্দেশ্য। ইহার মাধ্যমে সংগঠন শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতিসাধন এবং কর্মের ন্যায়োচিত সর্তাদি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলেই ইহা করা সম্ভব হয়। এইজন্য রাষ্ট্রসমূহের গ্রহণের জন্য সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহকে খসড়া-নিয়মপত্র আকারে প্রণীত করা হয়। তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সমর্থিত হইলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে নিয়মপত্র

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন

ভংগ করিবার পথে বিশেষ কোন বাধা নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের প্রকৃত সার্থকতা হইল যে ইহা শ্রম আইনের আলোচনা করিয়া উহার আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণের পথ সুগম করে। তদুপরি ইহা শ্রমিক সংক্রান্ত নানাপ্রকারের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়া থাকে।

স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত (Permanent Court of International Justice)ঃ জাতিসংঘের চুক্তিপত্র একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা করিবার দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত করে। পরিষদ ঐ উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালে আইন বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত এক কমিশন নিয়োগ করে। কমিশনের প্রস্তাবকে অল্পবিস্তর সংশোধন করিয়া জাতিসংঘ গ্রহণ করে। ১৯৩০ সালের পর হইতে এই আদালত ১৫ জন বিচারক লইয়া গঠিত হয়। ইহাদের কার্যকালের মেয়াদ ছিল ৯ বৎসর। বিচারকপদে প্রার্থিগণকে মনোনয়ন করিত হেগের স্থায়ী মীমাংসা-আদালতের জাতীয় দলগুলি এবং নির্বাচিত করিত জাতিসংঘের সভা ও পরিষদ। চুক্তির ব্যাখ্যা, আন্তর্জাতিক প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক দায়িত্বভংগ এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্বভংগের দরুন ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বিবাদের বিচার ইহার এলাকাভুক্ত ছিল।

বিচারপতিগণের কার্যকাল, নিয়োগ ইত্যাদি

এই আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘের অবিচ্ছেদ্য অংগ না হইলেও ইহা জাতিসংঘের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা (Failure of the League of Nations) ঃ

জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা রক্ষা এবং পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। জাতিসংঘ কিন্তু ইহা করিতে পারে নাই। অবশ্য অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইহা কতকটা সফলতা অর্জন করিতে পারিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইহা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক সহযোগিতার প্রসারসাধন, স্বাস্থ্য সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগ নিবারণের প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগ সম্পর্কে গবেষণা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা, আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বহু ক্ষেত্রে বিবাদের বিচার প্রভৃতি অনেক কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিয়াছিল।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় চরম ব্যর্থ তা কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে আংশিক সফলতা

কিন্তু প্রধান কর্মক্ষেত্রে—অর্থাৎ, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ ব্যাপারে জাতিসংঘের ইতিহাস হইল চরম ব্যর্থতার ইতিহাস। ১৯৩১ সালে জাপান যখন মাঞ্চুরিয়াকে আক্রমণ করিল তখন জাতিসংঘ আক্রমণের নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিল না। জাপান জাতিসংঘের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিয়া চীনের উপর অবাধে আক্রমণ চালাইতে থাকিল। এই ঘটনা ইতালী ও জার্মেনীর পক্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। ইতালী যখন ১৯৩৫ সালে ইথোপিয়াকে আক্রমণ করে

চরম ব্যর্থতার ইতিহাস

জাতিসংঘ বিশেষ কিছুই করিতে পারিল না। ইতালীর বিরুদ্ধে দ্বিধাগ্রস্তভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। ইহাতে বিশেষ সুফল ফলিল না। ইহার অন্যতম কারণ হইল যে, হোর এবং লাভাদের মত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের নেতারা মুসোলিনীর সহিত গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং আশ্বাস প্রদান করেন। আবার যখন ১৯৩৫ সালের পর জার্মেনী ভার্সাই চুক্তি এবং জাতিসংঘের চুক্তিপত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিল তখন জাতিসংঘ কেবল ঐ কার্যের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল। জার্মেনী ও ইতালী কর্তৃক স্পেনের প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসের ব্যাপারেও জাতিসংঘ গৃহযুদ্ধের অজুহাতে নিষ্ক্রিয় রহিল। ফলে ক্রমশই জাতিসংঘ নিষ্প্রাণ হইয়া যাইতে লাগিল। এক এক করিয়া জার্মেনীর ফ্যাসিষ্ট শক্তি অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ডকে একরকম বিনা বাধায় গ্রাস করিয়া লইল। এইভাবে জাতিসংঘের সমাধি রচিত হইল। ১৯৪০ সালের মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া যাইয়া জাতিসংঘ এক অতীত স্মৃতিতে পরিণত হইল। এখন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে নিম্নলিখিতগুলিই ছিল জাতিসংঘের ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

জাতিসংঘের সমাধি

(১) অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান না করায় সংঘ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদও অতি সহজে ত্যাগ করা যাইত। (২) ভার্সাই চুক্তি আক্রোশমূলক ছিল, এবং স্বভাবতই যাহাদের উপর উহা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। (৩) জাতিসংঘের বলপ্রয়োগের কোন সংস্থা ছিল না। সদস্য-রাষ্ট্রের সমরায়োজন সীমীত করিবার কোনও উপায় ছিল না। সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সমবায়ে গঠিত জাতিসংঘের এই দুর্বলতা থাকিতে বাধ্য। (৪) আবার এই জাতীয় সার্বভৌমিকতাকে আশ্রয় করিয়াই চলে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণী সার্বভৌমিকতাকে পরিহার করিয়া আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণকে সহ্য করিবে এরূপ আশা করা যায় না। ইহাই বোধ হয় জাতিসংঘের ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

ব্যর্থতার কারণসমূহ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) **:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতিসংঘের উদ্ভব হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা মহত্তর যুদ্ধের ফলে ঐ একই উদ্দেশ্যে উদ্ভব হইয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations)। অর্থাৎ, পৃথিবীকে যুদ্ধবিহীন করিবার উদ্দেশ্যে, পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হইয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্ভব

দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রথমাবস্থাতেই কয়েকটি মিত্রশক্তি ঘোষণা করে যে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে। মিত্রপক্ষীয় শক্তিসমূহের এই ঘোষণা ১৯৪১ সালের লণ্ডন ঘোষণা (**London Declaration of 1941**) নামে পরিচিত।

ঐ বৎসরই আটলান্টিক মহাসাগরের কোন স্থানে পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনার পর ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের বিখ্যাত আটলান্টিক সনদ ঘোষণা করেন। এই সনদে যুদ্ধোত্তর যুগে অন্যান্যের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' কথাটি প্রথম ব্যবহার করা হয় পরবর্তী বৎসরের সূচনায়। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন মিত্রশক্তি-স্বাক্ষরিত যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা (United Nations Declaration) প্রকাশ করা হয় তাহাতে আটলান্টিক সনদ কার্যকর করিবার নীতি সমর্থন করা হয়।

এ-পর্যন্ত অবশ্য বিশ্বসংঘ প্রতিষ্ঠার কোন উল্লেখ করা হয় নাই, জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হইলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় নাই। ইহা করা হয় মিত্রশক্তিসমূহের পরবর্তী চুক্তিতে যাহা 'মস্কৌ ঘোষণা' (Moscow Declaration, 1943) নামে পরিচিত। মস্কৌ ঘোষণায় বলা হয় যে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম সাম্যের ভিত্তিতে এক আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হইবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

পরবর্তী অধ্যায়গুলি এই সংগঠনের রূপদান করে। ইহার জন্য ওয়াশিংটনে ও ইয়াল্টায় মিত্রশক্তিসমূহের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চলে। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন তারিখে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের দ্বারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংবিধান গৃহীত হয়, এবং ঐ বৎসরের ২৪শে অক্টোবর তারিখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দেশ্য : সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিতে জাতিপুঞ্জ দৃঢ়সংকল্প।* এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রসমূহ সম্মিলিত হইয়াছে এবং তাহারা তাহাদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিবে। অর্থাৎ, শান্তিভংগকারী রাষ্ট্রকে সকলে সম্মিলিতভাবে শাস্তি দিবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের মীমাংসা করিবে। সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও স্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠা। সম্মিলিতভাবে

প্রাথমিক ও চরম লক্ষ্য

—অর্থাৎ, সকল রাষ্ট্রের দ্বারা প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার মাধ্যমে এই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় বলিয়া ইহাকে সামগ্রিক নিরাপত্তা (Collective Security) বলে।** অতএব, বলিতে পারা যায় যে সামগ্রিক নিরাপত্তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রাথমিক লক্ষ্য। পরোক্ষ চরম লক্ষ্য হইল বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা।

---

* "The peoples of the United Nations are determined to save succeeding generations from the scourge of war."

** "Collective Security implies the guarantee of peace and security of each state by all." Friedmann

সংবিধানে আরও কয়েকটি গৌণ উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হইয়াছে—যথা, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারা বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করা ; মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা ; জাতিসমূহের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা ; এবং পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করা।

গৌণ উদ্দেশ্য

যে-সকল গৌণ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হইল, আপাতদৃষ্টিতে তাহারা গৌণ হইলেও কার্যত তাহারা চরম লক্ষ্য বা 'বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠা'র সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধান না হইলে, পরাধীন জাতিগুলি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার না পাইলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের কল্পনা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের স্বপ্ন ছিল যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া, মানুষের অধিকারের প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া এবং সর্বোপরি সামগ্রিক নিরাপত্তার মধ্য দিয়া এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া উঠিবে। এই পৃথিবীতে জাতি থাকিলেও জাতি নাই ; রাষ্ট্র থাকিলেও রাষ্ট্র নাই। সকল জাতি ও রাষ্ট্র সহযোগিতা ও মৈত্রীর বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ ; সমগ্র মানবজাতি যেন এক পরিবার। এ এক নূতন পৃথিবী !

গৌণ উদ্দেশ্যগুলি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত

গঠন (Organization) : জার্মেনী ও জাপানের বিরুদ্ধে যে-মিত্রশক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল তাহাদের সকল সদস্যই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সদস্য। ভারতবর্ষও অন্যতম মূল সদস্য। স্বাধীনতার পর ভারত মূল সদস্যপদে আসীন রহিল। পাকিস্তান নূতন সদস্য হিসাবে জাতিপুঞ্জে গৃহীত হইল। মূল সদস্যগণ ব্যতিরেকেও যে-কোন রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। বর্তমানে (আগষ্ট, ১৯৬১) সদস্যসংখ্যা ৫১ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯৯-তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জাতিপুঞ্জ এক বিরাট সংগঠন ; ইহা নানাবিভাগে বিভক্ত। তবে মূল বিভাগ সংখ্যায় ছয়টি :

১। **সাধারণ সভা (General Assembly)** : ইহা জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য-রাষ্ট্র লইয়া গঠিত। ইহাতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মাত্র একটি করিয়া ভোটদানের ক্ষমতা আছে, যদিও প্রত্যেক রাষ্ট্রই পাঁচজন করিয়া সদস্য সাধারণ সভায় প্রেরণ করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধারণ সভায় সকল সদস্য-রাষ্ট্রকেই সমানাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। সভার নিয়মিত বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া থাকে। বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থাও আছে ; তবে উহা নিরাপত্তা পরিষদ কিংবা অধিকসংখ্যক সদস্যদের অনুরোধক্রমেই করা যায়। প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য একজন সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ সভা সংবিধানের অন্তর্গত যে-কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারে এবং যে-কোন সদস্য নিরাপত্তা পরিষদের নিকট

সাধারণ সভার গঠন ও অধিবেশন

সুপারিশ করিতে পারে। সভায় যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহা উপস্থিত ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক ভোটে করা হয়। তবে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হয়। যেমন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ সম্পর্কে সুপারিশ, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন, জাতিপুঞ্জে নূতন সদস্য গ্রহণ, কোন সদস্যকে বহিষ্করণ, বাজেট সংক্রান্ত প্রশ্ন, অনুন্নত দেশের তত্ত্বাবধান-ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্ন, ইত্যাদির বেলায় দ্বিতীয় পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষিত করিবার সাধারণ নীতিগুলি লইয়া বিচার-বিবেচনা করিতে সমর্থ। যে-কোন সদস্য কিংবা নিরাপত্তা পরিষদ কিংবা সদস্য নয় এমন যে-কোন রাষ্ট্র শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন সভার নিকট আলোচনার জন্য উপস্থিত করিতে পারে। শান্তি ও নিরাপত্তার কোন প্রশ্ন পরিষদের বিবেচনাধীন থাকিলে পরিষদের অনুরোধ ব্যতীত সেই সম্পর্কে সাধারণ সভা কোন সুপারিশ করিতে পারে না। কোন বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইলে সভাকে তাহা পরিষদের নিকট প্রেরণ করিতে হয়। অন্যান্য কার্যের মধ্যে সভা রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যাহাতে প্রসারলাভ করে, যাহাতে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হয় সেই উদ্দেশ্যে গবেষণা, পরিচালনা এবং সুপারিশ করে।

ভোটদান পদ্ধতি

সাধারণ সভার ক্ষমতা

এই প্রসংগে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণ সভা কোন আইন প্রণয়নকারী সংস্থা নয়; ইহা কূটনীতিবিদগণের সম্মেলন মাত্র।* সদস্যরা নানাবিষয় সম্বন্ধে আলোচনা, তর্কবিতর্ক ও ভোটপ্রদান করে; কিন্তু এমন কোন নিয়মকানুন প্রবর্তন করিতে পারে না যাহা বিভিন্ন রাষ্ট্র ও ইহাদের নাগরিকদের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত হইবে। সুতরাং যথার্থই ইহাকে 'বিশ্ব নাগরিক সভা' (town meeting of the world) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

সাধারণ সভার প্রকৃতি

২। নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council): নিরাপত্তা পরিষদই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রকৃত ভার ইহারই হস্তে ন্যস্ত। পরিষদ পাঁচ জন স্থায়ী ও ছয় জন অস্থায়ী সদস্য লইয়া গঠিত। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জাতীয়তাবাদী চীন। ছয় জন অস্থায়ী সদস্যের প্রত্যেকে সাধারণ সভা দ্বারা দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই কোন অস্থায়ী সদস্যকে পুনর্নির্বাচিত করা হয় না।

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন

* "The Assembly is no more a legislative body than any other conference of diplomats." Schuman

বিশ্বশান্তির রক্ষক বা অভিভাবক হিসাবে নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষা বিপন্ন হইতে পারে এমন অবস্থা বা বিবাদের উদ্ভব হইলে নিরাপত্তা পরিষদ তাহার অনুসন্ধান করে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে আলাপ-আলোচনা, সালিসী, বিচার ইত্যাদির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদের মীমাংসা করিতে বলে। পরিষদের যদি মনে হয় যে কোন বিবাদ চলিতে থাকিলে আন্তর্জাতিক শান্তিভংগ ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা আছে তাহা হইলে পরিষদ নিজেই মীমাংসার সর্তাদি সম্পর্কে সুপারিশ করিতে পারে। শান্তিভংগ হইয়াছে কিনা অথবা শান্তিভংগের আশংকা আছে কিনা অথবা আক্রমণ করা হইয়াছে কিনা এবং শান্তিভংগ হইলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে—এ-সমস্তই নির্ধারণ করে নিরাপত্তা পরিষদ।

নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্য

শান্তিভংগ হইলে যে-ব্যবস্থা পরিষদ অবলম্বন করিতে পারে তাহা হইল এইরূপ : সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রকে পরিষদ শান্তিবিপন্নকারী দেশের সহিত অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বলিতে পারে। এই ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত হইলে নিরাপত্তা পরিষদ উক্ত দেশের বিরুদ্ধে সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত বিমান, নৌ এবং স্থল বাহিনী প্রয়োগ করিতে পারে। এই সশস্ত্র বাহিনী নিরাপত্তা পরিষদের সামরিক কর্মচারী কমিটির (Military Staff Committee) দ্বারা পরিচালিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৪৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে সদস্য-রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তা পরিষদকে সামরিক বাহিনী দ্বারা সাহায্য প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবে কি পরিমাণ সাহায্য প্রদান করা হইবে তাহা বিশেষ বিশেষ চুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যগণের গুরুত্ব অধিক। প্রত্যেক সদস্যের মাত্র একটি করিয়া ভোট প্রদান করিবার অধিকার আছে। পদ্ধতিগত বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হয় সাতজন সদস্যের সম্মতিমূলক ভোট। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও সাতজন সদস্যের সম্মতিজ্ঞাপক ভোটেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কিন্তু সম্মতিজ্ঞাপক ভোটপ্রদানকারীদের মধ্যে অবশ্যই স্থায়ী সদস্যগণকে থাকিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে—যেমন, কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবকে—পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের যে-কোন একটি অসম্মতিজ্ঞাপক ভোটপ্রদানের সাহায্যে বাতিল করিয়া দিতে সমর্থ। স্থায়ী সদস্যদের এই ক্ষমতাই 'ভিটো' (Veto) নামে পরিচিত। ইহার ফলে কোন স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অথবা কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্থায়ী সদস্যের কোনটির সাহায্য পাইলে তাহার বিরুদ্ধে শক্তি-প্রয়োগের ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না।

নিরাপত্তা পরিষদে ভোটদান পদ্ধতি

অনেকের মতে, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির 'ভিটো' (Veto) ক্ষমতাই হইল জাতিপুঞ্জের দুর্বলতার প্রকৃত কারণ এবং ইহার জন্যই সামগ্রিক নিরাপত্তার (Collective Security)

ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করা যাইতেছে না। কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সামগ্রিক নিরাপত্তার পথে প্রকৃত বাধা 'ভিটো' ক্ষমতা নয়, প্রকৃত বাধা হইল আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি এত শক্তিশালী যে তাহাদের কোনটির বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগের অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াইবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।* অথচ এই যুদ্ধের বিলুপ্তিসাধনের জন্যই জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের পক্ষে পৃথকভাবে অথবা অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত যৌথভাবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পথে ভিটো ক্ষমতা কোনপ্রকার বাধার সৃষ্টি করে না; কারণ জাতিপুঞ্জের সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি কোন আক্রমণ হয় তাহা হইলে যে-পর্যন্ত-না নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে সে-পর্যন্ত সদস্য-রাষ্ট্রের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার রহিয়াছে। আবার যদি নিরাপত্তা পরিষদ 'ভিটো' প্রয়োগের ফলে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলেও সদস্য-রাষ্ট্রের এই অধিকার থাকে। আসল কথা হইল, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার উপর। 'ভিটো' ব্যবস্থা থাকুক আর নাই থাকুক এই সহযোগিতার অভাব হইলে বিশ্বশান্তি কোনক্রমেই সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। বরং 'ভিটো' ব্যবস্থা থাকায় নিরাপত্তা পরিষদের নামে বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হইতে পারে না এবং জাতিপুঞ্জকে হেয় প্রতিপন্ন করা সহজে সম্ভব হয় না।

'ভিটো' ক্ষমতার আলোচনা

৩। আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice): ইহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিচার বিভাগ। এই বিচারালয় ৯ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ১৫ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। সংবিধানের অন্তর্গত যে-কোন বিষয় এই বিচারালয়ের এলাকাধীন। জাতিপুঞ্জের যে-কোন সদস্য এই বিচারালয়ে মামলা রুজু করিতে পারে।

জাতিসংঘের (League of Nations) অধীনে যখন প্রথম আন্তর্জাতিক আদালতটি স্থাপিত হয় তখন উহার নাম ছিল আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের চিরস্থায়ী আদালত (Permanent Court of International Justice)। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনে নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হইয়াছে আন্তর্জাতিক বিচারালয় বা আদালত (International Court of Justice)। অধ্যাপক সুম্যানের মতে, ইহার কারণ বোধ হয় যে ন্যায়বিচার কোন আন্তর্জাতিক ব্যাপার নয় এবং ইহার জন্য প্রতিষ্ঠিত আদালতও চিরস্থায়ী হইতে পারে না—ইহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ-প্রণেতৃবর্গ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।** যাহা হউক, এই আদালতের এক্তিয়ার ও কার্যাবলী পূর্বতন আন্তর্জাতিক আদালতের মতই।

আন্তর্জাতিক আদালতের নূতন নাম ও উহার কারণ

* "Collective coercion of any of the major powers will result in another world war." Schuman

** "The change of nomenclature perhaps suggests, albeit unintentionally, that "justice" is seldom "international" and that courts among nations are peculiarly impermanent."

৪। **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)**ঃ ইহা সাধারণ পরিষদ দ্বারা মনোনীত ১৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত। এই পরিষদের উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা। ঐ একই উদ্দেশ্যে এই পরিষদের সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন মানব-হিতকর প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ; খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান; শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান; আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার; বিশ্ব-ব্যাংক; বিশ্ব স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত হওয়া ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মানব-হিতের জন্য অনেকগুলি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'মানুষের অধিকারের উপর কমিশন' (Commission on Human Rights), অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের উপর কমিশন (Commission on Economics and Employment) এবং ইয়োরোপের জন্য অর্থনৈতিক কমিশন (Economic Commission for Europe) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত কমিশনের ফলে ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা বিশ্বজনীনভাবে মানুষের অধিকার ঘোষণা করিয়াছে।

এই পরিষদের সহিত সংযুক্ত কয়েকটি মানব-হিতকর প্রতিষ্ঠান আছে

৫। **অভিভাবক পরিষদ (Trusteeship Council)**ঃ স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতকগুলি অনুন্নত দেশের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছে। এই তত্ত্বাবধানকার্য পরিচালনা করে অভিভাবক পরিষদ। এই পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যগণও আছে।

উপরি-উক্ত বিভাগগুলি ছাড়া জাতিপুঞ্জের একটি কর্মদপ্তর আছে। কর্মদপ্তর প্রধান কর্মসচিবের (Secretary-General) তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ সভা কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। কার্যকাল শেষ হইলে পুনর্নিযুক্তও হইতে পারেন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যকারিতা (The U. N. at Work)ঃ গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা, বিশেষত কোরিয়ার ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বলিতে পারা যায় যে, বিরাট আয়োজন ও সংগঠন সত্ত্বেও জাতিপুঞ্জ শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও নিরাপত্তা রক্ষায় বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। শান্তিভংগের আশংকা এখনও দূরীভূত করা সম্ভব হয় নাই। সকল জাতিই আজ সমরায়োজনকে দৃঢ় করিতে ব্যস্ত। জাতিতে জাতিতে মনোমালিন্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্বের ন্যায় পুরাদমেই চলিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাতিপুঞ্জের এই যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কারণ কি? অনেকের মতে, জাতিপুঞ্জের অকার্যকারিতার দুইটি প্রধান কারণ হইল (১) নিরাপত্তা পরিষদের ভোটপদ্ধতি, এবং (২) শান্তিভংগকারীকে শাস্তিপ্রদানের জন্য জাতিপুঞ্জের নিজস্ব

জাতিপুঞ্জের দুর্বলতা ও তাহার কারণ

শক্তির অভাব। কিন্তু আসল কারণের সন্ধান পাওয়া যায় অন্যত্র। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে জাতিপুঞ্জকে দুই প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া জাতিপুঞ্জ রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়ত; চরম অবস্থায় জাতিপুঞ্জ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সামগ্রিক শক্তি প্রয়োগ করিবে। এই দুই কার্য সম্যকভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিগুলির মধ্যে সহযোগিতা থাকা আবশ্যিক-ভাবে প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে যেভাবে সহযোগিতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে আশা করা হইয়াছিল যে যুদ্ধোত্তরকালে উহা বজায় থাকিবে। কিন্তু এই ধারণা মিথ্যায় পর্যবসিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শক্তিপ্রসারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ ভালভাবে জমিয়া উঠিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক দলের পুরোভাগে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর অপর দলের নেতৃত্ব করিয়া চলিয়াছে সোবিয়েত ইউনিয়ন; এবং জাতিপুঞ্জ স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার ফলে যে যুদ্ধের আবহাওয়া পৃথিবীকে ঘিরিয়া আছে তাহাকেই সংক্ষেপে

স্নায়ু যুদ্ধ

স্নায়ু যুদ্ধ (cold war) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।* অর্থাৎ, পৃথিবীতে যুদ্ধ না বাধিলেও যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে, যুদ্ধের আবহাওয়া বর্তমান আছে। ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। স্বভাবতই জাতিপুঞ্জও ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

জাতিপুঞ্জ যে বৃহৎ শক্তিদের কূটনৈতিক রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে তাহা অতীত ও সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে। ১৯৪৬ সালে নিরাপত্তা পরিষদ প্রথম মিলিত হইবার দুই দিন পরেই ইরাণ অভিযোগ করে যে, সোবিয়েত ইউনিয়ন তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছে। এই অভিযোগ করিবার পিছনে প্রেরণা যোগায় ব্রিটেন। সোবিয়েত ইউনিয়ন ইহার প্রত্যুত্তরে অভিযোগ করে যে, গ্রীস এবং ইন্দোনেশিয়ায় ব্রিটিশ সৈন্য থাকায় শান্তিভংগের আশংকা দেখা দিয়াছে। ইহার পর একাধিক প্রস্তাবে ব্রিটেন এবং

বিবাদ-মীমাংসায় জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা এবং বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোবিয়েত ইউনিয়নকে 'ভিটো' প্রয়োগ করিতে একরকম বাধ্য করিয়াছে। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহার দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে সোবিয়েত ইউনিয়ন 'ভিটো' শক্তির অপপ্রয়োগ করিয়া নিরাপত্তা পরিষদকে পংগু করিয়া রাখিয়াছে। এমনকি 'ভিটো' ব্যবস্থাকে উঠাইয়া দিবার এবং সোবিয়েত ইউনিয়নকে জাতিপুঞ্জ হইতে বিতাড়িত করিবার আন্দোলনও চালান হয়। ইহার পর

* The tension which developed between Soviet Union and Western Powers in post war period came to be known as the 'cold war'. G. C. Smith, Pattern of the Post War World

সুয়েজ সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রিটেন ও ফ্রান্সই ভিটোর আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে মার্কিন গোয়েন্দা বিমান সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য শীর্ষ সম্মেলন ভণ্ডুল করিয়াই সোবিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদে দাবি করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এইরূপ গর্হিত কার্য বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা হউক। এই আলোচনা বা ব্যবস্থা সম্পর্কেও যে 'ভিটো' প্রয়োগের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। পুরাতন বিবাদসমূহ ধরিলে দেখা যায় যে প্যালেষ্টাইনে গণ্ডগোল, কাশ্মীর সমস্যা ইত্যাদি ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ সন্তোষজনক মীমাংসা কিংবা কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন কোনটাই করিতে পারে নাই। বার্লিন ও জার্মান সমস্যার সমাধানও আজ পর্যন্ত হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ার সমস্যার যে সমাধান হইয়াছে তাহাতে জাতিপুঞ্জের অবদান অতি সামান্যই। কোরিয়ার ঘটনাবলী প্রথম প্রমাণ করে যে পশ্চিমী শক্তিগুলি তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ লইয়া জাতিপুঞ্জকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই সত্য আবার পুনঃপ্রমাণিত হয় কাশ্মীরের ব্যাপারে। বর্তমানে পশ্চিমী শক্তিগুলি কাশ্মীরকে লইয়া একপ্রকার জুয়াখেলা করিতেছে বলা চলে। ঐ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই আবার পশ্চিমী শক্তিগুলি নয়া চীনকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে জাতিপুঞ্জের বাহিরে রাখিয়াছে। অপরপক্ষে সোবিয়েত ইউনিয়ন সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমী শক্তিগুলিকে প্রতিহত করিবার জন্য ক্রমাগত 'ভিটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে। এইভাবে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হিসাবে জাতিপুঞ্জকে ব্যবহার করা হইতেছে। এই প্রসংগে অধ্যাপক সুম্যান (Frederick L. Schuman) যে উক্তি করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি তাহাদের বিবাদ জাতিপুঞ্জের বাহিরে সীমাবদ্ধ রাখিয়া নূতন সংগঠনটিকে অ-রাষ্ট্রনৈতিক সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধান করিতে দিলেই বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিত। সুতরাং জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত ইউনিয়নের বুঝাপড়ার মনোভাবের উপর। এ-মনোভাবের লক্ষণ যখন এখনও প্রকাশ পায় নাই তখন জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করা যায় কিরূপে? অনেকে এ-উক্তিও করিয়া থাকেন যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জাতিসংঘের পথেই চলিয়াছে।* সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ ব্যর্থতা অতি শীঘ্রই ঘোষিত হইবে।

কোরিয়া ও কাশ্মীর

নয়া চীন

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জাতিসংঘের পথেই চলিয়াছে

সভ্যতার সংকট (Crisis in Civilization) : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার পরও সভ্যতার সংকট ঘুচিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আদর্শ ও স্বার্থের সংঘাতের ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যসমূহ একরূপ স্বপ্নালোকে রহিয়া

সভ্যতার সংকট ঘুচে নাই

* "From a broader perspective the U. N... has become what the League was in the 1930's : an instrument of national policy on the part of the most influential Great Powers among its members." Schuman

গেল। পৃথিবী হইতে যুদ্ধের ছায়া দূর হইল না, মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইল না, পরাধীন জাতিসমূহ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাইল না। ইহার ফলে একদিকে নানাস্থানে জাতীয় আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করিল; অপরদিকে জাতীয় আন্দোলন নব রূপ পরিগ্রহ করিল। সকল দিক দিয়া এসিয়া হইয়া দাঁড়াইল ঘূর্ণিকেন্দ্র। আফ্রিকাও ঝটিকার আন্দোলন হইতে বাদ গেল না। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকায় ইয়োরোপীয় জাতিসমূহ আঞ্চলিক জোটে সমবেত হইতে লাগিল।

এসিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঘূর্ণিকেন্দ্র

এই অবস্থা এখনও অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। জাতীয় রাষ্ট্রের দিন বোধ হয় একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সক্রিয় শক্তি হিসাবে জাতীয়তাবাদের দিন এখনও ফুরায় নাই। রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে ধ্রুবতারকা করিয়া শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের জাতীয়তাবাদিগণ এখনও পথ চলিতেছেন। এই মনোভাব ও লক্ষ্য লইয়া আন্তর্জাতিকতার পথ প্রশস্ত করা যায় না। সুতরাং আদর্শবাদী এখনও নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিতেছেন—যাহার জন্য মানুষ যুগে যুগে সংগ্রামে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছে। অপরদিকে রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিক বিচার করিতেছেন জাতীয়তাবাদের বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের যাহার মাধ্যমে এই নূতন পৃথিবীর সংগঠন সম্ভবপর হইতে পারে।

জাতীয় রাষ্ট্রের দিন শেষ হইলেও জাতীয়তাবাদের দিন ফুরায় নাই

জাতীয়তাবাদের বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ, আঞ্চলিক শক্তিজোট, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠন, বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিপুঞ্জের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতাই প্রধান। নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

জাতীয়তাবাদের বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism): বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদকে জাতীয়তাবাদের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কল্পনা করিতে হইলে অনুমান করিয়া লইতে হয় যে, একটিমাত্র শক্তির পক্ষে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া শাসন করা সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে মাত্র দুইটি শক্তিকে—যথা, সোবিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই কার্যসাধনে সমর্থ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে উহাদের কাহারও পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। বিশ্বজনীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উহাদের যে-কোনটিকেই অপরটির বিরুদ্ধে জীবনমরণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইতে হইবে। এই দ্বন্দ্বের পর মানবজাতি যদি আবার সংগঠিত সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনে সমর্থ হয় তবেই নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে। এইরূপ পৃথিবী একটিমাত্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে পারিবে। কিন্তু উক্ত দ্বন্দ্বের পর মানবজাতির অস্তিত্ব থাকিবে কিনা তাহাই হইল মূল প্রশ্ন। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদের কোন বিকল্প ব্যবস্থা নহে।

সাম্রাজ্যবাদ জাতীয়তাবাদের বিকল্প ব্যবস্থা নহে

আঞ্চলিক শক্তিজোট (Regional Associations): সন্নিহিত রাষ্ট্রসমূহের আঞ্চলিক শক্তিজোটকেও অনেক সময় জাতীয় রাষ্ট্রের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা হয়। রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে আঞ্চলিক শক্তিজোটে সম্মিলিত হওয়াকে 'একের পরিবর্তে বহু পৃথিবীর দিকে গতি' (the tendency towards several worlds instead of one) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই বহু পৃথিবীময় ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা হইল বিভিন্ন শক্তিজোটের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সমস্যা উপরন্তু শক্তিজোটে সম্মেলন রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণা ও অর্থ-ব্যবস্থার সমতার উপর নির্ভরশীল। এই দুই কারণে আঞ্চলিক শক্তিজোটকেও জাতীয় সার্বভৌমিকতার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা যায় না।

আঞ্চলিক শক্তিজোট ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্থানাধিকার করিতে পারে না

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (A World Federation): বিশ্বজনীন যুক্তরাষ্ট্রের কল্পনা দার্শনিকগণকে অনেক সময় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র যদি পরস্পরের সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়া শক্তি, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে পারে তবে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সমবায়ে এক বিশ্বজনীন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব ও অস্তিত্ব প্রধানত জাতীয় ভাবের উপর নির্ভরশীল; কিন্তু এই জাতীয় ভাবের ধ্বংসই হইল বিশ্বজনীন যুক্তরাষ্ট্রের মূলমন্ত্র। সুতরাং জাতীয় রাষ্ট্রের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বজনীন যুক্তরাষ্ট্রের কল্পনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বস্তুত, বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা যে সর্বরোগহর ঔষধের ন্যায় বিশ্বজনীন সকল রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানে সমর্থ এ-ধারণার দিন বর্তমানে আর নাই।*

বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বাস বর্তমানে আর নাই

বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক আইন (Universal International Law): বর্তমানে বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিষ্ঠাকেই জাতীয় রাষ্ট্রের সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থা বলিয়া ধরা হয়। বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিষ্ঠা কার্য প্রধানত দুই উপায়ে সম্পাদন করা যাইতে পারে: (ক) সামগ্রিক নিরাপত্তার (collective security) মাধ্যমে; এবং (খ) বিশ্বজনীন অধিকার ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক বিচার-ব্যবস্থার মাধ্যমে। ইহাদের মধ্যে সামগ্রিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রসংগে পূর্বেই করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা সহজ হইলেও সামগ্রিক নিরাপত্তাকে কার্যকর করা একরূপ দুষ্কর। বিশ্বজনীন অধিকার ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি প্রযোজ্য। বিশ্বজনীনভাবে মানব অধিকার ঘোষণা করা হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক আদালতও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিচারালয়ের মাধ্যমে অধিকার সংরক্ষিত হয় নাই। এই প্রসংগে অধ্যাপক ফ্রীড্‌ম্যান

* "One of the few fortunate developments of recent international politics is a healthy distrust of panaceas. The magic of federalism is one of them." Friedmann

বলেন যে, মানব-অধিকারের সংহিতা মাত্র তখনই কার্যকর হইতে পারে যখন সমগ্র মানবগোষ্ঠী একই ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী এবং একই পথের যাত্রী হয়।

এইরূপ বিশ্বজনীন সম্প্রদায়ের উদ্ভব এখনও ঘটে নাই। ফলে স্বভাবতই বিশ্বজনীন মানব অধিকার ও বিচার-ব্যবস্থা কল্পনালোকেই রহিয়া গিয়াছে।

বিশ্বজনীন মানব অধিকার ও বিচার-ব্যবস্থা কার্যকর হয় নাই

রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা (Functional Collaboration among Nations): জাতিসংঘ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ন্যায় আন্তর্জাতিক সংগঠনের অকার্যকরত জাতিসমূহকে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে বাধ্য করিয়াছে বলা যায়। ফলে তাহারা যথা, দারিদ্র্য ও ব্যাধি দূরিকরণ, আন্তর্জাতিক রীতিনীতির ভিত্তিতে শ্রম সংগঠন, কৃষি-উন্নয়ন ও খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে পরস্পরের সহিত সমবায়িক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। অনেকে ইহাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাম্য অবস্থার উদ্ভব বলিয়া গণ্য করেন। কাম্য হইলেও কর্মক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে সকল আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের অপূর্ব সমাধান বলিয়া মনে করা ভুল। তখনই অপূর্ব সমাধানের সাক্ষাৎ মিলিবে যখন সকল জাতি তাহাদের বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ একসংগে করিয়া একই উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হইবে। সেদিন এখনও আসে নাই। এখনও জাতিগোষ্ঠীর অনেকে বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, বিশ্বব্যাংক প্রভৃতির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে।

কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা কাম্য রূপ গ্রহণ করে নাই

উপসংহার: একজন সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য কথা-সাহিত্যিক আমাদের যুগকে দুর্ভাগ্যমূলক বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই কারণেই আমরা ইহাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইতে অস্বীকার করিব। আলোড়নের ফলে আমরা ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়িয়া গিয়াছি সত্য কিন্তু ইহাদের মধ্য হইতে আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসগৃহ নির্মাণ করিতে হইবে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বপ্ন দেখিতে হইবে। এ-কার্য অতি-কঠিন সন্দেহ নাই; কিন্তু ভবিষ্যৎ অভিমুখে কোন ত' পাকা সড়ক নাই। হয় আমাদের ঘুরিয়া যাইতে হইবে, না-হয় বাধাবিপত্তির নিকট হার মানিতে হইবে। যতই আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক না কেন আমাদের বাঁচিতেই হইবে।*

উপসংহার

প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলিতে পারি যে আমাদিগকেও এক পৃথিবীর স্বপ্ন সফল করিতে হইবে।

---

* "Ours is essentially a tragic age, so we refuse to take it tragically. The cataclysm has happened, we are among the ruins, we start to build up new little habitats, to have new little dreams. It is rather hard work : there is no smooth road into the future : but we go round, or scramble over the obstacles. We've got to live, no matter how many skies have fallen." D. H. Lawrence, Lady Chatterley's Lover

সংক্ষিপ্তসার

অতিজাতীয় আন্দোলন : সুদূর অতীতকাল হইতেই আদর্শবাদী দার্শনিক নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন—যে-পৃথিবী শান্তি, মৈত্রী ও সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত হইবে। উনবিংশ শতাব্দী অবধি অবশ্য এই স্বপ্ন কার্যক্ষেত্রে মোটেই ফলপ্রসূ হয় নাই বলা চলে। তারপর ধীরে ধীরে ঘটিতে লাগিল মানুষের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন। একদিকে গঠিত হইল পবিত্র মৈত্রী এবং ইয়োরোপের কনসার্টের মত কূটনৈতিক সংগঠন এবং অপরদিকে ক্রমবিকশিত হইল আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়নের মত একাধিক সমাজমূলক প্রতিষ্ঠান। ইহার মধ্যে অবশ্য কূটনৈতিক সংগঠনগুলি বিশেষ সফল হইতে পারে নাই।

অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে অতিজাতীয় আন্দোলনের উদাহরণস্বরূপ 'হেগ সম্মেলন' এবং আন্তর্জাতিক সালিসী আদালতের উল্লেখ করা যায়। পূর্বের মত ইহারাও সার্থক হয় নাই।

জাতিসংঘ : অতিজাতীয়তার স্বপ্ন সফল করিবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা করা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার দ্বারা। জাতিসংঘ রাষ্ট্র বা অতিজাতীয় রাষ্ট্র—কোনটিই ছিল না। ইহার সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমিকতা অক্ষুণ্ণই ছিল। স্বেচ্ছায় গৃহীত চুক্তিপত্রের সর্তাদি পালন ব্যতীত অন্য কোন দায়িত্ব সদস্য-রাষ্ট্রগুলির ছিল না।

জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 'সভা' (Assembly), 'পরিষদ' (Council) এবং কর্মদপ্তরই (Secretariat) ছিল প্রধান। ইহা ছাড়া জাতিসংঘের অংগীভূত না হইলেও উহার সহিত সম্পর্কিত একটি 'স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত' ছিল।

জাতিসংঘ রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করিতে না পারিলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বহু পরিমাণে সার্থক হইয়াছিল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হয়। সামগ্রিক নিরাপত্তার (Collective Security) মাধ্যমেই এই কার্য সম্পাদন করা হইবে। উপরন্তু, সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রচেষ্টা, মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা, জাতিসমূহের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা, পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দান করা, ইত্যাদিও হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য।

জাতিপুঞ্জ এক বিরাট সংগঠন। ইহার প্রধান বিভাগগুলি হইল : 'সাধারণ সভা' (General Assembly), 'নিরাপত্তা পরিষদ' (Security Council), 'আন্তর্জাতিক বিচারালয়' (International Court of Justice), 'অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ' (Economic and Social Council) এবং অভিভাবক পরিষদ (Trusteeship Council)।

বিবাদ-মীমাংসায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সার্থকতার পরিচয় দিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ যে, ইহা বৃহৎ শক্তিগুলির কূটনৈতিক রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অনেকে এই আশংকা করে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চরম ব্যর্থতা শীঘ্রই ঘোষিত হইবে।

সভ্যতার সংকট : জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার পরও সভ্যতার সংকট ঘুচিল না, পৃথিবী হইতে যুদ্ধের ছায়া দূর হইল না। স্বভাবতই দার্শনিকগণ জাতীয়তাবাদের বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ লইয়া আলোচনা করিতেছেন। এই বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে (ক) সাম্রাজ্যবাদ, (খ) আঞ্চলিক শক্তিজোট ; (গ) বিশ্বজনীন যুক্তরাষ্ট্র, (ঘ) বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক আইন এবং (ঙ) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে

কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতাই প্রধান। কিন্তু এগুলির কোনটিই প্রকৃত বিকল্প ব্যবস্থা নহে। সুতরাং বলা যায় যে, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বসমৃদ্ধি পূর্বের মত স্বপ্নালোকেই রহিয়াছে। কিন্তু আশাবাদী বলেন, যতই আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক না কেন 'এক পৃথিবীর স্বপ্ন' আমাদিগকে সফল করিতেই হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the objects, composition and functions of the United Nations.

(৪০১-৪০৭ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the present weaknesses of the United Nations. What do you think to be its future ?

[ইংগিত: নানাদিক দিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। বিরাট আয়োজন ও সংগঠন সত্ত্বেও জাতিপুঞ্জ শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও নিরাপত্তা রক্ষায় বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই। শান্তিভংগের আশংকা এখনও দূরীভূত করা সম্ভব হয় নাই; সকল জাতিই আজ সমরায়োজনকে দৃঢ় করিতে ব্যস্ত।

অনেকের মতে, জাতিপুঞ্জের অকার্যকারিতার প্রধান কারণ মাত্র দুইটি (১) নিরাপত্তা পরিষদের ভোট পদ্ধতি, এবং (২) শান্তিভংগকারীকে শাস্তিপ্রদানের জন্য জাতিপুঞ্জের নিজস্ব শক্তির অভাব। আসল কারণের সন্ধান পাওয়া যায় অন্যত্র। বিবাদ-বিসংবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য যে সামগ্রিক শক্তি প্রয়োগ আবশ্যক তাহা বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই সহযোগিতার স্থলে দেখা দিয়াছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সমগ্র পৃথিবী দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক দলের পুরোভাগে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; অপর দলের নেতৃত্ব করিয়া চলিয়াছে সোবিয়েত ইউনিয়ন; এবং জাতিপুঞ্জকে স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে।

এরূপ পরিস্থিতিতে জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করা কঠিন। অনেকে বলেন যে, বিগত তিন দশকের জাতিসংঘের (League of Nations) ন্যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ব্যর্থতার পথেই চলিয়াছে।... এবং ৪০৫-৪০৬ এবং ৪০৭-৪০৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

3. Consider the main alternatives to nationalism. (৪১০-৪১২ পৃষ্ঠা)

লেখক ও বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

আ

শুদ্ধি

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হইবে
৬৭	১	১৬৬১ সালে	১৬'৫'১ সালে
৮৫	২০	এই সকল ধর্মী	এই সকল ধর্মীয়
		পুরোহিতদের	রাষ্ট্রে পুরোহিতদের
৩৪৯	২২	সংকটেরস ম্মুখীন	সংকটের সম্মুখীন